pproved by the University of Calcutta
(*Calcutta Gazette 18. 11. 43.*)

নব প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে লিখিত

বিজ্ঞান

[প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য]

বিজ্ঞান-সোপান, বিজ্ঞান (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর),
প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা
বাগনান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক,
ক্যালকাটা বয়েজ (ইউরোপীয়) স্কুলের প্রধান গণিত ও
বিজ্ঞান শিক্ষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
'ট্রেনিং সার্টিফিকেট' প্রাপ্ত

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল, বি. এস্-সি.

প্রণীত

এজেন্ট

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫ কলেজ স্কোয়ার

দি বুক কোম্পানি লিমিটেড্
৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

মূল্য ২৷৷০ আনা

মুদ্রণ

শ্রীসমরেন্দ্র ভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী
এম. আই. প্রেস
৩০নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীজগদানন্দ দে, বি এ., বি. এল্.,
৩০নং গোরাচাঁদ বোস রোড,
কলিকাতা।

সূচী

পদার্থ-বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা

ভূ-বিদ্যা

উদ্ভিদ-বিদ্যা

প্রাণী-বিদ্যা

শারীর-বিদ্যা

---

*চিহ্নিত অংশগুলি বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগেব ডিরেক্টাব মহোদয় প্রবর্তিত নহে, কেললমাত্র কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নব প্রবর্তিত সিলেবাসের জন্য প্রয়োজন।

SYLLABUS

1. The three states of matter Physical properties of air and water. Buoyancy and Archimedes' principle. Pressure of atmosphere. Effect of heat on water Effect of heat on air. Ventilation Effect of heat on solid bodies Pendulum Clock and Thermometer. Transference of heat. Simple ideas reagrding energy and its transformation with examples. Rectilineal propagation of light. Phenomena of reflection and refraction of light. colour and rainbow. Lodestone. magnetisation. terrestrial magnetism and compass Simple Electric Cell Conductors and insulators Effects of current : (a) heating and lighting. (b) chemical (c) magnetic Electro-magnet and Electric Bell Telegraphy

2 Separation of Mixtures—solution. filtration. crystallisation. distillation sublimation Rusting of iron and burning of candle. magnesium and sulphur in a closed volume of air over water Air—its composition Properties of Oxygen Nitrogen and Carbon dioxide. Water—its composition Properties of Hydrogen. Natural and aerated waters Properties of hard and soft water Characteristics of chemical compounds

3 * Observation and identification of the principal constellations. major stars and planets throughout the year at night The Sun—its dimension and distance from the earth Planetary system—relative positions * Solar year and seasons. Eclipses of sun and moon * Comets and meteors.

4. The Earth—condensation from a hot gaseous state—its crust—igneous and sedimentary rocks * Probable condition of the interior of the earth Earth movements (earthquake) * folding. *landslide Volcano. Varieties of soil and their bearing on plant life and agricultural operations The Story of the formation of coal and mineral oil.

* Not laid down by the D P. I., Beegal,—required only for the matriculation Examination of the Calcutta University

শিক্ষাগুরু



স্বর্গীয় অধ্যাপক **রজনীকান্ত দে** এম এ., বি এস-সি., বি এল.

যাহার অপরিমেয় মহানুভবতায় আমি পাঠ্য পুস্তক রচনায়
অসামান্য সাহায্য পাই তাঁহার উদ্দেশ্যে
—উৎসর্গ করিলাম—

"বিজয়"

বিজ্ঞান

(পদার্থ-বিদ্যা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

পদার্থের অবস্থা

ওই যে বই, খাতা, পেন্‌সিল ইত্যাদি পড়িয়া আছে,—চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি এই ঘরে রহিয়াছে, ইহাদের সকলকে আমরা দেখিতে পাইতেছি। ভাত, ডাল, চিনি, মিছরি ইত্যাদি দেখিতেও পাই এবং খাইয়াও ইহাদের আস্বাদ পাই। ফুলের গন্ধ পাই, আতরের গন্ধ পাই, পুকুরের পচা জলের গন্ধ পাই। আবার বায়ু দেখিতে পাই না বা খাইয়াও ইহার আস্বাদ বুঝিতে পারি না বটে, তথাপি বায়ু বহিলে আমাদের শরীরে আসিয়া লাগে—তখন ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি; বায়ু বহিলে গাছপালা নড়ে, ইহাও দেখিতে পাই। উত্তাপও আমরা স্পর্শ-শক্তি দ্বারা অনুভব করিতে পারি।

এই রকম সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দকে আমরা দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহাদের কতকগুলির ওজন আছে এবং কতকগুলির নাই। এ জগতে যাহার ওজন আছে তাহাই **পদার্থ** (Matter)। অধিকাংশ পদার্থই আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু এমন পদার্থ আছে যাহাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারি না। অতিশয় মন্থর বায়ু অথবা অনেক বায়বীয় বস্তু আমরা চোখে দেখিতে পাই না, স্পর্শশক্তি বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না, অথচ ইহাদের ওজন আছে বলিয়া বায়ু বা বায়বীয় বস্তুগুলি পদার্থ। অন্যদিকে আবার

শব্দ শুনিতে পাই, আলো দেখিতে পাই—কিন্তু ইহাদের ওজন নাই বলিয়া ইহারা পদার্থ নহে। অথচ ইহাদের প্রভাবে পদার্থের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাতেই ইহাদের ক্রিয়াশীলতা ও অস্তিত্ব অনুভব করি—ইহারা শক্তি। শক্তি ও পদার্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পদার্থের উপর শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু শক্তি রহিত পদার্থ কল্পনা করা যায় না।

বস্তুত পদার্থ মাত্রেরই নিম্নলিখিত গুণগুলি আছে—

১। **ওজন** (Weight) :—যে পরিমাণ শক্তিতে পৃথিবী পদার্থ নিচয়কে আপন কেন্দ্রের অভিমুখে টানে তাহাই পদার্থের ওজন।

২। **বিস্তৃতি** (Extension) :—প্রত্যেক পদার্থই থাকিবার জন্য কিছু না কিছু স্থান অধিকার করিবেই, এই গুণের নাম বিস্তৃতি।

৩। **অভেদ্যতা** (Impenetrability)—একই সময়ে একই স্থানে একাধিক পদার্থ থাকিতে পারে না। এই গুণের নাম অভেদ্যতা। কাঠে পেরেক মারিলে পেরেক ইহার মধ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু পেরেক যে স্থান অধিকার করে সে স্থান হইতে কাঠ সরিয়া যায়। অতএব একই সময়ে একই জায়গায় কাঠ এবং পেরেকের স্থান হয় না। কাঠকয়লা জলে ডুবাইলে উহার মধ্যে জল প্রবেশ করে, কিন্তু কদাচ মনে করিও না কয়লার অণু ও জলের অণু একই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ফলত কয়লার অণুর ফাঁকে যে স্থানে পূর্বে বায়ু ছিল তাহাদিগকে সরাইয়া সে স্থানে জল প্রবেশ করে। তাই কাঠ কয়লা জলে ডুবাইলে বুদ্‌বুদ উঠিতে দেখা যায়।

৪। **জড়তা** বা নিষ্ক্রিয়তা (Inertia) :—যে পদার্থ চলিতেছে তাহা চিরকাল চলিতে থাকিবে এবং যাহা স্থির আছে তাহা চিরকালই স্থির থাকিবে যতক্ষণ না অন্য কোন শক্তি তাহাকে বাধা দেয়। এই গুণের জন্যই চলন্ত গাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেলে গাড়ীর ভিতরের মানুষ বা মালপত্র ধাক্কা খায়। অসাবধান হইয়া চলন্ত গাড়ী হইতে নামিবার সময় মাটিতে পা ঠেকিলে শরীর ঝুঁকিয়া যায়।

৫। **মহাকর্ষ** (Gravitation) :—এই গুণের জন্য প্রত্যেক পদার্থ প্রত্যেক পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। আয়তন (Volume) এবং ভর (Mass) হিসাবে এই আকর্ষণ শক্তি কম বেশী হইয়া থাকে। পৃথিবীর আয়তন পার্থিব সকল পদার্থ অপেক্ষা অধিক। পৃথিবী সকল বস্তুকেই অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক জোরে আকর্ষণ করিতেছে, সেইজন্য সকল পদার্থই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নামিতে চেষ্টা করে এবং যে কোন জিনিষ উপরে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীতে পড়ে।

৬। **বিভাজ্যতা** (Divisibility) :—প্রত্যেক পদার্থকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ভাগ করা যায়। এক বালতি জলে বিন্দুমাত্র ম্যাজেণ্টা রং দিলে সমস্ত বালতির জল লাল হইয়া যায়। তাহা হইলে এক বিন্দু রং আবার বিভক্ত হইয়া এক বালতি জলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। রংএর অণুগুলি ইহা হইতে আরও সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত হইতে পারে।

৭। **সরন্ধ্রতা** (Porosity) :—সকল পদার্থের অণুর মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁক থাকিয়া যায়, যদিও এই ফাঁক আমরা খুব ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাই না। কাঠ কয়লার জল শোষণ এই গুণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৮। **স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity) :—চাপ দিয়া সকল পদার্থকেই অল্প বিস্তর চুপসাইতে পারা যায় এবং চাপ সরাইলে ঐ সকল পদার্থ পূর্বের আয়তন ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করে। কঠিন ও তরলপদার্থে এই গুণ বিশেষ পরিস্ফুট নয়।

৯। **সংশক্তি** (Cohesion) :—এই গুণের জন্য পদার্থের অণুগুলি পরস্পর আপনাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে।

১০। **রোধ** (Resistance) :—এই গুণের জন্য প্রত্যেক পদার্থ অপর পদার্থকে ইহার ভিতর প্রবেশ করিতে দেয় না।

এতদ্ভিন্ন কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্রত্যেকের আবার বিশেষ বিশেষ গুণ আছে।

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে আমরা তিন রকম অবস্থায় দেখিতে পাই—**কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।** পাথর, ইট, কাঠ প্রভৃতি কঠিন পদার্থ, জল, তেল, দুধ ইত্যাদি তরল পদার্থ এবং বায়ু, হাইড্রোজেন ইত্যাদি গ্যাসীয় পদার্থ।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন পদার্থ মাত্রই অসংখ্য অণুর সমষ্টি এবং সেই অণুগুলি সর্বদা পরস্পর টানাটানি করিতেছে, ফলে অণুগুলি সর্বদাই স্পন্দিত হইতেছে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে এই স্পন্দন আমরা চোখে দেখিতে পাই না, এমনকি খুব ভাল অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও এই স্পন্দন দেখিতে পাওয়া যায় না। পদার্থের অণুগুলির পরস্পর এই আকর্ষণের জন্যই তাহাদের তিন রকম অবস্থা। কঠিন পদার্থের অণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ অতীব অধিক, তরল পদার্থে কিছু কম এবং বায়বীয় পদার্থে এরূপ আকর্ষণ একেবারেই নাই বলিলেও চলে।

৯। **কঠিন পদার্থে** অণুগুলির আকর্ষণ এত অধিক যে অণুগুলি একস্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে যাইতে পারে না, কেবলমাত্র যে যেখানে থাকে সে সেইখানে থাকিয়া পাশের অণুগুলিকে টানাটানি করিতে থাকে এবং স্পন্দিত হইতে থাকে। অবশ্য জোর করিয়া পদার্থটিকে ভাঙ্গিয়া ইহার অণুগুলি পৃথক্ করিতে পারা যায়। এই আকর্ষণের জন্য অণুগুলি একত্রে এত অধিক জোরে জমাট বাঁধিয়া থাকে যে কঠিন পদার্থে হাত দিয়া বেশ বুঝা যায় ইহারা শক্ত। কোন পাত্রে রাখিলে নিজ ভারহেতু ইহারা কেবলমাত্র পাত্রের তলদেশে চাপ দেয়। ইহাদের একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে—তাহাদিগকে সহজে নষ্ট করা যায় না। সে জন্য ইহাদিগকে যে কোন আকারের বা আয়তনের পাত্রের ভিতর রাখিতে পারা যায় না। একটি কঠিন পদার্থের ভিতর আর একটি কঠিন পদার্থ সহজে প্রবেশ করান যায় না।

তরল পদার্থে অণুগুলির আকর্ষণ তত প্রবল নয়। কাজেই অণুগুলি অল্প জোর পাইলে ইহার মধ্যেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্বচ্ছন্দে সরিয়া যাইতে

পাবে। এইজন্য তবল পদার্থেব নির্দিষ্ট আকাব থাকে না – যখন যে পাত্রে বাখা যায তখন সেই পাত্রেব আকাব ধাবণ কবে। যে পাত্রে বাখা যায় তরল পদার্থ সেই পাত্রেব তলদেশে এবং পাশে চাপ দিতে পাবে। তবল পদার্থেব উপবিতল সমান। ইহাদেব ভিতব অন্য কোন কঠিন পদার্থ সহজে প্রবেশ কবান যায়। তবল পদার্থ নবম। ঢালিলে ইহাবা নিম্নদিকে গডাইযা যায।

তবল পদার্থ পাশে চাপ দেয় কিন্তু কঠিন পদার্থ পাশে চাপ দেয় না। কিন্তু একটি পাত্রে সূক্ষ্ম বালি ও আব একটি পাত্রে জল বাখিযা পাত্র দুইটিব পাশে ছিদ্র কবিয়া দিলে দেখা যাইবে বালি ও জল পডিযা যাইতেছে। তাই বলিয়া বালি বা অন্য কঠিন পদার্থ যে তবল পদার্থেব ন্যায পাশে চাপ দিতে পাবে একথা মনে কবিলে চলিবে না। সকল পদার্থকেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে চূর্ণ কবিলে ইহাদেব ঐরূপ কিছু ক্ষমতা আসিযা থাকে।

গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলিব পবস্পব আকর্ষণ নাই বলিলেও চলে, অধিকন্তু ইহাদেব মধ্যে বিকর্ষণ আছে বলিযা মনে হয। তাই ইহাদেব অণুগুলি পবস্পব দূব হইতে অধিক দূবে থাকিতে চায। তাই ইহাদিগকে একটি ছোট পাত্রে বাখিলে যেমন ইহাবা সমস্ত পাত্রটি পূর্ণ কবিযা থাকে, আবাব একটি বড পাত্রে বাখিলেও ইহাব অণুগুলি তেমনি সমস্ত পাত্রময ছডাইযা থাকে। তাই গ্যাসীয পদার্থেব কোন আকাব বা আযতন নাই এবং যে পাত্রে ইহাদিগকে বাখা যায সে পাত্রেব সকল দিকেই ইহাবা চাপ দিতে সমর্থ হয। গ্যাসীয় পদার্থেব উপবিতল সমান থাকিতে পাবে না। গ্যাসীয পদার্থেব মধ্যে অন্য কোন পদার্থ অতি সহজেই প্রবেশ কবান যায।

তবল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থেব অনেকগুলি গুণেব সামঞ্জস্য থাকায় বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ এই দুই প্রকাব পদার্থকে fluid বলিয়া একটি সাধারণ নামে অবিহিত কবেন।

পব পৃষ্ঠায কঠিন তবল ও গ্যাসীয পদার্থেব গুণগুলি পাশাপাশি বাখিয়া সংক্ষেপে বলা হইল।

	কঠিন	তরল	গ্যাসীয়
১।	আণবিক আকষণ অত্যাধিক।	আণবিক আকর্ষণ অপেক্ষাকৃত কম।	আণবিক আকর্ষণ নাই বলিলেই চলে।
২।	নির্দিষ্ট আকাব ও আযতন আছে।	আযতন সমান থাকিলেও নির্দিষ্ট আকাব নাই।	নির্দিষ্ট আকার বা আয়তন নাই।
৩।	বৃহৎ পাত্রে অথবা মাপমত পাত্রেব ভিতবই বাখা যায—ছোট পাত্রে বাখা যায না।	বৃহৎ পাত্রে, মাপমত পাত্রে এবং ছোট পাত্রেও রাখা যায। তবে ছোট পাত্র পূর্ণ হইবাব পব বাকী অংশ উব্‌ছিয়া পড়ে আব বড পাত্রেব মাত্র তলদেশে থাকে।	সকল রকম পাত্রে রাখা সম্ভব।
৪।	কেবল মাত্র নিম্নদিকে চাপ দেয।	পাশে ও নিচে চাপ দেয।	সকলদিকেই চাপ দেয়।
৫।	কঠিন পদার্থেব ভিতর অন্য কঠিন পদার্থ প্রবেশ করাইতে বিশেষ কষ্ট কবিতে হয।	তবল পদার্থে কোন কঠিন পদার্থ প্রবেশ করাইতে ।বশেষ জোর লাগে না। ঢালিলে নিম্নদিকে গড়াইযা যায়।	গ্যাসীয পদার্থেব মধ্যে অতি সহজেই অন্য পদার্থ প্রবেশ করান যায।

উত্তাপ পাইয়া উষ্ণতাবৃদ্ধি হইলে পদার্থেব অণুগুলিব আকর্ষণ শক্তি কমিযা যায। কাজেই উষ্ণতাবৃদ্ধি হইলে কোন কোন পদার্থেব এই আকর্ষণ হ্রাসেব জন্য অবস্থান্তব ঘটিতে পাবে। ববফ, জল এবং জলীয় বাষ্প একই পদার্থ, কেবল মাত্র ইহাদেব অণুগুলিব মধ্যে পবস্পব আকর্ষণ শক্তিব হ্রাস বৃদ্ধিব জন্য ইহাদেব বিভিন্ন অবস্থা। ববফ কঠিন পদার্থ, কিন্তু উত্তাপ পাইয়া ইহাব অণুগুলিব আকর্ষণ শিথিল হইয়া যায় এবং তবল জলে পবিণত হয; পবে আবও উত্তাপ দিলে ইহাদেব আণবিক আকর্ষণ আবও কমিয়া যায় এবং গ্যাসীয

আকার ধারণ করে। অতএব একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে।

কর্পূর কঠিন পদার্থ। ইহাতে উত্তাপ দিলে তরল না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় হইয়া যায়। এমন আরও অনেক কঠিন পদার্থ আছে যাহারা উত্তাপ পাইলে তরল না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় আকার ধারণ করে।

পদার্থে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহার অণুগুলি দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়। তাই ঘি ঠাণ্ডা থাকিলে ইহার গন্ধ বেশী দূর হইতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঐ ঘি গরম করিলে ইহার অণুগুলি ক্রমশ দূরে ছড়াইয়া পড়ে, তখন দূর হইতে ইহার গন্ধ পাওয়া যায়।

এমন অনেক পদার্থ আছে যাহাদিগকে সব সময়ে নিঃসন্দেহে কঠিন কিংবা তরল বলা যায় না। ঘি, গুড় ইত্যাদি গাঢ় তরল বস্তু—উত্তাপ পাইলে অধিকতর তরল হয়। নারিকেল তেল গ্রীষ্মকালে বেশ তরল থাকে কিন্তু শীত-কালে জমিয়া কঠিন হয়। সহরের রাস্তায় যে পিচ দেওয়া থাকে তাহা সাধারণত কঠিন, কিন্তু দুপুরের রোদে ইহা কিরূপ নরম হইয়া যায় তাহাও অনেকের জানা আছে। মোম কঠিন কিন্তু একটু রোদে রাখিলে তরল হইয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে উষ্ণতার মাত্রা জানা না থাকিলে কোন পদার্থ তরল বা কোন্ পদার্থ কঠিন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন। তবে ইহাও দেখা যায়, কোন কোন কঠিন পদার্থকে সহজেই তরল এবং কোন কোন তরল পদার্থকে সহজেই গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায়। আবার কোন কোন গুলিকে তত সহজে অবস্থান্তরিত করা যায় না। এক ফোঁটা এসেন্স যত সহজে উবিয়া গ্যাসীয় আকার ধারণ করে এক ফোঁটা জল তত সহজে বাষ্প হয় না। একখণ্ড বরফ যত সহজে তরল হয় একখণ্ড লোহা তত সহজে তরল হয় না।

সংক্ষেপ ঃ—যাহাদের ওজন আছে তাহারা পদার্থ। অগ্নিশিখা, শব্দ, ছায়া, আলো প্রভৃতি পদার্থ নয়, কিন্তু, ইট, কাঠ, জল বায়ু ইত্যাদি পদার্থ। উত্তাপ, আলো, শব্দ প্রভৃতি শক্তি। তাপ পাইলে পদার্থ কঠিন হইতে ক্রমে তরল ও গ্যাসীয় আকার ধারণ করে, পক্ষান্তরে

শীতল হইলে গ্যাসীয় হইতে ক্রমে তরল পরে কঠিন হইয়া যায়। কঠিন পদার্থ নিম্নে চাপ দেয়, তরল পদার্থ পার্শ্বে ও নিচে চাপ দেয়, গ্যাসীয় পদার্থ সকল দিকেই চাপ দেয়। কঠিন পদার্থের আকার ও আয়তন নির্দিষ্ট থাকে, তরল পদার্থের মাত্র আয়তন নির্দিষ্ট থাকে, গ্যাসীয় পদার্থের আকার বা আয়তন কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। পদার্থ কাহাকে বলে ? পদার্থের কি কি বিভিন্ন অবস্থা হইতে পারে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। (Define matter what are the different states of matter ? give an example of each)

২। তিনটি শক্তি ও পাঁচটি পদার্থের নাম কর। (Name three energies and five matters)

৩। এমন একটি পদার্থের নাম কর যাহা সহজেই কঠিন অবস্থা হইতে উত্তাপ পাইয়া ক্রমে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হইতে পারে। (Name such a matter which on being heated may become a liquid and finally a gas from a solid state)

৪। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের পার্থক্য কি ? (Distinguish a solid, a liquid and a gas)

৫। তরল পদার্থে ও গ্যাসীয় পদার্থে কি কি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় লিখ। (Show the similarity of properties of a liquid and a gas)

৬। অযুক্ত পদ পূরণ কর :—

কঠিন পদার্থে——প্রয়োগ করিলে তরল পদার্থ হইতে পারে, আবার গ্যাসীয় পদার্থকে ——করিলে তরল পদার্থ হইতে পারে।

(Fill up the gaps - If ——be applied to a solid, it may be changed into a liquid and if a gas be——, it may be changed into a liquid)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়ু ও তাহার সাধারণ ধর্ম

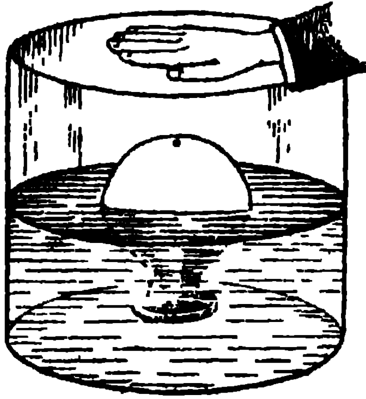
বালকগণ। তোমরা জান, জল ও বায়ু আমাদের জীবনধারণের দুইটি প্রধান অত্যাবশ্যকীয় বস্তু। জলাভাবে বরং আমরা দুই একদিন বাঁচিতে পারি, কিন্তু বায়ু অভাবে দুই চারি মুহূর্তও বাচিয়া থাকিতে পারি না। ইহাদের বিষয় কিছু জানা তোমাদের প্রথমেই আবশ্যক। আজ তোমাদিগকে বায়ু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

জল যেমন পৃথিবীপৃষ্ঠে সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া আছে, আর তাহাতে কত জলজ উদ্ভিদ, জীবজন্তু, পাহাড়পর্বত ডুবিয়া আছে, পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুসমুদ্রে আমরা ও অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালা ও পাহাড় পর্বত তেমনই ডুবিয়া আছি।

কোন স্থানে যদি তোমরা কোনও বস্তু দেখিতে না পাও, তবে তোমরা সে স্থানটি শূন্য বল, যেমন—যে কলসীতে কোন দৃশ্যমান বস্তু নাই, সেই কলসীটিকে, যে ঘরে লোকজন আসবাবপত্রাদি নাই সেই ঘরটিকে শূন্য বল, কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? না, তোমরা যাহাকে শূন্য বলিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ। বায়ুকে চক্ষু দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই এরূপ ভ্রম হয়। তবে পাখা নাড়িলে বা ঝড় বহিলে বায়ুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। নির্মল বায়ু **বর্ণ-স্বাদ-গন্ধ বিহীন।** তবে যে বাতাস বহিলে তোমরা কোন সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ পাও, তাহা বায়ুর গন্ধ নহে। বায়ু কোনও সুগন্ধ দ্রব্যের বা পচা দ্রব্যের গন্ধ তোমাদের কাছে বহিয়া আনে, তাই তোমরা গন্ধ পাও, এইজন্য বায়ুর আর এক নাম গন্ধবহ। বাতাস বহিলে বায়ু চঞ্চল হয় একথা তোমরা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু বায়ু প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই চঞ্চল। যখন ইহাকে একেবারে শান্ত ও স্থির বলিয়া বোধ হয়, তখনও বাস্তবিক ইহা ধীরে ধীরে চলিয়া বেড়াইতেছে, কারণ, তোমরা জান, ঘরের মধ্যে একটু এসেন্স পড়িয়া গেলে সমস্ত ঘর গন্ধে ভরিয়া উঠে। আবার

কাচের ভিতর দিয়া আমরা যেমন সকল দ্রব্যই দেখিতে পাই, বায়ুর ভিতর দিয়াও সেইরূপ প্রত্যেক দ্রব্য স্পষ্ট দেখিতে পাই, অতএব বায়ু **স্বচ্ছ**।

বাটি, কলসী বা যে কোনও জিনিষ প্রকৃতপক্ষে বায়ুপূর্ণ কিনা পরীক্ষা করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। একটি শূন্য ঘটি বা কলসী জলে উপুড় করিয়া ডুবাইতে থাক। দেখিবে ঘটি ডুবাইতে কিছু জোর লাগিতেছে এবং কলসীটি ডুবাইতে তদপেক্ষা অধিক জোর লাগিতেছে। এইরূপ পাত্র যত বড় হইবে, তাহাকে জলে ডুবাইতে তোমার জোরও তত অধিক প্রয়োজন হইবে। তাহার পর এই জলে উপুড় করা পাত্রটির তলা ফুটা করিয়া একটি হাত ঠিক সেই ফুটার কিছু উপরে রাখ, দেখিবে একটি সূক্ষ্ম বাতাসের স্রোত আসিয়া তোমার হাতে লাগিতেছে (১নং চিত্র)। অতএব বুঝিতেছ, এই বায়ু নিশ্চয়ই ঐ ডুবান পাত্রটির ভিতর ছিল। পাত্রটি ফুটা করিবার পর দেখিবে, ইহাকে ডুবাইতে অধিক জোর লাগিবে না। কেন এরূপ হয় তোমরা বলিতে পার কি? পূর্বে পাত্রের ভিতর বায়ু ছিল, তাই উপুড় করিয়া ধরিলেও জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন কলসীগাত্রে ছিদ্র করিয়া বায়ুর বাহিরে যাইবার পথ করিয়া দেওয়া হইল, তখন জল ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল। অতএব বায়ু স্থান অধিকার করিয়া থাকে।



১নং চিত্র—বায়ুর অবস্থিতি

বায়ু না থাকিলে আমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইতাম না। বায়ু স্থিতিস্থাপক বলিয়াই ইহা শব্দশোনা কাজে সহায়তা করিতে পারে।

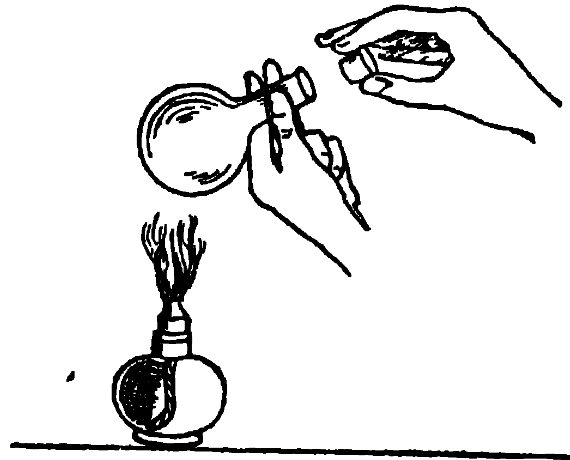
তোমরা দেখিয়াছ, একটুকরা সোলা বা কাঠ জলে ফেলিয়া দিলে তাহা ভাসে, আবার একখণ্ড ইট, একটুকরা লোহা জলে ফেলিয়া দিলে ডুবিয়া যায়। এমনই যে জিনিষগুলি জলের উপর ভাসে, তাহাদিগকে আমরা জল অপেক্ষা লঘু বা

হাল্কা বলি এবং যেগুলি ডুবিয়া যায় তাহাদিগকে গুরু বা ভারী বলি। সেইরূপ অধিকাংশ জিনিষ বায়ুতে ছাড়িয়া দিলে দেখিবে, তাহারা নীচে পড়িয়া ভূমি স্পর্শ করে। তুলার মত হাল্কা জিনিষও বায়ুতে ছাড়িয়া দিলে কিছুক্ষণ ইতস্তত উড়িবার পর মাটিতে পড়িয়া যায়। অতএব দেখা যায়, বহু পার্থিব দ্রব্য অপেক্ষা বায়ু **লঘু**; তাই বলিয়া শকুন, কাক, চিল প্রভৃতি জীব কিংবা এরোপ্লেন প্রভৃতি যন্ত্র যে বায়ু অপেক্ষা হাল্কা, তাহা তোমরা মোটেই মনে করিও না। কারণ তোমরা জান, লোহা জলাপেক্ষা ভারী হইলেও লোহার কড়া জলে ভাসে, লোহায় প্রস্তুত বড় বড় ষ্টীমার ও জাহাজ জলে ভাসে। সেইরূপ পক্ষিগণ বা এরোপ্লেন প্রভৃতি যন্ত্র বাস্তবিক বায়ু অপেক্ষা গুরু, তবে তাহাদের বায়ুতে ভাসিবার কারণ অন্য, পরে তাহা জানিতে পারিবে।

অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় বায়ুরও **ওজন** আছে।

কঠিন ও তরল পদার্থের ওজন সহজেই নির্ণয় করা যায়, কিন্তু বায়ু বা বায়বীয় পদার্থের ওজন সহজে নির্ণয় করা যায় না। নিম্নলিখিত উপায়ে বায়ুর ওজন আছে বলিয়া প্রমাণ করা যায়।

পরীক্ষাঃ—একটি কাচকূপী (flask) লও। একটি স্পিরিট লম্ফের শিখায় অল্পে অল্পে ইহাকে উত্তপ্ত কর। বেশী উত্তপ্ত হইলে রুমালে ইহার গলা ধরিয়া তলার দিকে উত্তাপ দাও। পরে একটি ভাল ছিপি দিয়া কাচকূপী-টির মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দাও যেন বায়ু ইহার ভিতর যাতায়াত করিতে না পারে। এইবার কাচকূপী-টিকে শীতল করিয়া একটি সূক্ষ্ম রাসায়নিক তুলাদণ্ডে ওজন কর।

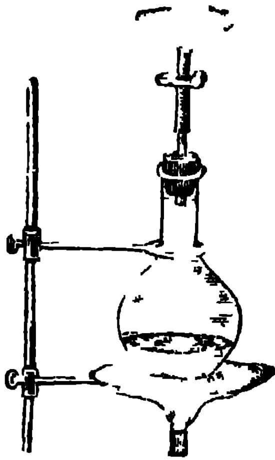


২নং চিত্র—বায়ুর ওজন

পরে ছিপি খুলিয়া ছিপি সমেত পুনরায় কাচকূপীটি ওজন কর। দেখিবে এই ওজন

পূর্ব্বের ওজন অপেক্ষা অধিক। কারণ সর্বপ্রথমে কাচকূপীর ভিতর বায়ু ছিল। যখন তাহাকে উত্তপ্ত করা হয় তখন ইহার ভিতর হইতে কিছু বায়ু হাল্কা হইয়া বাহির হইয়া যায়। সেরূপ অবস্থায় মুখ আঁটিয়া ওজন করা হয়। পরে যখন ছিপি খুলিয়া দেওয়া হয় তখন পুনরায় বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করায় ওজন বাড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও বহুপ্রকারে প্রমাণ করা যায় বায়ু বা বায়বীয় পদার্থের ওজন আছে।

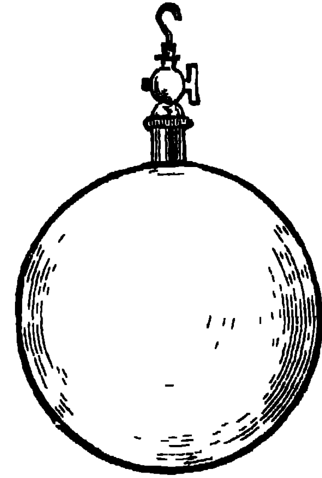
৩নং চিত্রের ন্যায় একটি বড় কাচকূপীতে কিছু জল লইয়া মুখটি ছিপি (cork) দিয়া বন্ধ কর। ছিপির মধ্য দিয়া একটি সরু দুই মুখ খোলা কাচের ফাঁপা নল লাগাইয়া দাও। দেখিও কাচের নল যেন কাচকূপী ভিতরে প্রবেশ করে মাত্র এবং জলে না লাগে। ছিপিটি কাচকূপীর মুখে জোরে আঁটিয়া দিলে, কেবলমাত্র নলের মধ্য দিয়া ভিন্ন বায়ু যাতায়াত করিবার অন্য কোন পথ থাকিবে না। পরে এই কাচনলের বাহিরের মুখে একটি রবারের নল লাগাইয়া তাহাতে একটি চিম্‌টা (clip) লাগাইয়া চিমটাটি আল্‌গা রাখিয়া কাচকূপীর তলদেশে উত্তাপ দাও। উত্তাপ পাইয়া জল বাষ্পাকারে পাত্র হইতে বাহিরে আসিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বায়ুও বাহির হইয়া যাইবে। অতঃপর কিছুক্ষণ জল ফুটাইবার পর, চিম্‌টা দিয়া রবারের নল চাপিয়া দাও, এবং পাত্রটি ঠাণ্ডা করিয়া একটি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন কর। পরে চিমটাটি খুলিয়া দিলে দেখিবে, তুলাদণ্ডের যে বাহুতে পাত্রটি ছিল, তাহা নিচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। প্রথমে উত্তাপে বায়ু প্রসারিত হইয়া জলীয় বাষ্পের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিল, এবং বায়ুর স্থান জলীয় বাষ্প



৩নং চিত্র—বায়ুর ওজন

অধিকার করিয়াছিল। শীতলতা পাইয়া জলীয় বাষ্প জমিয়া জল হইয়া যাওয়ায় বায়ুর স্থান প্রায় শূন্য ছিল। কাজেই তখন ওজন কম ছিল। পরে চিম্‌টাটি

খুলিয়া দিলে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করায় ওজন বৃদ্ধি পাইল। যতটুকু ওজন বাড়িল, তাহা ঐ পাত্রে জলের উপর হইতে মুখ পর্যন্ত যতটুকু বায়ু ঢুকিল, তাহার ওজন। এই পরীক্ষাটি বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই দেখান যাইতে পারে। এই যন্ত্র দ্বারা যে কোনও পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া লওয়া যায়। চিত্রে প্রদর্শিত গোলকটি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধা জনক, কারণ ইহার নলে একটি চাবি লাগান আছে। বায়ু বাহির করিবার পর পাত্রটির ওজন, বায়ুপূর্ণ পাত্রের ওজন অপেক্ষা বেশ কিছু কম হয়। বায়ুর ওজন আছে বলিয়াই এইরূপ হয়। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে সাধারণ অবস্থায় পৃথিবী পৃষ্ঠে এক ঘন ফুট বায়ুর ওজন **আধছটাকের** কিছু বেশী।



৪নং চিত্র—বায়ুর ওজন

ফুটবল খেলিবার সময় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে শক্ত চর্মাবৃত রবারের থলির ভিতর বায়ু প্রবেশ করাইয়া ফুটবলটিকে শক্ত করিলেও যখন ইহাকে জোরে টেপা যায় তখন সঙ্কুচিত হয় অথচ জোর সরাইয়া লইলে পুনরায় ফুলিয়া উঠে। বলের ভিতর বায়ু থাকে বলিয়া এরূপ হয়। তাহা হইলে দেখা যায় বায়ুর **সংনম্যতা** ও **প্রসারণশীলতা** (Compressibility and expansibility) আছে। প্রথম পরীক্ষার ন্যায় জলে কলসী উপুড় করিয়া জলের এই ধর্ম দুইটি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

অতএব দেখা গেল বায়ু বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন, সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল স্বচ্ছ পদার্থ। ইহা সতত চঞ্চল এবং পৃথিবীর বহু পদার্থ অপেক্ষা লঘু।

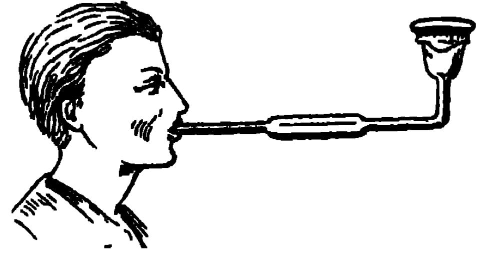
বায়ু মণ্ডলের চাপ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবিয়া আছি ও তাহারই ভিতর চলাফেরা করিতেছি। আমাদের মাথার উপরে এই বায়ুসমুদ্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার একটা সীমা আছে। বিজ্ঞানবিদগণ অনুমান করেন যে ভূপৃষ্ঠ হইতে একশত কিংবা দেড়শত মাইল অবধি এই বায়ু বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের উচ্চতা প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল, তাহাও বায়ুরাশির উচ্চতার কাছে তুচ্ছ। পৃথিবী বেষ্টন করিয়া এই যে গভীর বায়ুর আবরণ রহিয়াছে তাহাকে **বায়ুমণ্ডল** (Atmosphere) বলে।

বায়ুর যে ওজন আছে ইহা তোমরা দেখিয়াছ। এখন মনে করা যাউক, বায়ুমণ্ডলের বায়ুরাশি যেন স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। ভূপৃষ্ঠের সহিত সংলগ্ন সর্বনিম্নস্তরকে উপরের বায়ুস্তরগুলির ভার বহিতে হয় বলিয়া উহা সর্বাপেক্ষা ঘন। এই কারণেই ভূপৃষ্ঠ হইতে যত ঊর্ধ্বে উঠা যায় ততই বায়ু লঘু হইতে লঘুতর হইয়া আইসে। উচ্চ পর্বতের চূড়ায় বায়ু এত লঘু হয় যে, তাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য চালান অতিশয় কষ্টকর।

এই বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের উপর ও পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের উপর নিজের ভারহেতু যে চাপ দেয় তাহাকে বায়ুমণ্ডলের চাপ কহে। কিন্তু কঠিন পদার্থ যেরূপ কেবল নিম্নদিকেই চাপ দিয়া থাকে, বায়ু বা কোন বায়বীয় পদার্থ সেরূপ এক দিকে চাপ দেয় না। উহারা উপরে, নিচে, পার্শ্বে, অর্থাৎ সকল দিকেই সমান ভাবে চাপ দিয়া থাকে। কোনও একটি পাত্রের বাহিরের বায়ু যেমন তাহার উপরে ভিতরের দিকে চাপ দেয় তেমনই উহার ভিতরের বায়ু ও বাহিরের দিকে সমান চাপ দিতে থাকে। কোনও উপায়ে একদিকের বায়ু সরাইয়া লইলেই অপর দিকের বায়ুর চাপ সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। নিম্নলিখিত পরীক্ষা কয়টি হইতে ইহা তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে।

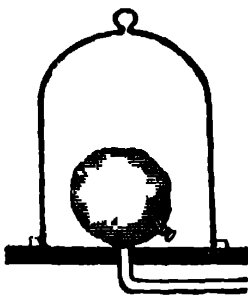
একটি বিয়োজী ফানেল (separating funnel)কে চিত্রের ন্যায় বাঁকাইয়া ফোঁদলের মুখটি পাতলা রবারের চাদরে ঢাকিয়া বেশ করিয়া বাঁধ, যেন এই মুখ দিয়া ইহার মধ্যে বায়ু চলাচল করিতে না পারে। পরে অপর দিকের নলটি চুষিয়া ইহার ভিতর হইতে বায়ু বাহির করিলে দেখা যাইবে রবারের চাদর ক্রমশ ভিতর দিকে ঢুকিয়া যাইতেছে। ভিতরে যে বায়ু ছিল



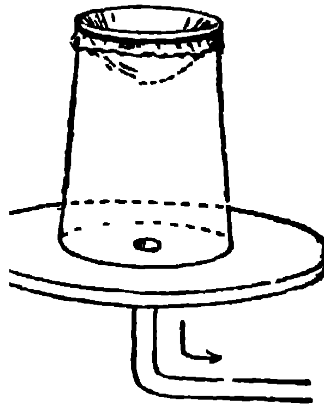
৫নং চিত্র—বায়ুর নিম্নচাপ

তাহার অধিকাংশ চুষিয়া বাহির করিয়া লওয়ায় বাহিরের বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপে রবারটি নিচে ঝুলিয়া পড়ে। চিত্রে ফানেলটির চর্মাবৃত তলকে ভূ-সমান্তরাল রাখা হইয়াছে। ইহাকে খাড়া রাখিয়া বা ফানেলের মুখ নিচে করিয়া পরীক্ষা করিলে একই ফল পাওয়া যাইবে।

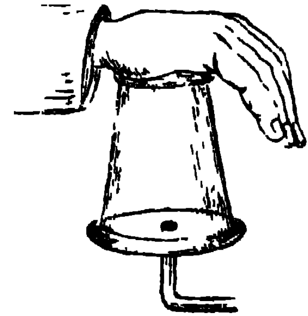
বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের থালির (disk) উপর একটি ফুটবল্ ব্লাডারের মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখ। দেখিও যেন থালির মধ্যস্থলে যে ছিদ্রপথে বায়ু বাহির



৬নং চিত্র
বায়ুর চাপ



৭নং চিত্র
বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপ



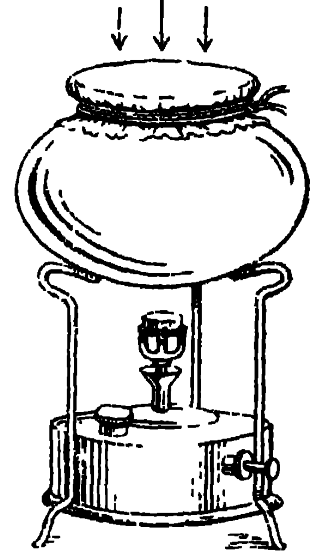
৮নং চিত্র—বায়ুমণ্ডলের
নিম্নচাপে হাতে চাপ লাগিতেছে

হয়, তাহা যেন বন্ধ হইয়া না যায়। পরে ৬নং চিত্রের ন্যায় একটি বৃহৎ কাচপাত্র উপুড় করিয়া ব্লাডারটি ঢাকা দাও। এই পাত্রের প্রান্ত দিয়া যাহাতে বাহিরের বায়ু ভিতরে না আসিতে পারে, তজ্জন্য ইহার ধারে ধারে কিছু চর্বি লাগাইয়া

চাপিয়া দাও। পরে যন্ত্রের সাহায্যে কাচপাত্রের বায়ু নিষ্কাশিত করিতে আরম্ভ করিলেই দেখা যাইবে যে, ব্লাডারটি ফুলিয়া উঠিতেছে। কেন এরূপ হয় দেখা যাউক; যন্ত্রের দ্বারা বায়ু নিষ্কাশন করিবার পূর্বে ব্লাডারের বাহিরের বায়ু উহার উপর ভিতরের দিকে যে পরিমাণ চাপ দিতেছিল, উহার ভিতরের বায়ুও বাহিরের দিকে ঠিক সেই পরিমাণ চাপ দিতেছিল। কাচপাত্রের মধ্যের বায়ু যখন খানিকটা বাহির করিয়া দেওয়া হইল, তখন তাহার ভিতরের অবশিষ্ট বায়ু প্রসারিত হইয়া পূর্বের আয়তন প্রাপ্ত হওয়ায় লঘু হইল এবং ইহার চাপ কমিয়া গেল। ফলে ব্লাডারের ভিতরে বায়ুর বহির্মুখী চাপ বাহিরের বায়ুর অন্তর্মুখী চাপ অপেক্ষা বেশী দাঁড়াইল। এইরূপে কাচপাত্রের বায়ু যতই বাহির করা যাইবে, ব্লাডারের দুই দিকের চাপের পার্থক্য ততই বাড়িতে থাকিবে, এবং ব্লাডারটিও ক্রমাগত ফুলিতে থাকিবে।

এক্ষণে বায়ুমণ্ডল যে নিম্নচাপ দেয়, তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করা যাউক। ৭নং চিত্রের ন্যায় একটি দুইমুখ খোলা কাচপাত্রের উপরের মুখটি একটি রবারের চাদর দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধ। অন্য মুখটি বায়ু নিষ্কাশনযন্ত্রের প্লেটের উপর আঁটিয়া বসাও। এইবার কাচপাত্রের ভিতরের বায় অল্পে অল্পে বাহির করিয়া লইলেই দেখা যাইবে যে, রবারের চাদর ক্রমে ক্রমে ভিতরে ঢুকিয়া যাইতেছে। পাত্রের ভিতরের বায়ু লঘু হওয়ায় বাহিরের বায়মণ্ডলের নিম্ন-চাপে এরূপ হইল। যন্ত্রটি কিছুক্ষণ চালাইলে রবারটি ফাটিয়া যাইবে। কাচপাত্রের উপর রবারের পরিবর্তে হাত রাখিয়া ভিতরের বায়ু নিষ্কাশিত করিলে হাতের উপর বায়ুর নিম্ন-চাপের জন্য এত ভার লাগে যে, হাতটি খুলিয়া লওয়া যায় না। কোন বালকের হাত এইরূপ কাচ পাত্রের উপর চাপাইয়া বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের দ্বারা বায় টানিয়া লইলে সে সহজে হাত তুলিতে পারিবে না। এইরূপে তোমরা বেশ কৌতুক দেখাইতে পার (৮নং চিত্র)। বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র না থাকিলে এই পরীক্ষাটি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যাইতে পারে। একটি বড হাঁড়িতে (৯নং চিত্র) কিছু জল লইয়া কিছুক্ষণ উত্তমরূপে ফুটাইতে থাক। পরে একটি রবারের চাদর পাত্রের মুখে এমন ভাবে

শক্ত করিয়া বাঁধ, যেন ইহার মধ্যে বায়ু কিছুতেই প্রবেশ করিতে না পারে। পরে পাত্রটি শীতল হইলে দেখা যাইবে যে, রবারটি নিচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। জল ফুটাইলে ইহার বাষ্পের সহিত হাঁড়ির ভিতরের বায়ু অনেকটা বাহির হইয়া যায়। হাঁড়ি শীতল হইলে অধিকাংশ বাষ্প জমিয়া জল হয়। ভিতরে যেটুকু বায়ু ছিল, তাহা লঘু হওয়ায় চাপ খুব কমিয়া যায়, সুতরাং বাহিরের বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপে রবারটি ঝুলিয়া পড়ে। এখানে একটি প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠিতে পারে যে, রবারের উপরে বহুদূর বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল যে চাপ দিতেছে, উহা পাত্রের ভিতর অত্যল্প পরিমাণ বায়ুর চাপের সমান কি না। হাঁ, নিশ্চয়ই সমান। কারণ বায়ু বাহির করিয়া লইবার পূর্বে রবারটি সমতল ছিল। আরও দেখ পাত্রের ভিতর যে বায়ু ছিল, তাহা তো বাহিরের বায়ুরই অংশ ছিল এবং তাহাদের ঘনত্ব একই ছিল।



৯নং চিত্র—বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপ

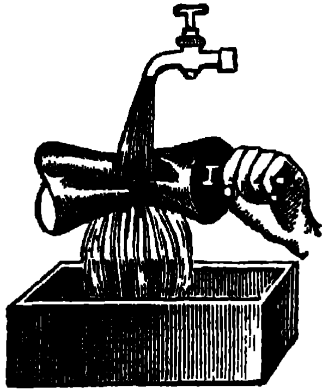
একটি কাচের গ্লাস সম্পূর্ণরূপে জলপূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একটি পাতলা কাগজ চাপা দাও। আস্তে আস্তে কাগজ সমেত গ্লাসটি উপুড় করিয়া দিলে দেখিবে যে গ্লাসের জল পড়িয়া যাইতেছে না (১০নং চিত্র)। কাগজের উপর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব-চাপ গ্লাসের জলের ভার অপেক্ষা বেশী হওয়ায় কাগজটিকে পড়িতে দেয় না।



১০নং চিত্র—বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বচাপ

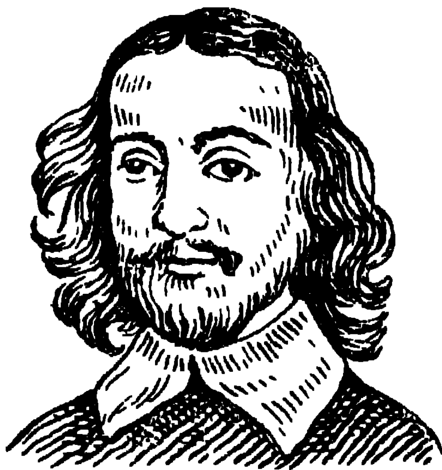
একটি পাতলা টিনের কৌটায় কিছু জল রাখিয়া আগুনে উত্তমরূপে ফুটাও। পরে কৌটাটির মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া শীতল করিবার জন্য কৌটার গায়ে জল সেচন কর। শীতল হইলে দেখিবে

বাহিবেব বায়ুব সর্বদিকে চাপেব জন্য কৌটার চতুর্দিক চুপসাইয়া গিয়াছে (১১নং চিত্র)।



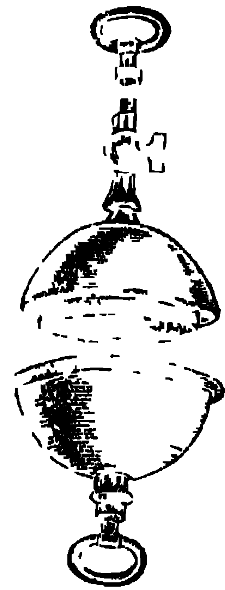
১১নং চিত্র—বায়ুব সর্বদিকে চাপ

বায়ুব চাপেব একটি আশ্চর্যজনক পরীক্ষা। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান সম্রাটেব সম্মুখে অটো ভন গ্যাবিক (Auto Von Guericke) কর্তৃক সম্পাদিত হইযাছিল। বালাযুক্ত দুইটি ধাতু নির্মিত ফাঁপা অর্ধগোলক কৌটাব মত এমনভাবে প্রস্তুত কবা হয যেন কৌটাব মত বন্ধ কবিলে কোন ফাঁক দিয়া ইহাব মধ্যে বায় চলাচল কবিতে না পাবে। একটি অর্ধগোলকে একটি প্যাচকল যুক্ত নল লাগানো থাকে। প্যাচকল ঘুবাইয়া ইহাব ভিতব বায় চলাচলেব পথ বন্ধ কবা বা খোলা যায। এই নলেয মুখ পাম্পেব সহিত যোগ কবিযা ইহাব মধ্যস্থ বায বাহিব কবা যায।



১২নং চিত্র—অটোভন্ গ্যাবিক

পবীক্ষাতে দেখা গিযাছিল ইহাব ভিতবেব বায বাহিব কবিবাব পব দুইদিকে চাবিটি কবিযা আটটি ঘোডায অর্ধ-গোলক দুইটিকে খুলিযা পৃথক কবিতে পাবে নাই, অথচ প্যাঁচকল খুলিযা যখন ইহাব মধ্যে বায় প্রবেশ কবান হইল তখন একটি শিশুও অনায়াসে ইহাদিগকে পৃথক কবিতে পাবিযাছিল। ম্যাগ-ডেবার্গ সহবে এই পবীক্ষা হয় বলিয়া যন্ত্রটিব নাম দেওযা হয় **ম্যাগডেবার্গ গোলার্ধ** (Magdeburgh Hemisphere)।

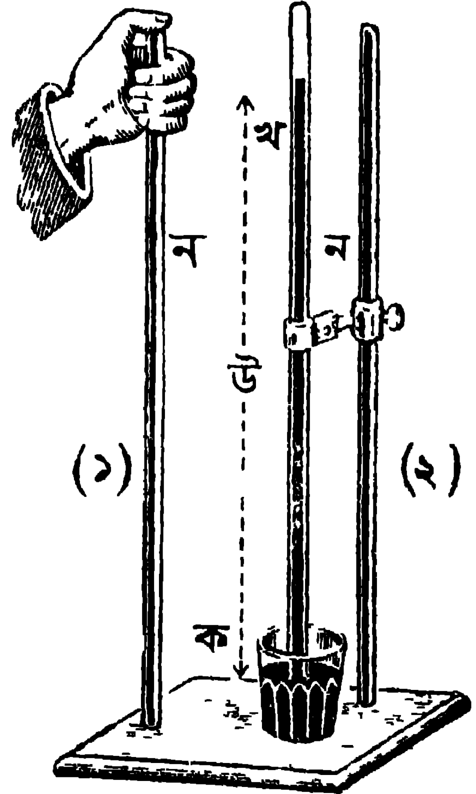


১৩নং চিত্র ম্যাগডেবার্গ গোলার্ধ

একটি কাগজের ঠোঙ্গাকে হাত দিয়া ফুলাইয়া তাহার মুখটি মুঠা করিয়া চুপ্-সাইয়া দিলে ঠোঙ্গাটি ফুলিয়া থাকিবে। কিন্তু ঠোঙ্গার মুখে মুখ দিয়া ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া দিলে ঠোঙ্গাটি চারিদিক হইতে চুপসাইয়া যায়। ইহার কারণ ঠোঙ্গার ভিতরের বায়ু চুষিয়া লইলে চাপ কমিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের বায়ুর চাপ সমান থাকায় ইহাকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরে।

ব্যারোমিটার

কোন স্থানে বায়ুমণ্ডল কি পরিমাণ চাপ দেয়, তাহা স্থির করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহাকে **ব্যারোমিটার** (Barometer) বলে। এক মুখ বন্ধ, প্রায় ৩১ ইঞ্চ লম্বা একটি কাচের সরু নল **ন** (১৪নং চিত্র) লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে পারদপূর্ণ কর। দেখিও যেন পারদপূর্ণ করিবার সময় নলের মধ্যে সামান্য মাত্রও বায়ু না থাকিয়া যায়। এখন পারদপূর্ণ নলের মুখটি অঙ্গুলির দ্বারা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধর এবং একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর এমন ভাবে উল্টাইয়া ধর যেন অঙ্গুলির দ্বারা বন্ধ মুখটি দ্বিতীয় পাত্রের পারদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এখন অঙ্গুলি পারদের মধ্য হইতে সাবধানে বাহির করিয়া লও। অঙ্গুলি সরাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে যে, নলের ভিতর পারদ কিঞ্চিৎ নামিয়া আসিয়াছে। এখন নলটিকে লম্বাভাবে খাড়া করিয়া রাখ এবং পাত্রের পারদপৃষ্ঠ হইতে নলের ভিতর

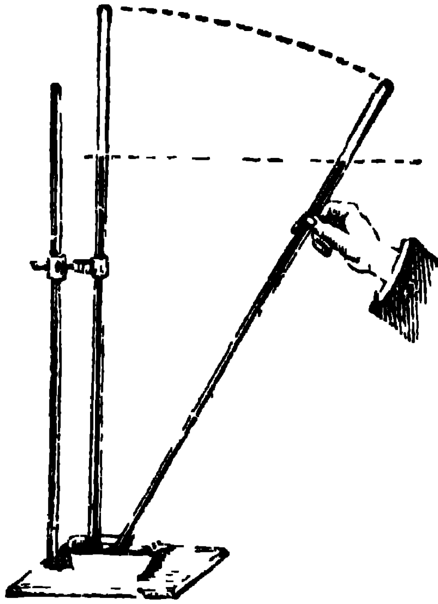


১৪নং চিত্র—ব্যারোমিটার

দণ্ডায়মান পারদস্তম্ভের উচ্চতা অর্থাৎ **কখ** দূরত্ব (১৪ নং চিত্র) একটি স্কেলের

দ্বারা মাপিলে দেখিবে যে, ইহা প্রায় ৩০ ইঞ্চ। নলের ভিতর পারদের উপর প্রায় দুই ইঞ্চ পরিমিত যে স্থানটুকু রহিল, তাহা একেবারে বায়ুশূন্য। বৈজ্ঞানিক টরিসেলির নামানুসারে উহাকে 'টরিসেলির শূন্য স্থান' বলা হয়। এইরূপ একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপুড় করা পারদপূর্ণ নলই মোটামুটি **ব্যারোমিটার।** ইহার পাত্রস্থ পারদের উপর বায়ু যে চাপ দিতেছে, তাহাই ঐ নলের পারদ-স্তম্ভকে পড়িতে দিতেছে না।

এখন যদি পারদপূর্ণ নলটিকে আস্তে আস্তে হেলাইয়া ধরা হয় তবে দেখা যাইবে টরিসেলির শূন্য স্থান কমিয়া যাইতেছে। যত বেশী হেলান হইবে ততই ঐ টরিসেলির শূন্য স্থান কমিতে থাকিবে। নলটি খুব বেশী হেলাইয়া ধরিলে হয়ত সমস্ত নলটিই পারদপূর্ণ হইয়া যাইবে—টরিসেলির শূন্যস্থান আর থাকিবে না। মোট কথা নিচের পাত্রের পারদ-তল হইতে পারদস্তম্ভের উচ্চতা খাড়া ভাবে ৩০″ পর্যন্ত থাকিবে। হেলাইলে ঐ খাড়া উচ্চতা কমিয়া যায় বলিয়া উপরোক্তরূপ ঘটনা ঘটে। ১৫নং চিত্রে ব্যাপারটি দেখান হইল।



১৫নং চিত্র—টরিসেলির শূন্য স্থানের হ্রাস

যদি কোনও কারণে বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে বাড়ে, তবে নলমধ্যস্থ পারদস্তম্ভের উচ্চতাও কমিবে বাড়িবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে এই পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে উঠা যায়, বায়ুমণ্ডলের চাপ ততই কমিতে থাকে এবং পারদস্তম্ভের উচ্চতাও তত হ্রাস পাইতে থাকে। পাহাড়ের উপর ব্যারোমিটার এবং পারদস্তম্ভের উচ্চতা লক্ষ্য করিলে ইহা প্রমাণিত হইবে। পাহাড়ের উপর না উঠিয়াও বায়ু-নিষ্কাশনযন্ত্রের সাহায্যে ইহা সহজেই পরীক্ষা করিতে পারা যায়। ১৬নং চিত্রে দেখ, একটি ব্যারোমিটারের কাচনলটি একটি কাচপাত্রের মুখের

ছিপির ভিতর দিয়া উপরে উঠিয়াছে। কাচপাত্রটি একটি নল সংযুক্ত প্লেটের উপর বসান আছে। এখন কাচপাত্রের ভিতরে বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান। এইবার নলে মুখ দিয়া কাচপাত্রের বায়ু কতকটা টানিয়া লইলে পারদ স্তম্ভ দ্রুত নামিতে থাকিবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মোটামুটি প্রতি নয় শত ফুট উচ্চতায় বায়ুর চাপ পারদস্তম্ভের উচ্চতা এক ইঞ্চি কমাইয়া দেয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাড়ে তিন মাইল ঊর্ধ্বে বায়ুর চাপ ১৫ ইঞ্চ পারদ-স্তম্ভের সমান এবং দশ মাইল উচ্চে মাত্র ৩৭৫ ইঞ্চ। অতএব কোনও স্থানে ব্যারোমিটারএর সাহায্যে বায়ুর চাপ দেখিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সেই স্থানের মোটামুটি উচ্চতা নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের চাপ হইতে দুই ইঞ্চ কম, সে স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মোটামুটি ১৮০০ ফুট উচ্চে

১৬নং চিত্র—বায়ুচাপের হ্রাসে পারদ স্তম্ভের নিম্নগমন

এখন বোধ হয় তোমরা জিজ্ঞাসা করিবে যে, ব্যারোমিটারে কেবল পারদ ব্যবহার করা হয় কেন। তাহার উত্তর এই যে, পারদের পরিবর্তে জল বা অন্য কোনও তরল পদার্থ দ্বারা কাচনলটি পূর্ণ করিয়া ব্যারোমিটার প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু কাচনলটির দৈর্ঘ্য একরূপ হইবে না। পারদ জল অপেক্ষা ১৩.৬ গুণ ভারী। অতএব বায়ুমণ্ডলের যে চাপ ৩০ ইঞ্চ পরিমিত পারদস্তম্ভকে দাড় করাইয়া রাখিতে পারে, তাহা $\frac{৩০ \times ১৩.৬}{১২}$ অর্থাৎ প্রায় ৩৪ ফুট উচ্চ জলস্তম্ভ দাড় করাইয়া রাখিবে। কাজেই নলে জল ব্যবহার করিতে হইলে, অন্তত ৩৫ ফুট লম্বা নল লইতে হইবে। এরূপ প্রকাণ্ড নল লইয়া পরীক্ষা করা অসুবিধাজনক। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি অসুবিধার জন্য জল বা অন্য তরল পদার্থ ব্যারোমিটারে ব্যবহার হয় না।

মনে কর নলের ছিদ্রের ক্ষেত্রফল ১ বর্গ ইঞ্চ ও পারদস্তম্ভের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চ।

সুতরাং ৩০ ঘনইঞ্চ পারদস্তম্ভ বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপে নলের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ৩০ ঘন ইঞ্চ পারদের ওজন প্রায় সাড়ে সাত সের। সুতরাং বায়ুমণ্ডল ভূতলে প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে প্রায় সাড়ে সাত সের ওজনের চাপ দেয়।

আমাদের শরীরের উপরকার ক্ষেত্রফল যদি মোটের উপর ১৬ বর্গফুট ধরা যায়, তাহা হইলে বায়ুমণ্ডল সর্বদা আমাদের শরীরের উপর $\frac{১৬ \times ১৪৪ \times ৭.৫}{৪০}$ বা ৪৩২ মণ চাপ দিতেছে। একমণ বোঝা মাথায় বহিয়া আনিতে কষ্ট হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বায়ুমণ্ডলের এই গুরুভার সর্বদাই আমাদের দেহের উপর রহিয়াছে, অথচ তাহা আমরা মোটেই টের পাই না। তাহার কারণ বাহিরের বায়ু চারিদিক হইতেই সমভাবে চাপ দিতেছে। আমাদের শরীরের ভিতরেও বায়ু রহিয়াছে, নাসিকা, ফুসফুস, লোমকূপ ইত্যাদি দিয়া সেই বায়ুর সহিত বাহিরের বায়ুর যোগ রহিয়াছে। অতএব শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর চাপও বাহিরের বায়ুর চাপের সমান। এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমরা এই দুইটি বিপরীতাভিমুখী চাপে পিষ্ট হইয়া যাই না কেন। বিজ্ঞানবিদগণ বলেন, যে আমাদের শরীর এই পরিমাণ চাপ বহন করিবার উপযোগী করিয়াই গঠিত হইয়াছে। এই চাপ কোনও কারণে বাড়িলে বা কমিলে আমাদের অনভ্যস্ততা হেতু বড় কষ্ট হয়। উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ আরোহণ কালে অথবা এরোপ্লেনে করিয়া উপরে উঠিলে বায়ুমণ্ডলের কম চাপের জন্য দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে, ফলে প্রায়ই নাক, কান দিয়া রক্ত বাহির হয়।

সংক্ষেপ :—বায়ু, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন, সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল স্বচ্ছ পদার্থ। ইহা সতত চঞ্চল এবং পৃথিবীর বহু পদার্থ অপেক্ষা লঘু। নিজ ভারহেতু ইহা পদার্থে, ঊর্ধ্ব নিম্ন ও সকল দিকে চাপ দিয়া থাকে। সে চাপের পরিমাণ সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে সাড়ে সাত সের। যত ঊর্ধ্বে উঠা যায় ঐ চাপ তত কমিয়া থাকে। প্রতি ৯০০ ফুট উচ্চতায় ব্যারোমিটারের পারদ ১ ইঞ্চ নামিয়া যায়। অধিক উচ্চে উঠিলে বায়ু মণ্ডলের চাপ কমিয়া যায় বলিয়া আমরা সেখানে সুস্থ থাকিতে পারি না। নিচে আমাদের দেহের সকল দিকে বায়ুমণ্ডল অত্যধিক চাপ দিলেও

আমরা পিষ্ট হইয়া যাই না তাহার কারণ, আমাদের দেহ এই চাপ সহিবার মত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। বায়ুর গুণের উল্লেখ কর এবং উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। (Explain with example the properties of air.)

২। দৃশ্যমান পদার্থ শূন্য একটি ঘটি যে প্রকৃতপক্ষে বায়ুপূর্ণ তাহা কিরূপে বুঝাইবে? (How would you show that a pitcher is full of air?)

৩। বায়ুর ওজন আছে, তাহা কিরূপে প্রমাণ করা যায়? (How it can be proved that air has weight?)

৪। বায়ুমণ্ডলের চাপ বলিতে কি বুঝায়? এই চাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য দুইটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। (What do you mean by the pressure of air? Describe experiments by which the existence of this pressure may be proved.) [কঃ বিঃ ১৯৪১]

৫। বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিমাণ কিরূপে নির্ণীত হয়? হাতের চেটোর ক্ষেত্রফল মোটামুটি ১২ বর্গ ইঞ্চি ধরা হয়, তবে ইহার উপর বায়ুর চাপের পরিমাণ নির্ণয় কর। (How atmospheric pressure is determined? If the area of the palm of a hand be 12 square inches, find the amount of atmospheric pressure on it.)

৬। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে কি হইবে বল ও তাহার কারণ দেখাও:—

(ক) ঠোঁটে একটি ছোট চাবি লাগাইয়া উহার মধ্যস্থ বায়ু মুখ দিয়া চুষিয়া লওয়া হইল।

(খ) একটি সাধারণ পিচ্‌কারীর মুখ জলে ডুবাইয়া পিষ্টনদণ্ডটি উপর দিকে টানা হইল।

(গ) দুগ্ধপূর্ণ বাটিতে চুমুক দেওয়া হইল।

(ঘ) দুই মুখ খোলা কাচনল জলপূর্ণ করিয়া উপরের মুখটি আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া রাখা হইল।

(ঙ) ৩০ ইঞ্চ লম্বা একমুখবন্ধ একটি কাচনল পারদপূর্ণ করিয়া একটি পারদপূর্ণ পাত্রের উপর উপুড় করিয়া ধরা হইল।

(Say what will happen in the following cases and state reasons:— (a) A small hollow key is put on a lip and the air is sucked out of it, (b) the mouth of an ordinary water syringe is put into water and the piston is drawn upwards, c) air is drawn from the edge of a cup full of

milk by mouth, (d) a tube, full of water is held up with upper end closed and lower end open, (d) a glass tube 20 inches long and closed at one end is filled with mercury and then carefully immersed into a cup of mercury with other end up.)

৭। ফাউন্টেন পেনের কালি-তোলা যন্ত্রের সাহায্যে পেনটিতে কিরূপে কালি ভরা হয়? (How a fountain pen is filled with the help of a dropper?)

৮। ব্যারোমিটার বর্ণনা কর। এই যন্ত্রে পারদের পরিবর্তে জল ব্যবহার করিলে কি অসুবিধা হয়? (Describe a Barometer, what will be the disadvantages if it is made with water instead of mercury?)

৯। সমুদ্রতল হইতে কোন স্থানের মোটামুটি উচ্চতা ব্যারোমিটার দ্বারা কিরূপে নির্ণয় করা যায়? (How the height of a place from the sea level can be determined by the help of a Barometer?)

দার্জিলিং-য়ের উচ্চতা যদি ৭০০০ ফিট ধরা হয়, তবে সেখানে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ কত হইবে? (If the height of Darjeeling be 7000 ft above the sea level, what will be the Barometer reading there?)

১০। আমাদের শরীরের উপর বায়ু নিয়ত গুরুভার দিলেও

(ক) আমরা সে ভার মোটেই বুঝিতে পারি না কেন?

(খ) আমাদের শরীর পিষ্ট হইয়া যায় না কেন?

(Why do we not realise the pressure of atmosphere on our bodies and why our bodies are not pressed by such a great pressure?)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জল

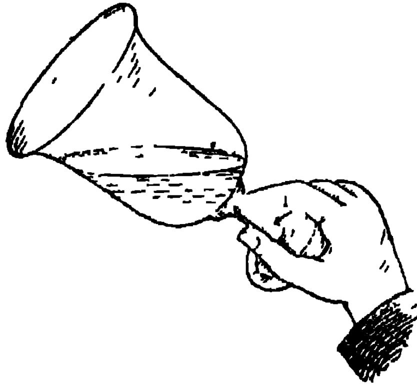
জলের ধর্ম

বায়ুর পরেই জল আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। জল না পাইলে প্রাণী ও গাছ পালা কিছুই বাঁচিত না, ভূমিতে চাষ আবাদ হইত না। এই জন্য মরুভূমিতে জলাভাবে প্রাণী কিংবা গাছপালা কিছুই থাকিতে পারে না।

জল তরল পদার্থ এবং ইহা আমাদের কাছে প্রায় বায়ুর মতই সহজ প্রাপ্য। তরল পদার্থের কথা মনে হইলে জলের কথা যত সহজে মনে পড়ে তেমন আর কোন পদার্থের কথা নয়। জল বায়ু অপেক্ষা অনেক ভারী। ইহাও স্বচ্ছ, তবে বায়ুর মত অধিক নহে। বায়ুর ভিতর দিয়া বহুদূর পর্যন্ত পদার্থকে যত স্পষ্ট দেখায় জলের ভিতর তত স্পষ্ট দেখা যায় না। জলেরও স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ নাই। জল বর্ণহীন হইলেও সমুদ্রে জল নীল বর্ণ দেখায়। বর্ণহীন বায়ু স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকায় আকাশকে যেমন নীল দেখায় সমুদ্রে বর্ণহীন জল ঐরূপ সজ্জিত থাকে বলিয়া সমুদ্রে জল নীল দেখায়। জলের আকার নাই। যখন যেরূপ পাত্রে রাখা যায় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। ইহাকে প্রায় সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না বলিলেই চলে, কাজেই ইহা সঙ্কোচনশীলও নয়। একটি পিচকারীতে জল লইয়া পিচকারীর মুখ আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া বন্ধ করিয়া পিষ্টন দণ্ডটি যত জোরেই ঠেলা যাউক না কেন কিছুতেই ভিতরে যাইতে চাহে না। জল যদি সঙ্কোচনশীল হইত তবে পিষ্টন দণ্ডটির জোরে সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং পিষ্টন দণ্ডটি ভিতরে ঢুকিত এবং পরে জোর কমাইয়া দিলে উহা যদি প্রসারণ

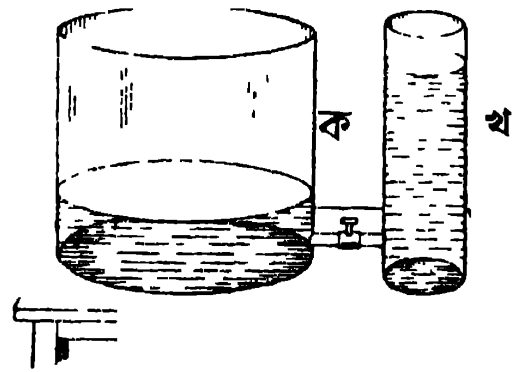
শীল হইত তবে পিষ্টন দণ্ডটি পুনরায় বাহির হইয়া আসিত। জল সকল সময়ে নিচের দিকে গড়াইয়া যাইতে চায়। মেঝেয় জল ঢালিলে দেখিয়াছ কেমন ইহা নিচের দিকে ক্রমশ গড়াইয়া পড়ে। এই ধর্মের জন্য নদীতে স্রোত বহে।

জলের উপরিতল সকল সময়েই সমতল এবং অনুভূম বা ভূমির সহিত সমান্তরাল (horizontal) থাকে। গ্লাস, কলসী, চৌবাচ্চা, পুকুর প্রভৃতির জলের উপরিভাগ যে ভূ-সমান্তরাল তাহা তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ। এমনকি কোন পাত্রকে কাত করিয়া রাখিলেও তাহার মধ্যস্থ জলের উপরিতল সমতল ও অনুভূম থাকিবে। চিত্রে দেখ পাত্রটি কাত করিয়া ধরিলেও ইহার মধ্যস্থ জলের উপরিতল কেমন সমতল অথচ অনুভূম রহিয়াছে।



১৭নং চিত্র—জলতল সমতল ও ভূসমান্তরাল

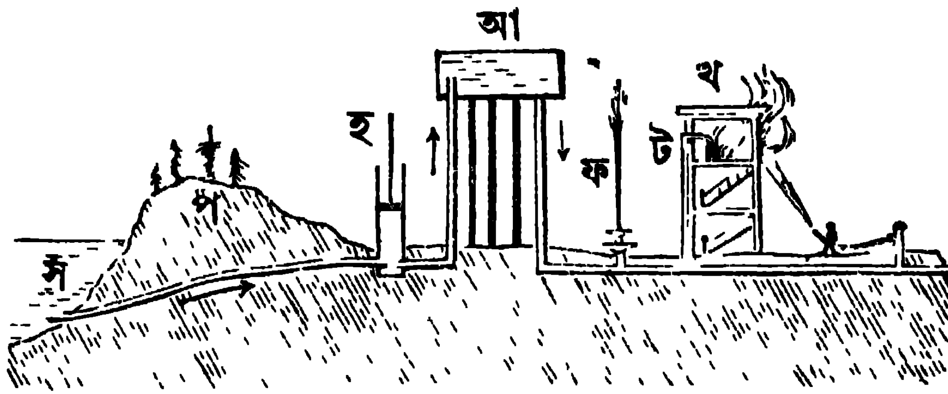
চিত্রে দেখ **ক** ও **খ** দুইটি পাত্র একটি নল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহাদের মধ্যে **খ** পাত্রটি **ক** পাত্রের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। নলের চাবিটি বন্ধ করিয়া দুইটি পাত্রে জল এরূপ ভাবে ঢাল যেন **খ** পাত্রের জলতল **ক** পাত্রের জলতল অপেক্ষা উচ্চে থাকে। এক্ষণে নলের চাবিটি খুলিয়া দিলে দেখিবে যে **খ** পাত্রের জলতল নামিয়া যাইতেছে ও **ক** পাত্রের জলতল ক্রমশ উচ্চ হইতেছে। অবশেষে পাত্র দুইটির জলতল এক সমতলে আসিবে। তখন আর চলাচল হইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে **খ** পাত্রের জল পরিমাণে কম হইলেও ইহার তলের উচ্চতা হেতু **ক** পাত্রে আসিল।



১৮নং চিত্র—জল চলাচল

যদি বড পাত্রটির জলতল উচ্চতর হইত তবে দেখিতে ইহার জলই ছোট পাত্রে আসিত। জলের **চলাচল জলতলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে,** পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

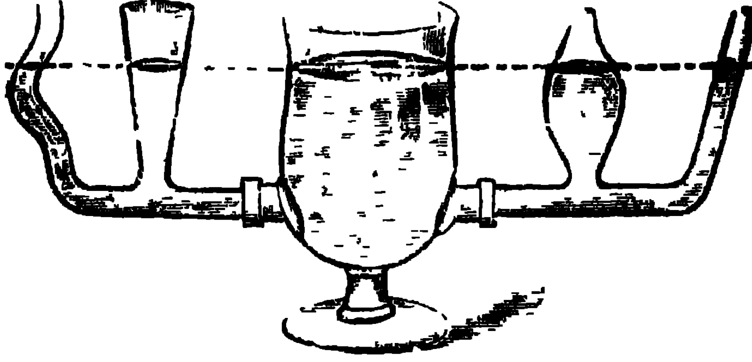
জলের এই ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া সহরে কলের জল সরবরাহ হইয়া থাকে। বহু উচ্চে একটি অতি বৃহৎ পাত্রে জল পাম্প করিয়া তুলিয়া সঞ্চিত রাখা হয়। পরে বড নল দ্বারা সেই পাত্র হইতে জল নিচে সরবরাহ করা হয়। এই বড় নলের সঙ্গে আবার ছোট ছোট নল, শাখা প্রশাখা হিসাবে বাহির হইয়া সহরের চতুর্দিকে ছড়াইয়া থাকে। যে কল গুলি হইতে আমরা জল পাই তাহার উচ্চতা



১৯নং চিত্র—সহরে জল সরবরাহ

যদি বৃহৎ পাত্রস্থ জলতলের অপেক্ষা নিচু হয় তবে সর্বদাই আমরা জল পাইতে পারি কিন্তু যদি এই কলগুলি উচ্চে স্থাপিত হয় এবং বৃহৎ পাত্রস্থ জলতলের উচ্চে বা সমান হয় তবে ইহা হইতে জল পাওয়া যাইবে না—নিচু হইলে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যত নিচু হইবে তত অধিক জোরে জল পাওয়া যাইবে। এই জন্য সহরের বাড়ীর একতলার কলের জল যত জোরে পড়ে দোতলার বা তেতলার কলের জল তত জোরে পড়ে না। চিত্রে দেখ **স** নামক নদী, পুকুর বা সমুদ্র হইতে জল **হ** পাম্প দ্বারা টানিয়া **আ** নামক আধারে রক্ষিত হইয়াছে। সেখান হইতে জল আনিয়া **ফ** নামক ফোয়ারা দিয়া বাহির হইতে পারে। আবার একটি বাড়ীর উপরে **ট** নামক স্থানে অনায়াসে আপনি উঠিতে পারে।

বিভিন্ন আকারের বহু শাখা বিশিষ্ট একটি পাত্রের একটি শাখায় জল ঢালিলে দেখা যায় জল ঢালা বন্ধ হইলে যতক্ষণ না সকল কটি শাখার জলতল সমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইবে ততক্ষণ জল স্থির হইবে না। ইংরাজিতে সেজন্য বলে "Water finds its own level"। চিত্রে বিভিন্ন আকৃতির বহু শাখা বিশিষ্ট একটি কাচ পাত্রে জলতলের সমতা দেখা গেল। জলের সকল বাহ্য ধর্ম অন্যান্য তরল পদার্থে দৃষ্ট হয়।

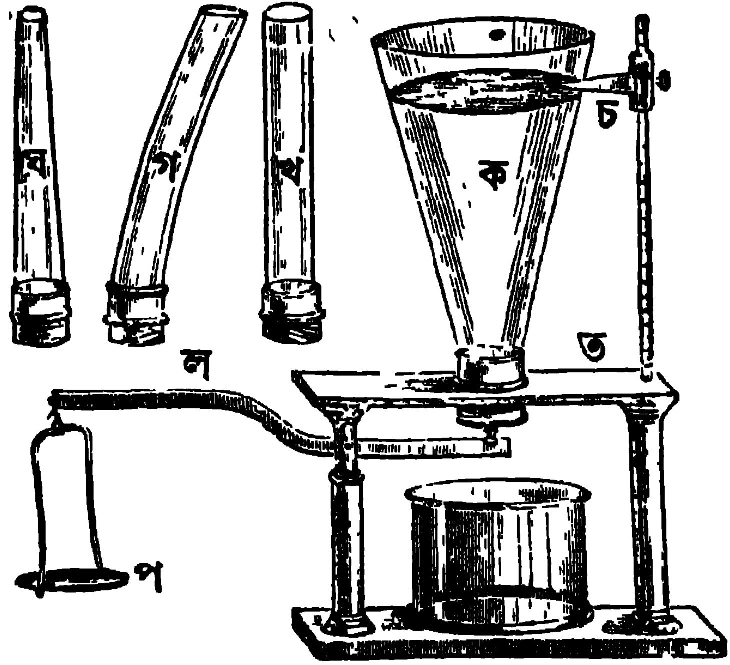


২০নং চিত্র—জলতলের সমতা

তরল পদার্থের চাপ

বায়ুমধ্যস্থ কোন স্থানে বায় যে চারিদিকেই চাপ দেয়, তাহা তোমরা পূর্বেই দেখিয়াছ। তরল পদার্থ উহার অভ্যন্তরস্থ সকল স্থানে চারিদিকেই চাপ দিয়া থাকে। মনে করা যাউক, জলের ভিতর জলতলের সমান্তরাল একটি ছোটতল রহিয়াছে। এই তলের উপর জলের উপরিতল পর্যন্ত যে জলটুকু দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ভারের দরুণ সে নিম্নদিকে চাপ দিবে, ইহাই জলের নিম্নচাপ। এইজন্য এই তলটিকে জলের ভিতর যতই নিচের দিকে লওয়া যাইবে, ততই ভারবৃদ্ধিহেতু জলের চাপও বেশী হইবে। আবার এই তল যত বিস্তৃত হইবে, উহার উপর মোট চাপও তত অধিক হইবে। সুতরাং কোনও জলপূর্ণ পাত্রের তলায় যে মোট চাপ পড়ে, তাহার পরিমাণ ঐ তলার বর্গফল ও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে, জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। পরীক্ষা করিবার জন্য চিত্রে প্রদর্শিত একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। **ক খ গ ঘ** প্রভৃতি কতকগুলি বিভিন্ন আকার

ও আযতন বিশিষ্ট পাত্র ; কিন্তু ইহাদেব সকলগুলিব তলদেশেব ক্ষেত্রফল সমান। একটি লেভাব লএব এক বাহুতে একটি পাল্লা প ও অপব বাহুতে একটি বাটি এমন ভাবে লাগান থাকে যে, পাল্লায় বাটকাবা দিয়া ছাডিয়া দিলে অপর বাহুব বাটিটি জোবে উপর দিকে উঠিবাব কালে পূর্বোক্ত যে কোন একটি পাত্রেব তলদেশে গিয়া লাগে। বলা বাহুল্য যে পাত্রগুলিব তলদেশ ফাঁকা এবং যদি উহাদিগকে যন্ত্রে লাগান যায তবেই বাটিটি গিয়া ইহাদেব তলদেশ বন্ধ কবিবে। পাশে একটি প্রদর্শক চ থাকে, তদ্বাবা পাত্রেব জল কতদূব উঠিল তাহা স্থিব কবা যায়। এখন পাল্লায কিছু বাটকাবা দিযা কোন একটি পাত্র যন্ত্রে লাগাইয়া

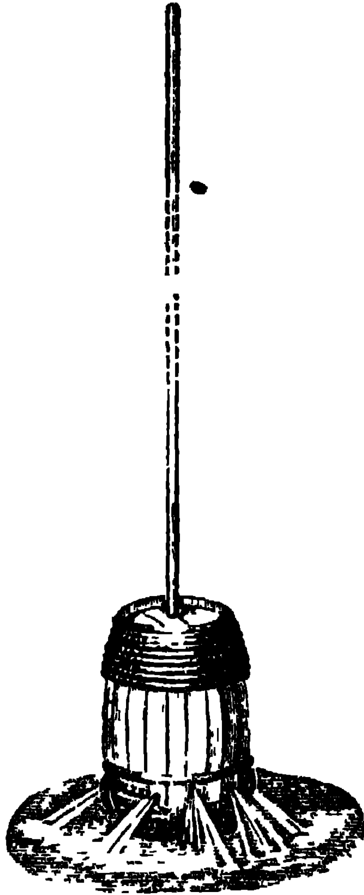


২১নং চিত্র—জলচাপেব সমতা

তাহাতে এমনভাবে জল ঢালিতে থাক যেন আব একটু জল দিলে উক্ত জলেব নিম্ন চাপ হেতু লেভাবেব বাটিতে যে চাপ পডিবে তাহাতে বাটিটি নিচেব দিকে নামিযা যাইবে এবং পাত্র হইতে জল পডিতে আবম্ভ হইবে। ঠিক এইরূপ অবস্থায় প্রদর্শকটিকে জলেব উপবিতলে স্থিব বাখ। এখন বিভিন্ন পাত্রগুলি লাগাইযা দেখিলে বুঝিবে যদি জলতল পূর্বোক্ত স্থান পর্য্যন্ত পৌছায তবে সকল পাত্রগুলিব অবস্থা একই রূপ হইবে। পাত্রেব আকাব বা আয়তনেব উপব কিছুই যায আসে না।

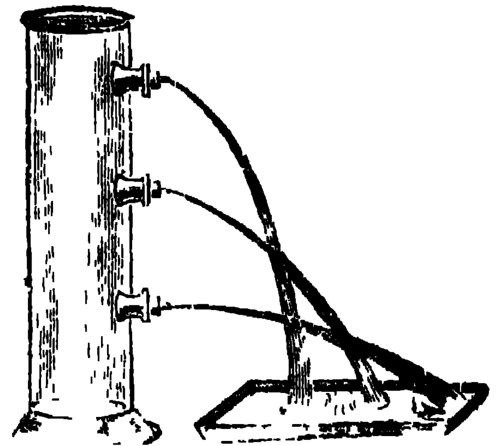
জলেব এই গুণেব উপব নিভব কবিযা অতি আশ্চর্যজনক একটি পবীক্ষা কবিতে পাবা যায। একটি বড মজবুত পিপা জলপূর্ণ কবিয়া তাহাব মুখটি বন্ধ

করিয়া একটি সরু দুইমুখ খোলা নল এমনভাবে লাগাইয়া দিতে হইবে যেন ঐ নলে জল ঢালিলে পিপার মধ্যে চলিয়া যায় এবং কোন পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না। এমত অবস্থায় ঐ নলের ভিতর দিয়া অল্পমাত্র জল ঢালিয়া দিলে পিপাটি ফাটিয়া যায়। তাহার কারণ আর কিছু নহে, পিপার তলার ক্ষেত্র ফল অধিক থাকায় এবং নল পথে জলের উচ্চতা অধিক হওয়ায় জলের চাপ বহু গুণ বাড়িয়া গেল। পিপাটি বরাবর যদি একই রূপ মোটা হইত তবে তাহাতে যে জল ধরিত তাহার চাপ যত হইত এক্ষণে ঐ অল্প মাত্র জলের দরুণ চাপ ঠিক তাহার সমান হওয়ায় এরূপ হইল।



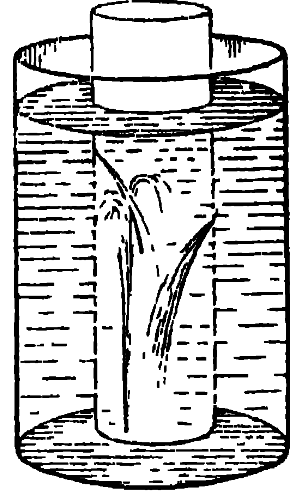
২২নং চিত্র—অল্প মাত্র জলের চাপে পিপা ফাটিয়া যাইতেছে

কঠিন পদার্থ আপন ভারের জন্য কেবল মাত্র নিম্নদিকেই চাপ দেয়, কিন্তু তরল পদার্থ যেমন নিম্নদিকে চাপ দেয়, তেমনই পাশেও চাপ দেয়। সামান্য পরীক্ষা দ্বারা জলের পার্শ্ব-চাপের অস্তিত্ব বুঝান যাইতে পারে। ২৩নং চিত্রে দেখ, একটি লম্বা নলের গায়ে কয়েকটি ছিদ্র আছে। নলের মধ্যে জল ঢালিলে ছিদ্রপথে ফিনকি দিয়া জল বাহির হইতে থাকিবে। নলটির পাশে জলের চাপ পড়িতেছে বলিয়াই এরূপ হয়। তাহা ছাড়া আরও দেখ, সকলের নিচের ছিদ্র দিয়া জল যত জোরে বাহির হইতেছে, উপরের ছিদ্র দিয়া তত জোরে বাহির হইতেছে না। ইহা



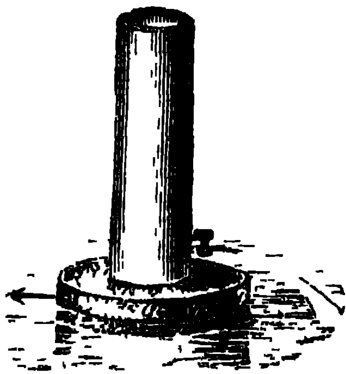
২৩নং চিত্র—জলের পার্শ্বচাপ

হইতে বুঝা যায় যে, ছিদ্রস্থানে জলের গভীরতা যত অধিক, তথাকার পার্শ্বচাপও তত অধিক। অতএব তরল পদার্থের **পার্শ্ব-চাপ** (Lateral pressure) ইহার গভীরতার সহিত বৃদ্ধি পায়। এই পরীক্ষাটি আর এক ভাবে করা যাইতে পারে। টিনের নলের গায়ে বা তলায় কতকগুলি ফুটা কর। বন্ধমুখ অর্থাৎ তলা নিচের দিকে রাখিয়া নলটি সোজাভাবে জলের ভিতর খানিকটা ডুবাইলে দেখা যাইবে যে জলের পার্শ্বচাপ বা ঊর্ধ্বচাপ হেতু সমস্ত ছিদ্র দিয়া জল জোরে ভিতর দিকে প্রবেশ করিতেছে (২৭নং চিত্র)।

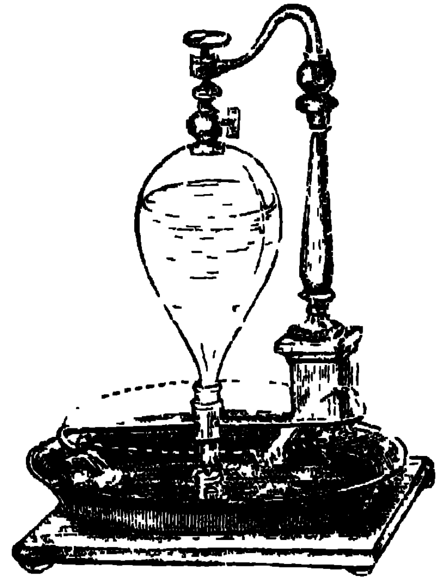


২৪ নং চিত্র—জলের পার্শ্বচাপ ও ঊর্ধ্বচাপ

নিচে প্যাচ কল বিশিষ্ট একটি পাতলা টিনের পাত্রকে এমন একটি কর্কের উপর আঁটিয়া বসান যায় যেন ঐ কর্ক সমেত পাত্রটিতে জল ঢালিয়া আর এক জল পূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দিলে উহারা ভাসিতে পারে। এখন টিনের পাত্রটির প্যাচ কল খুলিয়া দিলে উহা হইতে জল নির্গত হইয়া বৃহত্তর পাত্রের জলে পড়ে এবং দেখা যায় কর্ক-সমেত পাত্রটি পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ পাত্রের যে দিক দিয়া জল নির্গত হইয়া যাইতেছে সেই দিকের পার্শ্বচাপ কমিয়া যায়, অথচ তাহার বিপরীত দিকে পার্শ্বচাপ পূর্ববৎ থাকায় উহার গতির অন্তরায় কেহ থাকে না; কাজেই পাত্রটি বিপরীত দিকে সরিয়া যায়। এই



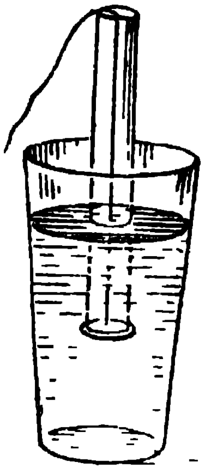
২৫ নং চিত্র—জল নির্গমনের ফলে পাত্রের পশ্চাদপসরণ



২৬নং চিত্র—বার্কারের যন্ত্র

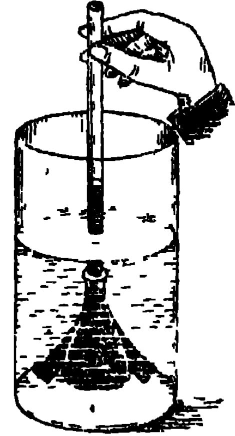
গুণের উপর নির্ভর করিয়া বার্কার সাহেব কেমন একটি কৌতুক জনক যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া ছিলেন চিত্রে দেখ। ইহার দুই পাশের দুইটি নল একই দিকে বাকান থাকায় জলের চাপ কমিয়া যাওয়ায় জল পাত্রটি ঘুরিতে থাকে।

উপরের পরীক্ষায় ঐ নলটির তলায় ফুটা থাকায় দেখিয়াছ যে, জল ফিন্‌কি দিয়া নলটির ভিতরে উপর দিকে উঠিতেছে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে জলের উর্ধ্বচাপও আছে। জলের **উর্ধ্বচাপ** (Upward thrust) বুঝিবার জন্য আর একটি পরীক্ষা করা যাউক। দুইমুখ খোলা একটি কাচের নল লও এবং তাহার মুখ ঠিক ঢাকিয়া রাখিতে পারে এমন একটি টিনের চাকৃতি লইয়া উহার মাঝে একটি লম্বা সূতা আটকাইয়া রাখ। এখন নলের মুখে চাকৃতি লাগাইয়া উহার সূতাটি নলের মধ্য দিয়া অন্য মুখে টানিয়া ধরিয়া রাখ (২৭নং চিত্র)। এইরূপ অবস্থায় নলটিকে একটি জলপূর্ণ গ্লাসের মধ্যে ধীরে ধীরে খানিকটা ডুবাইয়া দাও, দেখিবে সূতা ছাড়িয়া টিনের চাকৃতিটি নলের মুখে লাগিয়া আছে, পড়িয়া যাইতেছে না। ইহা হইতে বুঝা গেল যে চাকৃতির নিম্নস্থ জলের উর্ধ্বচাপ দ্বারাই ইহা নল-মুখে আটকাইয়া আছে। এইবার নলের খোলামুখ দিয়া ভিতরে জল ঢালিতে থাকিলে দেখিবে যে, নলের জল যখন বাহিরের জলের সহিত প্রায় এক সমতলে আসিয়াছে, তখন চাকৃতিটি নলের মুখ হইতে খসিয়া পড়িল। এখন চাকৃতির উপর গ্লাসের জলের উর্ধ্বচাপ ও তাহার উপর নলমধ্যস্থ জলের নিম্নচাপ সমান হওয়াতে চাকৃতি নিজের ভারের জন্য খসিয়া পড়িল। এই পরীক্ষা হইতে বুঝা গেল, জলমধ্যস্থ যে কোনও স্থানে জলের উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান থাকে। জলের ন্যায় অন্যান্য তরলপদার্থও এইরূপ নিম্নচাপ, পার্শ্বচাপ ও উর্ধ্ব-চাপ দেয়।



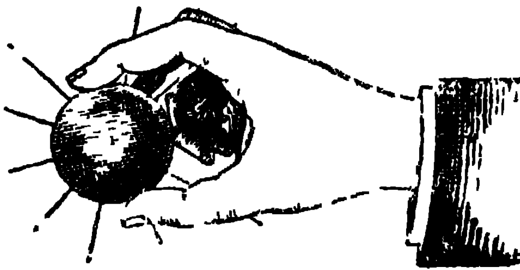
২৭নং চিত্র
জলের উর্ধ্বচাপ

একটি দুইমুখ খোলা সরু কাচের নলের একমুখ, পাতলা রবারের বেলুনের নলের মধ্যে ঢুকাইয়া রবার নলটি কাচ নলের উপর উত্তমরূপে সূতা দিয়া বাঁধ, যেন কাচ নলের ভিতর দিয়া বেলুনের মধ্যে জল ঢালিলে সে জল ঐস্থান দিয়া বাহির হইতে না পারে। পরে কিছু রঙিন জল কাচনল মধ্য দিয়া বেলুনের ভিতর ঢাল যেন সমস্ত বেলুন পূর্ণ হইয়া ঐ রঙিন জল কাচনলের মধ্যেও কিছু উঠিয়া থাকে। এমতাবস্থায় যদি কাচনলটি ধরিয়া বেলুনটিকে জলে ডুবান যায় তবে দেখা যায় বেলুনটি যত অধিকজলে ডুবান যাইবে ইহার মধ্যস্থ রঙিন জল ততই কাচনলে উপরে উঠিতে থাকিবে। তাহা হইলে বুঝা যায় যত জলের গভীরতা বাড়িবে ততই ইহার চাপ অধিক হইবে।



২৮নং চিত্র—জলের গভীরতা বৃদ্ধির সহিত চাপ বৃদ্ধি

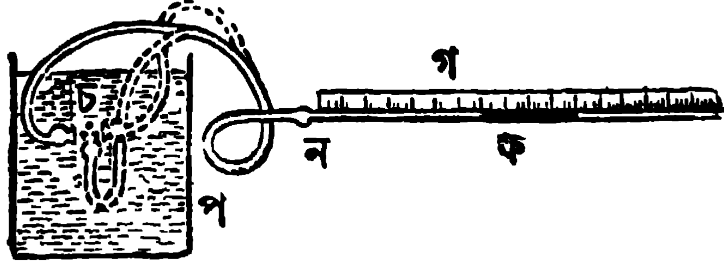
তরল ও বায়ব্য পদার্থের আর একটি ধর্ম এই যে উহাদের যে কোনও এক স্থানে চাপ দিলে, সেই চাপ সকল দিকে সমান ভাবে চালিত হয়। ইহাকে **পাস্কাল** সাহেবের নিয়ম বলে। পার্শ্বস্থ চিত্রে রবারের বলটির গায়ে একটি বড় ও অন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। বলটিকে টিপিয়া উহার ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া দিয়া জলের ভিতর ডুবাইয়া ধর। হাতের চাপ সরাইয়া লইলে জল বলের ভিতর প্রবেশ করিবে। জলপূর্ণ বলটি জল হইতে বাহির কর। পরে বড় ছিদ্রটি আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া বলের উপর চাপ দিলে জল বিভিন্ন ছিদ্র পথে চারিদিকেই সমান জোরে ছিটকাইয়া পড়িবে।



২৯নং চিত্র—জলের সর্বদিকে চাপ

৩০ নং চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্র সাহায্যে প্রমান করা যাইতে পারে জলের ভিতর কোন স্থানের নিম্নচাপ যত, ঊর্ধ্ব বা পার্শ্বচাপ ঠিক তত। **গ** একটি মাপিবার

গজ. ইহার গায়ে একটি রবারের নল **ন** সংযুক্ত একটি কাচ নল ভূ-সমান্তরাল করিয়া রাখা হইয়াছে। রবারের নলের এক প্রান্ত শুষিয়া কাচের নলের ভিতর এক ফোঁটা কালি লওয়া হইয়াছে। মনে করা যাউক **ফ** ইহার অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। রবারের নলের অপর প্রান্তে একটি কাচের ফানেলের ডাঁটি প্রবেশ করাইয়া ফানেলের মুখ পাতলা রবার দিয়া উত্তমরূপে বাঁধা হইয়াছে, যেন ইহার ভিতর জল প্রবেশ করিতে না পারে। এরূপ অবস্থায় ফানেলটি **প** পাত্রের জল মধ্যে যে কোন স্থানে, মনে কর **চ**তে আছে। ঠিক **চ** বিন্দুতে ফানেলের মুখের কেন্দ্র রাখিয়া ফানেলকে উপুড় কর, দক্ষিণে, বামে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাও কাচনলে কালির অবস্থান ঠিক থাকিবে। কিন্তু ফানেলটি আরও নিচে নামাইলে বা উপরে তুলিলে দেখা যাইবে কালির ফোঁটা কাচনলের যথাক্রমে বাহিরের দিকে বা ভিতরের দিকে যাইতে চেষ্টা করিবে।



৩০নং চিত্র—তরল পদার্থে একস্থানের সকল রকম চাপ সমান

জল এবং বায়ুর ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া বহু আশ্চর্যজনক এবং কৌতুক জনক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাদের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হইল।

ফাউন্টেন পেনের **কালিতোলা যন্ত্র** (Dropper):—উহার রবারটি টিপিলে ভিতর হইতে কিছু বায়ু বাহিরে চলিয়া আসে। এই অবস্থায় ইহার মুখটি কালিতে ডুবাইয়া রবার আল্‌গা করিয়া দিলে যন্ত্রের ভিতরের অল্প বায়ু ছড়াইয়া পড়ে, কাজেই ভিতরে বায়ুর চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু কালির পাত্রের উপর বায়ুমণ্ডল সবদাই অধিক চাপ দিতে থাকে—সেই চাপে পাত্র হইতে কালি যন্ত্রের মধ্যে চলিয়া যায়। এইবার সমস্ত যন্ত্রটি বাহিরে আনিয়া (যেন রবারে

চাপ না পড়ে) উহার মুখটি ফাউন্টেন পেনের খোলের ভিতর রাখিয়া বরাবরটি টিপিয়া দিলে চাপে ভিতরের কালি ফাউন্টেন পেনের খোলের মধ্যে চলিয়া যায়।

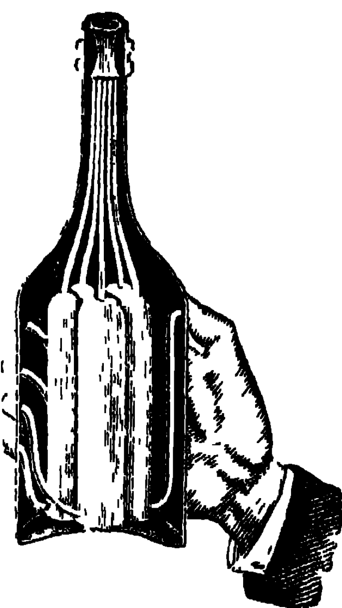
এখন তোমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে একটি বাটি বা গেলাস মুখে লাগাইয়া মুখ দিয়া ইহাদের ভিতর হইতে বায়ু শুষিয়া লইলে কেন ঐগুলি আমাদের মুখে আটকাইয়া যায়। একটি ফাঁপা চাবিকাটি কিংবা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ছোট শিশিও এইরূপে জিহ্বায় কিংবা ঠোঁটে আটকান যায়।

যাদু বোতল (Magic Bottle)—প্রথম প্রকার :—একটি সরু মুখ ও সছিদ্রতলা বিশিষ্ট পাত্রে জল লইয়া মুখটি আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া তুলিলে ইহা হইতে জল পড়িবে না। অথচ মুখের আঙ্গুল ছাড়িয়া দিলে ঝরণার ন্যায় ছিদ্র দিয়া জল নিচে পড়িতে থাকিবে।



৩১নং চিত্র—যাদু বোতল, প্রথম প্রকার

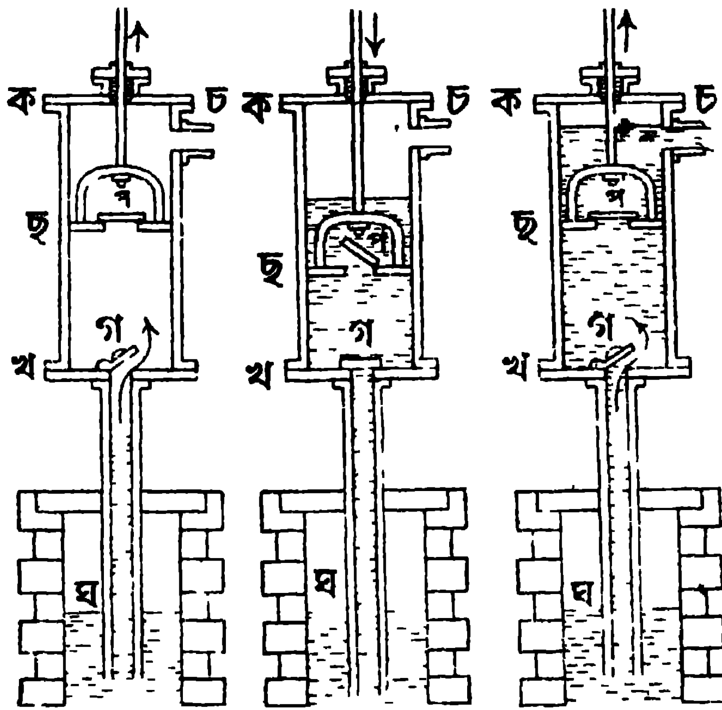
দ্বিতীয় প্রকার —উপর্যুক্ত বোতলের ন্যায় একটি পাত্রের ভিতরে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ থাকে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের কিন্তু একটি মুখ এবং তলাদেশে একটি ছিদ্র থাকে। সকল প্রকোষ্ঠগুলির মুখ কিন্তু বোতলটির মুখে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং তলার ছিদ্রে একটি নল লাগাইয়া বোতলের গায়ে লাগান আছে এবং তাহার মুখে একটি করিয়া বোতাম আছে। বিভিন্ন বোতাম টিপিয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের তলার ছিদ্র খুলিয়া দিতে পারা যায়। এইরূপ বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে চা, জল, সরবৎ প্রভৃতি বিভিন্ন তরল পদার্থ পূর্ণ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির তলা বন্ধ করিয়া উপুড় করিয়া ধরিলে প্রকোষ্ঠগুলির ভিতর হইতে তরল পদার্থ-গুলি পড়িয়া যায় না। এমতাবস্থায় যদি পাশের কোন একটি নির্দিষ্ট বোতাম



৩২নং চিত্র—যাদু বোতল, দ্বিতীয় প্রকার

টেপা হয় তবে ঐ প্রকোষ্ঠে যে তরল পদার্থ থাকিবে তাহা পড়িয়া যাইবে। এইরূপে ইচ্ছামত চা, জল ও সরবৎ ইত্যাদি পড়িতে পারে। এইরূপ পাত্রের সাহায্যে যাদুকর খেলা দেখাইয়া তোমাদের নিকট হইতে সময় সময় কত পয়সা আদায় করে। তোমরা ইহার কারণ জান না বলিয়া কতই আশ্চর্যান্বিত হও। এইরূপ জগতে কত আশ্চর্য ব্যাপারের কারণ তোমরা পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবে। 'Read and you will learn' এই ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি সর্বদা স্মরণ রাখিও।

পাম্প (Pump) :—নলকূপ হইতে জল তুলিবার সময় তোমাদিগকে পাম্পের হাতল টানিতে হয় বা চাকা ঘুরাইতে হয়, কিন্তু ঐরূপ করিলে কেন যে জল আসে এবং কিরূপে আসে তাহা তোমরা অনেকেই জান না। চিত্রে দেখ **কখ** একটি পাম্পের খোল (Cylinder)। ইহার ভিতরে **ছ** একটি বায়ুপথ বন্ধকারী পিষ্টন দণ্ড উঠা-নামা করে। খোলটির তলদেশ নলদ্বারা কোন কূপ বা নিম্নস্থ কোন জল ভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত। উক্ত খোলের তলদেশে ও নলের উপরে **গ** একটি কপাটিকা (Valve) এবং পিষ্টনদণ্ডটির সহিত সংযুক্ত **প** একটি কপাটিকা। **চ** ইহার পাশস্থ নল—এই পথে জল বাহির হয়। দুইটি কপাটিকার পার্থক্য এই যে যখন পিষ্টন দণ্ডটি নিচে নামিতে থাকে তখন **প** কপাটিকা খুলিয়া যায় ও জল চলাচলের পথ



৩৩নং চিত্র—পাম্প

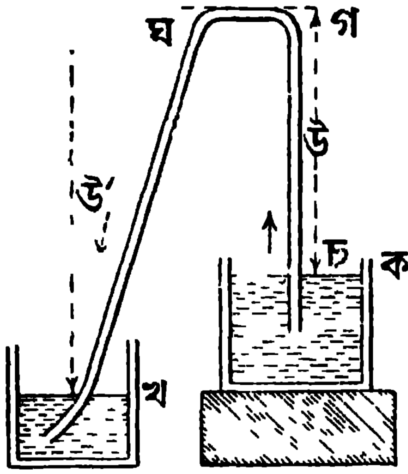
পরিষ্কার করিয়া দেয় অথচ **গ** কপাটিকা বন্ধ হইয়া জলপথ রোধ করে, আবার

যখন পিষ্টন দণ্ডটি উপরে উঠে তখন **গ** খুলিয়া যায় অথচ **প** বন্ধ হইয়া যায়। মনে কর প্রথম অবস্থায় পিষ্টন দণ্ডটি উপরদিকে টানা হইল। তখন **প** বন্ধ হইয়া যাওয়ায় খোলটির প্রায়-বায়ু-শূন্য অংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং ইহার ভিতরে বায়ুর চাপ কম হওয়ায় খোলা কপাটিকা অতিক্রম করিয়া নিচের জল উপরে উঠিতে থাকে। এইবার যদি পিষ্টন দণ্ডটি নামিতে থাকে তবে **গ** বন্ধ হইয়া যায় এবং **প** খুলিয়া যায়। কাজেই খোলের ভিতর যতটুকু জল প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সমস্তই **প** অতিক্রম করিয়া খোলের উপরদিকে উঠিতে থাকে। এইবার পিষ্টন দণ্ডটি উঠাইলে পুনরায় নিচের নলের জল উপরে উঠিতে থাকিবে এবং পূর্বে উত্তোলিত খোলের জল **চ** পথ দিয়া বাহিরে আসিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রমাগত পিষ্টন দণ্ডের উঠা-নামার ফলে আমরা **চ** পথ দিয়া ক্রমাগত জল পাইয়া থাকি।

ফুটবল ফুলাইবার জন্য যে পাম্প ব্যবহার কর তাহাতে বায়ু মণ্ডলের বায়ু লইয়া ফুটবলের ব্লাডারের ভিতর পোরা হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে জল টানা হয়, এক্ষেত্রে বায়ু ঠেলিয়া দেওয়া হয়। কপাটিকার অবস্থান অনুসারে পাম্পের সাহায্যে কোন পাত্র হইতে তরল পদার্থ বা বায়বীয় পদার্থ যেমন টানিয়া বাহির করা যায় তেমনই ইহাদের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পাত্রের তল বা বায়বীয় পদার্থ ভরাও যায়। ফাগ খেলিবার সময় যে পিচকারি ব্যবহার কর তাহাও এক প্রকার পাম্প।

সাইফোন (Syphon) ঃ—কোন একটি পাত্র হইতে অপর পাত্রে কোন তরল পদার্থ চালাচালি করিবার সময় যদি ঢালাঢালি করা সম্ভব না হয় অথবা পাত্রস্থ তরল পদার্থের সর্বত্র আন্দোলন করা ক্ষতিজনক হয় তবে এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া তরল পদার্থটি পাত্রান্তর করিতে পারা যায়। দুই মুখ খোলা একটি নলকে বাঁকাইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত করা হয় যেন একটি বাহু অপর বাহু হইতে দীর্ঘতর হয়। যে পাত্রের তরল পদার্থ অন্য পাত্রে চালিত করিতে হয় সেই পাত্রে ছোট বাহু এবং যে পাত্রে তরল পদার্থ চালিত করিতে হইবে সেই পাত্রে অপর বাহু

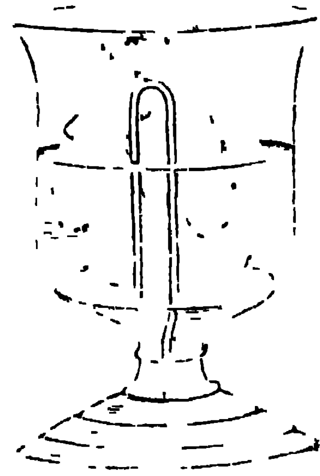
রাখিতে হয়, কিন্তু তৎপূর্বেই সাইফোনটি উক্ত তরল পদার্থে পূর্ণ করিয়া



৩৪নং চিত্র—সাইফোন

রাখিতে হয়। এই অবস্থায় যন্ত্রটিকে ছাড়িয়া দিলে প্রথম পাত্রের তরল পদার্থ আপনা হইতে দ্বিতীয় পাত্রে আসিতে থাকিবে যে পর্যন্ত না দুইটি পাত্রের তরল পদার্থের তল এক হইয়া যায় অথবা প্রথম পাত্রটি শূন্য হইয়া যায় অথবা প্রথম পাত্রের জল এত কমিয়া যায় যেন সাই-ফোনের বাহুটি আর ইহাতে ডুবিয়া থাকিতে না পারে। চিত্র দেখ **ক** পাত্রের জলতল **চ** হইতে **খ** পাত্রের জলতল নিচে আছে। **চগ** দূরত্ব যদি **উ** দ্বারা নির্দিষ্ট হয় তবে যতক্ষণ **উ′**, **উ**এর চেয়ে বড় থাকিবে ততক্ষণ জল চলাচল সম্ভব হইবে।

ট্যাণ্টালাসের বাটি (Tantalus' Cup) ঃ—ইহা সাইফোনের রূপান্তর বলিলেও চলে। চিত্রে একটি ট্যাণ্টালাসের বাটি দেখান হইল। একটি কাচের ফাঁপা নল বাকাইয়া একটি বাহু ভিতরের দিকে তলায় আনা হয় এবং ঐ নলের অপর প্রান্ত বাটির তলার একটি ফুটা দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যে ফুটা দিয়া নলটি বাহির হইয়া যায় সেই ফুটাটি বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় যেন বাটির জল এই ফুটা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে। এখন বাটিতে জল ঢালিলে দেখা যায় যতক্ষণ নলের উপর অংশ পর্যন্ত ডুবিয়া না যায় ততক্ষণ বাটি হইতে জল কোথাও যায় না, কিন্তু যেই উপর পর্যন্ত জল উঠে, অমনি বাঁকা নল দিয়া বাটির জল বাহির হইয়া যাইতে থাকে। যদি বাটিতে নূতন করিয়া জল না ঢালা হয় তবে যতক্ষণ বাটির ভিতর জল তলের সহিত বাটির ভিতরের নলের প্রান্তের যোগ ছিন্ন না হয় ততক্ষণ বাটির প্রায়

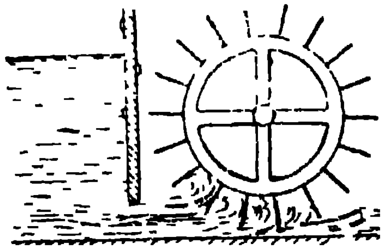


৩৫নং চিত্র—ট্যাণ্টালাসের বাটি

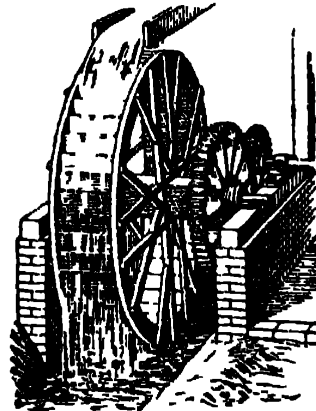
সমস্ত জলই এইরূপে বাহির হইয়া যায়। বাটিটিকে কৌতুকাবহ করিবার জন্য ভিতরের নলটির চারিদিকে ঘেরিয়া একটি মানুষের মূর্তি প্রস্তুত করা হয়, মূর্তিটি রাজা ট্যাণ্টালাসের মূর্তি বলিয়া কল্পিত হয়। এই উপায়েই বড় বড় সহরের সাধারণ পায়খানাগুলি জল দ্বারা আপনা আপনি মাঝে মাঝে ধৌত হইয়া যাইতে দেখা যায়।

জলের শক্তি অপরিসীম। সেই শক্তিবলে জল পর্বতশীর্ষ হইতে অজস্র ধারায় পাগলের মত সাগরে ছুটিয়া আসে। সে অমিত তেজে কত বিশাল প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বালুকণায় পরিণত হয়। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির সে দুর্বার শক্তিকেও পরাজিত করিয়া আপনার কাজে লাগাইয়াছে। জলচক্র তাহার একটি উদাহরণ। ৩৬ নং চিত্রে দুইটি জলচক্র (Water mill) দেখান হইল। জলধারা ছুটিয়া চলিয়া যাইবার সময় বড় বড় চাকার পাখায় ধাক্কা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া দেয়, ফলে ঐ চাকার সহিত অন্য চাকার যোগ করিয়া মানুষ বড় বড় কারখানা চালায়।

(ক) চিত্রে দেখ শক্ত দেওয়াল দিয়া একটি বৃহৎ জলাশয়ের জল আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ঐ দেওয়ালের তলায় খানিকটা ফাঁক আছে। ঐ পথ দিয়া জল বাহিরে আসে। এই পথের সম্মুখেই কারখানার একটি বৃহৎ পাখাওয়ালা



৩৬নং চিত্র—(ক) জলচক্র



৩৬নং চিত্র—(খ) জলচক্র

চাকা থাকে। এই চাকাটির পাখায় ধাক্কা লাগিলে ইহা ইহার ধূরার (Axle) চারিদিকে ঘুরিতে পারে। প্রাচীর দিয়া আটকান জলের গভীরতা যত অধিক

হইবে নিচের পথ দিয়া জল তত অধিক জোরে বহির্গত হইয়া চাকার পাখায় ধাক্কা মারে, ফলে চাকাটি ঘুরিতে থাকে। চাকায় ধাক্কা দিয়া জলের অপর দিকে অন্য নিম্নস্থানে গড়াইয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে।

(খ) চিত্রে দেখ জলপ্রপাত দ্বারা বৃহৎ চাকাটি কেমন ঘুরান হয়। কোন একটি উচ্চ স্থান হইতে জল যখন পড়ে তখন তাহা যাহাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না হইয়া ঠিক চাকার পাখার উপর পড়ে তাহার জন্য জলের পথ বাঁধিয়া ঠিক তাহার নিচেই চাকার পাখাগুলি যাহাতে ঘুরিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এস্থলে জলপ্রপাতের জোর যত অধিক হয় চাকাটি সেইরূপ অধিক শক্তিতে ঘুরিতে থাকে।

কঠিন ও তরল পদার্থের ঘনত্ব

সমায়তনবিশিষ্ট একটি লৌহখণ্ড ও একটি কাষ্ঠখণ্ড হাতে করিলে বুঝা যাইবে যে, লৌহ কাষ্ঠ অপেক্ষা অনেক ভারী। এইজন্য আমরা লৌহকে কাষ্ঠ অপেক্ষা ঘন বা গুরু বলি। একটি বাটি জলপূর্ণ করিলে তাহার যত ওজন হয়, বাটিটি পারদপূর্ণ করিলে তাহার ওজন তদপেক্ষা অনেক বেশী হইবে, আবার ঐ বাটিটি তৈলপূর্ণ করিলে তাহার ওজন জলপূর্ণ বাটির ওজন অপেক্ষা কম হইবে। এই কারণে পারদ জল অপেক্ষা এবং জল, তৈল অপেক্ষা ঘন। এইজন্যই তেল জলের উপর ভাসে। এক সঙ্গে একটি পাত্রে পারদ, জল তেল এবং স্পিরিট রাখিয়া দিলে ভারী জিনিষগুলি নিচে এবং হাল্কা জিনিষগুলি কিরূপে উপরে ভাসিতে থাকে দেখ। সর্বনিম্নে পারদ, পরে জল, তাহার পরে তেল এবং সর্ব উপরে স্পিরিট ভাসিতে থাকে। বস্তুর **ঘনত্ব** (Density) তাহার এক ঘন ইঞ্চ বা এক



৩৭নং চিত্র
বিভিন্ন তরল পদার্থের গুরুত্ব হিসাবে অবস্থান

ঘন ফুট আয়তনেব ওজনেব দ্বাবা সূচিত হয। সুতবাং কোনও বস্তুর ওজন ও ঘনফল জানা থাকিলে তাহাব ঘনত্ব বাহিব কবা যায , যথা—

$$\text{বস্তুব ঘনত্ব} = \frac{\text{তাহাব ওজন}}{\text{তাহাব ঘনফল}}$$

ওজন ও ঘনফলে যে যে একক ব্যবহৃত হয, ঘনত্ব প্রকাশ কবিবাব সময তাহা স্পষ্ট কবিয়া উল্লেখ কবিতে হয় , যথা—জলেব ঘনত্ব প্রতি ঘন ফুটে ৬২ ৫ পাউণ্ড।

সাধাবণত, কঠিন বা তবল পদার্থেব ঘনত্ব জলেব ঘনত্বেব সহিত তুলনা কবা হয। কোনও বস্তু তাহাব সমায়তন জল অপেক্ষা কত গুণ ভাবী, তাহা যে সংখ্যা দ্বাবা প্রকাশিত হয, তাহাকে ঐ বস্তুব **আপেক্ষিক গুরুত্ব** (Specific gravity) বলে। স্বর্ণেব আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯ ৩, লৌহেব ৭ ৮ এবং রূপাব ১০ ৫ ইত্যাদি।

তবল পদার্থেব আপেক্ষিক ঘনত্ব নিম্নলিখিত উপাযে সহজেই নির্ণয কবিতে পাবা যায। ধব, সবিষাব তৈলেব আপেক্ষিক ঘনত্ব বাহিব কবিতে হইবে। একটি খালি বোতল লইযা তুলাদণ্ডেব সাহায্যে তাহাব ওজন বাহিব কব। পবে ইহাকে জলপূর্ণ কবিযা ওজন কব। বোতলেব জল ফেলিযা দিযা উহাকে সবিষাব তৈল দিয়া পূর্ণ কব এবং উহাব ওজন বাহিব কব। ইহা হইতে বোতলটিকে পূর্ণ কবিতে যে জল বা তেল লাগিযাছে, তাহাদেব ওজন স্থিব কব। ধব,

খালি বোতলেব ওজন	= ক
জলপূর্ণ ,, ,,	= খ
তৈলপূর্ণ ,, ,,	= গ
অতএব বোতলেব জলেব ওজন	= খ—ক
এবং ,, তৈলেব ,,	= গ—ক

$$\therefore \text{ তৈলেব আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{গ—ক}}{\text{খ—ক}}$$

এইরূপে দেখা গিয়াছে, পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩.৫, তেলের ০.৯ এবং সমুদ্রজলের ১.০২ ইত্যাদি। সমুদ্রজলে লবণ মিশ্রিত থাকায় উহা বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা গুরু বা ভারী। মরুসাগর নামক হ্রদে লবণের পরিমাণ অধিক বলিয়া উহার জল সমুদ্রজল অপেক্ষাও গুরু।

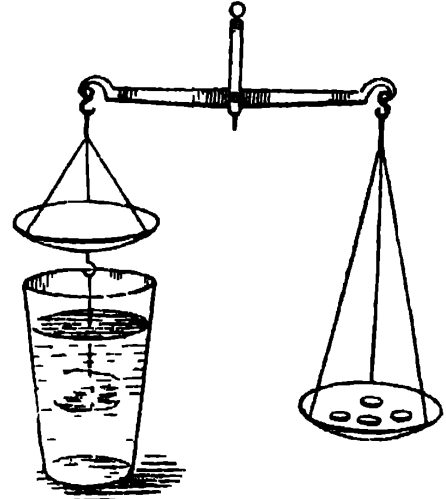
কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব আর্কিমিডিসের নিয়মানুসারে স্থির করিতে পারা যায়, তাহা তোমাদিগকে পরে বলিতেছি।

কঠিন ও তরল সকল পদার্থই উষ্ণ হইলে আয়তনে বর্ধিত হয়, কিন্তু ওজনের কোন পরিবর্তন হয় না বলিয়া ইহাদের ঘনত্ব কমিয়া যায়। তবে দুই একটি ক্ষেত্রে ইহারও ব্যতিক্রম দেখা যায়। জলে 0° সেন্টিগ্রেড্ হইতে ৪° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ করিলে দেখা যায়, ইহার আয়তন না বাড়িয়া কমিয়া যায়, সুতরাং ঘনত্ব বাড়িয়া যায়। তবে ৪° সেন্টিগ্রেডের পর জলের ঘনত্ব অন্যান্য বস্তুরই মত উষ্ণতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। এইজন্য ৪° সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় জল সর্বাপেক্ষা ঘন। ফলে, শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রজলের উপরিতল 0° সেন্টিগ্রেড্ হইলেও নিচের জল ৪° সেন্টিগ্রেড্ থাকায় অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকে। এই জন্য বরফ জলে ভাসে।

তরল পদার্থের প্লাবিতা ও আর্কিমিডিসের সিদ্ধান্ত

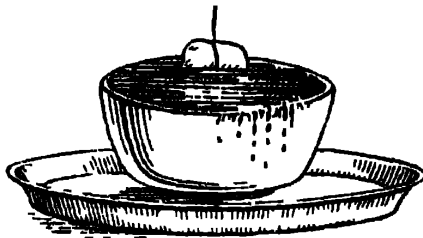
একটি জলপূর্ণ ঘড়া জলের ভিতর অতি সহজেই নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়, কিন্তু জল হইতে বাহির করিলেই উহা বেশ ভারী বোধ হয়। পুষ্করিণী বা নদীর জলে স্নান করিবার সময় তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ যে, তোমাদের শরীর জলের ভিতর যেন হাল্কা বলিয়া বোধ হয়। কোনও বস্তু জলে ডুবাইলে তাহার ভার কমে। এক টুক্‌রা লোহার ওজন তুলাদণ্ডের সাহায্যে বাহির কর। পরে উহাকে সূতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া ঐ অবস্থায় উহার ওজন বাহির করিলে দেখা যায় যে, জলের ভিতর তাহার ওজন কমিয়া গিয়াছে। এই

ওজন কমিবার কারণ কি? জলের ঊর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপের কথা তোমরা পূর্বেই শুনিয়াছ। এই লোহা টুকরাটির উপরতলে জলের নিম্নচাপ তাহাকে নিচে নামাইতে চায় এবং উহার নিচের তলে জলের ঊর্ধ্বচাপ উহাকে উপর দিকে ঠেলিয়া দেয়. কিন্তু কোন তলের উপর জলচাপের পরিমাণ, ঐ স্থানে জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য লোহাটির তলায় ঊর্ধ্বচাপ উহার উপর নিম্নচাপ অপেক্ষা অধিক। এই ঊর্ধ্বচাপ হইতে নিম্নচাপ বাদ দিলে যে পরিমাণ ঊর্ধ্বচাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে **ঊর্ধ্বচাপাবশেষ** (Resultant upward thrust) বলে, এবং ইহাই নিমজ্জিত বস্তুকে উপরদিকে ঠেলে এবং তাহার ভার কমাইয়া দেয়। তরল পদার্থের এই ধর্মকে উহার **প্লাবিতা** (Buoyancy) নাম দেওয়া যাইতে পারে।



৩৮নং চিত্র – নিমজ্জমান বস্তুর ওজন হ্রাস

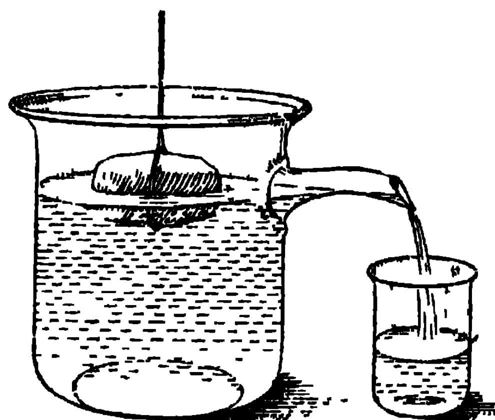
নিমজ্জিত বস্তুর উপর জলের ঊর্ধ্বচাপাবশেষ কত, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। একখণ্ড লোহাকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া তাহা লিখিয়া রাখ। লৌহখণ্ডটিকে একটি সূতার দ্বারা ঝুলাইয়া জলের মধ্যে ডুবাও এবং এই অবস্থায় তাহার ওজনও লিখিয়া লও (৩৮নং চিত্র)। জলে ওজন পূর্ব ওজন অপেক্ষা কত কম হইল, তাহা বাহির কর। এইবার একটি থালার উপর একটি জলপূর্ণ বাটি রাখিয়া উহাতে লৌহখণ্ডটি ডুবাইয়া দাও। লৌহখণ্ডের সমান আয়তনের জল উপ্ছাইয়া থালার উপর পড়িবে (৩৯নং চিত্র)। এই জলটুকুর ওজন বাহির করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা জলে নিমজ্জিত হওয়ায় লৌহখণ্ডের যে



৩৯নং চিত্র—নিমজ্জমান বস্তুর জলাপসারণ

ওজনের হ্রাস হইয়াছিল, ঠিক তাহার সমান। অতএব কোনও দ্রব্যকে জলে ডুবাইলে তাহা যে পরিমাণ জল সরাইয়া দেয়, সেই জলের যত ওজন, পদার্থটির নিমজ্জমান অবস্থার ওজন ঠিক তত কম হয়। এই সত্যটিকে **আর্কিমিডিসের নিয়ম** বা সিদ্ধান্ত (Archimede's principle) বলে। আর্কিমিডিসের সিদ্ধান্ত আরও সূক্ষ্মতররূপে প্রমাণ করিতে হইলে নিম্ন লিখিত পরীক্ষাটি করা যাইতে পারে।

প্রথমে একটি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে একখণ্ড পাথর সূতায় বাঁধিয়া ওজন কর। পরে ইহাকে ঐ সূতার দ্বারা তুলাদণ্ডের একটি বাহুতে ঝুলাইয়া জলে ডুবাইয়া ওজন কর। দেখিবে পূর্বাপেক্ষা এইবার ওজন কমিয়া গিয়াছে। যে পরিমাণ ওজন কমিয়াছে তাহা লিখিয়া রাখ। এইবার একটি কাচের পাত্র ঐ তুলাদণ্ডে ওজন কর। পরে চিত্রে যেমন গা-নলওয়ালা একটি পাত্র দেখান হইয়াছে ঐরূপ একটি পাত্রে জল ঢালিয়া দাও। দেখিবে যতই জল ঢাল না কেন পাত্রটি ভর্তি হইবে না, পাশের নল দিয়া ইহার জল বাহির হইয়া যাইবে। এইরূপে খানিকক্ষণ জল বাহির হইয়া গেলে যদি আর জল না ঢালা হয় তবে আপনা আপনি ইহা হইতে জল পড়া বন্ধ হইবে। ঠিক এই সময় পাত্রটিতে জল গলায় গলায় ভর্তি থাকিবে, একটু


৪০নং চিত্র—আর্কিমিডিসের সিদ্ধান্ত

মাত্র নাড়িলে বা অতি ক্ষুদ্র একটি কোন বস্তু ইহাতে ফেলিয়া দিলেও ইহা হইতে জল বাহির হইয়া যাইবে। এইবার কাচ পাত্রটি ইহার গা-নলটির নিচে বসাইয়া পাথর খণ্ডটি সূতাদ্বারা অতি সাবধানে আস্তে আস্তে পাত্রটির ভিতরে ডুবাইয়া ধর। তাহা হইলে পাথর খণ্ডটির আয়তন মত জল উপছাইয়া বাহির হইয়া পাত্রটিতে জমিবে। এখন যদি এই জল সমেত পাত্রটি ওজন

করা যায় তবে দেখা যাইবে পাত্রটির ওজন বৃদ্ধি এবং নিমজ্জমান অবস্থায় প্রস্তর খণ্ডটির ওজন হ্রাস, সমান।

উপরোক্ত নিয়মটির সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী শোনা যায়। সাযরাকিউজের রাজা হিরো এক স্বর্ণকারের দ্বারা একটি মুকুট প্রস্তুত করান। সুন্দর কারুকার্য-খচিত মুকুটটি দেখিযা রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে মুকুটটি বিশুদ্ধ স্বর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে কিংবা উহাতে কিছু খাদ মিশ্রিত আছে। তিনি দেখিলেন যে প্রদত্ত স্বর্ণের ওজন ও মুকুটটির ওজন এক। মুকুট ভাঙ্গিযা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার উপায নাই। তখনকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্‌কে ডাকিযা রাজা তাঁহার উপর এই বিষযে মীমাংসার ভার দিলেন। প্রথম কযেকদিন আর্কিমিডিস্ কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া মহাচিন্তায পড়িলেন। একদিন চৌবাচ্চায স্নান করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, চৌবাচ্চাটি কাণায কাণায জলপূণ। তিনি চিন্তিত মনে জলে অবগাহন করিবামাত্র লক্ষ্য করিলেন যে, চৌবাচ্চা হইতে জল উপ্‌চাইয়া পড়িল এবং তাঁহার



৪১নং চিত্র—আর্কিমিডিস

শরীরও কিছু লঘু বোধ হইল। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার শরীর জলে নিমজ্জিত হওয়ায় সময়াতন জল স্থানান্তরিত হইল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে মুকুটের ঘনফলও এইরূপে বাহির করা যাইতে পারে এবং মুকুটের ওজনপরিমিত বিশুদ্ধ স্বর্ণকে জলে ডুবাইলেও একই পরিমাণ জল উপ্‌চাইয়া পড়া উচিত। এইরূপে সমস্যা সমাধানের উপায় পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি চৌবাচ্চা হইতে

লাফাইয়া পড়িলেন এবং "পাইয়াছি পাইয়াছি" বলিতে বলিতে রাস্তার দিকে ছুটিলেন।

আর্কিমিডিসের সিদ্ধান্ত আরও একটি উপায়ে প্রমাণ করা যাইতে পারে। একটি গোল নিরেট ধাতব স্তম্ভক ও তাহার খাপ (Cylinder and Bucket) এমনভাবে প্রস্তুত করা যায় যে ধাতুদণ্ডের আকার ও আয়তন এবং খাপটির খোলের আকার ও আয়তন একেবারে অনুরূপ এবং ধাতুদণ্ডটি খোলের ভিতর ঠিক যাতায়াত করিতে পারে মাত্র। প্রথমে ধাতুদণ্ডটি খোলের ভিতর পুরিয়া দুইটিকে এক সঙ্গে ওজন কর। পরে ধাতুদণ্ডটিকে জলে ডুবাইয়া এবং খোলটি জলের উপর রাখিয়া পুনরায় ওজন কর। দেখ কিছু ওজন কমিয়াছে। এইবার আস্তে আস্তে খোলটি জলপূর্ণ কর। দেখ পূর্বের ওজন ফিরিয়া আসিয়াছে।

যে সকল কঠিন পদার্থ জলে ডুবে, তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব আর্কিমিডিসের নিয়ম দ্বারা অতি সহজেই বাহির করা যায়। একটি লৌহখণ্ড লইয়া নিম্নলিখিত উপায়ে ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব বাহির কর:—

মনে কর লৌহখণ্ডের ওজন = ক

জলে নিমজ্জিত অবস্থায় উহার ওজন = খ

∴ জলে লৌহখণ্ডের ওজন হ্রাস = ক − খ

কিন্তু আর্কিমিডিসের নিয়মানুসারে এই ওজন-হ্রাস, লৌহখণ্ডের সমায়তন জলের ওজনের সমান। আবার—

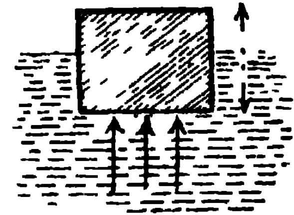
$$\text{বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{উহার ওজন}}{\text{উহার সমায়তন জলের ওজন}}$$

$$\text{অতএব লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{ক}}{\text{ক} - \text{খ}}$$

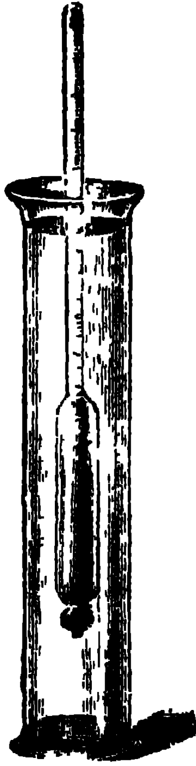
ভাসা ও ডোবা—একটুকরা লোহা জলে ফেলিয়া দিলে তাহা জলে ডুবিয়া যায় দেখিয়াছ। ইহার কারণ, নিমজ্জিত অবস্থায় লৌহখণ্ডের ভার উহাকে নিচের দিকে টানিতেছে এবং জলের ঊর্ধ্বচাপাবশেষ ইহাকে উপরের দিকে

ঠেলিতেছে। আর্কিমিডিসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই ঊর্ধ্বচাপাবশেষ লৌহখণ্ডের সমায়তন জলের ওজনের সমান। আবার, লৌহ জল অপেক্ষা ঘন, অর্থাৎ লৌহখণ্ডের ভার তাহার সমায়তন জলের ভার অপেক্ষা বেশী। অতএব উপরের দিকের চাপ কাটাইয়া লোহার টুক্‌রাটি জলে ডুবিয়া যায়। ঐরূপ ইট, পাথর প্রভৃতি গুরু জিনিষ জলে ছাড়িয়া দিলে ডুবিয়া যায়। অতএব যে জিনিষের ওজন তাহার সমায়তন জলের ওজন অপেক্ষা অধিক, তাহা জলে ফেলিলেই ডুবিয়া যাইবে।

কিন্তু দেখ, একটুক্‌রা কাঠ কিংবা সোলা জলে ফেলিলে উহা ভাসিতে থাকে। কাঠটিকে ধরিয়া জলমধ্যে ডুবাইলে ইহার সমায়তন জল সরিয়া যাইবে এবং উক্ত স্থানান্তরিত জলের ওজন পরিমিত চাপ ইহাকে উপর দিকে ঠেলিবে কিন্তু কাঠের ভার এই ঊর্ধ্বমুখ চাপ অপেক্ষা কম বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিলেই কাঠটি উপরে উঠিতে থাকে। অতএব যে সকল বস্তুর ভার সমায়তন জলের ভার অপেক্ষা কম, তাহারা জলে ভাসে। আরও দেখ, ভাসমান বস্তুর কতকাংশ জলের ভিতর থাকে (৪২নং চিত্র)। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই অবস্থায় যতটুকু জল সরিয়া গিয়াছে, তাহার ওজন ঐ ভাসমান বস্তুটির ওজনের সমান, অর্থাৎ যতটুকু অংশ জলের ভিতরে থাকিলে নিজের ভারের সমান জল অপসারিত হয়, বস্তুটি তাহার ঠিক ততটুক্ অংশ ডুবাইয়া ভাসিতে থাকে। এইজন্য ভাসমান বস্তু জলে ইহার যতটুকু ডুবাইয়া ভাসে, জলাপেক্ষা লঘু তরল পদার্থে তাহা অপেক্ষা বেশী অংশ ডুবাইয়া ভাসিবে। এইরূপ ভাসা ডোবা লইয়া তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, **হাইড্রোমিটার** (Hydrometer) নামক যন্ত্র সাহায্যে অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। চিত্রে হাইড্রোমিটার দেখান হইল। সমস্ত যন্ত্রটি কাচনির্মিত এবং প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। নিচের ফাঁপা গোলকটি পারদপূর্ণ, পরের অংশ অপেক্ষাকৃত


৪২নং চিত্র—ভাসা ও ডোবা

মোটা নল এবং উপর অংশ সরু নল। পারদ ভরিয়া যন্ত্রটিকে এরূপ ভারী করা হয় যে জলে ছাড়িয়া দিলে ইহার প্রথম দুই অংশ এবং উপরের নলেরও কিয়দংশ জলে ডুবিয়া থাকে। জল অপেক্ষা ভারি তরল পদার্থে ডুবাইলে কিছু কম অংশ ডুবে এবং জল অপেক্ষা লঘু তরল পদার্থে ডুবাইলে ইহার অধিকতর অংশ ডুবিয়া যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা কয়েকটি তরল পদার্থে ইহার যতদূর পর্যন্ত ডুবিয়া যায় সেই সেই স্থানে সেইরূপ দাগ দেওয়া থাকে। এরূপে সমস্ত যন্ত্রটির দাগ কাটা থাকে। পরে ইহাকে আপেক্ষিক গুরুত্ব না জানা কোন তরল পদার্থে ডুবাইলে যে পর্যন্ত ডুবিয়া যায় সেখানকার দাগ দেখিয়া তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা যায়। সুবিধার জন্য দুধ খাঁটি কি জল মিশ্রিত তাহা ঠিক করিবার নিমিত্ত হাইড্রোমিটারের এক বিশিষ্ট শ্রেণী ব্যবহৃত হয়, তাহারা **ল্যাক্টো-মিটার** (Lactometer) নামে অভিহিত। বলা বাহুল্য ল্যাক্টোমিটার খাঁটি দুগ্ধে যতটা ডুবে, জলমিশ্রিত দুগ্ধে তদপেক্ষা অধিক ডুবিয়া যায়। সকল তরল পদার্থ সম্বন্ধেই এই মন্তব্য খাটে।

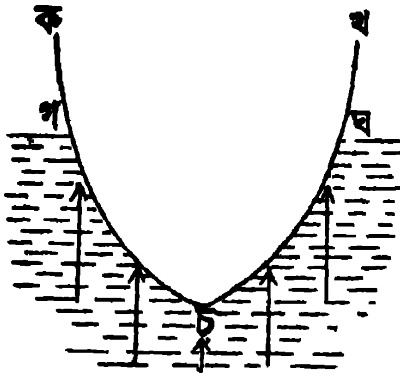


৪৩নং চিত্র—হাইড্রোমিটার

এইজন্য এক তরল পদার্থে যে বস্তু ভাসে, অন্য তরল পদার্থে তাহা না ভাসিতেও পারে। লোহা জলে ডুবিয়া যায় কিন্তু পারদে ভাসে। তেল জলে ভাসে, কিন্তু মেথিলেটেড্ স্পিরিটে ডুবিয়া যায় পূর্বে দেখিয়াছ।

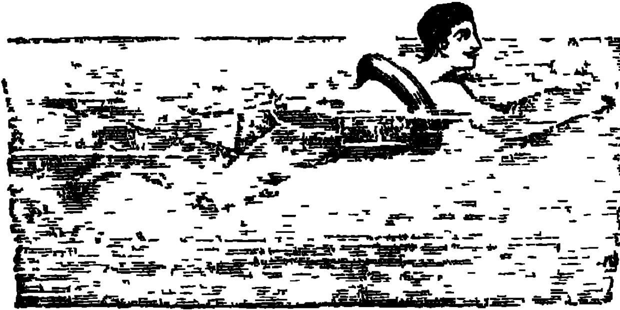
লোহা জল অপেক্ষা ভারী। তাহা হইলে লোহার জাহাজ জলে ভাসে কিরূপে? লোহার কড়া যে কারণে জলে ভাসে, জাহাজও ঠিক সেই কারণে জলে ভাসে। মনে কর, **কচখ** একটি লোহার খোল। (৪৭নং চিত্র)। খোলটি জলে ছাড়িয়া দিলে ইহার ভারের জন্য খোলটি যতই জলে নামিতে থাকিবে, ততই

অধিক জল সরাইয়া দিবে এবং জলের উৎপ্লাবনীশক্তিও ততই প্রবল হইবে। যখন খোলটির নিমজ্জিত অংশ দ্বারা অপসারিত জলের ওজন খোলটির ওজনের সমান হইবে, তখন খোলটি আর নিচে নামিবে না এবং সেই অবস্থায় ভাসিতে থাকিবে। খোলটির ভিতরে মাল বোঝাই করিলে উহা আর একটু ডুবিয়া উক্ত নিয়মানুসারে ভাসিতে থাকিবে। এখন জাহাজ কেন ভাসে তাহা তোমরা বুঝিতে পারিলে।



৪৪নং চিত্র--লোহার জাহাজ জলে ভাসিবার কারণ

আমাদের শরীর সম-পরিমাণ জল অপেক্ষা লঘু, এইজন্য আমরা জলে ভাসিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমাদের মাথা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ভারী বলিয়া ডুবিয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য মাথাটি জলের উপর রাখিবার অভ্যাস করিতে পারিলেই সন্তরণ শিক্ষা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রথম সন্তরণ শিক্ষার্থীদিগের একটি খালি কলসী জলে উপুড় করিয়া তাহা ধরিয়া সাঁতার দেওয়া কিংবা লাইফ বেল্ট (Life-belt) ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক। গরু, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি প্রাণীর মাথা দেহের তুলনায় ভারী নয় বলিয়া তাহাদিগের সাঁতার শিখিবার প্রয়োজন হয় না।



৪৫নং চিত্র—মানুষের সাঁতার

সংক্ষেপ :—জল বর্ণ, স্বাদ, গন্ধবিহীন স্বচ্ছ, তরল পদার্থ। ইহা সঙ্কোচন ও প্রসারণশীল নয় বলিলেই চলে। কোন স্থানে ঢালিলে ইহা নিম্ন দিকে গড়াইয়া যায়। ইহার উপরিতল সকল সময়ে ভূ-সমান্তরাল থাকে। জলের নিম্নচাপ আছে, পার্শ্বচাপ আছে এবং ভিতরে ঊর্ধ্বচাপ আছে। এই ঊর্ধ্বচাপের জন্য কোন পদার্থ সহজে জলের মধ্যে প্রবেশ

কবাইতে পাবা যায না। ইহাকে বিভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া পাত্রগুলি যোগ করিযা যাতায়াতেব ব্যবস্থা করিলে দেখা যায সকল পাত্রেব জলতল একই হইবে। জলতল হইতে গভীরতা যত অধিক হইবে ততই ঊর্ধ্ব, নিম্ন ও সকল দিকের চাপ বেশী হইবে। কোন বস্তুর ওজনকে তাহাব ঘনফল দিযা ভাগ কবিযা উহাব ঘনত্ব বাহিব করা হয। কোন পদার্থ জল অপেক্ষা যতগুণ ভাবী তাহাই তাহাব আপেক্ষিক গুরুত্ব। জলাপেক্ষা ভাবী জিনিষ জলে ডুবিযা যায়, হাল্কা জিনিষ জলে ভাসে। আর্কিমিডিস স্থির কবিযাছেন জলে ডুবাইলে পদার্থ যে পবিমাণ জলাপসাবণ কবে সেই জলেব ওজনের সমান পদার্থটিব ওজন কমিযা যাইবে। এই সিদ্ধান্তেব উপব নির্ভব কবিযা হাইড্রোমিটাব ও ল্যাক্টোমিটাব নির্মিত হইযাছে। ঊর্ধ্বচাপ অপেক্ষা নিম্নচাপ কম হইলে পদার্থ সকল ভাসে। তাই লোহাব খোলে প্রস্তুত জাহাজ জলে ভাসে।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। জলের ধর্মগুলি সবিস্তাব বর্ণনা কব। জলেব কোন্ ধর্মেব উপব নির্ভব কবিযা সহরে জল সববরাহ করা হয? (Describe in detail the properties of water. On which of its properties does the supply of water in a town depend?)

২। কোন্ কোন পবীক্ষায জলেব পার্শ্বচাপ, ঊর্ধ্বচাপ ও সর্বদিকে চাপ প্রমান কবিতে পাবা যায লিখ। (By which experiments it can be proved that water exerts pressure upwards, downwards and on all directions?)

৩। শূন্য স্থান পূর্ণ কব :—জলেব উপরিতল হইতে যত নিচে নামা যাইবে জলেব ঊর্ধ্ব চাপ তত——হইবে।

(Fill up the gaps :—The greater is the depth of water the——will be its upward pressure.)

৪। একটি পবীক্ষা নলেব তলার দিক জলে গুঁজিযা ছাডিযা দিলে উহা লাফাইয়া উঠে কেন? একটি জলের বালতি তলা নিচে কবিযা সোজাভাবে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করিলে বাধা পাওয়া যায় কেন? (Why does a test tube leap up when it is pushed into water? Why resistance is experienced when a bucket is pushed into water with its bottom downwards?)

৫। পদার্থের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব, ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিরূপে বাহির করা যায়? (What is the difference between the density and the specific gravity of a matter? How can the sp gravity of a liquid be determined?)

৬। উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে জলের ঘনত্বের কি পরিবর্তন হয়? জলের এই গুণের জন্য মেরু-সমুদ্রের জীবগুলির কি সুবিধা হয় লিখ। (What is the effect of temp on the density of water? Explain how the behaviour of water in this regard helps marine animals in the Arctic seas) [কঃ বিঃ ১৯৪১]

৭। পিতলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮.৫, এক ঘনফুট জলের ওজন ৬২.৫ পাউণ্ড। এক ঘন ইঞ্চ পিতলের ওজন কত? (The sp gr of brass is 8.5, a cubic ft of water weighs 62.5 lbs How much is the weight of a cubic inch of brass?)

৮। একটি বোতলের ওজন ১০ ছটাক, ইহার ওজন, জলপূর্ণ করিলে ১ সের ৬ ছটাক হয় ও গ্লিসারিণ পূর্ণ করিলে ১ সের ৯ ছটাক হয়। গ্লিসারিণের আপেক্ষিক ঘনত্ব বাহির কর। (The wt of a bottle is 10 chataks, when it is filled with water it weighs 1 sr 6 ch and when it is filled with glycerine it weighs 1 sr 9 ch Find the sp gr of glycerine)

৯। একটি ঘটিতে আড়াই সের জল ধরে। ঐ ঘটিতে কতটা দুধ ধরিবে? দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৩, (A pot can hold $2\frac{1}{2}$ srs of water How much milk can it hold? The sp gr of milk is 1.03)

১০। পদার্থ যত ঠাণ্ডা হয় তত ঘন ও ভারী হয়। জল কখন এ নিয়ম লঙ্ঘন করে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (When a substance is cooled it becomes dense and heavy When is there an exception to this in case of water?)

১১। তরল পদার্থের চাপ সম্বন্ধে আর্কিমিডিস্ কি তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন? (State the principle of Archimedes)

একতাল স্বর্ণে কিছু রৌপ্য মিশ্রিত আছে। তালটির বায়ুতে ওজন ৪০ গ্রাম ও জলে ওজন ৩৭ গ্রাম। তালটিতে কতটুকু স্বর্ণ আছে বাহির কর। স্বর্ণের ও রৌপ্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব যথাক্রমে ১৯.৩ ও ১০.৫। (A lump of gold contains some silver The lump

weighs 40 gms. in air and 37 gms. in water. How much gold is there in the lump? The sp. gravities of gold and silver are 19.3 and 10.5 respectively.)

১২। কোন কোন পদার্থ জলে ভাসে কেন আবার কোন কোন পদার্থ জলে ডুবিয়া যায় কেন? (Why do some bodies float on water and some sink in it?)

১৩। লোহা জলাপেক্ষা ভারী হইলেও লোহার জাহাজ জলে ভাসে কেন? কারণ বুঝাইবার জন্য একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর। (Why does a ship made of iron float on water, though iron is heavier than water? Describe an experiment to illustrate the principle involved.) [কঃ বিঃ ১৯৪০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাপ

তাপের প্রভাব

তাপের সহিত তোমাদের কিছু না কিছু পরিচয় আছে। সকালে উঠিয়াই তোমরা চায়ের জল গরম করিবার জন্য জ্বলন্ত উনানে কেট্‌লী বসাইতে দেখিয়াছ, শীতের সকালে রোদে বসিলে গা গরম হয় জান, রান্নাঘরে নিত্য কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়া সেই উত্তাপে রান্না করিতে দেখিয়াছ, আবার প্রকাণ্ড কয়লার উনানের তাপে রেলের এঞ্জিন, জাহাজের এঞ্জিন ও কলকারখানার এঞ্জিন চলে, হয়'ত তাহাও জান।

এই **তাপ যে কি**, তাহার সম্বন্ধে তোমাদিগকে একটু বলিয়া রাখি। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে পদার্থ মাত্রই অসংখ্য অণুর সমষ্টি। তাঁহারা আরও অনুমান করেন যে, এই অণুগুলি সর্বদাই স্পন্দিত হইতেছে, যদিও এই অণুগুলি কিংবা তাহাদের স্পন্দন আমরা খুব ভাল অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারাও দেখিতে পাই না। অণুগুলির স্পন্দন যখন কোনও এক নির্দিষ্ট মাত্রার ভিতর থাকে, তখন সেই কম্পন হইতে তাপের উৎপত্তি হয়। বস্তুর-উষ্ণতা এই কম্পনের বেগের উপর নির্ভর করে। বাহির হইতে কোনও বস্তুতে তাপ লাগিলে এই কম্পন আরও বাড়িয়া যায়, কাজেই বস্তুর উষ্ণতা বাড়িয়া যায়।

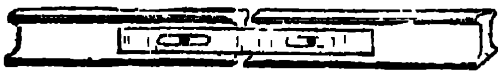
তাপ প্রয়োগ করিলে সকল পদার্থেরই—

(১) আয়তন বৃদ্ধি পায়,

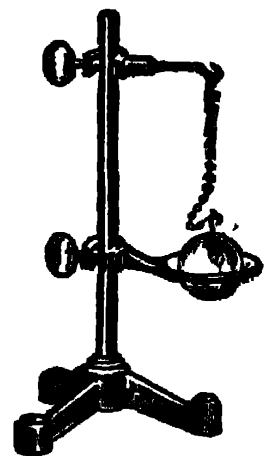
(২) উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটে,

(৩) এবং সময় সময় অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, যেমন বরফ গলিয়া জল হয়, জল আবার বাষ্পে পরিণত হয়।

তাপ পাইলে সকল পদার্থ আয়তনে বর্ধিত হয় এবং তাপ কমাইলে সঙ্কুচিত হয়। তোমাদের মধ্যে যাহারা কামারশালে গরুর গাড়ীর চাকার বেড় পরাইতে দেখিয়াছ, তাহারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে প্রথমত লোহার বেড়টি কাঠের চাকার পরিধি অপেক্ষা কিছু ছোট করিয়া নির্মাণ করা হয়; সেইজন্য শীতল অবস্থায় বেড়টি কিছুতেই চাকায় লাগে না। কিন্তু লোহার বেড়টি উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া কামার কাঠের চাকার চারিদিকে ইহাকে অনায়াসে লাগাইয়া দেয়, শীতল হইলে দেখা যায় কাঠের চাকার উপর ইহা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। অনেক সময় দেখিয়াছ, গাড়োয়ান গাড়ীর চাকায় জল ঢালে, পাছে রোদ পাইয়া বা মাটির ঘর্ষণে গরম হইয়া চাকার বেড় খুলিয়া যায়, তাই গাড়োয়ান এরূপ করে। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পার যে, চাকার বেড়টি উত্তাপ পাইয়া বর্ধিত হয়, এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়। এই জন্যই রেলরাস্তার লোহার রেলগুলি একেবারে গায়েগায়ে জুড়িয়া বসান হয় না, দুই দুইটির মাঝে একটু করিয়া ফাঁক রাখা হয়, কারণ তাহা না হইলে রৌদ্রে বা গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে উষ্ণতা-বৃদ্ধি হেতু যখন রেলগুলি দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ বাড়ে, তখন পরস্পর ধাক্কা খাইয়া বাঁকিয়া যাইতে পারে। তাপজনিত বৃদ্ধি কেবলমাত্র চাকার বেড় বা লোহার রেলের ধর্ম নহে, বস্তুত, জগতে যাবতীয় কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ তাপ পাইলে বাড়িয়া থাকে।



৪৬নং চিত্র—রেলরাস্তার সংযোগস্থল



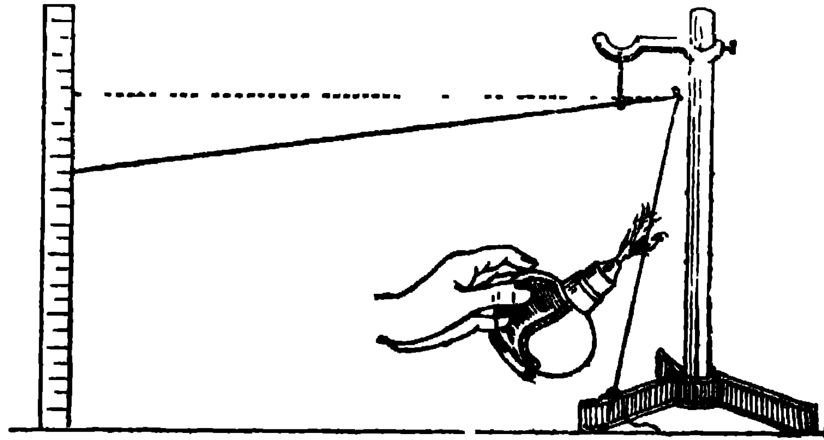
৪৭নং চিত্র—তাপে কঠিন পদার্থের বৃদ্ধি

ধাতব পদার্থ যে এই গুণবিশিষ্ট, তাহা তোমরা সহজেই নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একটি ধাতব গোলক ও একটি গোল বেড় নাও; বেড়টির ঘের এরূপ হয়

যেন উহার ভিতর দিয়া শীতল অবস্থায় ধাতব গোলকটি কেবল যাতায়াত করিতে পারে মাত্র। পরে গোলকটি উত্তপ্ত করিয়া দেখ, ইহা আর বেড়টির ভিতর দিয়া যাইতেছে না (৪৭নং চিত্র)। গোলকটি বেড়ের উপর রাখিয়া শীতল জল ঢালিলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া বেড়টির ভিতর দিয়া নিচে পড়িয়া যাইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও বহুবিধ উপায়ে প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, কঠিন দ্রব্য উত্তাপ পাইয়া প্রসারিত হয় এবং শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয়।

একটি শাখা-বিশিষ্ট একটি খুঁটির শাখাটিতে একটি লম্বা বাখারি বা অন্য কোন একটি সরল দণ্ডের একদিকে সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ। পরে ছবিতে যেমন দেখান হইয়াছে সেইরূপ ভাবে বাঁখারিটির ঐ প্রান্তেই একটি ধাতব তার বাঁধিয়া ঐ তার টানিয়া এমন ভাবে বাঁধিয়া দাও যেন বাখারিটি ভূমির সহিত



৪৮নং চিত্র—তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ

সমান্তরাল থাকিতে পারে। এখন দণ্ডটির অপর প্রান্তে একটি গজ খাড়া করিয়া রাখ যেন বাঁখারিটি উঁচু নিচু হইলে বুঝিতে পারা যায় কতটুকু উচ্চে উঠিল বা কতটা নিচে নামিল। এইবার এই ধাতব তারে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে উত্তাপ দিলে দেখা যাইবে বাঁখারিটির যে প্রান্ত গজের পাশে ছিল

তাহা নামিয়া যাইতেছে এবং স্পিরিট লম্ফ সরাইয়া লইলে আবার উঠিয়া যাইতেছে। ইহাতে আমরা এইরূপ বুঝিতে পারি,—উত্তাপ পাইয়া ধাতর তার বর্ধিত হয় এবং আল্‌গা হইয়া যাওয়ায় বাঁখারির যে প্রান্তে ইহা বাঁধা ছিল সেই প্রান্ত উঠিয়া যায়, ফলে অপর প্রান্ত নামিয়া যায়। কিন্তু স্পিরিট লম্ফ সরাইয়া লইলে পুনরায় ধাতব তার শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয় এবং তারটিতে টান পড়ায় বাখারির অপর প্রান্ত উঠিয়া যায়।

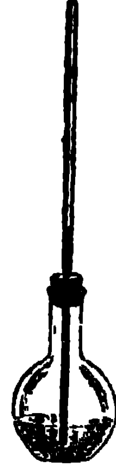
৪৯নং চিত্রের মত একটি সরু ও লম্বা নলবিশিষ্ট কাচের ফ্লাস্ক (Flask) রঙিন জলে পূর্ণ করিয়া ইহার নলের যে পর্যন্ত রঙিন্ জল উঠিল, সেইখানে একটি দাগ দাও, মনে কর চিত্রের **ক** স্থানে সেই দাগ। পরে ফ্লাস্কটিতে তাপ প্রয়োগ করিলে দেখিবে, রঙিন্ জল প্রথমত সেই দাগ হইতে নিচে **খ** স্থানে নামিয়া আসিয়া আবার উপরে উঠিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ, কাচপাত্র প্রথমেই উত্তাপ গ্রহণ করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, সেইজন্য রঙিন্ জল **ক** দাগের নিচে আসে, কিন্তু তাহার পরে জলও তাপ গ্রহণ করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয় এবং পূর্বোক্ত দাগ ছাড়িয়া উঠে। এই পরীক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, উত্তাপ পাইয়া কঠিন ও তরল পদার্থ প্রসারিত হয়, এবং তরল পদার্থের প্রসারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ অপেক্ষা অধিক।



৪৯নং চিত্র—তাপে তরল পদার্থের বৃদ্ধি

এক্ষণে গ্যাসীয়পদার্থ উত্তাপ পাইয়া প্রসারিত হয় কিনা দেখা যাউক। একটি কাচের ফ্লাস্কের কিয়দংশ জলপূর্ণ করিয়া মুখটি উত্তমরূপে ছিপি বন্ধ কর। ছিপির মধ্য দিয়া একটি দুইমুখ খোলা, সরু ও লম্বা কাচের নল প্রবেশ করাইয়া উহার একমুখ জলে ডুবাইয়া দাও (৫০নং চিত্র)। পরে এই পাত্রটি গরমজলে ডুবাইলে দেখিবে যে, সরু নলটির ভিতরে পাত্রস্থ জল উঠিতেছে। তাহার কারণ, পাত্রস্থ বদ্ধবায়ু তাপে প্রসারিত হইয়া বাহির হইতে না পারায়

জলে চাপ দেয়, এইজন্য জল উপরে উঠিতে থাকে। একটি ফুটবল ব্লাডারের মুখ বাঁধিয়া গরম জলে ফেলিয়া দিলে দেখিবে, ব্লাডারটি ফুলিয়া উঠিতেছে। বস্তুত অল্পমাত্র উত্তাপেই গ্যাসীয় পদার্থ অত্যধিক প্রসারিত হয়। অতএব দেখা গেল যে, কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ এবং তরল পদার্থ অপেক্ষা গ্যাসীয় পদার্থ, অধিক প্রসারিত হয়।



৫০নং চিত্র—তাপে গ্যাসীয় পদার্থের বৃদ্ধি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থ মাত্রই উষ্ণ হয়, কিন্তু এখানে বলিয়া রাখি যে, পদার্থের **তাপ** (Heat) ও পদার্থের **উষ্ণতা** (Temperature) একার্থবোধক নহে। পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে, তাহার তাপধারণ-ক্ষমতার উপর তাহার উষ্ণতা নির্ভর করে। পদার্থ আয়তনে বড় হইলে তাহার তাপধারণ-ক্ষমতা মোটামুটি বাড়িয়া যায়। একটি ছোট পাত্রে কিছু জল লইয়া তাহাতে একটি স্পিরিট্ ল্যাম্প দ্বারা তাপ প্রয়োগ কর এবং মধ্যে মধ্যে উহাতে হাত ডুবাইয়া দেখ উহার উষ্ণতা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্য একটি বৃহৎ পাত্রে অধিক জল লইয়া তাহাতেও ঐরূপ কর। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে, ছোট পাত্রটির জল শীঘ্র উষ্ণ হইতেছে, অথচ বড় পাত্রের জলের উষ্ণতা প্রায় পূর্বমতই আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সমপরিমাণ উত্তাপে সকল পদার্থ সমপরিমাণ উষ্ণ হয় না, বৃহৎ পদার্থ অল্প ও ক্ষুদ্র পদার্থ অধিক উষ্ণ হয়। আর একটি তৃতীয় পাত্রে এই দুই পাত্রের জল কিছু কিছু মিশাইয়া মিশ্রিত জলে হাত ডুবাইয়া দিলে বুঝিবে, এই জল ছোট পাত্রের জল অপেক্ষা শীতল, কিন্তু বড় পাত্রের জল অপেক্ষা উষ্ণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উষ্ণতর জল কিছু তাপ ত্যাগ করিয়াছে এবং সেই তাপ অপর জল গ্রহণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা উষ্ণ হইয়াছে। এই বিষয়টি তরল পদার্থের চলাচলের সহিত তুলনা করিলে বেশ বুঝিতে পারিবে।

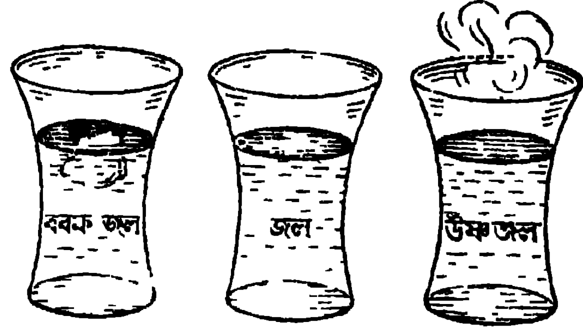
১৮নং চিত্রে দেখ **ক** ও **খ** দুইটি পাত্র একটি নল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত; ইহাদের মধ্যে **খ** পাত্রটি **ক** পাত্রের তুলনায় আকারে অনেক ছোট। নলের চাবিটি বন্ধ করিয়া দুইটি পাত্রে জল এরূপভাবে ঢাল, যেন **খ** পাত্রের জলতল **ক** পাত্রের জলতল অপেক্ষা উচ্চে থাকে। এক্ষণে নলের চাবিটি খুলিয়া দিলে দেখিবে যে, **খ** পাত্রের জলতল নামিয়া যাইতেছে ও **ক** পাত্রের জলতল ক্রমশ উচ্চ হইতেছে, অবশেষে পাত্র দুইটির জলতল এক সমতলে আসিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে **খ** পাত্রের জল পরিমাণে কম হইলেও ইহার তলের উচ্চতা-হেতু **ক** পাত্রে আসিল। যদি বড় পাত্রটির জলতল উচ্চতর হইত, তবে দেখিতে ইহার জলই ছোট পাত্রে আসিত। জলের চলাচল যেমন জল-তলের উচ্চতার উপর নির্ভর করে, পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, তেমনই পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে **তাপ-চলাচল** তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর না করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। কোনও বস্তুকে তদপেক্ষা উষ্ণতর বস্তুর সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলে শেষোক্ত বস্তু হইতে তাপ অপর বস্তুটিতে আসে, এবং শেষে দুইটি বস্তুই একরূপ উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়।

থার্মমিটার

একটি পাত্রে জল লইয়া ইহার নিচে উত্তাপ দিতে থাক, মধ্যে মধ্যে জলে হাত ডুবাইলে বুঝিবে, জল ক্রমশ উষ্ণ হইতেছে। অবশেষে এমন অবস্থা আসিবে যে, জলে হাত ডুবানই কষ্টকর হইবে। সেইরূপ একটি লৌহদণ্ডের একপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমশ উষ্ণতর হইতে থাকে। দেখ তাপ পাইয়া সকল পদার্থ উষ্ণ হয় এবং ঐ উষ্ণতা আমরা স্পর্শশক্তির দ্বারা অনুভব করি।

এখন দেখা যাউক, এই স্পর্শশক্তি দ্বারা পদার্থের উষ্ণতা সম্বন্ধে আমরা সঠিক জ্ঞান পাই কি না। একটি গ্লাসে সাধারণ জল ও অপর দুইটি গ্লাসে যথাক্রমে

বরফ-জল ও উষ্ণজল লইয়া (৫১ নং চিত্র) শেষোক্ত দুইটি গ্লাসে দুই হাত কিছুক্ষণ ডুবাইয়া, পরে তৃতীয় গ্লাসে দুইটি হাতই একসঙ্গে ডুবাইলে বুঝিবে, যে হাত বরফ-জলে ডুবান ছিল, সেই হাতে এই গ্লাসের জল গরম ও অপর হাতে শীতল বলিয়া বোধ হইতেছে।



৫১ নং চিত্র—উষ্ণতার আপেক্ষিকত্ব

বাস্তবিক **গরম বা ঠাণ্ডা তুলনার কথা।** যে জিনিষ একজনের কাছে ঠাণ্ডা, তাহাই অপরের কাছে গরম বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিলাত হইতে সাহেবরা এদেশে শীতকালে আসিলেও তাঁহারা খুব গরম বোধ করিয়া থাকেন, যদিও আমরা সে সময় অতিশয় শীত অনুভব করি। অতএব দেখা গেল, স্পর্শশক্তি দ্বারা পদার্থের উষ্ণতা সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা সকল সময় ঠিক নহে।

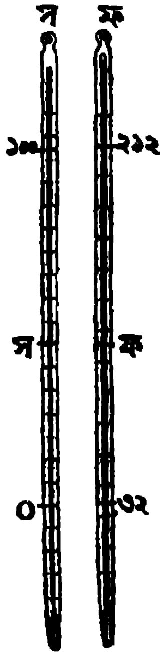
পদার্থের উষ্ণতা সঠিক নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার নাম **থার্মমিটার**।

এই যন্ত্র নির্মাণের মূলের কথাটি তোমাদিগকে মোটামুটি বুঝাইতেছি। পদার্থের উপর তাপ-প্রয়োগের ফলে যেমন তাহার উষ্ণতা বাড়ে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়তনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উষ্ণতাবৃদ্ধি চোখে ধরা যায় না, কিন্তু আয়তনবৃদ্ধি ধরা যায়। অতএব আয়তনবৃদ্ধির পরিমাণ দ্বারা পরোক্ষ উপায়ে উষ্ণতাবৃদ্ধি মাপ করা যাইতে পারে। দেখা যাউক, একটি লৌহদণ্ডকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় কিনা।

কোনও এক উত্তপ্ত বস্তুর উষ্ণতা মাপিবার জন্য লৌহদণ্ডটি তাহার সহিত সংযুক্ত করা হইল। উষ্ণ বস্তু হইতে কিছু তাপ লৌহদণ্ডে আসিয়া উহার আয়তনবৃদ্ধি করিল, এই বৃদ্ধি অতি সামান্য, চোখে ধরা যায় না। কিন্তু কঠিন পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থের তাপজনিত বৃদ্ধি বেশী। সেইজন্য থার্মমিটার

প্রস্তুত করিতে তরল পদার্থের ব্যবহারই সুবিধাজনক। আবার তরল পদার্থের মধ্যে জল, তেল ইত্যাদি অপেক্ষা পারদ ব্যবহার করায় অনেক সুবিধা আছে। তন্মধ্যে প্রধান সুবিধা এই যে, যে উষ্ণতায় তেল, জল ইত্যাদি বাষ্পীভূত হয়, সেই উষ্ণতায় পারদ তরলই থাকে, আবার যে শৈত্যে তেল, জল ইত্যাদি জমিয়া কঠিন হইয়া যায়, সেই শৈত্যেও পারদ তরল থাকে। এতদ্ব্যতীত তেল, জল ইত্যাদি অপেক্ষা পারদ তাড়াতাড়ি গরম হয়।

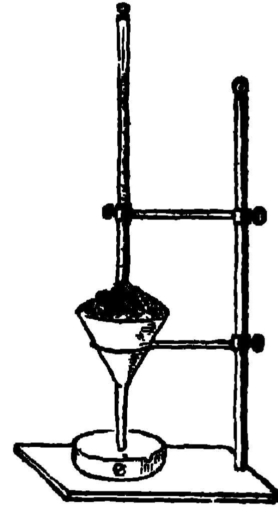
সাধারণত থার্মমিটার একটি লম্বা সূক্ষ্ম-ছিদ্রবিশিষ্ট নল দ্বারা প্রস্তুত। ইহার একপ্রান্তে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তনের ফাঁপা **কুণ্ড** (Bulb) আছে। কুণ্ড ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে। নির্মাণকালে যন্ত্রটি বায়ুশূন্য ও পারদ পূর্ণ করিয়া নলের অপর মুখটি আঁটিয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডটি আকারে বৃহত্তর থাকায় উত্তাপ পাইয়া পারদের যে বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা নলের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বহুদূর যাইতে পারে।



৫২ নং চিত্র—থার্মমিটার

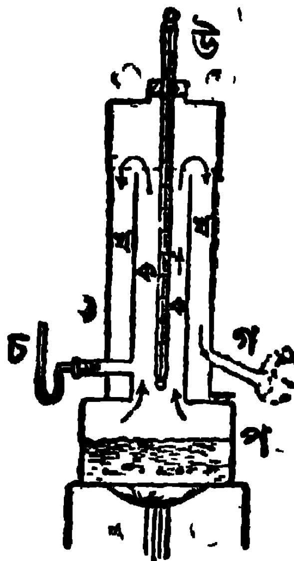
৫২নং চিত্রে দুইটি থার্মমিটার দেখান হইয়াছে। যন্ত্র দুইটি আকারে একইরূপ হইলেও ইহাদের গায়ের দাগগুলি একরূপ নয়। যন্ত্র দুইটিকে যদি বরফগলা জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়, তবে দেখা যায়, পারদ সঙ্কুচিত হইয়া একটি যন্ত্রের ০ দাগে ও দ্বিতীয়টির ৩২ দাগে আসিয়া স্থির হয়, ইহাকে **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বলে। পুনরায় যদি যন্ত্র দুইটিকে ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে ডুবান হয়, তবে দেখা যাইবে পারদ প্রসারিত হইয়া প্রথম যন্ত্রের ১০০ দাগে এবং দ্বিতীয় যন্ত্রের ২১২ দাগে আসিয়া স্থির থাকে, ইহাকে **স্ফুটনাঙ্ক** (Boiling point) বলা হয়। এই দুইটি দাগের মধ্যবর্তী স্থানকে যথাক্রমে ১০০ ও ১৮০ ভাগ করা হয় এবং এক একটি অংশকে **ডিগ্রী** (Degree) বলা হয়। প্রথম যন্ত্রটিকে **সেণ্টিগ্রেড্** (Centigrade)

ও দ্বিতীয়টিকে **ফারেণহিট** (Fahrenheit) যন্ত্র বলে। তাহা হইলে সেন্টিগ্রেড্ মতে 0° ডিগ্রীতে ও ফারেণহিট্ মতে ৩২° ডিগ্রীতে জল জমিয়া বরফ হয় এবং সেন্টিগ্রেড্ মতে ১০০° ডিগ্রীতে ও ফারেণহিট্ মতে ২১২° ডিগ্রীতে জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, হিমাঙ্কের নিচে কিংবা স্ফুটনাঙ্কের উপরে কাচনলের অংশকে সমানুপাতে ভাগ করা হয়।


৫৩নং চিত্র—হিমাঙ্ক স্থিরীকরণ

থার্মমিটারের হিমাঙ্ক বাহির করিবার জন্য একটি ফানেলের উপর উহার কুণ্ড রাখিয়া তাহার চারিধারে বরফ দিয়া ফানেলটি বরফ পূর্ণ করা হয়। ইহাতে থার্মমিটারের নলের পারদ নামিয়া একটি স্থানে স্থির হয়। ইহাই হিমাঙ্ক। ফানেল হইতে বরফ গলা জল ধরিবার জন্য নিচে একটি পাত্র রাখা হয়।

হিপসোমিটার (Hypsometer) নামক যন্ত্র সাহায্যে স্ফুটনাঙ্ক বাহির করা হয়। একটি পাত্রে জল ফুটান হয়, তাহার উপরে এই হিপসোমিটার বসান হয়। ইহার মধ্যস্থল দিয়া উষ্ণতামান যন্ত্রটি **উ** এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় যেন এই হিপসোমিটারে থাকা কালে পারদ যত দূরেই উঠুক না কেন উহার মাত্র শেষ বিন্দুটি আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে। ইহা একটি ধাতব পাত্র। ইহার দুইদিকে দেওয়ালের ন্যায় আটক **খ** আছে। এই আটকগুলি কিন্তু মাথা পর্যন্ত যায় নাই। জলীয় বাষ্প ইহার মধ্যস্থল হইতে উঠিয়া ঐ আটক পার হইয়া **গ** নল দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ঘনীভূত হইয়া বাষ্পের যে অংশ জল হয় তাহা



৫৪নং চিত্র—হিপসোমিটার

ধরিবার জন্য হিপসোমিটারের নলের মুখে আর একটি পাত্র বসান থাকে।

কোনও একপ্রকার থার্মমিটার সাহায্যে পঠিত উষ্ণতা জানা থাকিলে, অপর যন্ত্রে তাহা কত হইবে বলিতে পারা যায়। ইহাদের যোগ-সূত্র এই—

$$\frac{ফ—৩২}{৯} = \frac{স}{৫}$$

এখানে 'ফ' অর্থে ফারেণহিট্ যন্ত্রে পঠিত উষ্ণতা ও 'স' অর্থে সেন্টিগ্রেড্ যন্ত্রে পঠিত উষ্ণতা বুঝিতে হইবে। অতএব ফারেণহিট্ যন্ত্রে নির্ণীত উষ্ণতা হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া বিয়োগফলকে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ করিলে সেন্টিগ্রেড্ ডিগ্রী ও সেন্টিগ্রেড্ যন্ত্রে নির্ণীত উষ্ণতাকে $\frac{৯}{৫}$ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ দিলে ফারেণহিট্ ডিগ্রী পাওয়া যায়। সকল সময় মনে রাখিও, কোনও বস্তুর উষ্ণতা বলিবার সময় তাহা সেন্টিগ্রেড বা ফারেণহিট্ কোন্ যন্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হয়।

ধর, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বায়ুর উষ্ণতা ১১৩ ডিগ্রী ফারেণহিট্ উঠিল। উহা সেন্টিগ্রেড্ যন্ত্রে কত হইবে ?

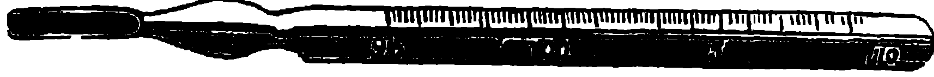
$$স = (ফ - ৩২)\frac{৫}{৯}$$

$$= (১১৩ - ৩২)\frac{৫}{৯} = ৮১ \times \frac{৫}{৯} = ৪৫^\circ$$

অতএব সেন্টিগ্রেড্ যন্ত্রে ইহা ৪৫ ডিগ্রী হইবে।

সাধারণত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্যে সেন্টিগ্রেড্ যন্ত্রই ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারেরা শরীরের উষ্ণতা মাপিবার জন্য ফারেণহিট্ যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁহারা যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে ৯৫ ডিগ্রী ফাঃ হইতে ১১০ ডিগ্রী ফাঃ পর্যন্ত দাগ দেখিতে পাওয়া যায় (৫৫ নং চিত্র) ; কারণ সাধারণত মানুষের সুস্থ দেহের উষ্ণতা ৯৮·৪ ডিগ্রী ফাঃ। ৯৫ ডিগ্রীর নিচের উষ্ণতায় কিংবা ১১০ ডিগ্রীর উপরের উষ্ণতায় মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে

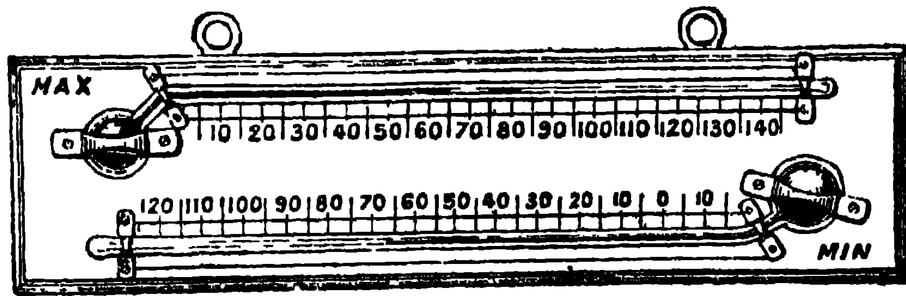
পারে না। **শারীর থার্মমিটার** (Clinical thermometer) যন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ফাঁপা কুণ্ড ও সরু নলের সংযোগস্থলে ছিদ্রটি



৫৫নং চিত্র—শারীর থার্মমিটার

একটু বেশী সূক্ষ্ম ও বক্রাকার করা হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই যে, শরীর হইতে থার্মমিটারটি বাহির করিবামাত্রই বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে নলের পারদ সঙ্কুচিত হইয়া কুণ্ডে ফিরিয়া আসিতে চায়, কিন্তু ঐ বাঁকের জন্য আসিতে পারে না, অথচ শরীরের তাপ পাইয়া পারদ যখন আয়তনে বাড়ে, তখন উহা ঐ বৃদ্ধির জোরে সেই বাঁক পার হইয়া নলে উঠে। এইজন্য দেহের উষ্ণতা পুনরায় মাপিবার পূর্বে যন্ত্রটিকে ঝাড়িয়া লইয়া পারদসূত্রটিকে নামাইয়া দিতে হয়।

দিন ও রাত্রির মধ্যে বায়ুর সর্বোচ্চ উষ্ণতা নির্দেশ করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **গরিষ্ঠ থার্মমিটার** (Maximum Thermometer) বলে (৫৬নং চিত্র), ঐরূপ লঘিষ্ঠ থার্মমিটারের দ্বারা বায়ুর সর্বনিম্ন উষ্ণতাও



৫৬নং চিত্র—গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার

মাপা যায়। গরিষ্ঠ থার্মমিটার একটি সাধারণ ফারেণহিট্‌ যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নহে। চিত্রে দেখ, কেবলমাত্র উহার কাচনলটি সোজাভাবে না তুলিয়া বাঁকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নলের ভিতরে একটি লোহার কাঁটা রহিয়াছে।

বায়ু উষ্ণ হইলে পারদ প্রসারিত হইয়া এই লোহার কাঁটাটিকে সম্মুখে ঠেলিয়া দেয় এবং বায়ু শীতল হইলে পারদ সঙ্কুচিত হইয়া কুণ্ডের দিকে ফিরিয়া আসে এবং কাঁটাটি যে স্থানে ছিল সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। কাঁটার অবস্থান দেখিয়া দাগের সাহায্যে বায়ুর সর্বোচ্চ উষ্ণতা জানিতে পারা যায়।

লঘিষ্ঠ থার্মমিটারে (Minimum Thermometer) পারদের পরিবর্তে সুরাসার ব্যবহৃত হয়। ইহাও একটি ফারেণহিট্ যন্ত্র। ইহার কাচনলের ভিতরেও একটি লোহার কাঁটা থাকে। বায়ু উষ্ণ হইলে সুরাসার প্রসারিত হইয়া কাঁটা পার হইয়া চলিয়া যায় এবং শীতল বায়ু উষ্ণ হইলে যখন উহা সঙ্কুচিত হয় তখন সুরাসারের শেষ প্রান্তের তলটি লোহার কাঁটাকে টানিয়া আনে। এই কাঁটার অবস্থান দেখিয়া বায়ুর সবনিম্ন উষ্ণতা নির্ণীত হয়।

তাপ-চলাচল

সাধারণত তিনটি উপায়ে এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে উত্তাপ চালিত হইয়া থাকে। যথা :—

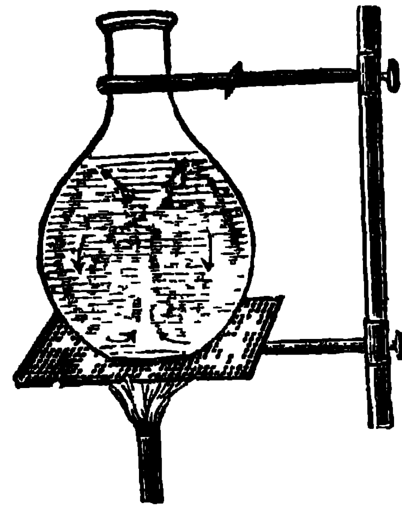
(১) পরিবহন
(২) পরিচলন
(৩) বিকিরণ

একটি লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত আগুনে ধরিলে অপর প্রান্তটিও শীঘ্র গরম হইয়া উঠে। আগুনের ভিতর লৌহদণ্ডের যে প্রান্ত থাকে, সেই প্রান্তস্থ অণুগুলির স্পন্দন বাড়িয়া যায়। এই স্পন্দনের ফলে পার্শ্বের অণুগুলিতে ধাক্কা লাগিয়া তাহাদেরও স্পন্দন বাড়ে। ক্রমে ক্রমে লৌহদণ্ডের অপর প্রান্তের অণুগুলিরও স্পন্দন বাড়ে অর্থাৎ তাহারাও উত্তপ্ত হয়। এইরূপে কোনও বস্তুর অণুগুলিরও স্পন্দনের সাহায্যে এক অংশের তাপ অন্য অংশে আসা-যাওয়াকে **পরিবহন** (Conduction) বলে। মনে রাখিও এই তাপ-পরিবহনে বস্তুর অণুগুলি

একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালিত হয় না, যাহা চালিত হয়, তাহা তাহাদেব বর্ধিত স্পন্দনেব ধাক্কা মাত্র।

যখন কোনও পদার্থকে তদপেক্ষা উষ্ণতব পদার্থের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তখন উষ্ণতব পদার্থ হইতে তাপ এই পবিবহন ক্রিয়াব দ্বাবা অন্য পদার্থে বহিয়া আসে, ফলে কিছুক্ষণ পবে দুইটি বস্তুই একই উষ্ণতা প্রাপ্ত হয়। কঠিন পদার্থে তাপ-চলাচল পবিবহনক্রিয়াব দ্বাবাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। পদার্থমাত্রেই কিছু না কিছু তাপ পবিবহন কবে; তবে ধাতব পদার্থ সর্বাপেক্ষা উত্তম তাপ-পবিবাহী।

এক কেট্‌লী জল উনানেব উপব বসাইলে কিছুক্ষণ পবে গবম হইযা উঠে। কেট্‌লীব তলায় জল তাপ পাইয়া প্রসাবিত হওয়াব লঘু হয। কিন্তু তবল পদার্থেব কণাগুলি ইতস্তত নডিযা চডিযা বেডাইতে পাবে। সুতবাং কেট্‌লীব তলাব উত্তপ্ত এবং লঘু জলকণাগুলি উপবেব দিকে উঠিতে থাকে। পাশেব শীতল জল আসিয়া উহাদেব স্থান অধিকাব কবে। তাহাবপব এই জলও পুনবায় গবম হইয়া উপবেব জল অপেক্ষা যখন লঘু হয, তখন ইহাও উপবে উঠে এবং উপবেব জল পাশ দিযা নিচে নামিযা আসিতে বাধ্য হয। এইরূপ ববাবব উঠা-নামাব ফলে কেট্‌লীব সমস্ত জল গবম হইযা শেষে ফুটিতে আবম্ভ কবে। এতএব দেখা গেল, তবল পদার্থে তাপ-চলাচল উহাব কণাগুলিব ক্রমাগত উঠানামাব ফলে হইয়া থাকে, ইহাকে **পরিচলন** (Convection) বলে।



৫৭নং চিত্র—পরিচলন

উপবে যাহা বলা হইল, পবীক্ষা দ্বারা তাহা সহজেই প্রমাণ কবিতে পাব। একটি কাচকুপীব তলায় একটু ম্যাজেণ্টা বং ফেলিয়া দিয়া কাচকুপী জলে পূর্ণ কর

এবং ইহার তলায় স্পিরিট ল্যাম্প দ্বারা তাপ প্রয়োগ কর। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে যে পাত্রের তলায় ম্যাজেণ্টা হইতে কয়েকটি সূক্ষ্ম রঙিন্ স্রোত উপরদিকে উঠিয়া পরে পাশ দিয়া নিচে নামিতেছে (৫৭নং চিত্র)।

তরল পদার্থের মত গ্যাসীয় পদার্থেও পরিচলন-ক্রিয়ার দ্বারাই তাপ চলাচল করিয়া থাকে, জলন্ত উনানের উপরের বায়ু গরম হইয়া লঘু হয় এবং উপরে উঠিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাতাস নিচে নামিয়া ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করে। এইরূপে গরম ও ঠাণ্ডা বাতাসের আনাগোনায় বাতাস বেশ গরম হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালে দুপুরে গ্রাম হইতে মাঠে আসিয়া পড়িলে দেখা যায়, যেন মাঠের উপর হইতে শাদা আগুনের হল্কা উঠিতেছে। বাস্তবিক উহারা ঊর্ধ্বগামী গরম বায়ুর স্রোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রখর রৌদ্রে মাটি খুব গরম হইয়া উঠে, মাটির উপরের বাতাস ঐ গরম মাটির সংস্পর্শে খুব গরম হয় এবং হাল্কা হইয়া উপরে উঠিবার সময় এইরূপ দেখায়।

এই তাপ-পরিচলন-ক্রিয়া তরল ও গ্যাসীয় পদার্থেই হওয়া সম্ভব, কঠিন পদার্থে সম্ভব নয়, কারণ কঠিন পদার্থের কণাগুলি তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের কণার মত ইতস্তত চলাফেরা করিতে পারে না।

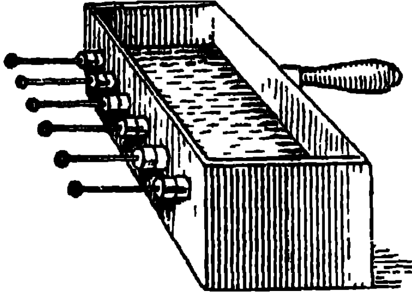
এইবার তাপ-চলাচলের তৃতীয় প্রক্রিয়ার কথা বুঝা যাউক। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় নয় কোটী মাইল দূরে থাকিয়াও নিত্য আমাদিগকে উত্তাপ দিতেছে। পৃথিবীর উপরে বায়ুমণ্ডল মাত্র একশত কি দেড়শত মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, তারপর মহাশূন্য। সুতরাং এখানে পরিবহন বা পরিচলন কোনটিও সম্ভব নয়। তাহা হইলে সূর্যের তাপ পৃথিবীতে কিরূপে আইসে? ইহা বুঝাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করিয়াছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় বস্তু রহিয়াছে, ইহাকে তাঁহারা **ঈথার** (Ether) কহেন। উত্তপ্ত সূর্যের অণুগুলির স্পন্দন এই ঈথারে বিভিন্ন প্রকারের ঢেউ তুলিয়া দেয়। ঢেউগুলি ঈথারের মধ্য দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে একপ্রকারের ঢেউ কোনও বস্তুতে আসিয়া বাধা পাইলে তাহাকে উত্তপ্ত করে। ঈথার-তরঙ্গের সাহায্যে

তাপের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমনের নাম **বিকিরণ** (Radiation) বিকিবিত তাপ উষ্ণ বস্তু হইতে উহার চতুর্দিকে সবল বেখাক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। উনানেব ধাবে বসিয়া থাকিলে আমরা যে তাপ পাই, বিকিবণই তাহাব কারণ। উত্তপ্ত বস্তু মাত্রই তাপ বিকিরণ দ্বাবা ক্রমশ শীতল হয়। বায়ু ঈথাব-তবঙ্গকে বিশেষ বাধা দেয় না, এইজন্য বিকিবণ দ্বাবা তাপ-চলাচলেব সময় ইহা উত্তপ্ত হয় না।

তাপ যে তিনটি বিভিন্ন উপাযে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে গমনাগমন কবে তাহা বলিলাম। এখন সেগুলিব সম্বন্ধে একটু আলোচনা কবা যাউক। সকল জিনিষেব **তাপ পরিবাহিতা** (Coductivity) সমান নয়। বান্না কবিবাব সময় হযত দেখিয়াছ, লোহা বা পিতলেব হাতা, খুন্তি দিযা দুই একবাব কড়াব গবম জিনিস নাড়িলে উহাবা এত উত্তপ্ত হইয়া যায় যে, তাহাদিগকে অধিকক্ষণ ধবিয়া বাখা কষ্টকব হয়, কিন্তু যে কাঠেব একপ্রান্ত বহুক্ষণ ধবিয়া উনানে জ্বলিতেছে, তাহাবও অপবপ্রান্ত অনাযাসে বহুক্ষণ ধবিয়া বাখা যায়। ইহাতে বুঝা যায, লোহা ও পিতল উত্তম তাপ-পবিবাহী কিন্তু কাঠ তাহা নহে। তূলা, ফ্লানেল, পশম, বেশম, কাগজ, বেত, চামড়া, জল ইত্যাদি তাপ পবিবাহী নয বলিলেই চলে। সেইজন্য উনান হইতে গবম কড়া, হাঁড়ি ইত্যাদি নামাইতে হইলে দুই হাতে কাপড বা কাগজ ইত্যাদিব টুকবা লইয়া পাত্রগুলি ধবিতে হয। তোমবা বোধ হয দেখিয়াছ, অনেক কেটলীব হাতলে বেত জড়ানো থাকে। বেতেব তাপপবিবাহিতা কম বলিয়াই এরূপ কবা হইযা থাকে। বেতজড়ানো হাতলটি ধবিয়া উনান হইতে গবম কেট্‌লীটিকে নামাইতে কোন কষ্ট হয় না। এই একই কাবণে অনেক পাত্রের হাতলে কাঠ লাগানো থাকে। বাঙ্‌ঝালের মিস্ত্রিকে তাতাল গবম কবিতে দেখিয়াছ, উহাব হাতলটিতেও কাঠ লাগানো থাকে।

মার্বেলপাথর, শ্লেট, মাটি ইত্যাদি অল্প পবিমাণে তাপ পবিবহন করিয়া থাকে। একটি য়্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি যত শীঘ্র গবম হয়, একটি মাটিব হাঁড়ি তত শীঘ্র গরম হয় না।

ধাতু মাত্রই উত্তম তাপপরিবাহী বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল ধাতু সমান পরিবাহী নহে। এই পরিবহন শক্তি তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য ৫৮নং চিত্রের ন্যায় একটি পাত্র লইয়া তাহার গাত্রস্থিত ছিদ্রগুলিতে বিভিন্ন ধাতবদ্রব্যের সমদীর্ঘ দণ্ড লাগাও। খানিকটা মোম গলাইয়া তাহার সাহায্যে দণ্ডগুলির গায়ে সমদূরে এক একটি লোহার গুলি আঁটিয়া দাও। পরে



৫৮নং চিত্র—বিভিন্ন বস্তুর তাপ পরিবহন

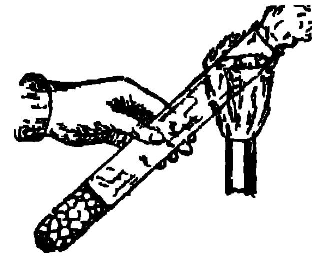
পাত্রটিতে ফুটন্ত জল ঢালিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে দেখা যাইবে যে এক এক করিয়া গুলি কয়টি পড়িয়া যাইতেছে, যেটির গুলি আগে পড়িবে সেই দণ্ডটি সবচেয়ে বেশী তাপ পরিবাহী। এইরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, রৌপ্যের তাপপরিবাহিতা সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহার পর যথাক্রমে তাম্র, স্বর্ণ, য্যালুমিনিয়ম, পিতল, টিন এবং লোহা ইত্যাদি। এজন্য লোহার পাত্র অপেক্ষা য্যালুমিনিয়মের পাত্রে এবং য্যালুমিনিয়ম অপেক্ষা তামার পাত্রে বাঁধিতে সুবিধা হয়।

শীতকালে আমরা শীত নিবারণের জন্য গরম কাপড়, গরম জামা, মোজা, শাল ইত্যাদি ব্যবহার করি। এগুলি সাধারণত ফ্লানেল, পশম, মেরুণ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত। এগুলিকে গরম বলা হয় বলিয়া সত্য সত্যই যে উহারা উষ্ণ, তাহা মনে করিও না। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের তাপপরিবাহিতা খুবই কম, তাই ইহাদের দ্বারা দেহ ঢাকিয়া রাখিলে দেহের স্বাভাবিক তাপ বাহিরের ঠাণ্ডা বায়ুতে আসিতে পারে না, সেইজন্য শরীর গরম থাকিয়া যায়।

একটি ব্যাপার হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, শীতকালে পিতল কাঁসা প্রভৃতি স্পর্শ করিলে তাহাদিগকে কাপড়-চোপড় ইত্যাদি অপেক্ষা শীতল বলিয়া মনে হয়, যদিও একঘরের ভিতর থাকিয়া তাহাদের কোন-একটি অপরাপর দ্রব্য অপেক্ষা উষ্ণতায় কম বেশী থাকিতে পারে না। শীতকালে

আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুষ্পার্শ্বের দ্রব্যগুলির উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক ; আবার ধাতব পদার্থগুলি উত্তম তাপ-পরিবাহী ; সুতরাং তাহারা আমাদের শরীর হইতে তাপ তাড়াতাড়ি টানিয়া লয়। এইজন্য ইহাদিগকে ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কাপড়-চোপড় অপরিবাহী বলিয়া তাহা পারে না।

তরল পদার্থ পরিচলনক্রিয়ার দ্বারাই উত্তপ্ত হয়। সাধারণত **তরলপদার্থের তাপ-পরিবাহিতা** খুবই অল্প। উহাদের মধ্যে কেবল পারদেরই ধাতব পদার্থের ন্যায় উত্তম পরিবহন-শক্তি আছে। একটি বড় পরীক্ষানল লইয়া উহার তিন-চতুর্থাংশ জলপূর্ণ করিয়া জলের পরিবহন-শক্তি পরীক্ষা কর। নলটির নিচে তাপ প্রয়োগ করিলে পরিচলন ক্রিয়ার জন্য পরিবহন কিছু হইতেছে কিনা বুঝা যাইবে না। এইজন্য জলের উপর দিকে একটি স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে উত্তাপ দিলে (৫৯নং চিত্র) দেখিবে উপরের জল উষ্ণ হইয়া ফুটিতে থাকিলেও তলার জল বেশ শীতল আছে। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ যে, গ্রীষ্মকালে পুকুরের উপরের জল খুব গরম লাগিলেও ডুব দিলে নিচের ঠাণ্ডা জলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।



৫৯নং চিত্র—জলের তাপ পরিবহন পরীক্ষা।

গ্যাসীয় পদার্থের পরিবাহিতা তরল পদার্থ অপেক্ষাও কম। তুলা, ফ্লানেল, পশম ইত্যাদির আঁশের মধ্যে অনেক বায়ু আবদ্ধ হইয়া থাকে, এই বায়ু ও তুলা শরীরের তাপ রক্ষা করে। এইজন্য সূতার পোষাক অপেক্ষা তুলা বা ফ্লানেলের পোষাকে বেশী শীত ভাঙ্গে। ব্যবহৃত লেপের তুলা চাপিয়া বসিয়া গেলে তাহাতে ভাল শীত ভাঙ্গে না, তখন পুনরায় তুলা ধুনাইয়া লইতে হয়। ঐরূপ করিলে তুলার ফাঁকগুলি বড় হয় এবং ঐ ফাঁকে অনেক বায়ু আটকাইয়া যায়। শীতের সকালে তোমরা হয়'ত দেখিয়া থাকিবে যে, কোঁচার কাপড় খুলিয়া খালিগায়ে জড়াইলে অনেকটা শীত নিবারণ হয়, কারণ কাপড়

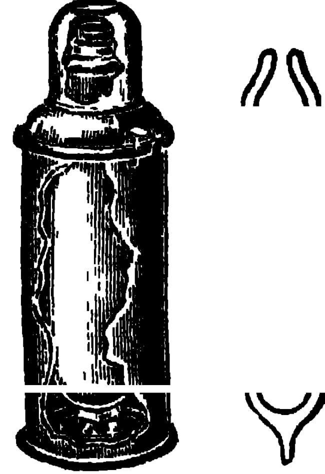
ও শরীরের মধ্যে যে বায়ু থাকে, তাহাই শরীরের তাপ-বহির্গমন অনেকটা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাও বোধ হয় তোমরা জান যে, ওয়াড দেওয়া লেপ ব্যবহার করিলে যতটা শীত ভাঙ্গে, ওয়াড়হীন লেপে তত ভাঙ্গে না; কারণ লেপ ও তাহার ওয়াড়ের মধ্যে যে দুই স্তর বায়ু আবদ্ধ থাকে, তাহা শীতভাঙ্গা কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় টিনের ঘর, খড়ের ঘর অপেক্ষা ঢের বেশী গরম হয়। রৌদ্রের তাপে টিন শীঘ্রই গরম হইয়া যায় এবং ঘরের ভিতরদিকে সেই তাপ বিকিরণ করিয়া ঘরকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু খড় তাপ-পরিবাহী নহে বলিয়া ঘরকে ঠাণ্ডা রাখে। শীতকালে ঠিক ইহার উল্টা হয়; ঘরের গরম টিনের ভিতর দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু খড় ঘরের উত্তাপ এরূপ ভাবে নষ্ট হইতে না দিয়া ঘরকে গরম রাখে। আরও দেখা যায়, অত্যন্ত গরম দুধ পান করিতে অসুবিধা বোধ করিলে মেয়েরা উহা কাল পাথর বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লয়েন। ইহার কারণ, কাল বাটির মধ্য দিয়া তাপ দ্রুতবেগে বিকিরিত হইতে থাকে। শাদা বাটির বিকিরণ ক্ষমতা কম বলিয়া ঐ গরম দুধ শাদা বাটিতে ঢালিলে ঠাণ্ডা হইতে অনেক বিলম্ব হয়। একটি কাল রংএর এনামেল্ করা কেট্‌লী ও শাদা রংএর এনামেল্ করা কেট্‌লীতে সমপরিমাণ ফুটন্ত জল রাখিলে দেখা যায়, কাল কেট্‌লীর জলই আগে ঠাণ্ডা হইতেছে। কাল রংএর পদার্থ শাদা রংএর পদার্থ অপেক্ষা দ্রুত তাপ গ্রহণ করে ও বিকিরণ করে। এইজন্য গ্রীষ্মকালে শাদা জামা ব্যবহার করাই সুবিধা। ইহা সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে এবং নিজে শীঘ্র গরম হয় না। এই কারণেই কেহ কেহ গ্রীষ্মকালে ছাতার কাল কাপড়ের উপর আর একটি শাদা কাপড় বসাইয়া লন।

কোন দ্রব্য হইতে যদি উপযুক্ত তিনটি উপায়ে তাপ নির্গত হওয়া বন্ধ করা যায় তবে দ্রব্যটি একই রকম উষ্ণ বা শীতল থাকিয়া যাইবে। **থার্মস ফ্লাস্কে** (**Thermos flask**) এই তিন উপায়ে যাহাতে তাপ চলাচল করিতে না পারে তাহার অনেকটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একেবারে উক্ত প্রক্রিয়া কয়টির পথ

বন্ধ করা কোন প্রকারে সম্ভব নয়। ফলে ইহ'তে কোন দ্রব্য রাখিলে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত দ্রব্যটি এক রকম উষ্ণতায় থাকিতে পারে।

দুইটি দেওয়ালবিশিষ্ট একটি কাচের বড মুখওয়ালা বোতল—দেওয়াল দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে বায়ু আবদ্ধ আছে। বাহিরের বায়ুর সহিত এই বায়ুর কোনও রূপে সংযোগ নাই। কাচের দেওয়ালগুলি আয়নার মত চকচকে করিয়া পালিশ করা। একটি টিনের পাত্রে কর্কের উপর এই কাচের পাত্রটি আবদ্ধ থাকে এবং চারিদিকেই কর্ক দিয়া টিনের পাত্রের সহিত উহার ব্যবধান রক্ষা করা হয়। টিনের পাত্রটির মুখ প্যাঁচ ওয়ালা টিনের ঢাকনি দিয়া বন্ধ করা যায় এবং ভিতরের কাচের পাত্রটির মুখ কর্ক দিয়া বন্ধ রাখা হয়। ইহাই হইল থার্মস ফ্লাস্ক।



৬০নং চিত্র—থার্মস ফ্লাস্ক

যখন কাচ পাত্রের ভিতর কোন পদার্থ থাকে তখন ইহার কাচের দেওয়াল ভেদ করিয়া সহজে তাপ পরিবাহিত হইতে পারে না। কারণ কাচ এবং বায়ু উভয়ে ভাল তাপ পরিবাহী নহে। তদুপরি কাচ পাত্রের গা চকচকে হওয়ায় ভিতরের তাপ ভিতরে এবং বাহিরের তাপ বাহিরেই বিকিরিত করে। কাজেই সহসা ভিতরের তাপ বাহিরে এবং বাহিরের তাপ ভিতরে আসিতে পারে না। ফলে ভিতরের দ্রব্য অনেকক্ষণ ধরিয়া একরূপ উষ্ণ থাকিয়া যায়।

তোমরা সকলেই জান, দুপুরে যখন সূর্য আমাদের মাথার উপরে উঠে, তখন তাহার তেজ যেমন প্রখর, সকালে পূর্বাকাশে ইহা যখন উঠিতে থাকে কিংবা বৈকালে পশ্চিমাকাশে যখন ঢলিয়া পড়ে, তখন তেমন প্রখর নয়। সূর্য বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ দিতেছে, তাহা নহে; ইহা সকল সময়েই সমভাবে তাপ দেয়, কিন্তু পৃথিবী উহার যে অংশ পাইতেছে, তাহা সকল সময় সমান নয়।

এই সূর্যোত্তাপে এবং ইহার হ্রাস বৃদ্ধির জন্য নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোনও পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে সময় সময় তাহার অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। কঠিন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে সময়বিশেষে উহা তরল পদার্থে পরিণত হয়, আবার তরল পদার্থেও তাপ দিলে উহা একসময়ে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এক টুকরা বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা শীঘ্র গলিয়া জল হয় এবং সেই জলে উত্তাপ দিলে বাষ্প হয়।

বাষ্পীভবন ও ঘনীভবন—একটি কড়ায় খানিকটা জল লইয়া উত্তাপ দিতে থাক, দেখিবে জল ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে এবং সেই পাত্রের উপর শাদা ধোঁয়ার ন্যায় কি উঠিতেছে। এই শাদা ধোঁয়ার উপর যদি একখানি শ্লেট ধর,—দেখিবে শ্লেটখানির উপর বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া আছে। এ জল কোথা হইতে আসিল? উত্তাপে কড়ার জল বাষ্পের আকার ধারণ করিয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশিয়া যাইতেছিল। শ্লেটের শীতল গাত্রে লাগিয়া তাহার কিয়দংশ জমিয়া পুনরায় জল হইয়া গিয়াছে। উত্তাপ পাইয়া জলের বাষ্পাকার ধারণ করাকে **বাষ্পীভবন** (Vaporisation) কহে এবং যে কোনও কারণে বায়ুর উষ্ণতা যথেষ্ট কমিয়া গেলে বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্পের জমিয়া যাওয়াকে **ঘনীভবন** (Condensation) বলে।



৬১নং চিত্র—জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন

কেট্‌লীতে জল গরম করিবার সময় ঠিক এইরূপ ব্যাপার দেখা যায়। জলীয় বাষ্প কেট্‌লীর নল হইতে জোরে নির্গত হইয়া কিছু দূরে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া জমিয়া যায় ও কুয়াসার ন্যায় দেখায় (৬১নং চিত্র)। কিন্তু কেট্‌লীর ঠিক নলমুখে উহা উষ্ণ থাকে বলিয়া

দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল আগুনের তাপ পাইলেই যে জল বাষ্পে পরিণত হয়, তাহা নহে ; সর্বদাই জল হইতে বাষ্পোদ্গম হইতেছে। একটা রেকাবীতে অল্প একটু জল লইয়া ঘরের মেঝেয় রাখিয়া দাও। ২।৩ দিন পরে দেখা যাইবে যে, জল শুকাইয়া গিয়াছে ও পাত্রটি খালি পড়িয়া আছে। ভিজা কাপড় হাওয়ায় মেলিয়া দিলে শুকাইয়া যায়। তোমরা গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট পুকুর, ডোবা, জলামাঠ প্রভৃতি শুকাইতে দেখিয়াছ। এই সব ক্ষেত্রে সূর্যের তাপে ও বায়ুর তাপে জল ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে অদৃশ্য হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে তাপের আবশ্যক। বাহির হইতে আগুনের তাপ দিলে বাষ্পোদ্গম দ্রুত হয়, তাহা না হইলে বাষ্পোদ্গম ধীরে ধীরে হইতে থাকে। ধীরে বাষ্পোদ্গম ক্রিয়ায় তাপ-হরণ হেতু কিঞ্চিৎ শৈত্যের উৎপত্তি হয়। গ্রীষ্মে যখন আমাদের শরীর ঘর্মাক্ত হয়, তখন পাখার বাতাস খাইলে শরীর শীতল হয়, ইহার কারণ পাখার বাতাসে যখন ঘাম বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, তখন বাষ্পে পরিণত হইতে গেলে যে তাপের প্রয়োজন, তাহার কিয়দংশ আমাদের শরীর হইতে গৃহীত হয়, সেইজন্য আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি। জল ঠাণ্ডা করিতে আমরা বালিমাটীর কলসী পছন্দ করি, কারণ এইরূপ কলসীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে জলকণা বাহিরে আসে ও কলসী হইতে তাপ শোষণ করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়।

জল হইতে নিয়তই যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহার দ্রুততা জলের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। এক কড়া জল উনানে চাপাইলে দ্রুত বাষ্পোদ্গম হওয়ায় জল শীঘ্র কমিয়া যায়, কিন্তু একটি ছোট রেকাবীতে সামান্য পরিমাণ জল রাখিলেও তাহা শুকাইয়া যাইতে যথেষ্ট সময় লাগে। তোমরা বোধ হয় জান না যে, সহরে অনেক স্থানে আজকাল কলের সাহায্যে কাপড় কাচিবার ব্যবস্থা আছে। ঘোর বর্ষার দিনেও এক দিনে কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়। কাচা কাপড়গুলি শুকাইবার জন্য বাষ্পপূর্ণ নল দ্বারা উত্তপ্ত বদ্ধ-গৃহের মধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। ইহাতে ১০।১২ মিনিটের ভিতর উহারা শুকাইয়া যায়।

আবাব জল তলেব আয়তন যতই বড় হয় অর্থাৎ জলপাত্র যতই প্রশস্ত হয়, বাষ্পীভবনও তত দ্রুত হয়। গবম চা প্লেটে ঢালিলে ঠাণ্ডা হয়; তাহাব কাবণ, ওরূপ কবায় বিস্তৃত তল হইতে এককালে যথেষ্ট বাষ্পোদ্গম হয়। এই জন্যই বাটিব দুধ অত্যন্ত গবম থাকিলে মেয়েবা এক বাটি হইতে অন্য এক বাটিতে তাহা ঢালাঢালি কবিয়া ঠাণ্ডা কবেন।

বাতাস বহিলেও বাষ্পোদ্গম দ্রুত হয়। তাহাব কাবণ এই যে, জলীয়-বাষ্প-সিক্তবায়ু বাতাসে সবিয়া যায ও পার্শ্ব হইতে শুষ্ক বায়ু আসিয়া বাষ্প গ্রহণ কবিতে থাকে। আবাব বাতাস যতই শুষ্ক হইবে, উহাব দ্বাবা বাষ্পশোষনও ততই দ্রুত হইবে। এই কাবণে শীতকালেব শুষ্ক বাতাসে ভিজা কাপড শীঘ্রই শুকায়, আমাদেব গা ঠোঁট প্রভৃতি ফাটে।

বাতাসে জলীয় বাষ্প—উপবে বলা হইয়াছে যে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জলাশয় যথা—খালবিল, নদনদী ও সমুদ্র হইতে প্রতিনিয়ত প্রভূত জল বাষ্পাকাবে উঠিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাণীদিগেব শবীব হইতে এবং গাছপালা হইতেও নিয়ত জলীয় বাষ্প উঠিতেছে। এই সকল বাষ্প যায় কোথায়? ইহাদেব সমস্তই বায়ুব মধ্যে অদৃশ্য হইযা মিশিয়া থাকে। কিন্তু বায়ুব বাষ্প-ধাবণ-ক্ষমতাবও একটা সীমা আছে। নির্দিষ্ট পবিমাণ বায়ু একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ জলীয় বাষ্প অদৃশ্য অবস্থায় ধাবণ কবিতে পাবে। যখন কোন স্থানেব বায়ু সেই নির্দিষ্ট পবিমাণ জলীয় বাষ্প ধাবণ কবে, তখন সে বায়ুকে **সংপৃক্ত** বায়ু কহে। বর্ষায় বৃষ্টিব সময় ভিজা কাপড় সহজে শুকাইতে চায় না, ইহাব কাবণ স্থানীয বায়ু ইতিপূর্বে প্রায় পবিগর্ভিত হইয়া আছে। শীতে ঠিক ইহাব বিপবীত ব্যাপাব হয়। সূর্য-তাপেব অল্পতা হেতু জল হইতে বাষ্প অল্প পরিমাণে উত্থিত হয়; সেইজন্যই অপেক্ষাকৃত শুষ্ক বায়ু ভিজা কাপডেব জল শীঘ্রই টানিয়া লয়।

বাতাসে যে সর্বদাই জলীয বাষ্প আছে, তাহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটি কাচের গ্লাসে খানিকটা জল লও এবং উহাতে কয়েক টুক্‌রা

বরফ* ফেলিয়া দাও। লক্ষ্য করিয়া দেখ, গ্লাসের বাহিরের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা জমিয়াছে। এই জল বাষ্পাকারে গ্লাসের চারিদিকের বায়ুতে মিশিয়া ছিল, ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে আসিয়া জলবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে।

উষ্ণ ও শীতল বায়ুর জলীয় বাষ্পধারণ ক্ষমতা—ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠের বিভিন্নরূপ জলাধার হইতে সর্বদা যে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইতেছে তাহা বায়ুমণ্ডলে অদৃশ্যভাবে মিশিয়া আছে এবং বায়ুরও জলীয় বাষ্প ধারণ করিবার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। যখন কোনস্থানের বায়ু যতটুকু বাষ্প ধারণ করিতে পারে, ঠিক ততটুকু ধারণ করে, তখন সেই বায়ুকে সংপৃক্ত বায়ু বলে। এই সংপৃক্ততা বায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। বায়ু শীতল অবস্থায় যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে, উষ্ণ হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিয়া রাখে। শীতকালের ভোর বেলায় যে কুয়াসা দেখা যায়, বেলা হইলে তাহা আর দেখা যায় না। ইহার কারণ, বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর উষ্ণতা বাড়ে এবং উহা অধিক বাষ্প ধারণ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং কুয়াসার আকারে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ভোরের ঠাণ্ডায় দেখা গিয়াছিল, তাহা বাষ্পে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়।

ঐরূপ আবার গরম বায়ু যতটা বাষ্প ধরিয়া রাখে, শীতল হইলে উহাই আর তত বাষ্প অদৃশ্যভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে না। উপরে এক পরীক্ষায় দেখিয়াছ, শীতল জলপূর্ণ গ্লাসের বাহিরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া থাকে। উহার কারণ, গ্লাসের চতুপার্শ্বস্থ বায়ু শীতল গ্লাসের সংস্পর্শে শীতল হয় ও ইহার বাষ্প-ধারণ-ক্ষমতা কমিয়া যায়। যে বাষ্পটুকু ইহা আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, তাহাই জলবিন্দুর আকার ধারণ করে।

বায়ু গরম হইলে অধিক বাষ্প ধারণ করে কেন? বায়ু যতই গরম হয়, ততই উহার আয়তন বর্ধিত হয়, অর্থাৎ বায়ুর অণুগুলির মধ্যে পরস্পরের ব্যবধান ততই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পূর্বে অণুগুলির ফাঁকে যে পরিমাণ বাষ্প

থাকিতে পারিত, আয়তন বৃদ্ধি পাইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে।

জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা অনেক হাল্কা। সেই জন্যই উহা উপরে উঠিয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, অতএব জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা লঘু হয় এবং উপরে উঠিতে থাকে। আবার বায়ু যতই লঘু হয়, উহার চাপও ততই কমিয়া যায়। সুতরাং যখন যেস্থানে বায়ুতে বহুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তখন সেই স্থানে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা কমিয়া যায়। এইজন্য বর্ষাকালে ব্যারোমিটারে পারদ নামিয়া যায়। যন্ত্রের পারদ অত্যধিক নামিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, স্থানীয় বায়ুমণ্ডলের চাপ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং অন্যস্থান হইতে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও ভারী বায়ু ছুটিয়া আসিয়া ঝড় তুলিতে পারে। মানমন্দিরে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যারো-মিটারের সাহায্যে বায়ুর চাপ দেখা হয় এবং তাহা হইতে আবহাওয়া সম্বন্ধীয় ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বাভাষ সাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত হইয়া থাকে।

উষ্ণ বাতাসের জলীয় বাষ্প প্রাকৃতিক কারণে ঠাণ্ডা হইলে কি হয় এইবার বলিতেছি।

পূর্বেই তোমাদিগকে বলা হইয়াছে যে উষ্ণ বায়ু যত বাষ্প ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, শীতল হইলে তাহা আর ততটা বাষ্প অদৃশ্যভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ইহার উদাহরণও তোমরা পূর্বে পাইয়াছ, ফুটন্ত জলের বাষ্পের উপর ধৃত শ্লেটে ও শীতল জলের গ্লাসের গায়ে বাষ্প জমিয়া জলবিন্দুর আকারে দেখা দেয়, কেট্‌লীর মুখ হইতে ফুটন্ত জলের বাষ্প শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলকণাতে পরিণত হইয়া কুয়াসার মত দেখায় (৬১ নং চিত্র দেখ)। প্রাকৃতিক উপায়ে বাতাস যখন শীতল হয়, তখন বায়ুর জলীয় বাষ্প এইভাবেই জলকণার আকৃতি পায়। এই জলকণাকেই আমরা শিশির, কুয়াসা, মেঘ ও বৃষ্টির আকারে দেখি। এখন এইগুলির সম্বন্ধে তোমাদিগকে একে একে বলিতেছি।

শিশির—দিনের বেলায় সূর্য কিরণে বিভিন্ন জলাধার হইতে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উঠিয়া বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া থাকে। রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে ভূপৃষ্ঠ ও তদুপরিস্থ দ্রব্যাদি তাপ বিকিরণ করিয়া শীতল হয়। ঐ সকল শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া তন্নিকটস্থ বায়ুও শীতল হয়। তখন সেই বায়ু আর পূর্বের ন্যায় অধিক জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে পারে না, এবং উহার উদ্বৃত্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শীতল বস্তুর গায়ে জলবিন্দুর আকারে দেখা দেয়, ইহারই নাম **শিশির**। অতএব দেখ, শিশিরের জল বৃষ্টির ফোঁটার মত আকাশ হইতে পড়ে না, শীতল বস্তুর চারিপার্শ্বস্থ জলীয় বাষ্পই রাত্রির ঠাণ্ডায় জমিয়া শিশিরের আকার ধারণ করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে সকল বস্তু রাত্রিকালে শীঘ্র শীঘ্র তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হয় তাহাদেরই গায়ে শিশির অধিক পরিমাণে জমে। এইজন্যই দুর্বাঘাস, গাছের পাতা, কাল পাথর, ঘরের চালের টিন প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে শিশির দেখা যায়। ইট, কাঠ প্রভৃতি শীঘ্র তাপ ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, কাজেই উহাদের উপর তেমন শিশির জমে না।

মেঘলা রাত্রিতে বেশী শিশির পড়ে না। আকাশে মেঘ থাকিলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বিকিরিত হয়, তাহা মেঘে বাধা পাইয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে, তাই মেঘলা দিনে আমরা গরম বোধ করি, চল্‌তি কথায় ইহাকে গুমট্ বলে। ফলে তখন কোন জিনিষ অধিক ঠাণ্ডা হইতে পারে না বলিয়া কোনও পদার্থে শিশির জমে না। অনুরূপ কারণেই গাছতলায় বা ঝোপের ভিতর শিশির দেখা যায় না।

আবার প্রবল বাতাস বহিলেও বেশী শিশির পড়ে না। কারণ, ঘাস প্রভৃতি তাপ বিকিরণ দ্বারা শীতল হইলেও উহাদের উপরকার বায়ু, বাতাসের জন্য এক স্থানে স্থির থাকিয়া শীতল হইতে পায় না, তজ্জন্য জলীয় বাষ্পগুলি ঘনীভূত হইবার সুযোগ পায় না।

শীতকালে পৌষ মাঘ মাসে বায়ু খুব শীতল হওয়া সত্ত্বেও শিশির যথেষ্ট

পরিমাণে দেখা যায় না। ইহার কারণ শীতকালের সূর্যতাপের অল্পত্ব হেতু বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকিলেও রাত্রে ভূপৃষ্ঠ যথোচিত শীতল হইতে না পাবায় শিশির জমিতে পারে না। এখন তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, কেন ভাদ্র আশ্বিন মাসে প্রচুর শিশির পড়ে।

ইহাও হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা গাছপালার পাতায় অধিক পরিমাণে শিশির জমিয়া থাকে। এই শিশির যে শুধু বায়ুধৃত বাষ্প হইতে জমে তাহা নহে; গাছের পাতা হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে বাষ্প উঠিযা থাকে। এই বাষ্প এবং বায়ুর বাষ্প উভয়ে ঘনীভূত হইয়া শিশিরের আকারে দেখা দেয়।

মোটের উপর দেখা গেল, বায়ু জলীয়-বাষ্প-বহুল হইলে, আকাশ মেঘশূন্য থাকিলে, স্থির বায়ুতে উন্মুক্ত স্থানে, উত্তম তাপবিকিরণকারী পদার্থের উপর শিশির অধিক পরিমাণে জমে।

কুয়াসা—(mist) সাধারণত শীতের শেষে, প্রত্যুষে, মধ্যে মধ্যে কুযাসা দেখা যায। সময় সময় ইহা এত নিবিড় হয যে, দুশ বারো হাত দূরের বস্তুও দেখিতে পাওযা যায় না। তোমরা বোধ হয দেখিযাছ, কুযাসায বাহির হইলে জামাকাপড় ভিজিয়া যায়, তাহাতে নিশ্চয বুঝিযাছ যে, কুযাসা খুব ছোট ছোট জলকণা ব্যতীত আর কিছুই নয।

যখন ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুরাশি, বায়ুমণ্ডলের উপরকার বায়ু অপেক্ষা অধিক শীতল হয়, তখন ইহার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া কুয়াসার সৃষ্টি করে। কখনও কখনও জলীয়বাষ্পপূর্ণ গরম বাতাস, শীতল জল বা ভূমির সংস্পর্শে কুয়াসার উৎপত্তি করে।

বিস্তীর্ণ জলাশয় কিংবা জলাভূমির বায়ুতে কুয়াসা বেশী জন্মে। রাত্রে জল, বায়ু ও স্থল অপেক্ষা উষ্ণ থাকে, সেইজন্য ঐ সময জল হইতে যথেষ্ট বাষ্প উত্থিত হইয়া উপরিস্থিত বায়ুকে প্রায় সংপৃক্ত করিয়া রাখে। ভোরের দিকে যখন

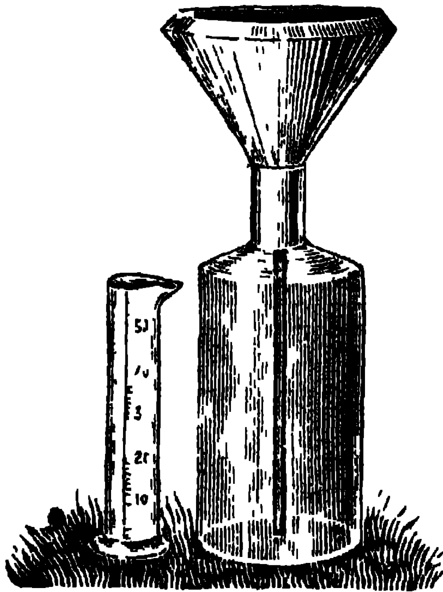
বাতাস খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়, তখন ঐ বাষ্প শীতল হইয়া কুয়াসার সৃষ্টি করে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোত্তাপে বায়ু ক্রমশ উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত বায়ুর বাষ্পধারণক্ষমতা বেশী, সুতরাং কুয়াসা আকারের জলকণা পুনরায় বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া আমরা কুয়াসাকে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে দেখি।

মেঘ ও বৃষ্টি—মেঘ ও কুয়াসার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। ভূপৃষ্ঠ হইতে কিছু উপরে বায়ুরাশির জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইলে মেঘের আকারে দেখা যায়। নানাবিধ জলাশয় হইতে যখন জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তখন এই জলীয়বাষ্পমিশ্রিত বায়ু লঘু হওয়ায় উপর দিকে উঠিতে থাকে। উপরের বায়ু নিচের বায়ু অপেক্ষা শীতল, তাহা তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ। এই জন্য জলীয়বাষ্পমিশ্রিত বায়ু যতই উপরে উঠিতে থাকে, ততই শীতল হইতে শীতলতর হয়। অধিকন্তু, উপরের বায়ু লঘু ও ইহার চাপ কম বলিয়া ঊর্ধ্বগামী বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রসারিত হয়, তাহাতেও কিছু শীতল হয়। এই শীতল বায়ুর বাষ্পধারণক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় সংপৃক্ত হইবার পর যে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প থাকে, তাহাই জলকণায় পরিণত হইয়া **মেঘের** আকার ধারণ করে। এই সকল জলকণা বায়ু অপেক্ষা গুরু বলিয়া নিচের দিকে পড়িতে থাকিলে ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় বাষ্পাকারে উপরে উঠে। উপরে উঠিয়া শীতল হইয়া আবার মেঘে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমাগত উঠানামা করার ফলে সহজে ইহারা মাটিতে পড়িয়া যায় না। অধিকন্তু ইহারা আকারে এত ক্ষুদ্র যে, বায়ুরাশিতে ভাসিয়াও বেড়াইতে পারে।

যখন এই ভাসমান জলকণাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয়, তখন কিন্তু আর বায়ুতে ভাসিতে পারে না, নিচে পড়িতে থাকে। ইহাকেই আমরা **বৃষ্টি-পাত** বলি। যখন এই জলবিন্দু বায়ুর উচ্চস্তর হইতে পড়িতে থাকে, তখন পতনকালে নিচের বায়ুস্তরগুলি হইতে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আকারে

বর্ধিত হয়; এই কারণে আমরা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে দেখি। কখনও কখনও বা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু, বাতাস দ্বারা চালিত হইয়া উচ্চ পর্বতগাত্রে প্রতিহত হইলে তাহার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হয়; ক্রমে উহা হইতে বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে ভারতমহাসাগর হইতে আগত মৌসুমী বায়ু যখন আসামের পর্বতমালায় বাধা পায়, তখন ইহা আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বারি-বর্ষণ করে। পৃথিবীতে আসিতে আসিতে যদি জলের ফোঁটা হঠাৎ বায়ুমণ্ডলের এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছায় যেখানকার বায়ু কোনও বিশেষ কারণবশত অধিক শীতল হইয়া গিয়াছে, তখন জলের ফোঁটা শীতলতা পাইয়া জমিয়া বরফ হইয়া পড়ে। কখনও বা উপরের বায়ু এত বেশী ঠাণ্ডা হয় যে, বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বরফের আকার ধারণ করিয়া ভূপৃষ্ঠে পড়ে, ইহাকেই **শিলাবৃষ্টি** বলে।

কোনও দেশের আর্থিক অবস্থা সেই দেশে বৃষ্টিপাতের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ, বৃষ্টির অভাব হইলে শস্যাদি জন্মিতে পারে না, নদনদী শুকাইয়া যায় এবং জলপথে বাণিজ্য দুষ্কর হইয়া উঠে। আবার অতি বৃষ্টিতেও মানুষের নানারূপ কষ্ট হয়। এই সব অসুবিধার প্রতিবিধান করিতে হইলে কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তাহা প্রথমেই জানা উচিত।



৬২ নং চিত্র—বৃষ্টিমান যন্ত্র

বৃষ্টির পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম **বৃষ্টিমান যন্ত্র** (Rain gauge) (৬২ নং চিত্র) সাধারণত একটি বড় বোতল, একটি মাপিবার গ্লাস ও একটি ফানেল, এই তিনটির সমষ্টিকে বৃষ্টিমানযন্ত্র ধরা হয়। বোতলটির মুখে ফানেলটি বসাইয়া যে

স্থানে বৃষ্টি পড়িতে কোনও বাধা পায় না, এমন ফাঁকা জায়গায় বসাইয়া রাখা হয়। যাহাতে অন্যস্থানের জল কোনওরূপে ছিটকাইয়া ফানেলে পড়িতে না পারে এবং যাহাতে কেবলমাত্র মেঘ হইতে যে জলের ফোঁটাগুলি পড়ে, তাহারা একেবারে ফানেলে পড়ে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। পরে বোতলে সঞ্চিত জল মাপিবার গ্লাসে ঢালিয়া কত উচ্চ হয়, তাহা স্থির করা হয়। মাপিবার গ্লাসের মুখ ও ফানেলের মুখ যদি সমান হইত, তবে গ্লাসে যত ইঞ্চি জল দাঁড়াইত, তাহাই ফানেলের মুখের ক্ষেত্রফল পরিমিত স্থানের উপর বৃষ্টির পরিমাণ হইত। কিন্তু সুবিধার জন্য মাপের গ্লাসটিকে এরূপ লওয়া হয় যে, উহার মুখের ক্ষেত্রফল এক বর্গইঞ্চ এবং ফানেলের মুখের ক্ষেত্রফল পাঁচ বর্গইঞ্চ। তাহা হইলে এক ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টি, মাপের গ্লাসে পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ হইবে, কিন্তু মাপের গ্লাসের সেখানে ১ ইঞ্চি দাগ দেওয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা হয় যে এক ইঞ্চের শতাংশ পরিমাণ বৃষ্টিও ইহা হইতে সহজে নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক দিনের হইতে প্রত্যেক মাসের ও প্রত্যেক মাসের হইতে সারা বৎসরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাওয়া যায়।

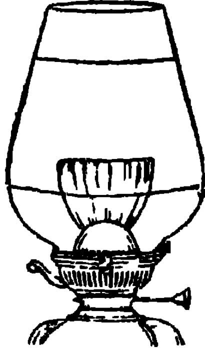
দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের হাউই দ্বীপে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বেশী বৃষ্টি হয়। করমণ্ডল উপকূলে ও মাদ্রাজেও যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়া থাকে।

বায়ুর উপর তাপের ক্রিয়া

জ্বলন্ত উনানের তাপে উহার উপরের বায়ুতে পরিচালন ক্রিয়া আরম্ভ হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। উনানের উপর উষ্ণ বায়ুর স্রোত কয়লার কণিকা সঙ্গে লইয়া ধোঁয়ার আকারে উপরে উঠিতে থাকে, পাশের শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে

এইরূপে টেবিল ল্যাম্পের চিমনীতেও বায়ুর পরিচালন ক্রিয়া চলে। চিমনী মধ্যস্থ বায়ু আলোর শিখার তাপে উত্তপ্ত হয় ও লঘু হইয়া উপরে উঠে। চিমনীর

তলার ছিদ্রপথ দিয়া (৬৩নং চিত্র) বাহিরের শীতল ঘন বায়ু চিমনীর মধ্যে প্রবেশ করে ও দীপ শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখে। যদি ছিদ্রগুলি কোনরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবে আলো নিভিয়া যায়। চিমনীর গরম বায়ু যে ঊর্ধ্বে উঠে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য চিমনীর কিছু উপরে হাত রাখিলে ঊর্ধ্বগামী উষ্ণবায়ু প্রবাহে হাতে তাপ লাগিবে। খুব পাতলা কাগজের ছোট ছোট টুকরা চিমনীর উপরে ছাড়িয়া দিলেও দেখিবে যে, তাহারা এই বায়ুস্রোতে উপর দিকে উঠিয়া যাইতেছে।


৬৩নং চিত্র চিমনীর মধ্যে বায়ু-প্রবাহ

কলকারখানাতে বড় বড় এঞ্জিনের ধোঁয়াও এইরূপে লম্বা লম্বা চিমনী দিয়া বাহির হইয়া যায়।

উত্তপ্ত হইলে বায়ুতে কিরূপ স্রোত জন্মে তাহা পরের পরীক্ষা হইতে জানা যাইবে। একটি অগভীর পাত্র, কিছু জল, একটি মোমবাতি, একটি কাচের চিমনী, Tএর মত ভাবে কাটা একটি কার্ড বোর্ডের খণ্ড, ন্যাকড়ার বা কাগজের সলিতা ও দেশলাই ইত্যাদি লইয়া নিম্নে বর্ণিত ভাবে পরীক্ষাটি কর (৬৪নং চিত্র)।

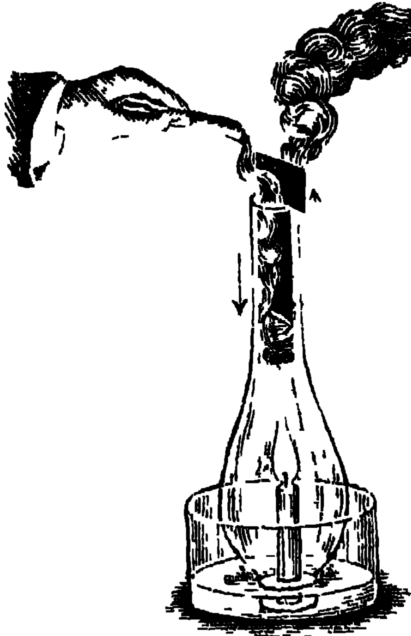
পরীক্ষা ঃ—

যাহা করিতে হইবে	যাহা দেখা যাইবে	মন্তব্য
১। অগভীরপাত্রে বাতি জালিয়া আঁটিয়া বসাইতে হইবে ও পরে ঐ পাত্রে জল ঢালিয়া দিতে হইবে।	বাতি জ্বলিতে থাকিবে।	
২। বাতিটির উপর দিয়া চিমনীটি ঢুকাইয়া জল পর্যন্ত ডুবাইয়া বসাও এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।	বাতির শিখা ক্রমে নিষ্প্রভ হইতে থাকিবে।	চিমনীর ভিতরের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া বাহিরে আসিতে থাকিবে এবং সেই একই পথে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে পায় না। কাজেই অক্সিজেন গ্যাসের অভাব ঘটে

যাহা করিতে হইবে	যাহা দেখা যাইবে	মন্তব্য
৩। এইবার কার্ড বোর্ডটি এমনভাবে চিমনীর মুখে বসাও যেন ইহার পা চিমনীর ভিতরে এবং বাহু দুইটি চিমনীর উপরে থাকে।	বাতিটি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিবে।	বায়ু হইতে অক্সিজেন বাতির নিকটে আসিতে থাকিবে।
৪। ন্যাকড়া বা কাগজের সলিতা পোড়া চিমনীর মুখে ধর।	ইহার ধোঁয়া কার্ড বোর্ডের এক পাশ দিয়া চিমনীর ভিতর প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া আসিবে।	যে দিক দিয়া সলিতার ধোঁয়া চিমনীর ভিতরে যায় সেই দিক দিয়া বাহিরের শীতল বায়ু উহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং অপর দিক দিয়া উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া আসে।

নিম্নে পরীক্ষাটির চিত্র দেওয়া হইল।

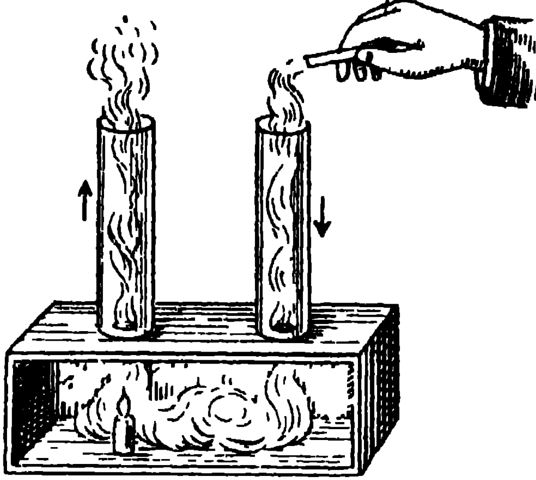
পূর্ব পৃষ্ঠার পরীক্ষাটি দুইটি চিমনীওয়ালা একটি বদ্ধ কাঠের বাক্সের সাহায্যেও দেখান যায় (৬৫ নং চিত্র)। জ্বলন্তবাতিটি দেখিবার জন্য কাঠের বাক্সের একটি দিক কাচ দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এইরূপ বাক্সের চিত্র দেওয়া গেল।



৬৪নং চিত্র—বায়ু প্রবাহ

আগুন না থাকিলেও ঘরের মধ্যে এইরূপে একটি বায়ুপ্রবাহ চলে। ঘরের লোকজনের শ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং লঘু হইয়া উপরে উঠে। এই উষ্ণ বায়ুর বহির্গমনের জন্য পাকাবাড়ীতে কড়ির কাছে দেওয়ালে বড় বড় ছিদ্র রাখা হয়। বাহিরের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বায়ু দরজা-জানালার ফাঁক দিয়া

ভিতরে প্রবেশ করে। এইরূপে ঘরে বায়ু চলাচল করে। ইহাও তোমরা



৬৫নং চিত্র—বায়ুপ্রবাহ



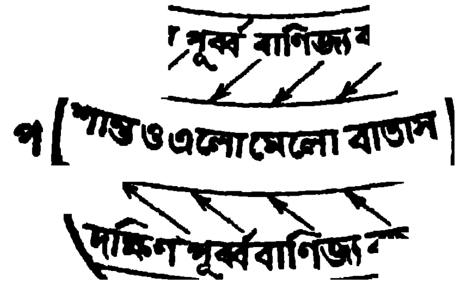
৬৬নং চিত্র—ঘরে বায়ুচলাচল

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। ঘরের সমস্ত দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া দরজার একটি কপাট তিন চারি আঙ্গুল ফাঁক করিয়া রাখ। একটি জ্বলন্ত বাতি ঐ কপাটটির উপর দিকে ফাঁকের কাছে ধর। দেখিবে, দীপশিখাটি খোলা দরজার বাহিরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। পরে বাতিটি কপাটের তলায় ফাঁকের কাছে ধরিলে দেখিবে, ইহার শিখা বাঁকিয়া ঘরের ভিতরদিকে হেলিয়া রহিয়াছে (৬৬নং চিত্র) কেন এরূপ হয় তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ।

কোনও বাড়ীতে আগুন লাগিলে সেই স্থানে বাতাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে। এবং ঐ প্রবল বাতাসের জন্য ঘর বাড়ী এত শীঘ্রই পুড়িয়া যায় যে, তাহাকে রক্ষা করিবার অবসর খুব কমই পাওয়া যায়। বাতাস প্রবল হইবার কারণ, এক সঙ্গে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া বায়ু গরম হইয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই বিস্তীর্ণ স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চারিদিকের বায়ু প্রবল বেগে ছুটিয়া আসে।

যেমন আগুনের তাপে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়, সূর্যের তাপেও পৃথিবীর উপর সেইরূপ বহুদূরব্যাপী বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত, যথা—বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমীবায়ু, স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু।

সূর্যের রশ্মি নিরক্ষপ্রদেশে খাড়া হইয়া পড়ে এবং উহার দুই পার্শ্বে নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে ও মেরুপ্রদেশে তির্যকভাবে পড়ে, সুতরাং শেষোক্তস্থান অপেক্ষা নিরক্ষ-প্রদেশ অধিকতর উষ্ণ হয়। এইজন্য নিরক্ষপ্রদেশের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপর দিকে উত্থিত হয় এবং দুই পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে বায়ুরাশি নিরক্ষপ্রদেশে ছুটিয়া আসে, কিন্তু পৃথিবীর নিজের আবর্ত্তন আছে বলিয়া আমরা উহাদিগকে ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে আসিতে দেখি না। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ু ঘুরিতেছে। কিন্তু নিরক্ষ-প্রদেশের বায়ু যে বেগে ঘুরিতেছে, তাহার উত্তর ও দক্ষিণ-দিকের বায়ু তদপেক্ষা কম বেগে ঘুরিতেছে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণদিক হইতে আগত বায়ু যথাক্রমে উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয় (৬৭নং চিত্র)। বহুপূর্ব্বে যখন কলের জাহাজ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন নাবিকগণ এই বায়ুতে পাল তুলিয়া দিয়া জাহাজ চালাইত। তাহাতে বাণিজ্যের সুবিধা হইত বলিয়া, এই বায়ুর নাম **বাণিজ্য-বায়ু** (**Trade wind**)। ইহা বৎসরের প্রায় সকল সময়েই বহে।



৬৭নং চিত্র—বাণিজ্যবায়ু

মৌসুমী বায়ু (Monsoon) নামে একপ্রকার সাময়িক বায়ু ভারতবর্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা সাধারণত গ্রীষ্মের শেষে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং পুনরায় শীতকালে বহিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকটবর্ত্তী স্থানের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। সুতরাং মধ্যএসিয়া ও ভারতবর্ষের ভূভাগ, দক্ষিণে ভারতমহাসাগরের জল অপেক্ষা অনেক বেশী উত্তপ্ত হয়। ইহার ফলে ভারতমহাসাগর হইতে বায়ুপ্রবাহ উক্ত ভূভাগের দিকে অগ্রসর হয়; কিন্তু

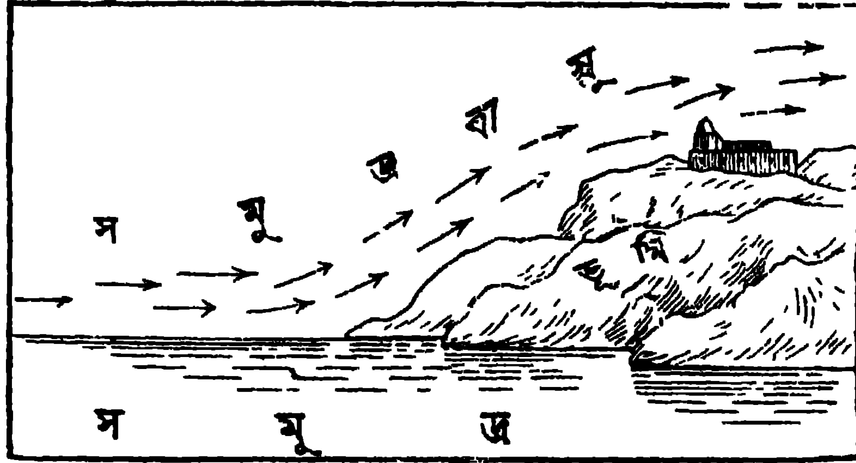
পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্য উক্ত বায়ুকে দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। ইহা ভারতমহাসাগরের উপর দিয়া আসিবার সময় প্রচুর জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীতে বাধা পাইয়া মালাবার উপকূলে প্রচুর বারি-বর্ষণ করে। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত মৌসুমী বাতাস আমাদের বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং পরে আসামের পর্বতমালায় প্রতিহত হইয়া আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত করে। বস্তুত অসামের চেরাপুঞ্জী প্রদেশে যত বৃষ্টিপাত হয়, ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে তত বৃষ্টি হয় না।

শীতকালে সূর্যের দক্ষিণায়ণে অবস্থিতি বশত ঠিক ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সূর্য মকরক্রান্তির নিকটবর্তী স্থানে প্রায় মাথার উপরে থাকে। সুতরাং এই সময়ে মধ্যএশিয়া হইতে শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে বহিতে থাকে। আমাদের উত্তরে বিস্তীর্ণ জলভাগ নাই বলিয়া এই বায়ু শুষ্ক। এইজন্য শীতকালের ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়ায় আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু এই বায়ুই বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া গিয়া পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীতে বাধা পাইয়া মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে ও সিংহলে বারিবর্ষণ করে।

সূর্যের কিরণ সমুদ্র ও ভূমির উপর পতিত হইয়া উভয়কেই উত্তপ্ত করে। কিন্তু স্থলভাগ যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, জল তেমন হয় না, এবং একবার উত্তপ্ত হইলে জল শীঘ্র তাপত্যাগ করিয়া শীতল হইতে চায় না। ফলে আমরা সমুদ্রের নিকটবর্তী স্থানে প্রতিদিনই সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নামে দুইপ্রকার বায়ুপ্রবাহ দেখিতে পাই।

প্রায় মধ্যাহ্নকাল হইতে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্থলভাগ সমুদ্র অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত স্থলভাগের সংস্পর্শে উহার উপরিস্থ বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। উহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রের উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং ঘন বায়ু স্থলভাগের দিকে ধাবিত হয় (৬৮নং চিত্র), এই বায়ুকে **সমুদ্রবায়ু** (Sea-breeze) বলে। কলিকাতা সমুদ্র হইতে প্রায় ৭০।৮০ মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে

তথায় দক্ষিণদিক হইতে যে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাবায়ু প্রত্যহ প্রবাহিত হয়, তাহা সমুদ্রবায়ু ভিন্ন আর কিছু নহে। রাত্রি আসিলে স্থলভাগ বিকিরণ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র তাপ ত্যাগ করিতে থাকে, এবং প্রায় মধ্যরাত্রি হইতে প্রাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমুদ্র স্থলাপেক্ষা গরম থাকে। এইজন্য স্থলভাগ হইতে সমুদ্রাভিমুখী যে বায়ুপ্রবাহের



৬৮নং চিত্র—সমুদ্র বায়

সৃষ্টি হয়, তাহাকে **স্থলবায়ু** (Land-breeze) বলে। ৬৮নং চিত্রে তীরগুলির মুখ ঠিক বিপরীত দিকে উল্টাইয়া দিলে স্থলবায়ুর গতিচিত্র পাওয়া যাইবে। সমুদ্রোপকূলে দাড়াইলে এই স্থলবায়ু, কাপড, চাদর প্রভৃতি সমুদ্রাভিমুখে উড়াইয়া লইয়া যায়। (৬৯নং চিত্র)।

ভূভাগের নিকট সমুদ্র ভিন্ন বড় হ্রদ বা নদ নদী প্রভৃতি বিস্তীর্ণ জলাশয় থাকিলেও এই একই কারণে সেখানেও এইরূপ বায়ু প্রবাহ হইয়া থাকে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে পথ চলিতে চলিতে তোমরা দেখিয়াছ, বেলা ১০টা বাজিতে না বাজিতেই মাটি এত উত্তপ্ত হয় যে, খালি পায়ে চলিলে পা যেন পুড়িয়া যায়, অথচ পুকুরের জল তখন বিশেষ গরম হয় না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ইহার বিপরীত ব্যাপার দেখা যায়। মাটি তখন ঠাণ্ডা হইয়া আসে, কিন্তু গা ধুইবার জন্য পুকুরে নামিলে জল বেশ গরম লাগে। জল ও স্থল উভয়েই সূর্য কিরণ পাইয়া গরম হয় কিন্তু জল অপেক্ষা স্থল শীঘ্র উত্তপ্ত হয়।

তোমরা খানিকটা মাটি, এক আঁচলা বালি ও এক আঁচলা জল এক একটি পাত্রে লইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দাও। আধঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে,



৬৯নং চিত্র—স্থলবায়ু

মাটি যত গরম হইয়াছে, বালি তদপেক্ষা অধিক গরম হইয়াছে, জল কিন্তু বিশেষ গরম হয় নাই। সাধারণত কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ অপেক্ষা শীঘ্র উত্তপ্ত হয়।

আবার, যে দ্রব্য তাড়াতাড়ি তাপশোষণ করিয়া গরম হয়, তাহা তেমনি তাড়াতাড়ি তাপবিকিরণ করিয়া ঠাণ্ডাও হয়। সুতরাং মাটি জলাপেক্ষা যেমন তাড়াতাড়ি গরম হয়, তেমনই জলাপেক্ষা তাড়াতাড়ি তাপ-ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হয়। পক্ষান্তরে, জল গরম হইতে যেমন বেশী সময় লয়, একবার গরম হইলে ঠাণ্ডা হইতেও উহা তেমনই বেশী সময় লয়। এইজন্য ডাক্তারেরা নিউমোনিয়া রোগীর বুকে তাপ দিবার জন্য রবারের থলি গরম জলে পূর্ণ করিয়া সেক দিতে ব্যবস্থা দেন, বহুক্ষণ ধরিয়া মৃদু তাপ দিবার ইহাই প্রশস্ত উপায়।

জল যে স্থল অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয়, তাহার কারণ কি? প্রথমত বিভিন্ন

পদার্থের তাপ-শোষণ-ক্ষমতা বিভিন্ন। যদি সমান ওজনের বিভিন্ন দ্রব্য সমপরিমাণ তাপে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে উষ্ণ হয়। এক সের জলকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, সেই তাপেই এক সের লোহা প্রায় নয় ডিগ্রী উষ্ণ হয়। দ্বিতীয়ত জল হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহাতেও সূর্যোত্তাপের কিয়দংশ ব্যয়িত হয়। তৃতীয়ত সূর্যকিরণ যে তাপ দিতেছে, তাহার কিয়দংশ জলতল হইতে প্রতিফলিত হইয়া যায়, কিন্তু স্থলে তাহার অতি অল্পাংশই প্রতিফলিত হয়।

সমুদ্রনিকটবর্তী স্থানে গ্রীষ্মকালে যখন স্থলভাগ উত্তপ্ত থাকে, তখন সমুদ্র শীতল এবং শীতকালে স্থলভাগ যখন শীতল, তখন সমুদ্র উষ্ণ থাকে। এইজন্য সমুদ্রনিকটবর্তী স্থান নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ গ্রীষ্মে খুব গরম হয় না, এবং শীতে তত শীতল হয় না। এইজন্য পুরী, ওয়াল্টেয়ার, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানে কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই লোক বায়ু-পরিবর্তনে যাইয়া থাকে।

মাটি অপেক্ষা পাথর শীঘ্র উত্তপ্ত ও শীতল হয় বলিয়া পাথুরে দেশ শীতকালে যেমন ঠাণ্ডা গ্রীষ্মকালে তেমনই গরম।

স্থল ও জল সূর্যকিরণে বিভিন্ন পরিমাণে উত্তপ্ত হওয়ায় যে বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি করে, তাহার বিষয় তোমাদিগকে এইবার বলিব।

পৃথিবীর উপর বায়ু ও তাপের ক্রিয়া

সমুদ্র হইতে সূর্যোত্তাপে বহুলপরিমাণে জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া বাতাসের সাহায্যে স্থলভাগের দিকে চালিত হইয়া ঠাণ্ডা হইলে বৃষ্টিপাত করে। সেই বৃষ্টিতে কত দেশ শস্যশ্যামল ও উর্বর হয়, নদনদী পুষ্ট হয় ও স্থানীয় আবহাওয়া শীতল হয়। বাতাস না থাকিলে বাষ্প চালিত হইত না, যেখান হইতে উঠিত কেবল সেইখানেই বৃষ্টিপাত করিত। পৃথিবীর ভূভাগ বৃষ্টি অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইয়া মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইত।

বায়ুপ্রভাবে সমুদ্র এবং অন্যান্য বিস্তীর্ণ জলাশয়ে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। বায়ু যতই বেগে বহে, তরঙ্গও তত প্রবল হয়। তোমরা নদীর ঢেউ দেখিয়াছ, সুবিধা পাইলে সমুদ্রের ঢেউ কিরূপ বড় হয় দেখিও।

তাপ ও বাতাসের সমবেত ক্রিয়ায় সমুদ্রে এক প্রকার স্রোতের সৃষ্টি হয়, তাহাকে **সমুদ্রস্রোত** (Ocean current) বলে। গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রখর সূর্যকিরণে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হইয়া ফাঁপিয়া উঠে, আবার মেরুপ্রদেশে দারুণ শীতে সমুদ্রজল শীতল ও গুরু হইয়া থাকে। বাতাসের সহযোগে গরম সমুদ্রজল গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে মেরু-প্রদেশের দিকে চালিত হয় এবং মেরুপ্রদেশের শীতল জল সমুদ্রগর্ভ হইতে মেরু-প্রদেশের দিকে চালিত হয় এবং মেরুপ্রদেশের শীতল জল সমুদ্রগর্ভ দিয়া গ্রীষ্ম-মণ্ডলের দিকে আইসে। এই উপরের ও নিচের সমুদ্রস্রোত সাধারণত মন্থর-গতিতে চলিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশ হইতে যে জলস্রোত আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া, ইউরোপের পশ্চিমদিক দিয়া মেরুপ্রদেশের দিকে আইসে তাহা অতিশয় প্রবল। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া যে মৌসুমী বায় মেক্সিকো প্রদেশাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা মেক্সিকো উপসাগরের জলরাশিকে সমধিক উচ্চ করিয়া তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ জল সূর্যের প্রখর কিরণে গরম হইয়া উঠে। এতদুভয় কারণে ঐ জলরাশি আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতর দিয়া সবেগে বহিয়া যায়। তখন এই উচ্চ জলস্রোতকে সমুদ্রমধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি প্রশস্ত নদীরই মত মনে হয়। পার্শ্বস্থ জলরাশি হইতে ইহার স্বাদ, বর্ণ ও উচ্চতা বিভিন্ন।

তাপ ও বায়ু-প্রবাহের ফলে পৃথিবীর ভূভাগেও নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূভাগকে আমরা বৃক্ষলতাদিশোভিত সমতলভূমি, সু-উচ্চ পর্বত-ভূমি ও ঊষর মরুভূমি এই তিন ভাগে মোটামুটি ভাগ করিতে পারি।

সূর্যের তাপে শিলারাশি যখন উত্তপ্ত হয়, তখন ইহার প্রস্তর সমূহ অন্যান্য পদার্থেরই ন্যায় উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, আবার শীতে শীতল ও সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু প্রস্তর উত্তম তাপ-পরিবাহক নহে এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থে গঠিত

বলিয়া ইহার সকল অংশ সমান প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না, ফলে উভয় সময়েই ইহা ফাটিয়া যায়। আবার এই ফাটলের মধ্যে যখন জল প্রবেশ করিয়া শীতে বরফ হয়, তখন জলাপেক্ষা বরফের আয়তনবৃদ্ধি হেতু ফাটল্ আরও বাড়িতে থাকে। এইরূপে পাহাড়ের প্রস্তর খণ্ড ক্রমশ ভাঙ্গিয়া ও খসিয়া নিচে পড়িতে থাকে। কালে প্রস্তরখণ্ড গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া বালুকণায় পরিণত হয়। ইহার কতকাংশ মাটির সহিত মিশিয়া যায়, কতকাংশ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া অন্যস্থানে নীত হয়।

বৃক্ষলতাবহুল সমতলভূমিতে এরূপ ভাবে ভাঙ্গন হয় না। বৃষ্টির জন্য এখানকার ভূমি ন্যূনাধিক আর্দ্র থাকে এবং গাছপালায় ভূমি আবৃত থাকে। এইজন্য বাতাসে ইহার ধূলিকণা সহজে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু বায়ু যখন ঝড়ের আকারে জোরে বহিতে থাকে, তখন ইহা গাছপালা উপড়াইয়া, ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া ও ধুলি উড়াইয়া ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত প্রলয় কাণ্ড করিয়া থাকে।

উন্মুক্ত মরুভূমিতে ঝড় উঠিলেই বৃক্ষলতাদির অভাবে প্রভূত বালুকণা একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। এইরূপে মরুভূমির মধ্যে এবং তাহার নিকটবর্তী স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালির পাহাড় জমিতে দেখা যায়। কখনও কখনও মরুভূমি বা সমুদ্রতীর হইতে বাহিত বালুকণা শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পড়িয়া তাহাকে মরুভূমিতে পরিণত করে। আবার কখনও বা এই বালুরাশি প্রবল ঝড়ের দ্বারা বাহিত হইয়া পর্বতগাত্রে প্রতিহত এবং উভয়ের সংঘর্ষণে পাহাড়েরও ক্রমশ ক্ষয় হইতে থাকে।

বাহিরের তাপের দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে যেরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা দেখিলে। আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপের দ্বারাও ভূস্তরে নানা পরিবর্তন সাধিত হয়। পাণ্ডতেরা বলেন যে, পৃথিবী তাহার জন্মসময়ে একটি জলন্ত বাষ্প-গোলকের আকারে ছিল। ক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়া উহার উপরিভাগ শীতল ও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্তই রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠের কঠিন আবরণের চাপে ইহার অভ্যন্তরে সকল পদার্থই তরল অবস্থায় আছে।

উপব হইতে নিচে পর্যন্ত কোনরূপ পথ পাইলেই গলিত ধাতবপদার্থ, কর্দম ইত্যাদি নির্গত হয়। আগ্নেযগিরিব অগ্ন্যুৎপাতেব সময গলিত ধাতবপদার্থাদি প্রবলবেগে নির্গত হইযা থাকে। কখনও বা গলিত-ধাতু-প্রবাহ পর্বতগাত্র বাহিযা নামিযা আসিয়া গ্রামেব পব গ্রাম ধ্বংস কবিযা ফেলে। আবাব সমষ সময় ভূগর্ভস্থ এই গলিত পদার্থ উপবে আসিবাব পথ না পাইলে প্রবলবেগে আলোড়িত হইযা ভূতল কম্পিত কবে, ভূকম্পনেব ইহা অন্যতম কাবণ। ইহা দ্বাবাও ভূপৃষ্ঠেব কত আকস্মিক পবিবর্তন হয, কত স্থানে সমুদ্রগর্ভ উন্নত হইযা উচ্চ স্থলভূমিতে পবিণত হয, আবাব কোথাও পর্বত বসিযা গিযা সমুদ্রেব সৃষ্টি কবে। এই সকল বিষয় ভূ-তত্ত্বে পড়িবে।

সংক্ষেপ ঃ—পদার্থেব অণুগুলিব স্পন্দনেব বেগেব উপব ইহাব উষ্ণতা নির্ভব কবে। তাপ প্রযোগ করিলে পদার্থেব আযতন বৃদ্ধি পায, উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘটে ও অবস্থান্তর ঘটিতে পাবে। বিভিন্ন পবিমাণে উষ্ণ দুইটি পদার্থ যোগ কবিযা দিলে যতক্ষণ না দুইটি বস্তু একই উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ অধিকতর উষ্ণপদার্থ হইতে কম উষ্ণ পদার্থে তাপ চলিতে থাকে। তাপ ও উষ্ণতা একার্থ-বোধক নহে। তাপেব ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। উষ্ণতা কম বা বেশী স্পর্শশক্তি দ্বারা সকল সময় ধরা যায না বলিয়া থার্মমিটাব সাহায্যে উহাব পবিমাণ জানিতে হয। থার্মমিটার বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ভাবে গঠিত—উহাদের উষ্ণতাজ্ঞাপক অঙ্কগুলি তিন প্রকারের, তন্মধ্যে সেন্টিগ্রেড্ ও ফারেনহিট মত অধিক প্রচলিত। পবিবহন পবিচলন, এবং বিকিরণ এই তিন প্রকার উপাযে তাপ চলাচল করে। সকল পদার্থের তাপ পবিবাহিতা সমান নয। তাই শীতকালে একই অবস্থায় রক্ষিত ধাতব পদার্থ অপেক্ষা তুলা, কাঠ নির্মিত পদার্থগুলি উষ্ণতর বলিযা মনে হয়।

সূর্যোত্তাপে প্রতিনিযত জলাশয় হইতে বাষ্পীভবন হইতেছে এবং শীতলতা পাইয়া ঐ বাষ্প আবার ঘনীভূত হইযা মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। বায়ু উষ্ণ হইলে ইহার জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোন স্থানে কত পরিমাণ বৃষ্টি হয তাহা বৃষ্টিমান যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। বায়ুর উপর তাপের ক্রিয়ার ফলে বায়ু প্রবাহ হয়। এই বায়ু প্রবাহ বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল পদার্থ সহজে গরম হয তাহারা সহজে ঠাণ্ডা হয—এবং যাহারা সহজে গরম হয় না তাহারা সহজে ঠাণ্ডাও হয না। ধাতব পদার্থ ও জল উক্ত দুই প্রকার পদার্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভূপৃষ্ঠে তাপের ক্রিযার ফলে বহু পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

চতুর্থ প্রশ্নমালা

১। তাপে পদার্থের নিম্নলিখিত গুণের কি কি পরিবর্তন হয় লিখ :—আয়তন, ওজন, । ও ঘনত্ব। (When heat is applied to a matter, what happens regarding the following —Volume, weight, temperature and density ?)

২। তাপ ও উষ্ণতা কি একার্থ-বোধক ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাও। (Do heat and temperature bear the same meaning ? Explain with examples)

৩। স্পর্শ-শক্তি দ্বারা বস্তুর উষ্ণতামাপ কি নির্ভুল হয ? (Does sense of touch correctly measure heat ?

৪। থার্মমিটার বর্ণনা কর। এই যন্ত্রে পারাদর পরিবর্তে জল ব্যবহার করিলে কি অসুবিধা হয় ? এই যন্ত্রকে তাপমান-যন্ত্র বলিলে কি ভুল হয ? (Describe a thermometer What will the disadvantages if water is substituted for mercury ? What mistake will be there if it is called a calorimeter ?)

৫। জ্বর দেখিতে যে থার্মমিটার ব্যবহার হয়, তাহার বিশেষত্ব কি ? সুস্থ মানবদেহের সাধারণ উষ্ণতা কত ? ইহাকে সেন্টিগ্রেড্ মতে প্রকাশ কর। (What is the speciality of a clinical thermometer ? What is the normal temperature of a human body ? Express in the Fahrenheit scale)

৬। ভূপৃষ্ঠে দিনরাত্রির মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বায়ুর উষ্ণতা কিরূপে নির্ণয় করা যায় ? (How the maximum and minimum temperature of the atmosphere is determined ?)

৭। তাপ কি কি প্রকারে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যায় তাহা উদাহরণ সমেত বুঝাও। একটি কাঁসার বাটিতে গরম দুগ্ধ ঢালিয়া বাটিটি মেঝের উপর রাখা হইল, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে, উহা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। তাপ কি কি উপায়ে উহা হইতে বাহির হইল বুঝাও। (Explain the different modes of transmission of heat A cup containing a quantity of hot milk was found to be cooled when kept on the floor Explain in how many ways heat was dissipated)

৮। তাপ সুপরিবাহী কয়েকটি বস্তুর নাম কর। তরল পদার্থ তাপ-পরিবাহক কি না,

কিরূপে পরীক্ষা করিবে ? (Name some good conductors of heat How could you test whether a liquid is a conductor of heat or not)

৯। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির কারণ নির্দেশ কর :—

(ক) শিশিতে কাচের ছিপি আঁটিয়া গেলে শিশির গলার উপর একটু গরম জল ঢালিয়া ছিপি খোলা হইল।

(খ) পুরুতলা-বিশিষ্ট একটি কাচের গ্লাসে গরম চা ঢালিলে গ্লাসের তলা ফাটিয়া যাইতে দেখা গেল।

(গ) গরম চা এনামেলের কাপ অপেক্ষা চীনা মাটির কাপে খাইতে সুবিধা।

(ঘ) বরফ রাখিতে হইলে তাহা কাঠের গুঁড়ার ভিতর রাখিয়া কম্বল জড়াইয়া দেওয়া হয়।

(ঙ) শরীর ঘর্মাক্ত হইলে পাখার বাতাসে বসিলে আরাম হয়।

(চ) জ্বর-রোগীর গায়ের উষ্ণতা অত্যধিক হইলে কপালে জলপটী দেওয়া হয়। আবার রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে বোতলে গরম জল পুরিয়া হাতে ও পায়ে সেক দেওয়া হয়।

(ছ) একটি গ্লাসের জলে বরফ ফেলিয়া দিলে গ্লাসের গায়ে জলবিন্দু দেখা যায়।

(জ) শীতকালে হাই তুলিলে মুখের কাছে ধোঁয়ার মত দেখা যায়।

(State reasons of the following cases —(a) A tight glass cork of a bottle is taken out after pouring some hot water on the mouth of the bottle (b) The thick bottom of a glass pot was found cracked when hot water was put in it (c) It is convenient to drink hot tea in a China clay pot than in an enamel cup (d) To preserve ice it is packed with saw dust and a blanket is wrapped round it (e) We feel comfortable when we sit under a fan after being perspired (f) When temperature rises a wet piece of cloth is put on the forehead of a patient but hot water bottle is applied on the palms of hands and feet of a collapsing patient (g) Water particles are found on the outside wall of a glass when a piece of ice is put inside it (h) In the winter we find a cloudy substance in front of our mouth when we yawn

১০। শীত ও গ্রীষ্মভেদে আমাদের পোষাকের রঙের কিরূপ পার্থক্য থাকা উচিত এবং কেন ?

(What should be the colour of our dresses in summer and in the winter and why ?)

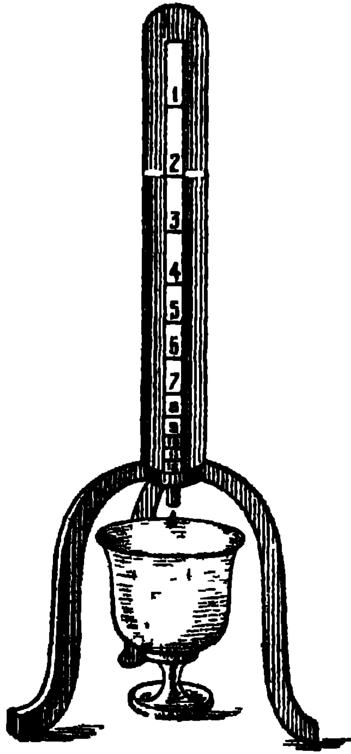
১১। গ্রীষ্মকালে বিষুবরেখার নিকটবর্তী ভূভাগ, নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয় কেন? ইহার জন্য যে যে বায়ুপ্রবাহ হইয়া থাকে, তাহাদের পরিচয় দাও। (Why the equatorial region is hotter than the temperate zones in the summer ? Describe the different kinds of winds caused by the same reason.)

১২। 'শিশির আকাশ হইতে পড়ে" এই বাক্যটি কি বিজ্ঞান-সম্মত? কোন্ কোন অবস্থায় শিশির যথেষ্ট পরিমাণে জমে। ('The dew-drops fall from the sky' is this scientifically true ? under what circumstances dew-drops are deposited in large quantities ?)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দোলক বিশিষ্ট ঘড়ি

বহু পূর্বে যখন আমাদের দেশে ঘড়ির প্রচলন হয় নাই তখন আকাশে সূর্যের অবস্থান, অথবা সূর্য কিরণে কোন জিনিসের ছায়ার দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া সময় নির্ণয় করা হইত। কিন্তু মেঘলা দিনে সূর্যের ছায়া পাওয়া যায় না— অতএব সময় নির্ধারণের অসুবিধা হইত। তাহা ছাড়া আরও অনেক অসুবিধা ছিল। কাজেই সূর্য সাহায্যে সময় নির্ধারণ সকল সময়ে সুবিধামত ঘটিয়া উঠিত না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত **জল ঘড়ি** (Water clock) নির্মাণ করা হয়। একটি বড় পাত্রে জল রাখিয়া তাহার তলদেশে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করা হইত। পাত্রটিতে দাগ কাটা থাকিত। ছিদ্র পথ দিয়া জল বাহির হইয়া গেলে বড় পাত্রের জল তলের অবস্থান দেখিয়া সময় কত অতিবাহিত হইয়াছে ঠিক করা হইত। কিন্তু ইহাতেও ছিদ্রের আয়তন পাত্রের আয়তন প্রভৃতি লইয়া বড় অসুবিধা উপস্থিত হইল। কাজেই আরও উন্নত প্রণালীর সময় জ্ঞাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি চালিত করিতে হইল। বর্তমান ঘড়ি সেই প্রচেষ্টার একটি সুফল সন্দেহ নাই। ঠিক এই সময়ে একদিন গির্জায় যাইবার সময় অনবধানতা বশত ইটালির খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক



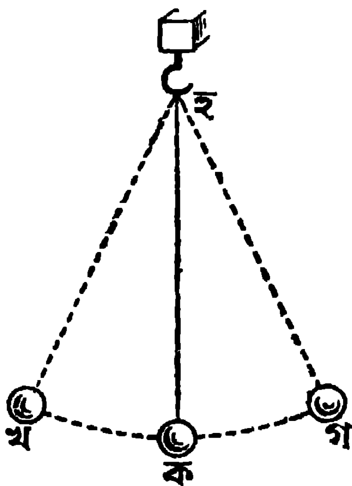
১০নং চিত্র—জলঘড়ি

গ্যালিলিওর মাথায় গির্জার সম্মুখে দোদুল্যমান লণ্ঠনটি লাগিয়া যাওয়ায় তিনিও কেমন একটু ঔৎসুক্য বশত ইহার দোলনের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ফলে মনে করিলেন, লণ্ঠনটি যত জোরেই দুলুক না কেন বা যতই আস্তে দুলুক না কেন, ইহার একটি সম্পূর্ণ দোলন কাল সব সময়ে একই রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের নাড়ি টিপিয়া এবং লণ্ঠনের দোলন গণনা করিয়া জানিলেন তাঁহার এ ধারণা ভুল নহে। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া গবেষণার ফলে বর্তমান দোলক-বিশিষ্ট ঘড়ির



৭১নং চিত্র—গ্যালিলিও

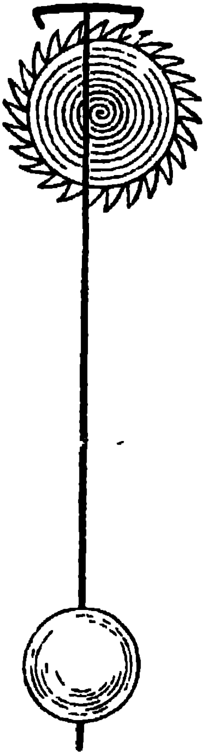
প্রচলন সম্ভব হইয়াছে। এই সকল ঘড়ির দোলকগুলি ধাতু নির্মিত, এবং সূক্ষ্ম ধাতু দণ্ডের সাহায্যে উপরের একটি বিন্দু হইতে বিলম্বিত থাকে।



৭২নং চিত্র—দোলক

তোমরাও একটি ছোট কাঠ বা ধাতু খণ্ডকে সূতায় ঝুলাইয়া দোলক প্রস্তুত করিতে পার। ৭২নং চিত্রে **ক** দোলকটি **হ** বিন্দু হইতে একটি সূক্ষ্ম সূতায় ঝুলান রহিয়াছে। দোলকটি যদি এক দিকে সরাইয়া ছাড়িয়া দাও, তবে দেখিবে যে ইহা **ক** বিন্দুর দুই দিকে দুলিতেছে। **ক** হইতে **খ** এবং **খ** হইতে **গ** হইয়া পুনরায় **ক** এ ফিরিয়া আসিতে দোলক যে সময় লয় তাহাকে উহার **দোলনকাল** (Period) বলে। **হ** হইতে দোলকের ভর-কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্বকে ঐ দোলকযন্ত্রের

দৈর্ঘ্য (Length) কহে এবং **ক হ খ** কোণ বা **ক হ গ** কোণ উহার **বিস্তার** (Amplitude)। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বিস্তার কম অর্থাৎ ৪° ডিগ্রীর অনধিক হইলে দোলকযন্ত্রের দৈর্ঘ্য সমান রাখিয়া দোলকটিকে দোলাইলে ইহার দোলনকাল একই থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে ২০।২৫টি দোলনের মোট সময় ঘড়ির সাহায্যে জানিয়া তাহা হইতে একটি দোলনের সময় বাহির করাই সমীচীন। আরও দেখ, দোলক-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিলে দোলনকালও দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইবে, তজ্জন্য এইরূপ দোলক-যন্ত্র-বিশিষ্ট ঘড়ি 'শ্লো' বা 'ফাষ্ট' যাইবে। অতএব দোলক-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য যতক্ষণ সমান থাকে, ততক্ষণ ঘড়িও ঠিক সময় রাখিয়া চলে, কিন্তু কোনও কারণে যদি তাহা না হয়, তবে ঘড়ি ধীরে বা দ্রুত চলিতে থাকে।



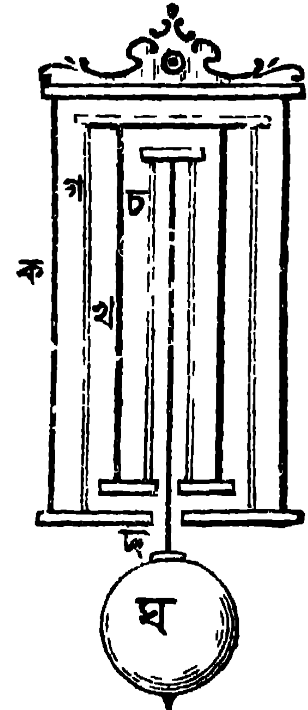
৭৩ নং চিত্র—ঘড়ির দোলক

ঘড়িতে দোলক দণ্ডের উপরদিকে দুইটি দাঁত বিশিষ্ট সরু ও ঈষৎ বক্র আর একটি দণ্ড লাগান আছে। দোলকের দোলনের সঙ্গে সঙ্গে উহার একমুখ উঠিতে ও পড়িতে থাকে এবং একটি দাঁতওয়ালা চাকার দাঁতের উপর খেলিতে থাকে (৭৩নং চিত্র)। দাঁতওয়ালা চাকাটি দম দেওয়া স্প্রিংএর সহিত সংযুক্ত বলিয়া নিয়ত ঘুরিয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু বক্রদণ্ডের প্রান্তের উঠা নামার সহিত ইহা কেবল একদাঁত একদাঁত করিয়া নিয়মিত ভাবে ঘুরিতে পারে। পরে এই চাকাটির ঘূর্ণন আরও কতকগুলি চাকার সাহায্যে ঘড়ির কাঁটাকে ঘুরাইয়া থাকে।

দোলক-যন্ত্রের প্রসারণ ও তাহার প্রতিকার :—উপরে বলা হইয়াছে যে দোলক-যন্ত্রের দৈর্ঘ্য যতক্ষণ ঠিক থাকে, ততক্ষণ ঘড়িও ঠিক সময় রাখে।

তোমরা জান তাপে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। এইজন্য গ্রীষ্মকালে সাধারণ ঘড়ির ধাতব দোলকদণ্ডের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া যায়; ফলে ঘড়ি কিছু ধীরে (slow) চলে। শীতকালে আবার ঠিক ইহার বিপরীত হয়; শৈত্যে সঙ্কোচের জন্য দোলকদণ্ডের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায় বলিয়া ঘড়ি দ্রুত (fast) চলে। অতএব ঘড়ি যাহাতে ঠিক সময় রাখে, সেজন্য গ্রীষ্মকালে দোলকটি দণ্ডের উপরে একটু তুলিয়া দিতে হয় এবং শীতকালে নামাইয়া দিতে হয়। যাহাতে ঋতুভেদে দোলকযন্ত্রের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য না হয়, তজ্জন্য ভাল ঘড়ির দোলকযন্ত্র একটু ভিন্ন রকমে গঠিত হয়। তোমাদিগকে এখন এই প্রকার সংশোধিত দোলক-যন্ত্রের কথা বলিব।

তোমরা জান তাপে সকল ধাতু সমান প্রসারিত হয় না। সমান দৈর্ঘ্যের লৌহদণ্ড ও পিত্তলদণ্ডের উষ্ণতা সমপরিমাণে বাড়াইলে পিত্তলদণ্ড লৌহদণ্ড অপেক্ষা অধিক বর্ধিত হয়। এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া ভাল ঘড়ির দোলক-যন্ত্র গঠিত হয়। এখানে এইরূপ একটি দোলকযন্ত্রের চিত্র প্রদর্শিত হইল (৭৪নং চিত্র)। ইহার মধ্যে **দ** এবং এক এক পার্শ্বে **ক, খ**এর মত দুইটি লৌহদণ্ড এবং **গ** ও **চ**এর মত দুইটি পিত্তলদণ্ড, ইহাদিগকে ঝাঁজরীর মত করিয়া এমনভাবে সাজান হয় যে, লৌহদণ্ডগুলি নিম্নদিকে এবং পিত্তলদণ্ডগুলি উপর দিকে বাড়িতে পারে। লৌহ ও পিত্তলের দণ্ডগুলির দৈর্ঘ্য এরূপভাবে লওয়া হয় যে, লৌহদণ্ডগুলি প্রসারিত হইয়া দোলকটিকে যে পরিমাণ নামাইয়া দেয়, পিত্তলদণ্ড গুলি প্রসারিত হইয়া গোলককে ঠিক সেই পরিমাণে উপরে তুলে, ফলে দোলকের দৈর্ঘ্য সমান থাকে। কাজেই দোলকটির দোলনকাল বাড়েও না, কমেও না। এইরূপ দোলক-যন্ত্রযুক্ত ঘড়ি শীত গ্রীষ্মে ঠিক সময় দিয়া থাকে।



৭৪নং চিত্র—সংশোধিত দোলক

সংক্ষেপ ঃ—জল ঘড়ির ছিদ্র ছোট বড হইলে সময়েব পার্থক্য হইযা যায। সকল সময় সূর্য কিরণে কোন পদার্থের ছায়া দেখিযা সময নির্ণয় কবাও সম্ভবপর নয়। গ্যালিলিও দোলক যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া দোলক যন্ত্রবিশিষ্ট ঘড়ি নির্মাণ করিবার সুবিধা কবিযা দিয়াছেন। দোলন কাল, বিস্তাব এবং দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা একটি নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ঘড়িব দোলক দীর্ঘ হইলে ঘড়ি মন্থব হয় এবং দোলক সঙ্কুচিত হইলে ঘড়ি দ্রুত চলে। শীত এবং তাপে দোলকযন্ত্র বিস্তার লাভ করে বলিয়া প্রতিবিহিত দোলক যন্ত্র নির্মিত হইযাছে।

পঞ্চম প্রশ্নমালা

১। জল ঘড়িতে কি অসুবিধা ছিল? (What were the inconveniences of a water clock?)

২। দোলক যন্ত্রের দৈর্ঘ্য এবং দোলন কালেব সম্বন্ধটি কি বল এবং কিরূপে উহা প্রমাণ কবা যায় লিখ। (State the laws of pendulum regarding its length and period and how it can be proved.)

৩। সংজ্ঞা দাও:—দোলকের দোলনকাল, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার।

(Define—Period, length and amplitude of a pendulum)

৪। দোলক-যন্ত্র-বিশিষ্ট ঘড়ি গ্রীষ্ম ও শীত ভেদে 'স্লো' ফাষ্ট' হয কেন এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য ভাল ঘড়িতে কি বন্দোবস্ত কবা হয? (Why does a pendulum clock go slow in summer and fast in winter and what arrangements may be made for their remedy?)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শক্তি ও তাহার রূপান্তর

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে লক্ষকোটি গ্রহ, উপগ্রহ—তাহারা যথাক্রমে এক একটি বৃহত্তর জ্যোতিষ্কের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া কাজ করিতেছে। রেলগাড়ী ছুটিতেছে, এরোপ্লেন উড়িতেছে, ইহারা সকলেই কাজ করিতেছে—আবার তোমরা যখন হাঁট, খাও, বস, তখনও তোমরা কাজ কর। অনেক সময় দেখা যায় কোন পদার্থ বর্তমানে কাজ না করিলেও কালে তাহারা কাজ করিতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় ইহাদের পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহাদের প্রভাবে জগতে সকল কাজ সাধিত হইতেছে, ইহার নাম **শক্তি** (Energy)। পদার্থ মাত্রই শক্তির আশ্রয়; যাহারা কাজ করিতেছে তাহারা তো শক্তির সাহায্যে কাজ করিতেছে, কিন্তু যাহারা কাজ করিতেছে না তাহাদেরও শক্তি আছে—যাহা দ্বারা পরে ইহারা কাজ করিতে পারিবে। কাজ করিতে হইলেই পদার্থটিকে নড়িতে হইবে অথবা অন্য পদার্থকে নড়াইতে হইবে। তাহা হইলে গতি ও স্থিতি লইয়া যখন জগতের সকল কার্যের সম্বন্ধ তখন উহারা শক্তির প্রধান দুইটি রূপ।

এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাদিগের অস্তিত্ব আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না, পরোক্ষভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। তেমনই সকল শক্তি সকল সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু তাহাদের প্রভাব অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। উত্তাপ আমরা চোখে দেখিতে পাই না, হাতে ধরিতে পারি না, কানে শুনিতে পাই না বটে, কিন্তু উত্তপ্ত বস্তুতে হাত দিলে আমরা ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। শব্দ কানে শুনিতে পাই, আলো চোখে দেখিতে পাই। বিদ্যুতের প্রবাহে আমরা পেশী সমূহের সঙ্কোচন জনিত বেদনা অনুভব করিতে পারি, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির প্রভাব আমরা চোখে দেখিতে পাই। কোনও বস্তুকে উপরে তুলিয়া ধরিয়া থাকিলে তাহার কোন

শক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না—অথচ ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া যায়—ইহাতেও সে কাজ করে; অতএব ইহারও শক্তি নিশ্চয় ছিল, নতুবা ইহা কাজ করে কেমন করিয়া? উত্তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ, চুম্বকের আকর্ষণ প্রভৃতি সকলেই এক একটি শক্তি। চলন্ত পদার্থের যে শক্তি তাহা **গতি** (Kinetic) শক্তি এবং স্থির পদার্থের যে শক্তি থাকে তাহা **স্থৈতিক** (Potential) শক্তি নামে অভিহিত। এই দুইটি শক্তি **যান্ত্রিক** (Mechanical) শক্তি, কারণ যন্ত্রের কার্য করিবার সময় উহাতে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত দুইটি শক্তির প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, সকল প্রকার শক্তিই, হয় গতিশক্তি নতুবা স্থৈতিক শক্তির প্রভাবেই উদ্ভূত। রাসায়নিক শক্তির ফলে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ইহা পরে বুঝাইতেছি।

তাহা হইলে আমরা নিম্নলিখিত কয় প্রকারের শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি:—(১) **যান্ত্রিক**—স্থৈতিক ও গতি, (২) **তাপ**, (৩) **আলো**, (৪) **শব্দ**, (৫) **বিদ্যুৎ**, (৬) **চুম্বক**, (৭) **রাসায়নিক**।

মানুষের পৈশীক শক্তির দ্বারাও বহু কার্য সাধিত হয়।

যান্ত্রিক শক্তি—উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘড়ির যন্ত্রের কথা বলা যাউক। আমাদের পৈশীক শক্তির বলে ঘড়ির চাবি ঘুরাইয়া দম দিলে ইহার কলকব্জার স্থৈতিক শক্তি পরিবর্তিত হইয়া গতি শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং ঘড়ির কাঁটাকে চালাইয়া দেয়। এইরূপ বহু যান্ত্রিক শক্তিই পরিবর্তিত হইয়া ক্রমে গতি, স্থৈতিক এবং অন্যপ্রকার শক্তিতে পরিণত হয়। উঁচুতে একটি ভারী জিনিস তুলিয়া ধরিলে মনে হয় ভারী জিনিসটি যেন কিছুই করিতে পারে না—স্থিরভাবে থাকে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে উহা গতি শক্তি প্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং মাটির সহিত ঘর্ষিত হইয়া উত্তাপ ও শব্দ শক্তিতেও পরিণত হয়। যান্ত্রিক শক্তির বহুবিধ কাজ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই।

তাপ শক্তি—কাঠ জ্বালাইয়া, কয়লা পুড়াইয়া আমরা তাপ শক্তি পাই এবং ইহার প্রভাবে আমরা ভাত তরকারি রাঁধি, জল গরম করি, ইঞ্জিন চালাই

ইহা পূর্বেই জানিয়াছ। কিন্তু মনে রাখিও কাঠ বা কয়লা হইতে রাসায়নিক শক্তিবলে তাপশক্তি জন্মাইযাছে; অবশ্য ইহাও ঠিক যে রাসায়নিক শক্তিই পরিবর্তিত হইয়া তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। গতিশক্তিবলে ঘর্ষণ জনিত তাপের উদ্ভব আমরা বহু ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। পূর্বে তোমরা দেখিয়াছ উত্তাপ পাইলে পদার্থের অণুগুলির কম্পন বাড়িয়া যায়—অর্থাৎ অণুগুলি গতিশক্তি সম্পন্ন হয়।

আলোক শক্তি—অতীন্দ্রিয় পদার্থ ঈথারের তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে আঘাত করিলে আলোক শক্তির উন্মেষ অনুভূত হয। এখানেও তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ঈথারের গতিশক্তির প্রভাবে আলোক শক্তির সৃষ্টি। যান্ত্রিক শক্তি বা তাপ শক্তির কাযগুলি আমাদের কাছে যত পরিচিত আলোক শক্তির কাজ আমাদের নিকট তত পরিচিত নয। কিন্তু ফটোগ্রাফিতে আলোক শক্তির কাজের পরিচয পাই।

শব্দ শক্তি—কর্ণপটহে বায়ু-তরঙ্গের আঘাতে শব্দশক্তির অনুভূতি পাই। এক্ষেত্রেও বায়ুর গতিশক্তি হইতে শব্দ শক্তির জন্ম। আবার বিপরীত দিক হইতে ধরিলে দেখা যায় কোন প্রকারে উত্থিত শব্দশক্তি হইতে বায়ুতে যে তরঙ্গ উঠে তাহার বলে অনেক কার্য হয়। জোরে শব্দ হইলে জানালা কপাট কাঁপিয়া উঠিতে দেখা যায এবং আমাদের কর্ণপটহ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে—এমন কি মানুষ চির বধির হইতে পারে।

চুম্বক, তড়িৎ, রাসায়নিক প্রভৃতি শক্তি কিরূপে উদ্ভূত হয এখন তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, এক একটি শক্তি রূপান্তরিত হইযা অন্যরূপে দেখা দেয, বস্তুতঃ শক্তির বিনাশ নাই।

যখন আমরা ঢিল ছুঁড়ি তখন আমাদের পেশীর শক্তি ঢিলের স্থৈতিক শক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া গতি শক্তিতে পরিণত করে। পাথরের উপর পাথর ঘসিলে আমাদের পেশীর শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া তাপশক্তিতে পরিণত হয, শব্দ শক্তিতেও পরিণত হয়। এইরূপ জগতে প্রত্যেক কার্যের পিছনে এক বা একাধিক শক্তির

রূপান্তর ঘটিতেছে, পূর্ববর্তী উদাহরণ গুলিতে তাহা লক্ষ্য করিয়াছ। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে সকল শক্তির মোট পরিমাণ আবহমান কাল স্থির আছে, তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নাই এবং কেহ ঘটাইতে পারিবে না।

শক্তি এবং পদার্থের প্রধান পার্থক্য এই যে পদার্থের ওজন আছে, শক্তির ওজন নাই, পদার্থের বিস্তৃতি আছে শক্তির বিস্তৃতি নাই, পদার্থের অভেদ্যতা আছে শক্তির অভেদ্যতা নাই।

মনে রাখিও কোন পদার্থের উপর যত কাজ করা হইবে—সেই পদার্থটি ততটুকু কাজ করিবার শক্তি সঞ্চিত করিবে এবং সুযোগ পাইলে ঠিক ততটুকু কাজ করিয়া সে শক্তিটুকু রূপান্তরিত করিয়া ফেলিবে।

মনে কর একটি ভারী বস্তু উপরে তুলিয়া ধরা হইল। পৃথিবীর মহাকর্ষের বিরুদ্ধে পদার্থটির উপর কিছু কার্য করা হইল। ইহাতে বস্তুটি কিছু শক্তি সঞ্চয় করিল। এইবার যদি বস্তুটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে সে ঐ শক্তিবলে নিচে পড়িয়া যাইবে।

পৃথিবীতে সকল প্রকার তাপের প্রধান উৎস যে সূর্য ইহা আমরা প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবেই বুঝিতে পারি। কারণ আপাত দৃষ্টিতে যখন দেখি কাঠ বা কয়লাই যেন তাপের প্রধান উৎস, তখন ইহাও আমরা বুঝিয়া লইতে পারি যে এই কয়লাও এক সময়ে কাঠ ছিল এবং বৃক্ষ হইতে কাঠ পাওয়া গিয়াছিল। সূর্যোত্তাপে বায়ুমণ্ডলের কার্বন আত্মকরণ করিয়াই বৃক্ষগুলি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক সূর্যোত্তাপের অভাবে বর্ত্তমান সভ্য যুগের অতি প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস কাঠ বা কয়লার জন্ম সম্ভব হইত না। কাজেই রান্না, এঞ্জিন বা কল কারখানা চালনা, আলোজ্বালা প্রভৃতি কার্যই অসম্ভব হইয়া পড়িত, আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সূর্যোত্তাপের অভাবে গাছ পালা না জন্মাইলে জীবগণের আহার জুটিত না, তাহাদের কলেবর পুষ্ট হইত না, পৈশীক শক্তিও জন্মাইত না। সূর্যোত্তাপের অভাবে নদীতে জোয়ার ভাঁটা হইত না, স্রোত

বহিত না, মেঘ বৃষ্টি হইত না এমন কি বায়ু বহিত না। তাহা হইলে সকল শক্তিব প্রধান উৎস তাপ শক্তি এবং তাহাব আধাব সূর্য।

সংক্ষেপ :—কাযক্ষমতাই শক্তি। শক্তিহীন পদার্থ হইতে পারে না, আবার পদার্থ ছাড়া শক্তি থাকিতে পাবে না। শক্তির ওজন নাই, বিস্তৃতি নাই, অভেদ্যতা নাই, শক্তি বিভিন্ন প্রকাবের হইলেও এক প্রকার শক্তি রূপান্তরিত হইযা অন্য প্রকার হইতে পারে। সকল শক্তির মূল উৎস সূর্য।

ষষ্ঠ প্রশ্নমালা

১। বিভিন্ন প্রকাব শক্তিব নাম কব ও তাহাদের সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে লিখ। (Name some of the energies and state what do you know of them ?)

২। এক শক্তি রূপান্তরিত হইযা অন্য শক্তিতে পরিণত হয, উদাহবণ দিযা বুঝাইযা দাও। (Explain the transformation of energy)

৩। শক্তি ও পদার্থের পার্থক্য কি ? (Distinguish between matter and energy ?)

৪। একটি ঢিল নিক্ষিপ্ত হইবাব পর মাটিতে পড়া পযন্ত কি কি শক্তির প্রভাব বুঝা যায লিখ। (Influence of how many kinds of energies may be found when a stone is thrown away, till it comes down to the ground)

৫। সকল শক্তিব মূল উৎস সূর্য, প্রমাণ কব। (Prove that the sun is the source of all energies)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আলোক

আলো ও ছায়া, আলোর গতি

আলোক এক প্রকার শক্তি। অন্ধকারময় স্থানে যেখানে কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না আলো জ্বালিলে সে স্থানের প্রায় সকল পদার্থই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা স্থির হইয়াছে যে আলো জ্বালিলে ইহার পার্শ্ববর্তী ঈথারে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং সেই তরঙ্গ আমাদের চোখের পিছনে যে পর্দা আছে তাহাতে প্রতিভাত হইলে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কোন পদার্থের আলো কোন পদার্থে পড়িলে তবে আমরা দেখিতে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, অথচ এই আলো যখন শূন্য দিয়া যায় সে স্থানে যদি ধূলি কণা বা অন্য কোন পদার্থের কণা না থাকে তবে এই আলোর অস্তিত্ব মোটেই উপলব্ধি করিতে পারি না। জানালার ফাঁক দিয়া আলোর রশ্মি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় ঐ আলোকে উদ্ভাসিত কত ধূলিকণা ইতস্তত নড়িতেছে। আলোকের পথে যদি ধূলিকণা না থাকিত তবে আলো আছে বলিয়া বুঝা যাইত না, অথচ সেই আলো মেঝেতে পড়িলে মেঝে আলোকিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

আলোর সম্মুখে পদার্থ আনিলে দেখা যায় কতকগুলির ভিতর দিয়া আলো প্রায় অবাধে চলিয়া যায়—তাহাদিগকে আমরা **স্বচ্ছ** (Transparent) পদার্থ বলি, যথা—কাচ, বায়ু, অভ্র, জল ইত্যাদি, আবার কতকগুলির ভিতর দিয়া আলোর কিয়দংশ যাইতে পারে তাহাদিগকে **ঈষদচ্ছ** (Translucent) বলি, যেমন—ঘসা-কাচ, তেলে-কাগজ ইত্যাদি, এবং যে পদার্থ গুলির মধ্য দিয়া আলো প্রায় যাতায়াত করিতে পারে না তাহাদিগকে **অসচ্ছ** (Opaque) বলা হয়, যথা—কাঠ, ইট, পাথর, চামড়া, লোহা ইত্যাদি। অবশ্য ইহাও সত্য যে সকল পদার্থই এমন কি অতি স্বচ্ছ পদার্থও যদি পুরু করিয়া রাখা হয়

তবে তাহার ভিতর দিয়া আলোক যাইতে বাধা পাইবেই, আবার তেমনই অস্বচ্ছ পদার্থকে পাতলা করিয়া রাখিয়া তাহাতে আলোক প্রবেশ করাইলে তাহার ভিতর দিয়া অল্প আলো যাইলেও যাইতে পারে। **রঞ্জন** (Rontzen) সাহেবের আবিষ্কৃত আলোক কাষ্ঠ বা চর্ম ভেদ করিয়া যাইতে পারে।

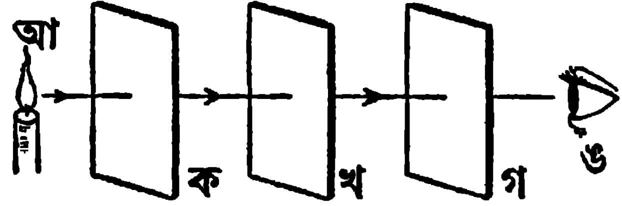
অস্বচ্ছ পদার্থের নিকট আলো থাকিলে ইহার ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে না বলিয়া আলোর বিপরীত দিকে খানিকটা অন্ধকার অস্বচ্ছ পদার্থের মূর্তিরূপে দেখা যায়। ঐ অন্ধকারময় স্থানকে উক্ত অস্বচ্ছ পদার্থের **ছায়া** (Shadow) বলা হয়। আলো যত তীব্র হয় ছায়া তত কম অন্ধকার হয় এবং আলোকের সম্মুখস্থ পদার্থ যত অস্বচ্ছ এবং পুরু হয় ছায়াও তত অধিকতর অন্ধকারময় হয়। একটি অস্বচ্ছ পদার্থের সামনে একটি আলো রাখিলে যেরূপ গাঢ় অন্ধকারময় ছায়া পড়ে, দুইটি আলো জ্বালিলে তাই তত গাঢ় অন্ধকারময় ছায়া পড়ে না।

অনেক ক্ষেত্রে আলো, অস্বচ্ছ পদার্থ এবং যে স্থানে ছায়া পড়ে সেই পর্দা, এই তিনটির আনুপাতিক অবস্থান অনুসারে ছোট বড় ছায়া পড়ে। অস্বচ্ছ পদার্থটির ছায়ার পাশেই আরও একটি কম অন্ধকারময় উহার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে **উপচ্ছায়া** (Penumbra) বলে। গাঢ় অন্ধকার মূর্তিকে **প্রচ্ছায়া** (Umbra) বলে।

আলো সকল সময় সরল রেখাক্রমে গমন করে। যদি কোন ক্রমে আলোর গতি একদিক হইতে অন্যদিকে বাঁকাইয়া দেওয়া হয় তবে পুনরায় ইহার গতি সরল রেখা ক্রমেই চালিত হইয়া থাকে। আমরা যখন দূর হইতে ট্রেণ বা ষ্টিমারে সার্চ লাইটের আলো দেখি কিংবা জানালার ফাঁকে অন্ধকার ঘরে আলো প্রবেশ করিতে দেখি, অথবা মেঘের আড়ালে সূর্যের বিচ্ছুরিত কিরণ অথবা অস্তাচলের পিছনে সূর্যের শেষ রশ্মি দেখি তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি ইহাদের কিরণ সরল রেখা ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই আলোর সম্মুখে যদি অস্বচ্ছ পদার্থ ধরা হয় তবে দেখা যাইবে আলোর বিপরীত দিকে অস্বচ্ছ পদার্থের

ছায়া পড়িয়াছে। আলো যে সরল রেখা ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে সহজেই তাহা প্রমাণ করিতে পারা যায়।

একটি জ্বলন্ত বাতির সম্মুখে পর পর তিনটি পিস্ বোর্ডের পর্দা **ক খ গ** সমান্তরাল-ভাবে খাড়া করিয়া রাখ। এই তিনটি পর্দার মধ্যস্থলে একটি করিয়া সরু ছিদ্র আছে, (৭৫নং চিত্র) পদার্থগুলিকে এমনভাবে সাজাও যেন বাতির শিখা এবং ইহাদের ছিদ্রগুলি এক সরল রেখায় পড়ে। পরে শেষের পর্দাটির ছিদ্রের সামনে



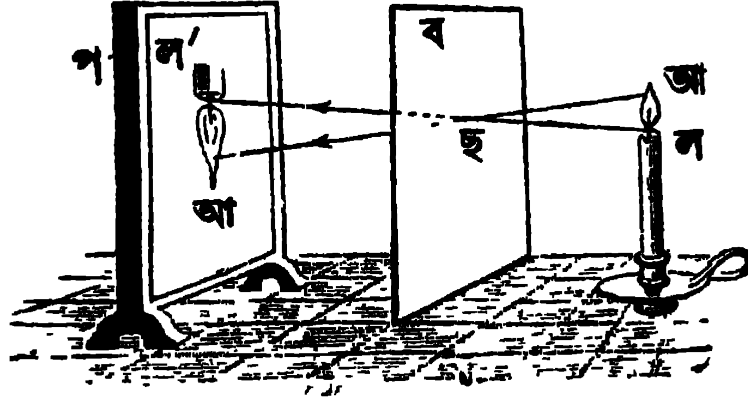
৭৫নং চিত্র—সরলরেখাক্রমে আলোর গতি

মনে কর **ঙ** স্থানে চোখ রাখিলে যতক্ষণ **ক খ** ও **গ** এর ছিদ্রগুলি এবং **ঙ** এক সরল রেখায় থাকিবে ততক্ষণ দীপশিখাটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি একটি মাত্র পর্দাকেও সরাইয়া এমনভাবে রাখা যায় যাহাতে অপর গুলির ছিদ্রের সহিত ইহার ছিদ্র এক সরল রেখায় থাকিবে না, তবে পূর্বের ন্যায় চোখ রাখিলে আলো দেখা যাইবে না।

আলোর গতি সরল রেখা ক্রমে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা অস্বচ্ছ পদার্থের ছায়া সময় সময় উল্টা দেখিতে পাই। এরূপ একটি ছায়া কেমন উল্টা ভাবে পড়িয়াছে তাহা ৭৬নং চিত্র হইতে বুঝিয়া লও।

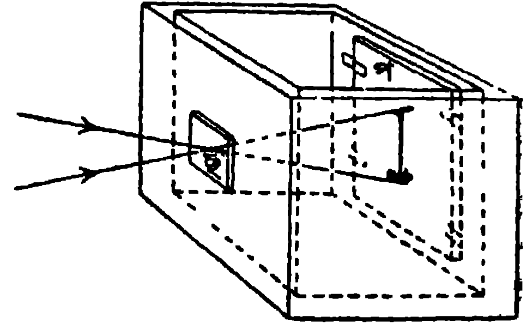
একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট টিন বা পিস বোর্ডের পর্দার একপাশে একটি জ্বলন্ত বাতি ও অপর পাশে আর একটি ঘসা কাচের পর্দা রাখিলে দেখা যায় ঘসা কাচের পর্দার উপর বাতির শিখার একটি উল্টা ছবি পড়িয়াছে। যদি বাতিটিকে মধ্যের পর্দার নিকটে আনা যায় অথবা ঘসা কাচের পর্দাটি পূর্ব পর্দা হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয় তবে এই ছবিটি বড় হইতে থাকিবে। আবার যদি বাতিটিকে পর্দা হইতে দূরে সরাইয়া দেওয়া হয় অথবা ঘসা কাচের পর্দা পূর্বোক্ত পর্দার নিকট সরাইয়া আনা হয় তবে বাতির ছবিটি আকারে ছোট হইয়া যায়। ইহার কারণ কি—তোমরা খাতায় বিভিন্ন দূরবর্তী বাতি ও পর্দার

আলোর রেখাগুলি টানিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। এখানে লক্ষ্য



৭৬নং চিত্র—ছায়ার উল্টা মূর্তি

রাখিও, মধ্যের পর্দার ছিদ্রটি অতি সূক্ষ্ম সূচাগ্রে নির্মিত হওয়া চাই। যদি ছিদ্রটি বড় হয় তবে বাতির ছবি তত উজ্জ্বল হইবে না, আব্‌ছা আব্‌ছা হইবে এবং আকারেও বড় হইয়া যাইবে। ফটো তুলিবার ক্যামেরার মূলসূত্রটি অনেকটা এইরূপ। ক্যামেরায় কিরূপে চিত্র গৃহীত হয় পার্শ্বের



৭৭নং চিত্র—ক্যামেরা

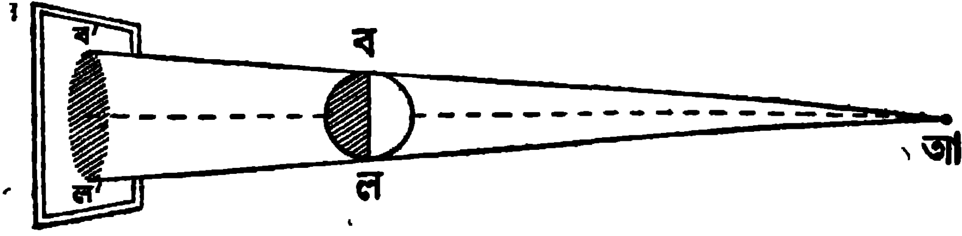
চিত্রে তাহার একটু আভাষ পাওয়া যাইবে। একটি গাছের চিত্র পর্দায়, এখানে প্লেটের উপর উল্টা ভাবে পড়িয়াছে দেখ। একটি আলো শিখা **আ ল** বোর্ডে কিরূপ উল্টা মূর্তি **আ' ল'** প্রস্তুত করিয়াছে ৭৬নং চিত্রে দেখ।

এইবার দেখা যাউক আলোকের উৎস এবং অসচ্ছ পদার্থের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ছায়া বা উপচ্ছায়া কিরূপ হইয়া থাকে।

আলোকের উৎস যদি বিন্দু-প্রমাণ হয় তবে অস্বচ্ছ পদার্থটির মাত্র ছায়া পর্দায় পড়িবে। আলো, অস্বচ্ছ পদার্থ এবং পর্দার আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। (৭৮নং চিত্র)। এক্ষেত্রে ছায়া অতিশয় গাঢ় অন্ধকারময় হয়।

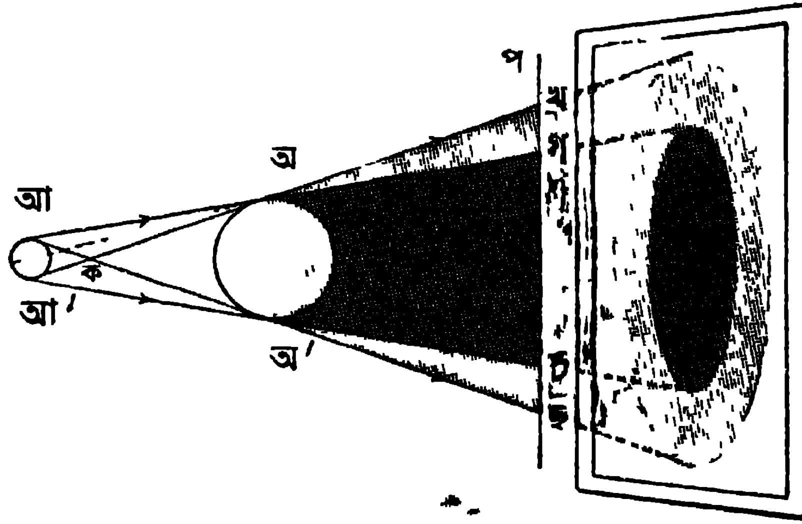
আলোকের উৎস যদি বিন্দু অপেক্ষা বড় হয় অথচ অস্বচ্ছ পদার্থটি অপেক্ষা

আকারে ছোট হয় তবে পর্দায় যে ছায়া পড়ে তাহার চারিপাশে অপেক্ষাকৃত



৭৮নং চিত্র—ছায়া

কম অন্ধকারময় উপচ্ছায়া পড়ে। এক্ষেত্রেও পর্দাকে যত অস্বচ্ছ পদার্থ হইতে

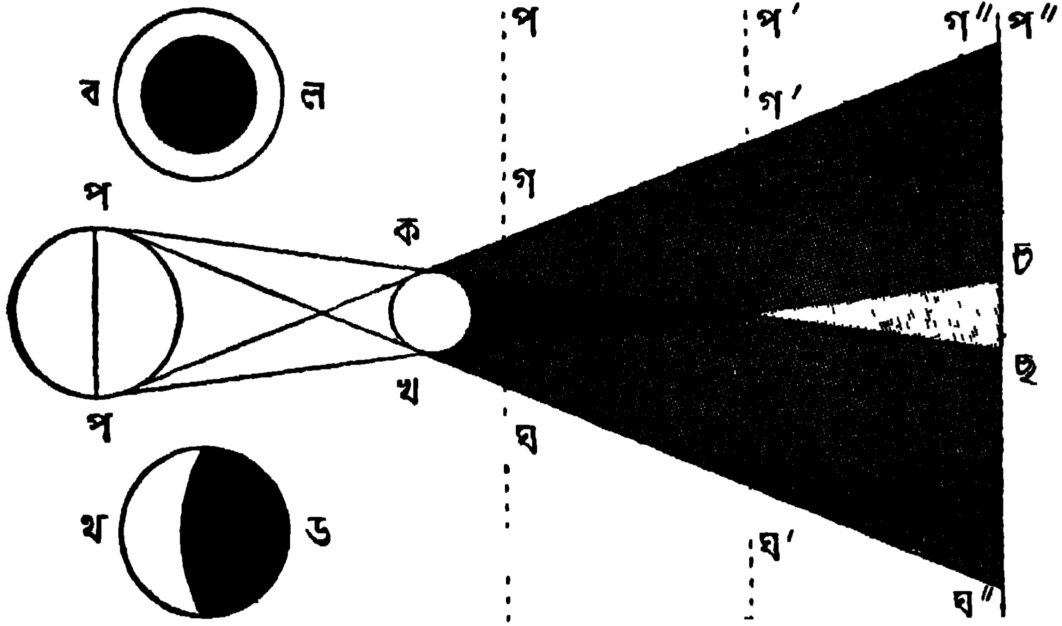


৭৯নং চিত্র—ছায়া ও উপচ্ছায়া

দূরে অথবা আলোটিকে যত অস্বচ্ছ পদার্থের নিকটে সরান যাইবে তত ছায়া এবং উপচ্ছায়া বড় হইবে, পক্ষান্তরে ছোট হইবে।

কিন্তু যদি আলোকের উৎস, অস্বচ্ছ পদার্থ হইতে বৃহত্তর হয় তাহা হইলে পদার্থ টিকে অধিকদূরে সরাইলে ছায়া আর দেখা যায় না, কেবলমাত্র উপচ্ছায়াই ইহার উপর পড়িবে। ইহার কারণ ৮০নং চিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে। খাতায় বিভিন্নরূপ দূরে পর্দা, আলো ও অস্বচ্ছ পদার্থ রাখিয়া ছায়া ও উপচ্ছায়ার কিরূপ পরিবর্তন হয় লক্ষ্য কর। এখানে **গ গ'** এবং **গ''** একটি পর্দার তিনটি অবস্থান, **প প** আলোক উৎস এবং **ক খ** অস্বচ্ছ পদার্থ, **চ ছ** হইতে, এবং উহার দুই পাশ হইতে আলোক উৎসকে যেমন দেখায় অন্য দুইটি বৃত্ত **ব ল, থ ড,** সেই চিত্র দিতেছে।

এরোপ্লেন যখন উড়িতে থাকে তখন ইহার ছায়া কেন পড়ে না এইবার বোধহয় তোমাদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সূর্য বৃহত্তর আলোক উৎস,



৮০নং চিত্র—সম্পূর্ণ উপচ্ছায়া

এরোপ্লেন অস্বচ্ছ পদার্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠ পর্দা। এক্ষেত্রে অস্বচ্ছ পদার্থ হইতে পর্দার দূরত্ব এত অধিক যে পর্দায় ছায়া পড়ে না। যে উপচ্ছায়া পড়ে তাহা সূর্যালোকের তীব্রতায় বুঝিতে পারা যায় না।

উপরের চিত্রগুলি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে আলোর গতি সরলরেখা ক্রমে হইয়া থাকে বলিয়া উপর্যুক্ত ঘটনাগুলি সম্ভব।

এইরূপে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থানানুসারে যে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয় তাহা পরে বুঝান হইবে। যখন পৃথিবী অস্বচ্ছ পদার্থ এবং চন্দ্র পর্দার কাজ করে তখন সূর্য গ্রহণ হয় এবং যখন চন্দ্র অস্বচ্ছ পদার্থ এবং পৃথিবী পর্দার কাজ করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে।

সংক্ষেপঃ—আলো জ্বালিলে ইহার পার্শ্ববর্তী ঈথারে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের চোখের পিছনে যে পর্দা আছে তাহাতে পড়িলে আমাদের দেখিবার অনুভূতি

জন্মে। আলো কোন পদার্থে পড়িলে তবে সেই পদার্থ দেখিতে পাই এবং আলোর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, নতুবা শূন্যে আলোকর শ্মি অদৃশ্য।

যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়া আলো প্রায় অবাধে চলিয়া যায় তাহাদিগকে স্বচ্ছ এবং যাহাদের ভিতর দিয়া আলোক যাইতে পারে না বলিলেই চলে তাহাদিগকে অস্বচ্ছ পদার্থ বলে। কতকগুলি পদার্থের ভিতর দিয়া আলো যাইতে পারে বটে কিন্তু আলোর প্রভা উজ্জ্বল থাকে না—তাহাদিগকে ঈষদচ্ছ বলে। বস্তুত সকল পদার্থই পাতলা হইলে তাহাদের ভিতর অল্পবিস্তর আলোক যাতায়াত করিতে পারে। আলোক সকল সময়ে সরল রেখাক্রমে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়। আলোকের সামনে অস্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে অস্বচ্ছ পদার্থের পশ্চাতে ছায়া পড়ে। আলোক উৎস হইতে কোন রশ্মিই ছায়াময় স্থানে পৌঁছাইতে পারে না। যদি আলোক উৎস বড় হয় এবং অস্বচ্ছ পদার্থ ছোট হয় তবে পশ্চাতে রক্ষিত পর্দার ছায়া ও উপচ্ছায়া কিংবা দূরত্ব অনুসারে কেবলমাত্র উপচ্ছায়া পড়িতে পারে, আলোক উৎসের কোন না কোন স্থান হইতে রশ্মি ছায়াময় স্থানে পড়িলে উহাই উপচ্ছায়া হইয়া দাঁড়ায়।

সপ্তম প্রশ্নমালা

১। স্বচ্ছ, ঈষদচ্ছ, অস্বচ্ছ পদার্থ ও উপচ্ছায়া কাহাকে বলে? (What are the following :—transparent and opaque bodies and penumbra)

২। ছায়া এবং উপচ্ছায়ায় প্রভেদ কি চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। ইহারা আলো এবং অস্বচ্ছ পদার্থের কোন দিকে পড়ে লিখ। (Explain with a diagram what is the difference between an umbra region and a penumbra region Write on which side of the light and the opaque body they fall)

৩। দুইটি এমন পরীক্ষা বর্ণনা কর যাহাতে প্রমাণ করা যায় আলোর গতি সরল রেখা ক্রমে হইয়া থাকে। (Describe two experiments which will prove that light travels in straight lines)

৪। আলোর গতি যদি সরল রেখা ক্রমে না হইত তবে উপচ্ছায়া পড়া সম্ভব হইত না—চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (Explain with a diagram—penumbra region would not be found had not light travelled in straight lines)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আলোক প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে একটি আয়নার উপর রোদ পড়িলে সেই রোদ আয়না হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঘরের দেওয়ালে, মেঝেয় অথবা অন্য কোন পদার্থে গিয়া পড়ে, কিন্তু প্রতিফলিত রোদের প্রখরতা কমিয়া যায়। ঠিক আয়নাটির মত যদি একখণ্ড কাঠ রাখা হয় তবে তাহাতে রোদ পড়ে বটে কিন্তু প্রতিফলিত হয় না। আয়নার তলটি পালিশ করা চক্‌চকে, মসৃণ, কিন্তু কাঠের তল খস্‌খসে এবং অমসৃণ। মসৃণ তলে আলো পড়িলে তাহা প্রতিফলিত হয়, যে তল যত মসৃণ সেই তল হইতে তত অধিক আলো প্রতিফলিত হয়। যে তলের উপর আলো পড়িয়া প্রতিফলিত হয় তাহাকে **প্রতিফলক** (Reflector) বলে। তলের রং কাল হইলে, ইহা হইতে আলো প্রতিফলিত হইতে পারে না। পরীক্ষা করিবার জন্য আয়না, চক্‌চকে পালিশ করা পিতলের পাত, এবং অল্প চক্‌চকে আর একটি পিতলের পাত ও একটি কাল রংএর চীনামাটীর মসৃণ ফলক লইয়া তাহাদিগকে রোদে ধর। দেখিবে আয়না এবং মসৃণ পিতলের পাত হইতে সর্বাধিক পরিমাণ রোধ প্রতিফলিত হইয়াছে। অল্প মসৃণ পিতলের পাত হইতে অল্প আলো প্রতিফলিত হইয়াছে অথচ কাল চীনামাটির মসৃণ তল হইতে আলো প্রতিফলিত হয় নাই।

আপতিত আলোকের সমস্ত অংশই প্রতিফলিত হয় না তাহার কারণ আলোর কিয়দংশ প্রতিফলক শোষণ করিয়া লয়। আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর যতই তির্যকভাবে পড়ে তত অধিক অংশই ইহার প্রতিফলিত হয়। আলোক যে সকল পদার্থের ভিতর দিয়া যায় তাহাদের তারতম্যেও প্রতিফলনের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে। বায়ুর মধ্য দিয়া আলো গিয়া যদি প্রতিফলকে পড়িয়া পুনরায়

বায়ুর মধ্যেই প্রতিফলিত হয় তবে যে পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত হয় জলের মধ্য দিয়া গিয়া জলের মধ্যেই ঠিক তত পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয় না। এই জন্য কাচের আয়নার উপর যদি জল পড়ে তবে প্রতিফলিত আলোর প্রখরতা কমিয়া যায়।

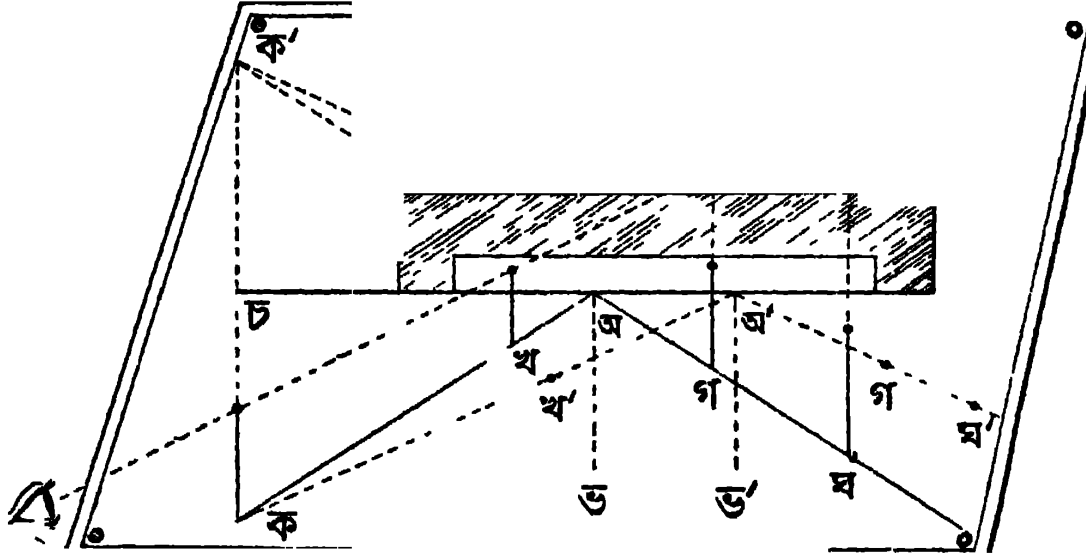
পালিশ করা মসৃণ তলের উপর উপরোক্ত উপায়ে আলোক পতিত হইয়া পুনরায় অন্যপথে ফিরিয়া আসাকে **প্রতিফলন** (Reflection) বলা হয়। কোনও একটি আলোক রশ্মি আসিয়া যখন প্রতিফলকের উপর পড়ে তখন ইহাকে **আপতিত রশ্মি** (Incident ray) বলা হয় এবং যখন প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া যায় তখন তাহাকে **প্রতিফলিত রশ্মি** (Reflected ray) বলা হয়। প্রতিফলকের যে বিন্দুতে আসিয়া রশ্মি পতিত হয় সেই বিন্দু হইতেই প্রতিফলিত হয়, এই বিন্দুটিকে **পাতনবিন্দু** (Point of incidence) বলা হয়। এই বিন্দু হইতে প্রতিফলকের উপর যে লম্ব কল্পনা করা হয় তাহাকে **অভিলম্ব** (Normal) বলা হয়। অভিলম্বের সহিত আপতিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **আপতন** কোণ (Angle of incidence) এবং অভিলম্বের সহিত প্রতিফলিত রশ্মি যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **প্রতিফলন কোণ** (Angle of reflection) বলা হয়।

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন দুইটি বিশিষ্ট নিয়মাধীনে এই প্রতিফলন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

যথা :—(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। (২) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান।

পরীক্ষা—ড্রইং বোর্ডে এক টুকরা শাদা কাগজের চারি কোণে পিন দিয়া আটকাইয়া বোর্ড খানি টেবিলের উপর রাখ। শাদা কাগজখানির উপর রুলার সাহায্যে একটি সরল রেখা টান। এই সরল রেখার উপর একখানি ছোট আয়না এমন ভাবে খাড়া করিয়া রাখ যেন আয়নার ঠিক পিছন দিকের কলাই এই রেখার সহিত মিলিয়া থাকে। আয়নাটির ঠিক নিচের দিকে খানিকটা অংশ ছোট

একটি আয়ত ক্ষেত্রের মাপে কলাই শূন্য থাকা চাই ; পরে দুইটি বড পিন ঐ আয়নার সামনে বোর্ডের উপর এমনভাবে খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দাও যেন পিন দুইটির পদদেশ সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া সরল রেখাটিকে বর্ধিত করিলে ঐ সরল রেখা আয়নার সহিত একটি সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করে। মনে কর পিন দুইটির



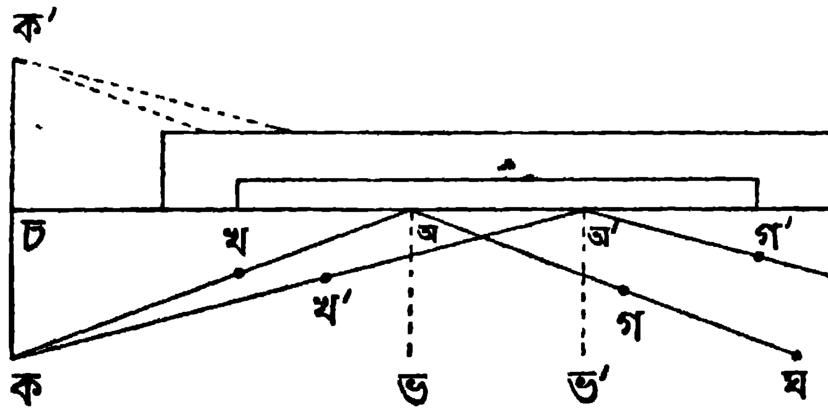
৮১ নং চিত্র—প্রতিফলনের পরীক্ষা

অবস্থান যথাক্রমে **ক** এবং **খ** , এইবার চোখ ফিরাইয়া পিন দুইটির উপর এমন ভাবে লক্ষ্য রাখ যেন পিন দুইটিকে একই সরল রেখায় দেখা যাইবে। এই অবস্থায় চোখ নিবদ্ধ রাখিয়া আবার দুইটি পিন **গ** এবং **ঘ** অবস্থানে এরূপভাবে পুঁতিয়া দাও যেন মনে হয় শেষোক্ত পিন দুইটি পূর্বোক্ত পিন দুইটির প্রতিবিম্বের সহিত একই সরল রেখায় অবস্থান করে। চারিটি পিনের অবস্থানে দাগ দিয়া আয়না এবং পিন সরাইয়া লইয়া **ক খ** এবং **গ ঘ** সরল রেখাদ্বয় টানিয়া বর্ধিত করিলে দেখা যাইবে তাহারা পূর্ব সরল রেখার একটি বিন্দু **অ** তে আসিয়া মিলিত হইবে। **অ** হইতে পূর্বের সরল রেখার উপর **ক খ** বা **গ ঘ** এর দিকেই **অ ভ** একটি লম্ব টানিলে দেখা যাইবে ∠ **ক অ ভ** = ∠**ঘ অ ভ** , **ক অ ভ** কোণ আপতন কোণ, এবং **ঘ অ ভ** কোণ প্রতিফলন কোণ। ইহারা সমান হইবে (৮১নং চিত্র)।

ক অ, অ ভ, এবং **অ ঘ** রেখাগুলি যথাক্রমে আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মি বুঝাইতেছে। ইহারা সকলেই কাগজ খানির তলে অবস্থিত হওয়ায় বুঝা যায় আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি, একই তলে অবস্থান করে।

এইবার যদি **ক** এর অবস্থান ঠিক রাখিয়া **খ** এর অবস্থান পরিবর্তিত করিয়া **খ'** অবস্থানে রাখা যায় তবে দেখা যাইবে **গ ঘ** এবং **অ ভ** এর অবস্থান যথাক্রমে **গ' ঘ'** এবং **অ' ভ'** অবস্থানে আসিয়া পড়িবে। এইরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় আলো যদি লম্বভাবে প্রতিফলকে পড়ে তবে সেই পথেই প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে।

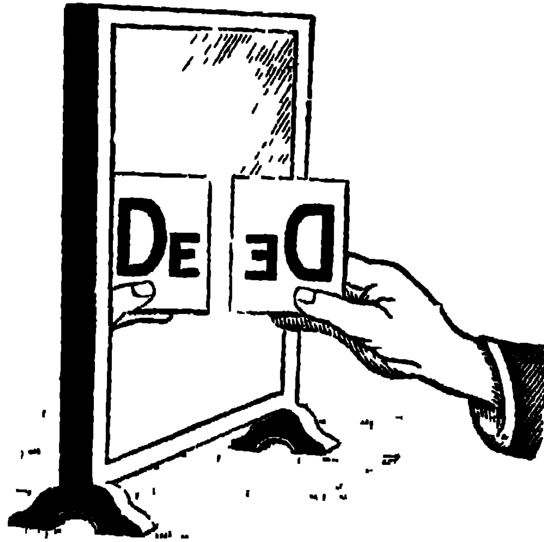
আলোক প্রতিফলনের দ্বিতীয় নিয়মানুসারে প্রমাণ করিতে পারা যায় প্রতিফলক হইতে বস্তু যত দূরে থাকে ইহার প্রতিবিম্বও প্রতিফলক হইতে ঠিক তত দূরেই প্রতিফলিত হয়, ৮২নং চিত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়



৮২ন চিত্র—প্রতিফলনের নিয়ম

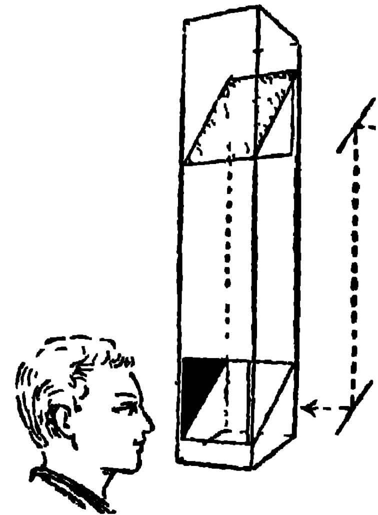
কচ = ক'চ। মনে কর একটি আয়নার সম্মুখে DE এই অক্ষর দুইটি রহিয়াছে। ইহার প্রতিবিম্ব প্রতিফলক হইতে যত দূরে আছে, বিন্দুগুলির প্রতিবিম্বও আয়নাটি হইতে ঠিক ততদূরে পড়িতে দেখা যাইবে। এইরূপে দেখা যায় প্রতিবিম্বটি উল্টাইয়া গিয়াছে। এই জন্য আমরা যখন আয়নার সামনে দাড়াইয়া ডান হাত তুলি তখন প্রতিবিম্বে মনে হয় বাম হাত উঠিতেছে।

প্রতিফলনের নিয়মটির উপর নির্ভর করিয়া একটি ফ্রেমে আঁটা আয়নাকে ফ্রেম হইতে না খুলিয়াও তাহার বেধ আন্দাজ করিয়া লইতে পারা যায়। আয়নার উপর কোন একটি বস্তু রাখিলে আয়নার অপর পৃষ্ঠের কলাই হইতে বস্তুটি যতদূরে থাকে, কলাই করা পৃষ্ঠ হইতে ঠিক ততদূরে বস্তুটির প্রতিবিম্ব পড়ে। কাজেই বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্বের মাঝে যতটুকু ফাঁক দেখা যায় তাহাকে অর্ধেক করিয়া লইলে আয়নাটির বেধ পাওয়া যায়।



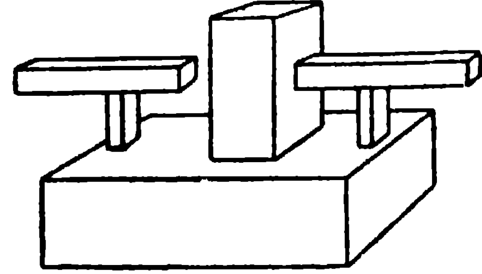
৮৩নং চিত্র—উল্টা প্রতিমূর্তি

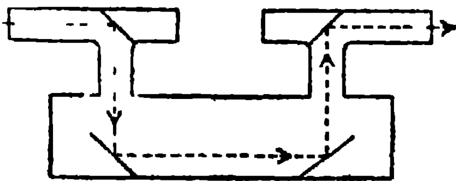
প্রতিফলন ক্রিয়া আমাদের যে কয়টি ব্যবহারিক উপকারে লাগে তন্মধ্যে ফুটবল খেলার মাঠের পাশে লোক যে **পেরিস্কোপ** (Periscope) ব্যবহার করে তাহা একটি সরল উদাহরণ। একটি লম্বা কাঠের বাক্সের ভিতরে, উপরে ও নিচে দুইখানি আয়না মুখো মুখি সমান্তরালভাবে থাকে। আয়নাগুলি দিগন্তের সহিত ৪৫° কোণ করিয়া অবস্থিত থাকে। উপরের আয়নাটি দ্রষ্টব্য পদার্থের দিকে পাতা থাকে, কাজেই নিচের আয়নাটির মুখ ঠিক উপরের আয়নার মুখের বিপরীতদিকে খোলা থাকে। সেই আয়না দেখিলেই দূরের পদার্থ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের ভিড়ে যখন দূরের পদার্থ দেখিতে


৮৪নং চিত্র—পেরিস্কোপ

অসুবিধা হয় তখন এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে ইহার উপরের আয়নাটি মানুষের মাথা ছাড়াইয়া উপরে থাকে বলিয়া ইহাতে দ্রষ্টব্য পদার্থগুলি প্রতিফলিত হইয়া নিচের আয়নায় পড়ে এবং তাহা হইতে আমরা দ্রষ্টব্যগুলি দেখিতে পাই। চিত্রে তীর চিহ্ন দ্বারা পেরিস্কোপে আলোর গতি পথ দেখান হইল। ডুবো জাহাজে এই পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের উপরে দূর দূরান্তের দৃশ্য দেখিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়।

প্রতিফলনের নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া আর একটি মজার যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারা যায়। দুইটি ফাঁপা নলের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া বাহু আছে। বাহুগুলি পূর্বোক্ত নলগুলির সহিত সমকোণ করিয়া থাকে। এই নলগুলি চিত্রে প্রদর্শিত উপায়ে একটি ফাঁপা বাক্সের উপর বসান থাকে। নলগুলির ভিতর চারি খানি আয়না এমনভাবে বসান থাকে যে একটি নলের ভিতর আলোক রশ্মি প্রবেশ করিলে প্রথম যে আয়নায় পড়ে তাহা হইতে দ্বিতীয় আয়নায় এবং দ্বিতীয় আয়না হইতে তৃতীয় আয়নায় এবং তৃতীয় আয়না হইতে চতুর্থ আয়নায় এবং চতুর্থ হইতে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় অপর নল দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। এই যন্ত্রে যদি দুইটি নলের একটির বাহির দিকের প্রান্তে চোখ রাখা যায় তাহা হইলে অপর নলের সামনে রক্ষিত পদার্থ দেখা যায়। যদি দুইটি নলের মাঝে একটি অস্বচ্ছ পদার্থ দিয়া আড়ালকরা যায় তাহা হইলেও পূর্বোক্ত পদার্থ দেখা যাইবে। ইহাতে মনে হয় যেন যন্ত্রটির সাহায্যে অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়াও অন্য পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত


৮৫নং চিত্র—ধাঁধা


৮৬নং চিত্র—ধাঁধা

পক্ষে ব্যাপাব তাহা নহে। দ্রষ্টব্য পদার্থেব প্রতিবিম্ব প্রথম আযনা হইতে দ্বিতীয, ক্রমে তৃতীয ও চতুর্থ আয়নায প্রতিফলিত হইযা চোখে দেখা যায। ৮৫নং চিত্রে যন্ত্রটিব বহির্গঠন ও ৮৬নং চিত্রে আলোক বশ্মিব গতিপথ ও যন্ত্র নির্মাণেব কৌশলটি বুঝান হইল।

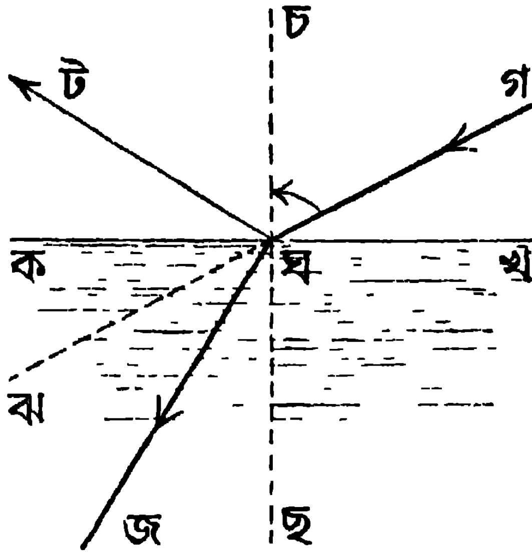
মধ্যযুগে ইউবোপীযগণ 'ভূতেব নাচ' দেখিযা বডই আমোদ পাইতেন। এখন যেমন আমবা বঙ্গমঞ্চে অভিনয কিংবা পর্দায় চলচ্চিত্র দেখিবাব জন্য আনন্দেব সহিত মঞ্চেব (Auditorium) সম্মুখে সমবেত হই, তাঁহাবাও তেমনই তখন ভূতেব নাচ দেখিবাব জন্য মঞ্চেব সম্মুখে সমবেত হইতেন। মঞ্চেব উপব কিন্তু দৃশ্যপট বা পর্দাব পবিবর্তে একখানি বড কাচ সামনেব দিকে হেলাইয়া ঝুলান থাকিত। এই কাচখানিব সম্মুখেব খানিকটা জাযগা ফাঁকা এবং তাহাব পবেই একটি মঞ্চ পর্যন্ত উঁচু দেওযাল। এই দেওযালেব ভিতব দিকে একখানি বড আয়না পূর্বোক্ত কাচখানিব সহিত সমান্তবাল ভাবে মুখোমুখি থাকিত। মঞ্চেব তলদেশে কোন দৃশ্য বা লোকজন থাকিলে তাহাদেব প্রতিবিম্ব নিচেব আযনাতে পডিযা উপবেব কাচে পড়িত, সেই উপবেব কাচেব মধ্য দিয়া নিচেব আযনায প্রতিফলিত দৃশ্য দর্শকগণ দেখিতে পাইতেন। উপবেব কাচখানি অন্ধকাব থাকিত এবং নিচেব আযনা দর্শকগণ দেখিতে পাইতেন না। মঞ্চেব নিচে মানুষ বিকট মূর্তি তথাকথিত ভূতেব মূর্তি ধাবণ কবিয়া বীভৎস নৃত্য কবিত এবং তাহাবই প্রতিবিম্ব দেখিয়া দর্শকগণ আমোদ পাইতেন (৮৭নং চিত্র)।

প্রতিসরণ ঃ—যে সকল পদার্থেব মধ্য দিয়া আলো যাতাযাত কবে তাহা-দিগকে আলোব **মাধ্যম** (Medium) বলে এবং যে সকল মাধ্যমেব প্রকৃতি ও গুরুত্ব এক বকম তাহাদিগকে **সমসত্ত্ব** (Homogeneous) মাধ্যম বলে। সমসত্ত্ব মাধ্যমেব মধ্যে আলো সবল বেখা ক্রমে যাতাযাত কবে, কিন্তু একটি সমসত্ত্ব মাধ্যম হইতে অন্য প্রকাব সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো গিযা পৌঁছিলে যেখানে দুইটি মাধ্যম মিলিত হইয়াছে সেখান হইতে গতিপথ বাঁকিয়া পুনবায সবল বেখাক্রমে



৮৬নং চিত্র—ক্রুটের নাচ

যাত্রা করে। এইরূপ যতবার মাধ্যম পরিবর্তিত হয় ততবার আলোর গতি ভিন্নমুখ হয়। আলোর এই গতি পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। পূর্বে যেমন দেখা গিয়াছে প্রতিফলন হইবার সময় আলো, দুইটি কোণ উৎপন্ন করে, এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিবার এবং বাহির হইবার সময়ও ঠিক সেইরূপ দুইটি কোণ উৎপন্ন করে—একটি আপতন কোণ এবং একটি প্রতিসরণ কোণ। মনে কর চিত্রের **কখ** সরল রেখাটি দুইটি মাধ্যমের মিলন সীমা এবং নিচের মাধ্যমটি উপরের মাধ্যম অপেক্ষা গুরুতর। **গঘ** একটি আলোকরশ্মি উপরের মাধ্যম হইতে আসিয়া **কখ** রেখার **ঘ** এই পাতন বিন্দুতে পৌঁছিল। এক্ষণে **ঘ** বিন্দুতে **কখ** রেখার উপর যে লম্ব কল্পনা করা যায় তাহাকে **অভিলম্ব** বলে। মনে



৮৮নং চিত্র—প্রতিসরণ

কর **চছ** সেইরূপ অভিলম্ব। **গঘ** আলোকরশ্মি কিন্তু **ঘ** বিন্দুতে আসিয়াই বাঁকিতে আরম্ভ হয় এবং অভিলম্বের দিকে হেলিয়া সরল রেখা ক্রমে নিচের মাধ্যমে যায়। মনে কর **গঘজ** রেখা দ্বারা তাহার গতি নির্দেশ করা হইল। তাহা হইলে **গ ঘ চ** কোণটি **আপতন কোণ** এবং **ছ ঘ জ** কোণটি **প্রতিসরিত কোণ** (Angle of refraction)। অতএব লঘুতর মাধ্যম হইতে গুরুতর মাধ্যমে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত হইলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে হেলিয়া যায়। আবার গুরুতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রতিসরিত হইলে ইহা অভিলম্ব হইতে দূরে বাঁকিয়া যায়। যদি প্রতিসরণের পরিবর্তে **ঘ** বিন্দুতে প্রতিফলন হইত তবে রশ্মিটি **ঘট** রেখায় ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিতাম ∠**চঘগ** = ∠**টঘচ**। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে (১) আপতিত রশ্মি

অভিলম্ব ও প্রতিসরিত রশ্মি, এক সমতলে থাকে। (২) নির্দিষ্ট এক জোড়া মাধ্যমে আপতন কোণের এবং প্রতিসরিত কোণের সাইনের (Sine) অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে।

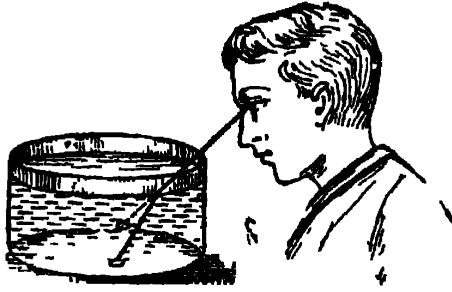
ড্রইং বোর্ডে কাগজ আটকাইয়া একটি চৌকা কাচখণ্ড রাখ। তাহার গায়ে—মনে কর **আ** বিন্দুতে এক পিন পোঁত। পরে **ক** তে একটি পিন পোঁত এবং **ক** এ চোখ রাখিয়া পিন দুইটির মাথার সোজা চোখ রাখিয়া আর একটি পিন কাচের অপর দিকে মনে কর **খ** তে এমন ভাবে পুঁতিয়া দাও যেন তিনটি পিনের মাথা এক সরলরেখায় দেখায়। তিনটি পিন যদি সমান পোঁতা হয় তবে তিনটির মাথা এক তলে দেখা যাইবে। ইহাতে প্রথম নিয়ম প্রমাণিত হয়। কাচখণ্ড তুলিয়া **অভ** লম্ব টান। **ক আ অ** কোণ এবং **খ আ ভ** কোণ মাপিয়া দেখ। দুই তিনটি অবস্থায় পিনগুলিকে রাখিয়া এইরূপ কোণ বাহির করিলে দ্বিতীয় নিয়ম প্রমাণিত হইবে।

ক′ ক অ আ ভ খ খ′ র র′

৮৭নং চিত্র—প্রতিসরণের নিয়ম

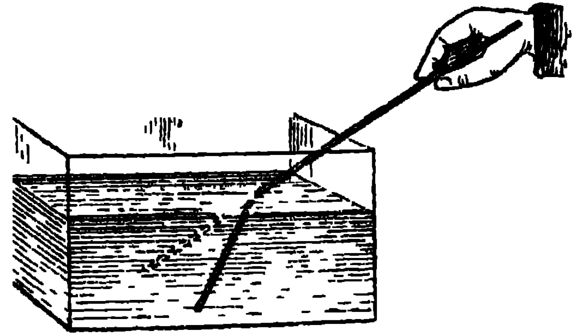
প্রতিসরণের ফল স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। একটি বাটিতে একটি পয়সা রাখিয়া এমন দূরে দাঁড়াও যেখান হইতে বাটির ভিতরের পয়সাটি মাত্র দেখিতে পাইবে না—বাটির বাড পয়সাটিকে আড়াল করিয়া রাখিবে। এইবার বাটিতে ক্রমাগত জল ঢাল। দেখিবে পয়সাটি ক্রমে তোমার দৃষ্টির গোচরে আসিবে। ইহার কারণ চোখ হইতে আলোক রশ্মি আসিয়া

জলতলের উপর যখন পড়িল তখন অভিলম্বের দিকে হেলিয়া যাওয়ায় যে রশ্মি পূর্বে পয়সাটির নাগাল পাইতেছিল না এক্ষণে তাহার নাগাল পাইল কাজেই পয়সাটি দৃষ্টি গোচরে আসিল। প্রতিসরিত রশ্মি থাকিলেও চোখ হইতে রশ্মি প্রথম যে দিকে বহির্গত হয় সেই দিকেই বস্তু সকল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় বাটির তলার পয়সাটি কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া গিয়াছে।



৯০নং চিত্র—প্রতিসরণের ফল

এই কারণেই চৌবাচ্ছায় জল থাকিলে মনে হয় চৌবাচ্ছার তলদেশটি যেন কিঞ্চিত উপরে উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই ইহাকে কম গভীর মনে হয়। একই কারণে চৌবাচ্ছায় বা পুকুরে কিংবা নদী, সাগর, উপসাগরে জলের ভিতরে মাছ দেখিতে পাইলে, তাহারা যত গভীর দেশে থাকে আপাত দৃষ্টিতে ঠিক তত গভীর দেশে আছে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য জলের ভিতরে মাছ শড়কি দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইলে আন্দাজ করিয়া লইতে হয় প্রকৃতপক্ষে ইহারা কত গভীর স্থানে আছে। অনুরূপ কারণেই একখণ্ড পুরু কাচের তলায় রক্ষিত কাগজ খণ্ডকে উপর হইতে দেখিলে মনে হয় কাগজ অনেক উচ্চে উঠিয়া আছে। একটি কাচের পাত্রে জল লইয়া তাহাতে একটি কাঠি ডুবাইয়া ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় জলের ভিতরে কাঠিটি যেন বাঁকিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং নিমজ্জিত অংশটি ইহার প্রকৃত আকার হইতে ক্ষুদ্রতর মনে হইবে (৯১নং চিত্র)।



৯১নং চিত্র—লঘু হইতে গুরু মাধ্যমে আলোক

মনে কর কাঠিটির শেষ প্রান্তকে পূর্ব পরীক্ষায় কথিত কারণে কিছু উপরে দেখা গেল। তেমনই নিমজ্জিত কাঠিটির প্রত্যেক বিন্দু সমানুপাতে উপরে দেখা গেল। কাজেই নিমজ্জিত অংশটুকু ছোট মনে হয় এবং দেখা যায় যেন ইহা জলের উপরিতল হইতে বাকিয়া জলে প্রবেশ করিতেছে। ইহার প্রত্যেক বিন্দু সমানুপাতে উঠিয়া যাওয়ায় নিমজ্জিত অংশের জলের ভিতরে সরলভাব কোন ব্যতিক্রম হয় না।

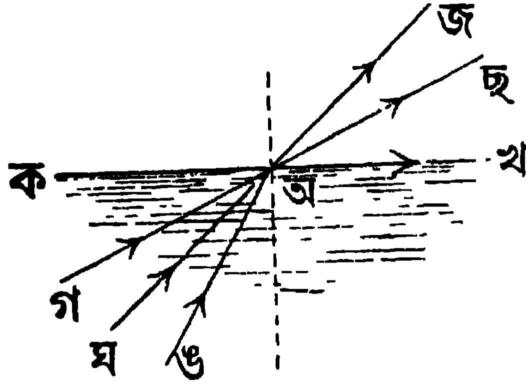
যদি নিমজ্জিত কাঠিটি দাগ কাটা একটি স্কেল হয় তাহা হইলে আমরা সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারি যে ইহার দাগের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জলের উপর হইতে দেখিলে ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কাঠিটি যত তির্যক ভাবে রাখা হইবে নিমজ্জিত অংশটুকু তত বেশী বাঁকিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

পূর্বের চিত্র কয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বেশ বুঝা যায় যে, কোন পদার্থ হইতে আলোক রশ্মি নির্গত হইয়া মাধ্যম পরিবর্তন করিবার জন্য নিজের গতি পরিবর্তন করিলেও যখন সেই রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছায় তখন চোখ যে মাধ্যমের মধ্যে থাকে সেই মাধ্যমে আলোক রশ্মির গতি যে রেখায় থাকে পদার্থটিকে ঠিক সেই রেখাতেই দেখা যায়।

মনে কর (৯ নং চিত্রে) পয়সাটি বাটির একটি বিন্দু। এখন ঐ বিন্দু হইতে আলোক রশ্মি নির্গত হইয়া জল তলের আর একটি বিন্দুতে (যেখানে জলতল ও বায়ু একত্র মিশিয়াছে) আসিয়া পৌঁছিল। এইবার পূর্ব হইতে অধিকতর তির্যক গতিতে ঐ রশ্মি আসিয়া চোখে পৌঁছিল। যদি চোখ এবং দ্বিতীয় বিন্দু সংযোগকারী রেখাকে বর্ধিত করা হয় তবে এই রেখার উপরেই একটি বিন্দুতে পয়সাটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সকল ক্ষেত্রেই এই নিয়ম খাটে।

দেখা গিয়াছে গুরুতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হইবার কালে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিয়া পড়ে। মনে কর **ক খ** দুইটি মাধ্যমের ছেদক রেখা (৯২নং চিত্র)। উপরের মাধ্যমটি লঘুতর, নিচের

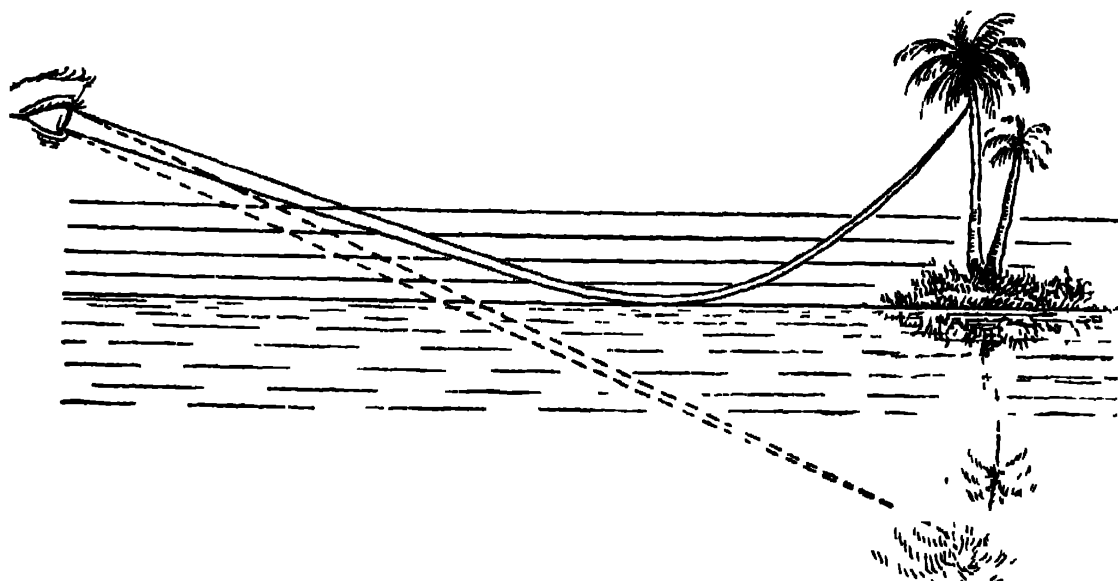
মাধ্যমটি গুরুতর। **ঙ অ** রশ্মিটি **ক খ** রেখার **অ** বিন্দুতে আপতিত হইয়া **অ জ** রেখায় প্রতিসরিত হইয়াছে। কিন্তু যদি রশ্মিটি **ঘ অ** রেখায় আসিয়া **অ** বিন্দুতে আপতিত হয় তখন **অ ছ** রেখায় প্রতিসরিত হয়। এখন এরূপ হইতে পারে যে যখন ঐ রশ্মি **গ অ** রেখায় আসিয়া **অ** বিন্দুতে আপতিত হয় তখন প্রতিসরিত রশ্মি **ক খ** রেখার সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইবার যদি এই রশ্মি আর একটু হেলিয়া পড়ে অর্থাৎ আপতন কোণ যদি আর একটুমাত্র বড় হয় তখন এই রশ্মি আর প্রতিসরিত না হইয়া যে মাধ্যম হইতে প্রথমে নির্গত হইয়াছিল সেই মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে। দুইটি মাধ্যমের মধ্যে একটি মাধ্যমের আলোক রশ্মি অপর মাধ্যমের প্রান্ত হইতে এইরূপে পুনরায় পূর্ববর্তী মাধ্যমে ফিরিয়া আসাকে আলোকের **পূর্ণ প্রতিফলন** (Total reflection) বলে। কোন এক মাধ্যমে আপতন কোণ যখন এমন হয়, যে অপর মাধ্যমে আলোকরশ্মি প্রতিসরিত না হইয়া দুইটি মাধ্যমের ছেদক রেখার সহিত মিশিয়া যায় তখন ঐ আপতন কোণকে মাধ্যম দুইটির **সঙ্কট** (Critical) কোণ বলে। কেবল মাত্র গুরু মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে রশ্মি যাইবার সময় এই কোণ পাওয়া যাইবে।



৯২নং চিত্র—পূর্ণ প্রতিফলন

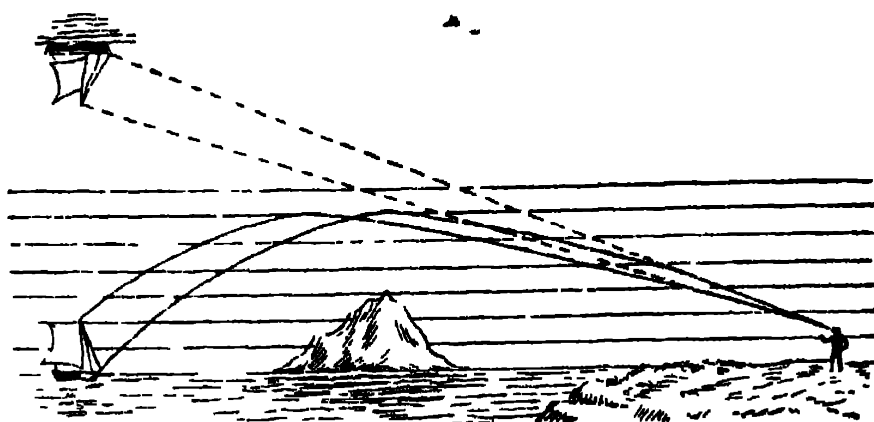
পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার দ্বারা সময় সময় প্রতারিত হয়। মরুভূমিতে সূর্য কিরণে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ু উপরের বায়ু অপেক্ষা অধিক উষ্ণ হওয়ায় লঘু হয়। মনে হয় লঘু হইতে গুরু বায়ুস্তর উপরি উপরি সজ্জিত রহিয়াছে। উপরিস্থিত কোন বস্তু হইতে আলোক রশ্মি ক্রমাগত যখন নিম্নতর বায়ু রাশির মধ্যে আসে ততই তাহারা কোন দুই বায়ুস্তরের মিলন রেখায় যে অভিলম্ব কল্পনা করা হয় তাহা হইতে দূরে সরিয়া যায়। এইরূপে ক্রমাগত

আলোক রশ্মি বাঁকিয়া অবশেষে এমন এক বায়ুস্তরে আসিয়া পৌঁছায় যখন ঐ



৯৩নং চিত্র—মৃগতৃষ্ণিকা

আলোক রশ্মি আর নিচের দিকে না গিয়া পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় উপর দিকে উঠিতে থাকে। এখন যদি মানুষের চোখে এই রশ্মি পতিত হয়



৯৪নং চিত্র—মরীচিকা

তখন ঐ বস্তুর একটি প্রতিবিম্ব সে অন্য দিকে দেখিতে পায়। গাছপালাময় কোন জলাশয়ের এইরূপ প্রতিবিম্ব দেখিয়া মরুভূমিতে মানুষ দিকভ্রম করিয়া অন্যদিকে নীত হয়। ফলে জলাশয় না পাইয়া তৃষ্ণায় প্রাণ হারায়। হরিণও

এইরূপে প্রতারিত হয় বলিয়া এইরূপ মায়াকে **মৃগতৃষ্ণিকা** বা **মরীচিকা** (Mirage) বলা হয়।

সমুদ্র তীরেও এইরূপ মায়া (Illusion) দেখা যায়। সমুদ্র তীরে নিচের বায়ু ঘন এবং উপরের বায়ু লঘু হওয়ায় মরুভূমির মরীচিকার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। সেখানে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের প্রতিবিম্ব অনেক সময় আকাশ বক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়।

সংক্ষেপ ঃ—মসৃণ তলে পতিত হইয়া আলোক পুনরায় যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে ফিরিয়া যায়—ইহাকে আলোর প্রতিফলন বলে। আপতন রশ্মি, প্রতিফলন রশ্মি ও অভিলম্ব একই তলে থাকে। আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। আপতিত আলোর সমস্ত অংশই প্রতিফলিত হয় না কিছু প্রতিসরিতও হয়। কোন একটি বস্তুর কোন অংশ প্রতিফলক হইতে যত দূরে থাকে, প্রতিফলকের পিছনে ঠিক ততদূরে সেই অংশের প্রতিমূর্তি পড়ে বলিয়া প্রতিমূর্তিকে উল্টা দেখায়। একটি মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে আলোক প্রবেশ করার নাম প্রতিসরণ। প্রতিসরণকালেও আপতন রশ্মি, অভিলম্ব ও প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে এবং আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণ এক নির্দিষ্ট অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি পায়। লঘু মাধ্যম হইতে গুরু মাধ্যমে প্রবেশ করিবার কালে আলোক রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায় এবং গুরু মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করিবার কালে অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। লঘু মাধ্যম হইতে গুরু মাধ্যমে এইরূপ প্রবেশকালে প্রতিসরিত রশ্মি যখন অভিলম্ব হইতে এত দূরে যায় যে অভিলম্বের সহিত এক সমকোণ হইয়া যায় তখন পূর্ণ প্রতিফলন হয়। পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য সমুদ্র বা মরুভূমিতে মরীচিকা দৃষ্ট হয়। পূর্ণ প্রতিফলন কালে আপতন কোণের পরিমাণকে মাধ্যম দুইটির সঙ্কট কোণ বলা হয়।

অষ্টম প্রশ্নমালা

১। প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের নিয়ম কয়টি প্রমাণ করিবার জন্য কি পরীক্ষা করিবে বর্ণনা কর। (Describe experiments by which you can prove the laws of Reflection and Refraction.)

২। আয়নাতে কতদূরে কি ভাবের প্রতিবিম্ব দেখা যায় চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া লিখ। (Illustrate with a figure the formation of images after reflection on plain

mirrors showing the distances between the mirror and the object and between the image and the reflecting surface)

৩। পেরিস্কোপ যন্ত্র বর্ণনা কর। (Describe a Periscope.)

৪। জলে ছড়ি ডুবাইলে কেন মনে হয় যেন ছড়িটি বাঁকিয়া গিয়াছে ? চৌবাচ্চায় জল থাকিলে উহাকে অগভীর মনে হয় কেন ? (Why a rod seems to be bent when immersed into water ? Why a cistern looks shallow when it is full of water ?)

৫। একটি বাটিতে পয়সা রাখিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইলে পয়সাটি দেখা যায় না। বাটিতে জল ঢালিলে পয়সাটি দেখা যাইতে পারে। কেন ? (A coin in a cup is not visible from a certain distance but when water is poured into the cup it may be visible Why ?)

৬। পূর্ণ প্রতিফলন কাহাকে বলে ? (Explain total Reflection ?)

৭। মরীচিকা কেন দেখা যায় লিখ। চোখে এরূপ ধাঁধা লাগাইতে পারে এরূপ আর একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা কর। (Explain the formation of illusion in a desert. Describe another natural optical illusion)

নবম পরিচ্ছেদ

বর্ণ ও রামধনু

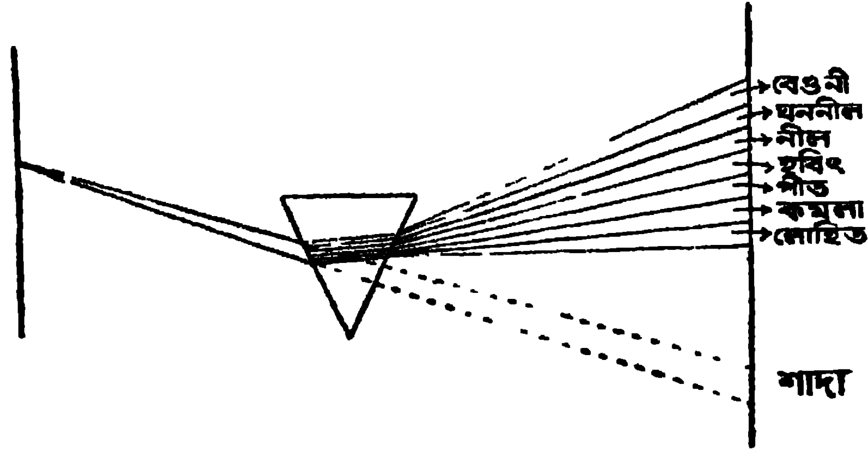
দুই শতাধিক বৎসর পূর্বে বৈজ্ঞানিকবর **নিউটন** লক্ষ্য করিয়াছিলেন তে-পলা কাচ (Prism) এর মধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া যখন বাহির হইয়া আসে তখন ঐ আলোক-রশ্মি বহুবিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের গতিপথ পূর্বগতিপথ হইতে বাঁকিয়া যায়। বর্ণ কয়টির মধ্যে সাতটি প্রধান—বেগুনে (Violet), ঘোর নীল (Indigo), নীল (Blue) সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলালেবু রঙ্ (Orange) ও লাল (Red)। এই সাতটি রঙ্‌এর সমন্বয়কে **বর্ণালি** (Spectrum) বলা হয়। ঝাড় লণ্ঠনে যে সমস্ত তে-পলা কাচের ঝুরি থাকে তাহার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিলে তোমরা অনেকে



৯৫নং চিত্র—বৈজ্ঞানিক নিউটন

এমন রঙ্ দেখিয়া থাকিবে। এইরূপ বর্ণালির প্রত্যেক বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বা আয়তন

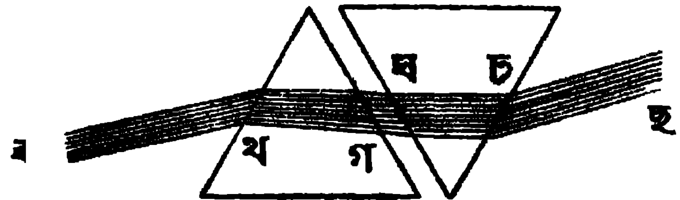
সমান নহে। বেগুনী রঙ সর্বাধিক আয়তন অধিকার করে বটে, কিন্তু হলুদে রঙ সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। আবার ইহাদের প্রত্যেকটির গতিপথ পূর্বটির অপেক্ষা



৯৬নং চিত্র—বর্ণালি

অধিক বাঁকিয়া যায়। চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে লাল রঙ্ নত বাঁকিয়া পড়ে, কমলালেবু রঙ তদপেক্ষা অধিক বাঁকিয়া পড়ে, আবার কমলা লেবু রঙ নত বাঁকিয়া পড়ে, হলুদে রঙ তদপেক্ষা অধিক বাঁকিয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমশ সবুজ, নীল, ঘন নীল ইত্যাদি, বেগুনী রঙ্ সর্বাপেক্ষা অধিক বাঁকিয়া পড়ে।

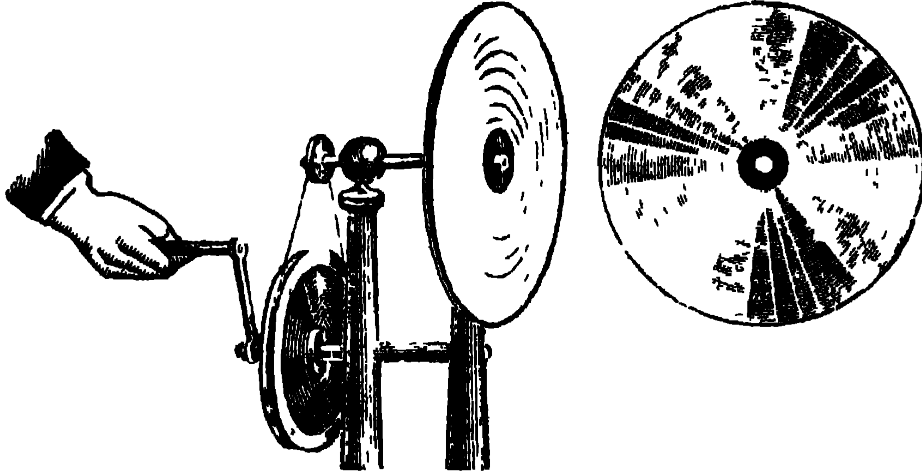
আবার যদি এই সাতটি রঙএর রশ্মি পুনরায় আর একটি বিপরীত ভাবে অবস্থিত তেপলা কাচের মধ্য দিয়া গিয়া বাহির হইয়া আসে তবে তখন ইহা পুনরায় সূর্যরশ্মির ন্যায় বর্ণহীন হইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা এইবার স্থির করিয়া বলিতে পারি যে সূর্যরশ্মি প্রকৃতপক্ষে সাতটি বর্ণের



৯৭নং চিত্র—বর্ণালির সংমিশ্রণ

সমষ্টি। বস্তুত সকল শাদা আলোক মাত্রই পূর্বোক্ত সাতটি বর্ণের সমষ্টি। নিউটন সাহেব এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। একটি চক্রাকার পাতকে ৯৮নং চিত্রের ন্যায় পূর্বোক্ত সাতটি রঙ্এ

বিভিন্ন অনুপাতে বণ্টিত করিয়া চক্রটিকে জোরে ঘুরাইলেই চক্রটিকে শাদা রঙএর বলিয়া মনে হইবে।



৯৮নং চিত্র—নিউটনের থালি

এইবার পদার্থের বর্ণের কথা ধরা যাউক। আমরা যখন কোন সাদা রঙ্এর পদার্থ দেখিতে পাই, তখন ধরিয়া লইতে পারি যে ইহার মধ্যে বর্ণালির সকল প্রকার বর্ণগুলি বর্তমান আছে। কিন্তু যখন কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণের পদার্থ দেখিতে পাই তখন কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি?

উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। পূর্বেই জানা গিয়াছে পদার্থের অণুগুলির স্পন্দন হইতে তাপ শক্তির উদ্ভব হয় এবং স্পন্দনের গতির হ্রাস বৃদ্ধির সহিত উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। তেমনই ঈথার তরঙ্গের মধ্য দিয়া পদার্থের স্পন্দন আমাদিগকে আলোকের অনুভূতি দেয়। পদার্থের স্পন্দন হইতে উদ্ভূত তরঙ্গে তাপ ও আলোকের অনুভূতি পাই বটে কিন্তু উভয় প্রকার তরঙ্গের পার্থক্য আছে। তরঙ্গের গতিবেগের হ্রাস বৃদ্ধির উপর যেমন উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে তেমনই যে তরঙ্গ হইতে আমরা আলোক পাই তাহার তারতম্যের জন্য আমরা বিভিন্ন বর্ণের আলোকের অনুভূতি পাই। সূর্যকে আমরা শাদা দেখি কারণ শাদা রঙ্এর অনুভূতি জাগাইবার জন্য যতগুলি বর্ণের তরঙ্গ যে অনুপাতে থাকা দরকার সূর্যের

আলোতে তাহাই বর্তমান রহিয়াছে। আবার যখন কোন বায়বীয় পদার্থের লাল, হলদে রঙের শিখা দেখি তখন বুঝিতে হইবে ইহাতে নীল বা অন্য বর্ণের তরঙ্গের অভাব আছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা নিউটন সাহেব ঠিক করিয়াছিলেন যে স্বচ্ছই হউক আর অস্বচ্ছই হউক কোন পদার্থের নিজস্ব বর্ণ কিছুই নাই; তবে যে তাহাদিগকে কোন এক নির্দিষ্ট বর্ণের দেখি তাহা কেবলমাত্র তাহাদের বিশিষ্ট বর্ণের তরঙ্গ শোষণের ফলে।

যখন শাদা রঙ্এর আলো কোন একবর্ণের অস্বচ্ছ পদার্থের উপর পড়ে তখন ইহা বর্ণালির বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের কতকগুলি বর্ণ ইহা প্রতিফলিত করে এবং অবশিষ্টগুলি শোষণ করিয়া লয়। কাজেই যে বর্ণগুলি ইহা প্রতিফলিত করে পদার্থটিকে সেই সেই বর্ণের বলিয়া মনে হয়।

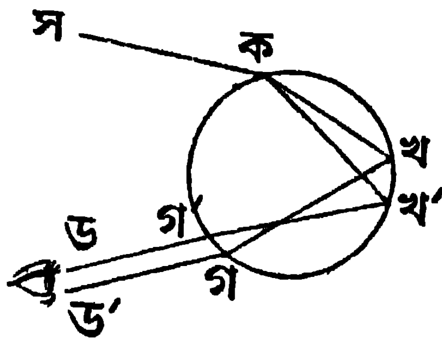
তাহা হইলে একটি লালবর্ণের ফুলকে আমরা লাল দেখি ইহার কারণ ঐ ফুল সূর্যালোকের বর্ণালির সমস্ত বর্ণ শোষণ করিয়া মাত্র আমাদের চোখে লাল রঙ্টি ফিরাইয়া দেয়। অতএব যে পদার্থ বর্ণালির সমস্ত বর্ণই আমাদের চোখে ফিরাইয়া দেয় তাহাকে আমরা শাদা দেখি। আবার যে পদার্থ বর্ণালির কোন বর্ণই আমাদের চোখে ফিরাইয়া দিতে পারে না তাহাকে কাল রঙ্এর বলিয়া মনে করি। বস্তুত কালিমা কোন একটি নির্দিষ্ট রঙ্ নহে, সকল বর্ণের অভাবই কাল রঙ।

সূর্যালোকে একটি বিশিষ্ট বর্ণের পদার্থকে যেমন দেখায় অন্য রঙ্এর আলোকে পদার্থটিকে ঠিক সেই রকম রঙএর দেখায় না। শাদা সূর্যালোকে যে ফুলটিকে শাদা দেখায় লাল আলোকে সেই ফুলই লাল দেখায় এবং সবুজ আলোকে সবুজ দেখায়। আবার সূর্যালোকে যে পদার্থকে লাল দেখায় লাল আলোকে তাহা অধিকতর লাল দেখায়, কিন্তু বর্ণালির অন্য কোন আলোকে যদি ঐ লাল পদার্থটিকে ধরা হয় তবে উহাকে কাল দেখাইবে।

কারণ পদার্থটি কেবলমাত্র লাল বর্ণই প্রতিফলিত করিতে পারে বাকি সমস্ত বর্ণ শোষণ করিয়া লয়।

রামধনু—আকাশে আমরা যে রামধনু দেখি তাহা জলকণার মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মির বিশ্লেষণ ভিন্ন আর অন্য কিছুই নহে। বৃষ্টি হইবার ঠিক পূর্বে কিংবা পরে বায়ু-মণ্ডলে ভাসমান জলকণাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয়। তখন এই জলকণাগুলি তে-পলা কাচের ন্যায় কার্য করে। সূর্যরশ্মি আসিয়া এই জলকণায় পড়িলে জলকণার মধ্য দিয়া প্রতিসরিত হইয়া এই জলকণার মধ্যেই পূর্ণ প্রতিফলিত হয় এবং শেষে ঐ প্রতিফলিত রশ্মি পুনরায় প্রতিসরিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু জলকণায় আসিয়া সূর্যরশ্মি বিশ্লিষ্ট হওয়ায় আমরা বর্ণালি দেখিতে পাই। অনেকগুলি জলকণায় এইরূপ বর্ণালির একত্র সমাবেশকেই আকাশে আমরা অর্ধ বৃত্তাকার রামধনুরূপে দেখিতে পাই।

মনে কর **স** সূর্য। উহার একটি রশ্মি **স ক** আসিয়া একটি জলকণার **ক** বিন্দুতে পতিত হইয়া জলকণার মধ্যেই প্রতিসরিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া জলকণার **খ খ'** সীমার মধ্যে রহিল। পরে এই **খ** ও **খ'** বিন্দু হইতে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া ইহা যথাক্রমে জলকণার **গ গ'** বিন্দু হইতে প্রতিসরিত হইয়া আমাদের চোখে **ড ড'** স্থানে আসিয়া পড়িল। এখন সূর্যের রশ্মি বর্ণালির বর্ণ সমষ্টিতে বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বহু জলকণার বর্ণালি আমাদের চোখে বিশাল রামধনুর আকারে দেখা দেয়। চিত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় সূর্য যে দিকে থাকে রামধনু ঠিক তাহার বিপরীত দিকে দেখা যায়। এইজন্য সকালে রামধনু দেখা দিলে উহাকে পশ্চিমাকাশে, এবং বিকালে দেখা দিলে পূর্বাকাশে দেখা যায়।



৯১নং চিত্র—রামধনুর জলকণায় সূর্যরশ্মির বিশ্লেষণ

অনেক সময় একটি রামধনুর কিছু দূরে অন্য একটি রামধনু দেখা যায়। তখন কিন্তু দুইটি রামধনুর বর্ণবিন্যাস ক্রমে বিপরীত হইয়া যায়। একটির উপর দিকে লাল থাকিলে অন্যটির উপর দিকে বেগুনী এবং পর পর অন্যান্য বর্ণগুলি পর্যায়ক্রমে সাজান থাকে। রামধনু আকাশে দেখা দিলে বুঝা যায়, হয় সেই স্থানে অল্প পূর্বেই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে নতুবা শীঘ্রই বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার কারণ, ঐ সময় জলকণাগুলি বড় না হইলে বর্ণালি সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু জলকণাগুলি বড় হইলে ভারি হইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

কৃত্রিম উপায়েও রামধনুর মত অর্ধবৃত্তাকার বর্ণালি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সূর্যের দিকে পিছন করিয়া কোন জলপাত্রের উপর জলের কুলি করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সৃষ্টি হয় তন্মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি প্রতিসরণের ফলে জল-পাত্রের উপর রামধনুর ন্যায় বর্ণালি দেখিতে পাওয়া যায়। জলপ্রপাতেও অনুরূপ কারণে রামধনুর ন্যায় বর্ণালি দেখিতে পাওয়া যায়।

সংক্ষেপ ঃ—তে-পলা কাচের মধ্য দিয়া শাদা আলো যাইলে উহারা সাতটি বিভিন্ন রঙে বিভক্ত হইয়া যায়, বস্তুত শাদা রঙ ঐ সাতটি রঙএর সমাবেশ মাত্র। দুইটি তে-পলা কাচ বিপরীত ভাবে বসাইয়া তাহার মধ্যে আলোক প্রবেশ করাইলে কিন্তু বিভিন্ন রঙএ বিভক্ত হইবে না। যে পদার্থের রঙ শাদা, বুঝিতে হইবে তাহাতে সাতটি বর্ণ নির্দিষ্ট অনুপাতে আছে। যে বস্তুর রং কাল বুঝিতে হইবে তাহাতে কোন রংই নাই। এতদ্ভিন্ন যাহার যে রং, বুঝিতে হইবে সেই পদার্থ বর্ণালির মাত্র সেই রং ত্যাগ করিয়াছে। আলোকের রং অনুসারে দৃশ্যমান পদার্থের রং বদলাইয়া যায়। সূর্যালোকে যাহা শাদা দেখায়, লাল আলোকে তাহাকে লাল দেখাইবে, নীল আলোকে তাহাকে নীল দেখাইবে ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলে জলীয় কণা তে-পলা কাচের কাজ করে। তাই রৌদ্র পড়িলে ইহা হইতে সূর্যালোক বিশ্লিষ্ট হইয়া সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনুর সৃষ্টি করে।

নবম প্রশ্নমালা

১। বর্ণালি কাহাকে বলে? একটি পর্দায় বর্ণালি দেখাইতে হইলে কিরূপে তাহা পারা যায় বিস্তৃতভাবে লিখ। বর্ণালির বর্ণগুলি পর্যায়ক্রমে লিখ (What is a spectrum ? Describe

in detail how can you produce spectrum on a screen. Write down the colours of light in order of their being dispersed in a specturm.)

২। এমন দুইটি পরীক্ষা বর্ণনা কর যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমান করিতে পারা যায় শাদা রঙ সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ মাত্র। (Describe two experiments which can directly prove that white colour is composed of seven different colours only.)

৩। বুঝাইয়া দাও 'পদার্থের নিজস্ব বর্ণ নাই'। কোন একটি পদার্থের বর্ণ কাল বা অন্য কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণ হয় কেন ? (Prove, matters have no colour of their own. Why does a certain substance take black or some other colour ?)

৪। বিভিন্ন বর্ণের আলোকে একটি নির্দিষ্ট বর্ণের পদার্থ কি একই রকম দেখা যায় ? বিস্তৃত ভাবে বুঝাইয়া উত্তর দাও। (Answer, explaining in detail—does a substance retain the same colour when lights of different colours fall on it ?)

৫। রামধনু কিরূপে উৎপন্ন হয় লিখ। (Explain the formation of a rainbow.)

[কঃ বিঃ ১৯৪০]

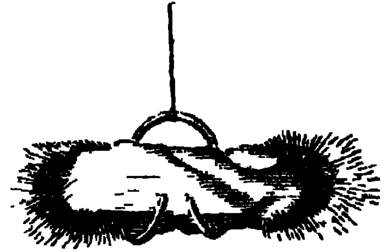
৬। বৃষ্টি হইবার কিছু আগে কিংবা কিছু পরে রামধনু দেখা যায় কেন ? (Why rainbow is seen just before or after a shower of rain ?)

দশম পরিচ্ছেদ

চুম্বকতত্ত্ব

চুম্বক

বাজারে অল্পদামে চুম্বক কিনিতে পাওয়া যায়, এবং তাহা যে লোহাকে টানে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান, সেগুলি কৃত্রিম চুম্বক। ভূগর্ভে এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহাও লৌহ আকর্ষণ করে। পুরাকালীন ইতিবৃত্তে জানা যায় যে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বেও এই পাথরের লৌহ-আকর্ষণী শক্তির বিষয় চীনদেশের লোকেরা জানিত ইহাকে **স্বভাবজ চুম্বক** (Natural magnet) বলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ইহা লৌহ এবং অক্সিজেনের মিলনে গঠিত। চিত্রে দেখ, এইরূপ একটি স্বভাবজ চুম্বকখণ্ড লৌহচূর্ণে

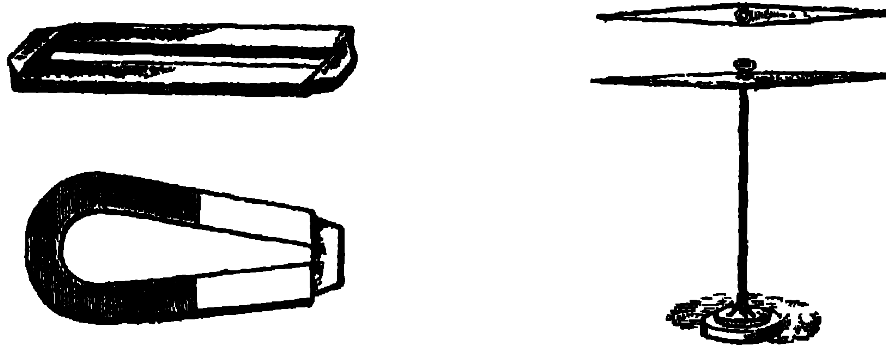


•••নং চিত্র—স্বভাবজ চুম্বক

ডুবাইতে লৌহ চূর্ণগুলি আকৃষ্ট হইয়া কিরূপে ইহার গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে। আবার একটি সূতার দ্বারা এই চুম্বকখণ্ডটিকে ঝুলাইয়া দিলে ইহার একপ্রান্ত সর্বদা উত্তরদিকে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণদিকে ফিরিয়া থাকে। ইহার এই গুণ জানিয়া বহুদিন হইতেই সমুদ্রে দিঙ নির্ণয় করিবার জন্য নাবিকগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, এইজন্য ইহার আর একটি নাম **চালক-পাথর** (Lode stone)।

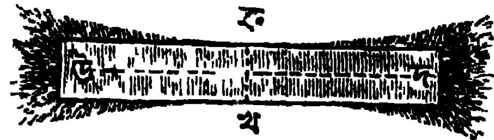
স্বভাবজ চুম্বকের লৌহাকর্ষণী শক্তি বড় অল্প, আকৃতিরও কিছু স্থিরতা নাই। এইজন্য ইহার পরিবর্তে কৃত্রিমচুম্বক ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিমচুম্বক সাধারণত

তিনটি বিভিন্ন আকারে প্রস্তুত হয়; ১০১নং চিত্রে উহা প্রদর্শিত হইল। দেখ প্রথমটির আকৃতি দণ্ডের ন্যায় ও দ্বিতীয়টির আকৃতি অশ্বখুরের ন্যায়। তৃতীয় প্রকারের আকৃতিবিশিষ্ট চুম্বককে কাঁটাচুম্বক বলা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে



১০১নং চিত্র—কৃত্রিম চুম্বকের আকৃতি

লইয়া লৌহচূর্ণে ডুবাইয়া তুলিয়া ধর। দেখ চুম্বকটির দুই প্রান্তে (১০২নং চিত্র) প্রচুর পরিমাণে লৌহচূর্ণ লাগিয়া আছে, মধ্যস্থানে একেবারে লাগে নাই এবং প্রান্তদ্বয় হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত স্থানে আকৃষ্ট লৌহচূর্ণ ক্রমশ কমিয়া আসিয়াছে। চুম্বকটির দুই প্রান্তে যে যে স্থানে আকর্ষণী শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদিগকে চুম্বকের **মেরু** (Poles) বলে। এখন চুম্বকদণ্ডটিকে সূতা দ্বারা ঝুলাইয়া দিলে দেখিবে যে দণ্ডটি কয়েকবার এদিক ওদিক দুলিয়া স্বভাবজ চুম্বকের ন্যায় উত্তরদক্ষিণে স্থির হইয়া দাঁড়াইবে।



১০২নং চিত্র—চুম্বকের মেরু

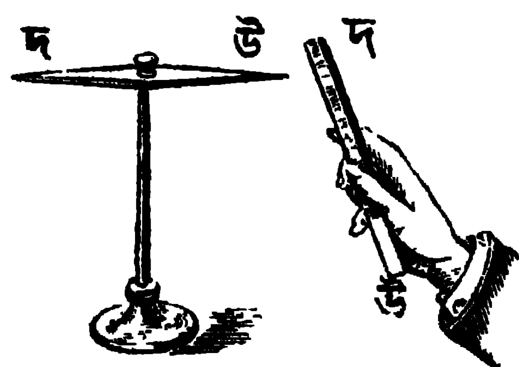
চুম্বকের যে প্রান্ত উত্তর দিকে ফিরিয়া থাকে, সেই প্রান্তের মেরুকে উত্তর-দর্শী মেরু বা সংক্ষেপে **উত্তর মেরু** এবং অপরটিকে দক্ষিণ-দর্শী মেরু বা **দক্ষিণ মেরু** বলে। একটি দণ্ডচুম্বককে মধ্যস্থলে বাঁকাইলে উহা অশ্বখুরের আকার ধারণ করে। উহার দুই মেরু পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ায় উহার প্রান্তদেশে লৌহাকর্ষণী শক্তি সমধিক বর্ধিত হয়; লৌহচূর্ণে ডুবাইয়া দেখ,

কত অধিক পরিমাণে লৌহচূর্ণ আকৃষ্ট হইয়াছে। কাঁটাচুম্বকের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র সাদা পাথরের কীলক থাকে এবং উহা একটি সূক্ষ্মাগ্র সূচের উপর রক্ষিত হয়। একটু নাড়াইয়া দিলে, ইহা আশে পাশে ঘুরিয়া শেষে উত্তর-দক্ষিণে স্থির হইয়া থাকে।

একটি নিকেলের দুয়ানি, রূপার আধুলি, কাচের বা সোনার বোতাম, এক টুক্‌রা কাগজ, এক টুকরা লোহা ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র লোহার উপর চুম্বকের আকর্ষণ বেশী, নিকেলের উপর খুব কম এবং অন্যান্য বস্তুগুলির উপর মোটে নাই।

একটি কাচের প্লেটের উপর কিছু লৌহচূর্ণ রাখিয়া তাহার অপর পৃষ্ঠে একটি দণ্ডচুম্বক নাড়াচাড়া করিলে দেখিবে, লৌহচূর্ণ উহার সঙ্গে সঙ্গে প্লেটের উপর সরিতে থাকিবে। এইরূপে প্রমাণ করা যায় যে কাচ, কাগজ জল, কাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়াও চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে।

চুম্বকের ধর্মঃ—একটি দণ্ড-চুম্বককে সূতায় ঝুলাইয়া তাহার উত্তর-মেরু বা একটি কাঁটা চুম্বকের উত্তর-মেরু খড়ি দিয়া চিহ্নিত কর। একটি কাঁটাচুম্বক লও. উহা উত্তর দক্ষিণে স্থির হইয়া দাঁড়াইলে দণ্ডচুম্বকের উত্তরমেরু উহার উত্তরমেরুর কাছে ধীরে আনিতে থাক, দেখ কাঁটার উত্তরমেরুটি ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতেছে। এইবার দণ্ড চুম্বকের উত্তরমেরু কাঁটার দক্ষিণ-মেরুর নিকট লইয়া আসিলে দেখিবে যে,



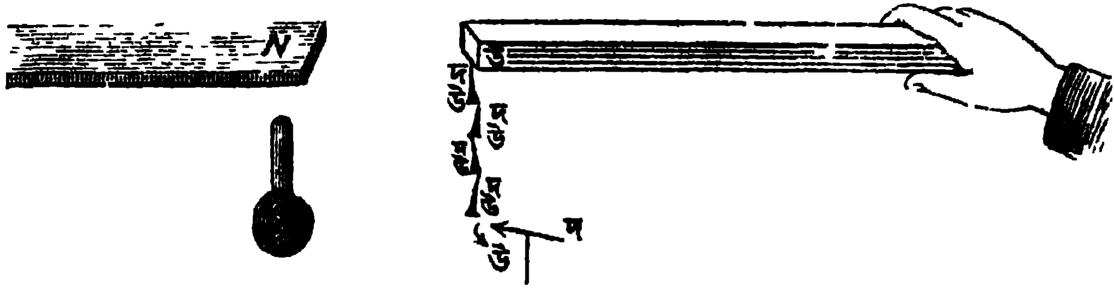
১০৩নং চিত্র—চুম্বকের মেরু

কাঁটার এই প্রান্তটি আকৃষ্ট হইতেছে। ঐরূপে চুম্বকদণ্ডের দক্ষিণ-মেরু কাঁটার দক্ষিণমেরুকে বিকর্ষিত করিবে এবং উত্তরমেরুকে আকৃষ্ট করিবে (১০৩নং চিত্র)। অতএব জানা গেল যে, সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট দুইটি মেরু

পরস্পর বিকর্ষণ করে এবং ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি মেরু পরস্পর আকর্ষণ করে।

আরও দেখ, কাঁটাচুম্বকের উত্তর মেরু হইতে দণ্ডচুম্বকের উত্তর মেরুটি দূরে ধরিলে বিকর্ষণ অতি সামান্যই হইবে; কিন্তু দণ্ডচুম্বককে কাছে আনিলেই বিকর্ষণ অধিক হইবে। অতএব দূরত্ব কমিলে চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বর্ধিত হয় এবং দূরত্ব বাড়িলে উহা কমিয়া যায়।

একটি কাঁচালোহার টুক্‌রা লৌহচূর্ণের উপর ধরিয়া দেখ, উহা লৌহচূর্ণকে আকর্ষণ করিতেছে না, কিন্তু যদি ঐ কাঁচা লোহার টুক্‌রার উপরে একটি দণ্ড-চুম্বকের এক প্রান্ত ধরা যায়, তবে দেখিবে লৌহচূর্ণ আকৃষ্ট হইয়া কাঁচালোহার



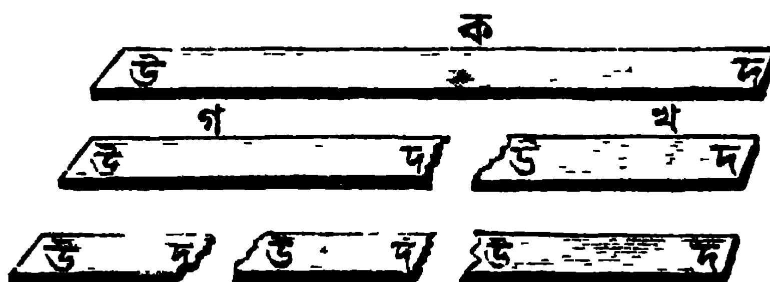
১০৪নং চিত্র—চুম্বক শক্তির আবেশ

গায়ে লাগিতেছে (১০৪নং চিত্র)। আবার চুম্বকটি সরাইয়া লইলে সমস্ত লৌহ-চূর্ণগুলি খসিয়া পড়িবে। লৌহখণ্ডটি চুম্বকের নিকট আসিলে অথবা ইহাকে স্পর্শ করিলে অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়, এই ব্যাপারকে চুম্বকশক্তির **আবেশ** (**Magnetic induction**) বলে।

লৌহখণ্ড কোনও একটি স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা এরূপে আবিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় আর একটি লৌহখণ্ডকে আবিষ্ট করিতে পারে, দ্বিতীয়টি আবার আর একটিকে আবিষ্ট করিতে পারে। বলা বাহুল্য, এই আবেশ-শক্তি পর পর ক্রমশ কমিতে থাকে। চিত্রে দেখ, একটি চুম্বকে কতগুলি কাঁটা পেরেক এইরূপে আবিষ্ট হইয়া ঝুলিতেছে।

ধর, একটি লৌহখণ্ড চুম্বকধর্মবিশিষ্ট কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহার এক প্রান্ত চিহ্নিত করিয়া একটি কাঁটাচুম্বকের উভয় মেরুর কাছে পর পর ধর। যদি দেখা যায় উভয় ক্ষেত্রেই কাঁটা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তবে উহা চুম্বক হইতেই পারে না, যদি চুম্বক হইত, তবে কাঁটার এক প্রান্তে আকর্ষণ এবং অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ হইত। কোনও বস্তু চুম্বক কি না, বিকর্ষণ দ্বারাই সঠিক নির্ণীত হয়।

তোমরা বোধ হয় জান, ঘড়ির স্প্রিং খুব ভাল ইস্পাতে প্রস্তুত হয়। একটি স্প্রিং হইতে তিন চারি ইঞ্চি লম্বা একটি টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া লও এবং নিম্নবর্ণিত উপায়ে এই স্প্রিং টুক্‌রাটিকে চুম্বকে পরিণত কর। ইহার দুই প্রান্তে দুই মেরু সৃষ্ট হইবে, কিন্তু মাঝখানে কোনও চুম্বকশক্তি থাকিবে না। এখন টুক্‌রাটিকে মাঝামাঝি ভাঙ্গিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক টুক্‌রাই এক একটি পৃথক চুম্বক হইয়াছে (১০৫নং চিত্র)। প্রত্যেকেরই ভগ্নপ্রান্তে তাহার অপর প্রান্তস্থ মেরুর বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট

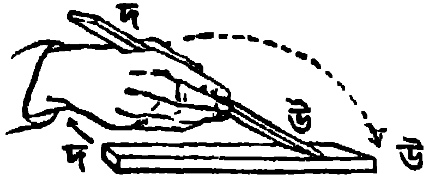


১০৫নং চিত্র ভগ্ন চুম্বক

মেরুর আবির্ভাব হইয়াছে। পুনরায় এই দুইটি টুক্‌রাকে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট টুক্‌রা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক টুক্‌রাই এক একটি স্বতন্ত্র চুম্বক। তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পদার্থমাত্রই বহু অণুর সমষ্টি। অতএব বলা যাইতে পারে, যে, চুম্বকের অণুমাত্রেই এক একটি অতি ক্ষুদ্র চুম্বক। বস্তুত, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, লৌহমাত্রেরই অণুগুলি এক একটি চুম্বক। সাধারণ অবস্থায় এই আণবিক চুম্বকগুলি এলোমেলো ভাবে থাকে বলিয়া লৌহখণ্ডের চুম্বকশক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। যখন কোনও লৌহখণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা

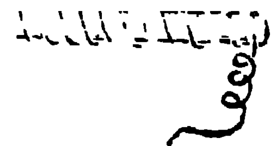
হয়, তখন এই আণবিক চুম্বকগুলি নিয়মিতভাবে সজ্জিত হয়। উত্তাপ যোগে ইহারা আবার এলোমেলো হইয়া যায় বলিয়া লৌহদণ্ডের চুম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

চুম্বকন (Magnetisation) ঃ—সাধারণ লৌহফলককে চুম্বক করিতে হইলে, একটি স্থায়ী চুম্বকের প্রয়োজন। লৌহফলকটি টেবিলের উপর রাখিয়া চুম্বকের একটি মেরু, ধর উত্তর-মেরু, উক্ত ফলকের একপ্রান্তে রাখ, পরে উহাকে লৌহফলকটির উপর চাপিয়া অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘসিয়া যাও (১০৬ চিত্র)। তথা হইতে চুম্বক তুলিয়া লইয়া পুনরায় লৌহফলকটির গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ঘসিয়া যাও। কিছুক্ষণ এইরূপ করিবার পর লৌহফলকটি চুম্বকে পরিণত হইবে। এক্ষণে একটি কাটাচুম্বকের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, লৌহফলকটির যে প্রান্ত হইতে স্থায়ী চুম্বকটির উত্তরমেরু বারে বারে তুলিয়া লওয়া হইতেছিল, সেই প্রান্তে দক্ষিণ-মেরু এবং অপর প্রান্তে উত্তরমেরু হইয়াছে। লৌহফলকটির এক পৃষ্ঠ এইরূপে কিছুক্ষণ ঘসা হইলে উল্টাইয়া উহার অপর পৃষ্ঠে ঐরূপ ভাবে চুম্বক ঘসিলে ইহার শক্তি বর্ধিত হয়।



১০৬নং চিত্র—চুম্বকন

কাঁচালোহা চুম্বকে পরিণত হইলে উহার চুম্বকত্ব শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ভাল ইস্পাতকে চুম্বক করিলে উহার চুম্বকত্ব বহুকাল স্থায়ী হয়। এইজন্য স্থায়ী চুম্বক ইস্পাতেই প্রস্তুত হয়। স্থায়ী চুম্বকের সাহায্য ব্যতীত অপর এক উপায়েও লোহা চুম্বকে পরিণত হইতে পারে। একটি লৌহদণ্ডকে রেশমজড়িত তার দিয়া চিত্রের মত জড়াও। এক্ষণে ঐ তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালিত করিলে অত্যল্প সময়েই লৌহদণ্ডটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। তখন ইহাকে **তড়িৎ**


১০৭নং চিত্র—তড়িৎ চুম্বক

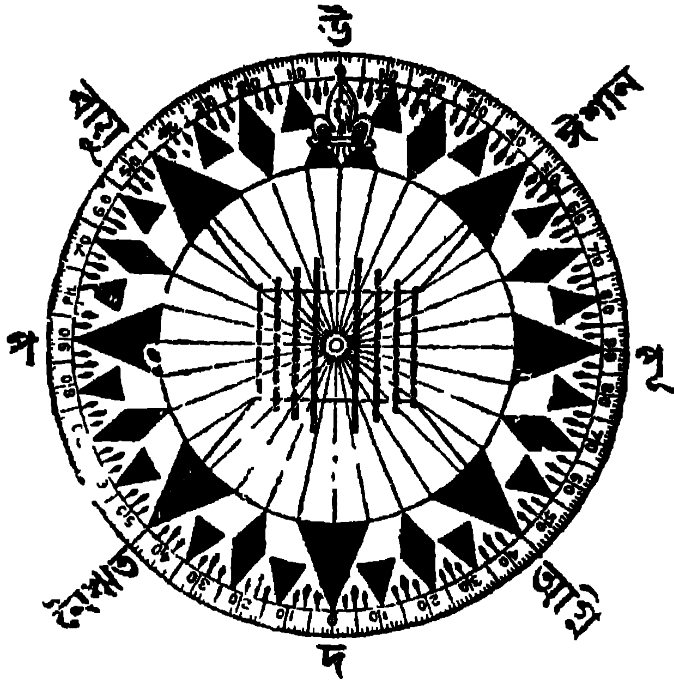
চুম্বক (Electro Magnet) বলে। লৌহদণ্ডটি কাঁচালোহা হইলে দেখিবে, যতক্ষণ তারে তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকিবে, ততক্ষণ লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব পুরা থাকিবে; কিন্তু প্রবাহ বন্ধ করিলেই উহার চুম্বকত্ব প্রায় সমস্তই চলিয়া যাইবে; দণ্ডটি ইস্পাতের হইলে তাহাকে চুম্বক করিবার পর তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিলেও ইহার চুম্বকশক্তি অল্পই কমে। আবশ্যকমত বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা লৌহদণ্ডকে মুহূর্ত মধ্যেই চুম্বকে পরিণত করা যায় এবং প্রয়োজন না থাকিলে মুহূর্ত মধ্যে ইহার চুম্বকত্ব নষ্ট করিতে পারা যায় বলিয়া তড়িৎ চুম্বক প্রস্তুত করিতে ইস্পাতের পরিবর্তে কাঁচা লোহাই ব্যবহার করা হয়।

একটি লৌহদণ্ডকে যেমন বিভিন্ন উপায়ে চুম্বক করা যায়, ইচ্ছা করিলে উহার চুম্বকত্ব তেমনই নষ্টও করা যায়। একটি চুম্বককে আগুনে তাতাইয়া লাল কর, শীতল হইলে একটি কাঁটা-চুম্বকের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, ইহার চুম্বকত্ব আর নাই। চুম্বকের উপর জোরে কয়েকবার হাতুড়ী মারিলেও এইরূপ হইতে দেখা যায়।

ভূ-চুম্বক :—সূতায় বিলম্বিত চুম্বকদণ্ড ও কাঁটাচুম্বক সর্বদা প্রায় উত্তর-দক্ষিণে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, পৃথিবী নিজেই একটি প্রকাণ্ড চুম্বক এবং সাধারণ চুম্বকের ন্যায় ইহারও দুইটি মেরু আছে। ইহাদের অবস্থান পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী। ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুর প্রকৃতি, কাঁটা-চুম্বকের দক্ষিণমেরুর প্রকৃতির সমান, এইজন্য কাঁটা-চুম্বকের উত্তরদর্শী মেরু সর্বদা উত্তরদিকে ফিরিয়া থাকে। এই ভূ-চুম্বকের শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ লৌহখণ্ডকে সময় সময় চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

দিগ্‌দর্শী বা **কম্পাস** (Compass) :—যখন সূর্য বা নক্ষত্রের সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করা যায় না, তখন দিগ্‌দর্শীর (Compass এর) সাহায্য ব্যতীত দিঙ্‌নির্ণয়ের কোনও উপায় থাকে না। ১০৮নং চিত্রে একটি দিগ্‌দর্শী প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে একটি বৃত্তাকার চাকৃতির কেন্দ্রে যে ছিদ্র-পথ রহিয়াছে,

তাহার মধ্য দিয়া একটি সূক্ষ্মাগ্র শলাকা লম্বভাবে দাড়াইয়া আছে। এই শলাকার উপর একটি কাঁটাচুম্বক আলগাভাবে বসান আছে। এই বৃত্তাকার চাকৃতিটি উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব, ঈশান, বায়ু, নৈঋত, অগ্নি প্রভৃতি দিক সূচিত করিবার জন্য ৩২ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। কাঁটাচুম্বকটি ভূচুম্বকের শক্তিতে সর্বদা উত্তর দক্ষিণে ফিরিয়া থাকে। যে কোনও সময় দিঙনির্ণয় করিতে হইলে চাকৃতিটি এরূপভাবে ঘুরাইয়া লইতে হয়, যে, উহার উত্তরচিহ্নিত দাগটি কাঁটাচুম্বকের উত্তর মেরুর ঠিক নিচে আসিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে উত্তর দিক নির্দিষ্ট হইলে অন্যান্য দিকও চাকৃতির সাহায্যে সহজেই নিরূপিত হয়।



১০৮নং চিত্র— দিগ্‌দর্শী

ইহাপেক্ষা উন্নততর দিগ্‌দর্শীতে একটি কাঁটাচুম্বকের পরিবর্তে কয়েকটি সূক্ষ্ম ও পাতলা দণ্ডচুম্বক সমান্তরালভাবে গ্রথিত হইয়া গোল চাকৃতিটির নিম্ন পৃষ্ঠে ১০৮নং চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে নিবদ্ধ থাকে এবং সমস্ত চাকৃতিটি একটি শলাকার সূক্ষ্মাগ্রে এমনভাবে স্থাপিত হয়, যে ইহা সহজেই এদিক ওদিক ঘুরিতে পারে।

দুইটি গোলাকার বেড়ের (Ring এর) সাহায্যে কম্পাস্‌যন্ত্রটি এইরূপ ভাবে ঝোলান হয়, যাহাতে জাহাজের প্রবল আন্দোলনেও ইহা স্থির থাকে; এইজন্য ইহা ব্যবহার করিতে কোন অসুবিধা হয় না। সাধারণ কম্পাস্ হইতে, নৌ-দিগ্‌দর্শী (Mariners' compass) এই হিসাবে একটু বিভিন্ন।

সংক্ষেপ ঃ—৩০০০ হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে ভূগর্ভ হইতে স্বভাবজ চুম্বকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। দণ্ড, অশ্বখুরাকৃতি ও কাটাচুম্বক প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের চুম্বক হয়। চুম্বকের দুইটি মেরু। এক রকমের মেরু নিকটবর্তী হইলে বিকর্ষণ এবং ভিন্ন প্রকারের মেরু নিকটবর্তী হইলে আকর্ষণ হয়। চুম্বক ভাঙ্গিলে প্রতি খণ্ডই এক একটি পূর্ণ চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে। কৃত্রিম উপায়ে লৌহখণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। লৌহ দণ্ডে বৈদ্যুতিক তার জড়াইয়া তাহাতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইলে তড়িৎ চুম্বক হয়—ইহাদের শক্তি ইচ্ছামত অত্যধিক পরিমাণে বর্ধিত করা যায়। পৃথিবীও একটি বড় চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করে। পৃথিবীর এই ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া দিগ্‌দর্শী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

দশম প্রশ্নমালা

১। স্বভাবজ চুম্বক কাহাকে বলে? ইহার কি কি গুণ দৃষ্ট হয়? (What is a natural magnet? What are its properties?)

২। কৃত্রিম চুম্বক কোন্ কোন্ আকারের প্রস্তুত হয়? বিভিন্ন আকারের চুম্বক কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? (How many different shapes of artificial magnets are there? State the different uses of different shapes)।

৩। একটি লৌহদণ্ড চুম্বকধর্ম-বিশিষ্ট কি না কিরূপে পরীক্ষা করিবে? চুম্বক হইলে উহার মেরুদ্বয়ের প্রকৃতি নির্ণয় কর। (How would you test that an iron rod has acquired magnetic properties or not? If it is a magnet find out its poles)

৪। কি কি উপায়ে একটি লৌহদণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাহা চিত্র সমেত দেখাও। স্থায়ী চুম্বকের চুম্বক শক্তি নষ্ট করা যায় কিরূপে? (Illustrate with the help of a diagram in how many ways can an iron-rod be magnetised. How can a permanent magnet be demagnetised)?

৫। তড়িৎ-চুম্বক কাহাকে বলে? ইহাতে ইস্পাতের পরিবর্তে কাচালোহা ব্যবহার করায় কি সুবিধা? (What is an electromagnet? If a soft iron rod is used instead of a steel rod for this purpose, what will be the advantage?)

৬। চুম্বক-শক্তির আবেশ কি প্রকারে প্রমাণ করিবে? (How can you prove magnetic induction?)

৭। পৃথিবী একটি চুম্বক প্রমাণ কর। (The earth is a magnet Explain this.)
(কঃ বিঃ ১৯৪১)

৮। জলে ভাসমান একটি বড় ছিপির উপর একটি চুম্বকদণ্ড রাখিলে ভূ-চুম্বকের আকর্ষণে উহা ছুটিয়া যায় না কেন? (Why does not a magnet floating on a cork run by the attraction of the earth?)

৯। দিগ্‌দর্শী কাহাকে বলে? সাধারণ কম্পাস ও নৌ-দিগ্‌দর্শীতে পার্থক্য কি? (What is a compass? distinguish between an ordinary compass and a mariners' compass)

১০। মেরুদ্বয় পৃথক্ করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী চুম্বককে মাঝামাঝি ভাঙ্গা হইল। এই পরীক্ষার ফল কি ও উহাতে কি শিক্ষালাভ হয়? (To separate the poles of a permanent magnet it is broken into two pieces What will be the consequence and what do you learn by this?)

একাদশ পরিচ্ছেদ

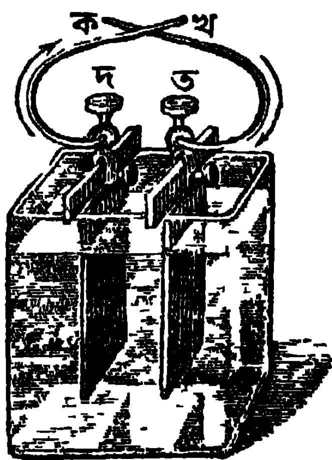
তড়িৎ

তড়িতের কার্য সম্বন্ধে তোমাদের সকলের অল্পবিস্তর জ্ঞান আছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সময় সময় বিদ্যুৎ চমকাইতে দেখিয়াছ। সেই বিদ্যুতের আলোকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, বজ্ররূপে পৃথিবীতে আসিবার সময় উহার কড়কড় শব্দে বুক কাঁপিয়া উঠে, পৃথিবীতে পড়িয়া উহা কত প্রাণীর জীবন নাশের কারণ হয়। অনেকদিন হইতে বৈজ্ঞানিকগণ এই তড়িতের স্বরূপ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে-ছেন। সেই চেষ্টার ফলে মানুষ আজ ইহাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত খাটাইয়া কত কাজ করাইয়া লইতেছে। ইহার সাহায্যে সুদূর পল্লীর ঘরে ঘরে "টর্চলাইট" ব্যবহৃত হইতেছে, সহরের ঘর বাড়ী, পথ ঘাট আলোকিত হইতেছে, গ্রীষ্মে পাখা ঘুরিয়া বাতাস দিতেছে, শীতে ঘর গরম রাখিতেছে, টেলিফোনে কথাবার্তা চলিতেছে; টেলিগ্রামে দূরের সংবাদ আসিতেছে, ট্রাম চলিতেছে, কাচা কাপড় ইস্ত্রি হইতেছে, এমন কি চায়ের জলটুকুও গরম হইতেছে। তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা কত কার্য করা যায়, তাহা শুনিলে। এখন ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয় দেখা যাউক।

তড়িৎ-সেল (Electric Cell)—তড়িৎ-সেল হইতে তড়িৎ-প্রবাহ সহজেই উৎপন্ন করিতে পারা যায়। তড়িৎ-সেল প্রস্তুত করিতে হইলে জলমিশ্রিত সাল্‌-ফিউরিক্ অ্যাসিডের প্রয়োজন। একটি ছোট কাচের গ্লাসে খানিকটা সাল্‌ফিউরিক্ অ্যাসিড্ লও, আর একটি বড় কাচের গ্লাসে ইহার ৮ গুণ পরিমাণ জল লও। পরে ঐ অ্যাসিড্ জলের গ্লাসে আস্তে আস্তে ঢালিয়া একটি কাচদণ্ডের দ্বারা নাড়িতে থাক। সাবধান, যেন অ্যাসিডের উপর জল ঢালিও না; তাহা হইলে

পাত্রটি গরম হইয়া ফাটিয়া যাইতে পারে। ঢালিবার সময় দেখিও যেন অ্যাসিড কোন মতে কাপড়-চোপড়ে না লাগে, কারণ অ্যাসিড লাগিলেই কাপড় পুড়িয়া যায়। এই যে জল মিশ্রিত অ্যাসিড প্রস্তুত হইল, ইহাকে একটি বোতলে রাখিয়া দাও; প্রয়োজন মত ঢালিয়া লইবে।

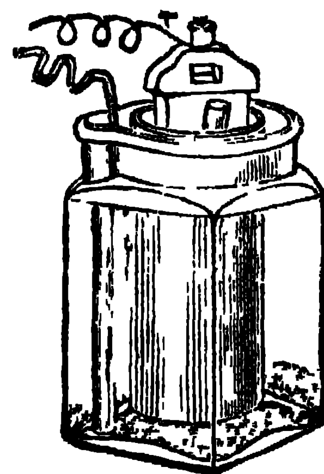
একটি কাচ বা চীনামাটির পাত্রে ঐ জলমিশ্রিত সালফিউরিক্ অ্যাসিডের খানিকটা লও এবং পাত্রের একধারে একখানি তামার ও অপরধারে একখানি দস্তার পাত এরূপ ভাবে ডুবাইয়া ধর, যেন উহাদের কিয়দংশ অ্যাসিডের উপর জাগিয়া থাকে এবং পাত দুইটি যেন পরস্পর লাগিয়া না থাকিতে পায় পাত দুইটির উপরে একটি করিয়া তামার তার লাগাইয়া দাও (১০৯ চিত্র)। পাত্রস্থ অ্যাসিডের সহিত দস্তার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দস্তার গায়ে বুদ্বুদ্ উঠিবে। এইবার যদি তার দুইটির অপরপ্রান্ত একত্র করা হয়, তাহা হইলে এই বুদ্বুদ্‌গুলি দস্তার পাতের উপর জমিতে থাকিবে এবং তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরেই দেখিবে যে তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তামার তার গরম হইয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থায় তারটি লৌহচূর্ণের মধ্যে ডুবাইয়া উঠাইলে দেখিবে ইহাতে লৌহচূর্ণ লাগিয়া রহিয়াছে। তার দুইটি পৃথক্ করিলে তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে লৌহচূর্ণও ঝরিয়া পড়িবে। তড়িতোৎপাদনের এই যন্ত্রটিকে **সাধারণ তড়িৎ সেল** (Simple Electric Cell) বলে। তড়িৎ-প্রবাহ তামার পাত দিয়া দস্তার পাতে চালিত হয়। এইজন্য তামার পাতের যে প্রান্ত অ্যাসিডের মধ্য হইতে বাহিরে থাকে, তাহাকে পজিটিভ মেরু বা + মেরু (Positive pole) ও দস্তার এইরূপ অংশকে নেগেটিভ মেরু বা − মেরু (Negative pole) বলে। মনে রাখিও যে, তড়িৎ সর্বদা পজিটিভ মেরু হইতে নেগেটিভ মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়।



১০৯নং চিত্র—সাধারণ তড়িৎ সেল

এইরূপ একটি তড়িৎ-সেলের দুইটি প্রান্ত তার দিয়া যোগ করিয়া রাখিলে তামার পাতের উপর বুদ্বুদ ক্রমশ অধিক জমিতে থাকিবে এবং তড়িৎ-প্রবাহ কমিয়া কিছুক্ষণ পরে বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন তামার পাতের উপর একটি বুরুষ বুলাইয়া বুদ্বুদগুলি দূর করিলেই পুনরায় তড়িৎ-প্রবাহ আরম্ভ হইবে। তড়িৎ-সেলটিকে কার্যকরী রাখিতে হইলে এইরূপে মধ্যে মধ্যে তামার পাতটি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়।

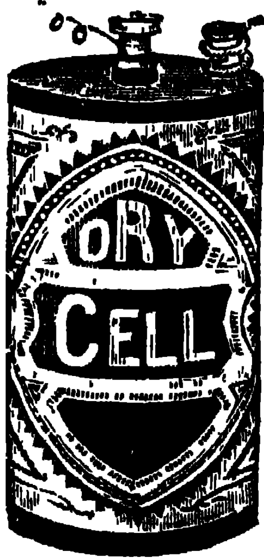
উপরোক্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য নানাপ্রকারের তড়িৎ-সেল উদ্ভাবিত হইয়াছে। সহজেই প্রস্তুত করিতে পারা যায় এমন একটি তড়িৎ-সেলের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। সেই তড়িৎ-সেলের নাম **লেক্‌লান্স সেল** (Leclanche's Cell)। ইহাতে দুইটি পাত্র ব্যবহৃত হয়। বাহিরের কাচপাত্রটির আকার সাধারণত নিম্নের চিত্রে যেরূপ দেখান হইল, ঐরূপ ধরণের হয়। এই পাত্রটিতে নিশাদলের (Sal ammoniacএর) ঘনদ্রবণ ঢালা থাকে এবং একটি দস্তার দণ্ড ঐ দ্রবণের মধ্যে দাঁড় করান থাকে। দস্তাদণ্ডের উপর প্রান্তই এই সেলের নেগেটিভ-প্রান্ত। ভিতরের পাত্রটি খস্‌খসে চীনামাটির তৈয়ারী একটি তলাবন্ধ চোঙ ও জলের কুঁজার ন্যায় সছিদ্র। ইহাতে 'ম্যাঙ্গানিজ্ ডাই-অক্সাইড' (Manganese Dioxide) নামক এক প্রকার কাল গুঁড়া, কয়লারগুঁড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া হয়। এই গুঁড়ার মধ্যে একটি কারবনের (Gas Carbon) চেপ্টা দণ্ড বসান থাকে। এই দণ্ডের উপরপ্রান্তই পজিটিভ্-প্রান্তের কার্য করে। তারের দ্বারা দুইটি প্রান্ত সংযুক্ত হইলে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকে। তড়িৎ-প্রবাহ-কালে দস্তার সহিত নিশাদলের রাসায়নিক



১১০নং চিত্র—লেকল্যান্স সেল

ক্রিয়ায় যে বাষ্প বাহির হইতে থাকে, তাহা ভিতরের পাত্রের ছিদ্রপথে আসিয়া

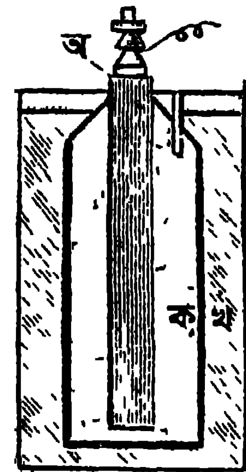
কালগুঁড়ার গায়ে লাগে এবং ঐ গুঁড়া ইহাকে অন্য পদার্থে পরিণত করে; বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইতে এই কোষ ব্যবহার করাই বিশেষ সুবিধাজনক; কারণ ইহা একবার প্রস্তুত হইলে কয়েক মাস চলে। টেলিফোনের কার্যে এই সেল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।



১১১নং চিত্র—ড্রাইসেল

আজকাল 'টর্চলাইটে' যে তড়িৎ-সেল ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **ড্রাই সেল** (Dry Cell) বলে। (১১১ নং চিত্র)। ইহা উপরে বর্ণিত লেক্‌ল্যান্স সেল ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল মাত্র ইহাতে নিশাদলের দ্রবণের পরিবর্তে গুঁড়া নিশাদল কাঠের গুঁড়ার সহিত অল্প জল দিয়া কাদার মত করিয়া ভিতরের পাত্রটিতে পুরিয়া দেওয়া হয়; ইহারই মধ্যস্থলে অঙ্গার দণ্ডটি প্রোথিত থাকে। বাটিরের কাচপাত্রের পরিবর্তে একটি দস্তার চোঙ ব্যবহার করা হয়। এই দস্তার উপরপ্রান্ত নেগেটিভপ্রান্তের কাজ করে। সমস্ত সেলটি একটি পিস্‌বোর্ড দিয়া মোড়া থাকে। টর্চলাইটের পাশের চাবি টিপিয়া ধরিলে সেলের তড়িৎ-প্রবাহ টর্চের আলো জ্বালায়।

ড্রাই সেলের ভিতর কোন্ পদার্থ কিরূপে আছে তাহা বুঝাইবার জন্য একটি চিত্র দেওয়া হইল। **অ** ইহার অঙ্গারদণ্ড, **ক** ভিতরের পাত্রস্থ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড, **খ** নিশাদল ইত্যাদির মিশ্রণ এবং **দ** ইহার দস্তার খোল।



১১২নং চিত্র—ড্রাই সেলের ভিতর

উপরে যে তড়িৎ-সেলের বর্ণনা করা হইল, তাহা হইতে উৎপন্ন তড়িতের শক্তি খুব অল্প। সহরে আলো জ্বালাইতে, পাখা ঘুরাইতে কিংবা ট্রামগাড়ী চালাইতে এবং কলকারখানাতেও অধিক শক্তিসম্পন্ন তড়িতের প্রয়োজন হয়। উক্ত তড়িৎ বৃহদাকার ডায়নামো

(Dynamo) নামক যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যে স্থানে ডায়নামো চলে, তাহাকে 'পাওয়ার হাউস' (Power House) বলা হয়। ষ্টীমার ও জাহাজে ব্যবহৃত তড়িৎ ডায়নামো হইতে উৎপন্ন হয়।

বিদ্যুৎপরিবাহী ও বিদ্যুদন্তরক—জন্মস্থান হইতে তড়িৎ-প্রবাহকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে একটি বাহন প্রয়োজন। সাধারণত ধাতব তারই এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। ধাতু ছাড়া অন্য পদার্থও তড়িৎ-প্রবাহের বাহনের কার্য করিতে পারে। কিন্তু সকল পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহ সহজে যাতাযাত করিতে পারে না। যে পদার্থগুলির মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ সহজে যাতায়াত করিতে পারে তাহাদিগকে **তড়িৎপরিবাহী** (Conductor) এবং যাহাদের মধ্য দিয়া তড়িৎ যাতায়াত করিতে পারে না তাহাদিগকে **তড়িদন্তরক** (Non-Conductor) বলে। ধাতু, কাঠ কয়লা, জল, জীব-দেহ, পৃথিবী প্রভৃতি তড়িৎপরিবাহী এবং কাচ, চীনামাটি (Porcelain) রেশম, পশম, রবার, তৈল, আবলুস, গন্ধক, মোম প্রভৃতি তড়িদন্তরক, কিন্তু মার্বেল পাথর, কাগজ, তূলা প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের মধ্য দিয়া তড়িৎ অল্প অল্প যাতাযাত করে।

মানবদেহ যে তড়িৎ পরিবাহী তাহা সহরের ছেলেদের মধ্যে অনেকেই কখনও না কখনও বেশ উপলব্ধি করিয়াছ। বিজলী বাতি জ্বালিবার সময় যদি 'সুইচ' খারাপ থাকে তবে মাটিতে দাঁড়াইয়া ঐ সুইচ টিপিতে গেলে 'শক' (Shock) লাগে। কিন্তু শুকনা কাঠ বা রবারের উপর দাঁড়াইয়া ঐ সুইচই টিপিলে উহারা তড়িদন্তরক বলিয়া শক লাগে না।

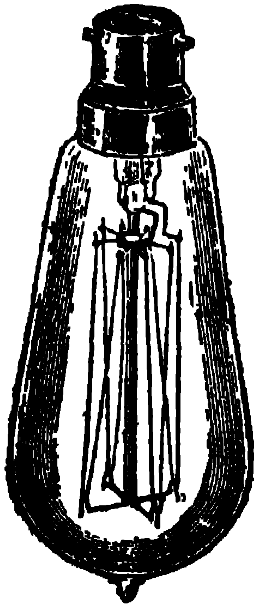
তড়িৎবাহন যত মোটা হয় তত সহজেই ইহার ভিতর দিয়া তড়িৎ যাতায়াত করিতে পারে; পক্ষান্তরে তড়িৎবাহন যত সরু হইবে ইহার ভিতর দিয়া তত অল্প তড়িৎ যাতায়াত করিবে।

ধাতুর মধ্যে রৌপ্যই সর্বাপেক্ষা সু-পরিবাহী; কিন্তু ইহা মূল্যবান ধাতু বলিয়া তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে ইহার প্রচলন নাই। তামাও সু-পরিবাহী অথচ

ইহা সস্তা। সেইজন্য তড়িৎ-প্রবাহের বাহনরূপে তামার তার অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লৌহ আবার তামা অপেক্ষা সস্তা বলিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া টেলিগ্রাফের তারের জন্য লোহার তারের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক।

তড়িৎ-প্রবাহের ফল ঃ—(১) তড়িৎ-সেল হইতে পরিবাহী তার দিয়া প্রবাহ চালাইলে পরিবাহী তারটি ক্রমেই উষ্ণ হইতে থাকে, হাত দিয়া অনুভব করা যায়। বৈদ্যুতিক ষ্টোভ, কেট্‌লী বা ইস্ত্রীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে উহারা কিরূপ গরম হইয়া উঠে তাহা তোমরা অনেকেই জান। তাহা হইলে **বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে তাপের সৃষ্টি** হয়।

(২) পরিবাহী তার খুব সরু অথচ প্রবাহের শক্তি প্রবল হইলে অনেক সময় তার ক্রমশ উত্তপ্ত হইতে হইতে এত অধিক উত্তপ্ত হয় যে তখন ইহা লাল হইয়া উঠে এবং আলোক দেয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহাকে আরও উত্তপ্ত করিলে ঐ আলো ক্রমে সাদা হইয়া অধিকতর উজ্জ্বল হয়। অধিক উত্তপ্ত তার বায়ু সংস্পর্শে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে পারে বলিয়া বিজলী বাতির সূক্ষ্মতারটি একটি বায়ুশূন্য ঢুনির (Bulb) মধ্যে রাখা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় বৈদ্যুতিক **প্রবাহে আলোকের সৃষ্টি** হয়।



১১৩নং চিত্র—বৈদ্যুতিক আলোর ঢুনি

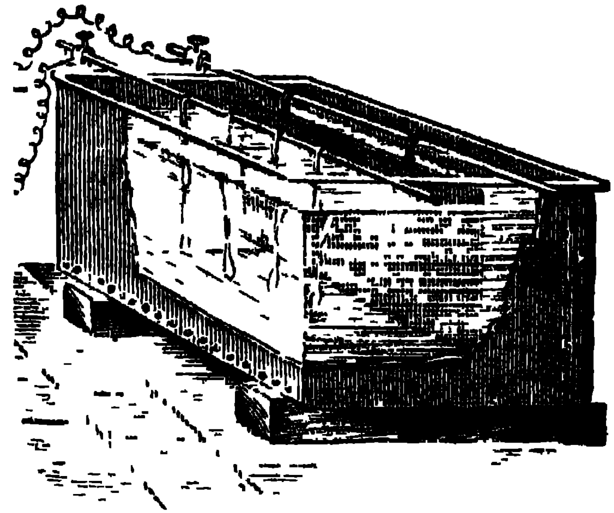
বৈদ্যুতিক আলোর ঢুনির ভিতর সূক্ষ্ম তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে ইহা উত্তপ্ত হইয়া কেমন মনোরম আলো দেয় তাহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ।

(৩) একটি কাচ পাত্রে জল লইয়া তাহাতে একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া একটি তড়িৎ-সেলের দুই প্রান্তের তার ঐ জলে ডুবাইয়া ধরিলে তার দুইটির গা দিয়া বুদ্বুদ উঠিতে দেখা যায়। পূর্বে ভল্টামিটারের সাহায্যে জল বিশ্লেষণ কালে বিস্তৃতভাবে বুঝান হইয়াছে দুইটি তারের গা দিয়া দুইটি বিভিন্ন প্রকারের গ্যাস

উঠে। অ্যাসিড মিশ্রিত জলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে জলে বাসায়নিক ক্রিয়া হয় এবং জল বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটি বাষ্পেব সৃষ্টি কবে।

আবও বহুবিধ উপায়ে দেখান যায বিদ্যুৎ প্রবাহেব ফলে পদার্থে অনেক প্রকাব **রাসায়নিক পরিবর্তন** ঘটে।

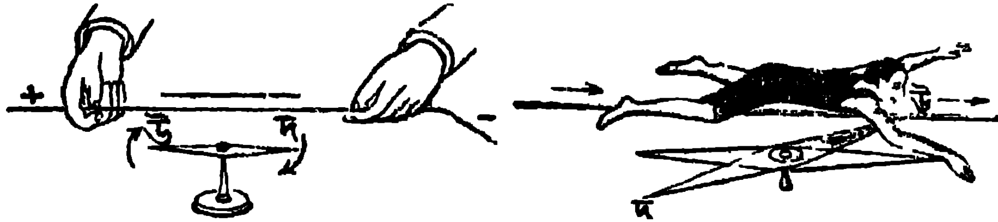
তড়িৎপ্রবাহের ফলে যে বাসায়নিক ক্রিযা ঘটে তাহাব উপব নির্ভব করিয়া লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুব উপব অন্য ধাতুব কলাই কবা হয়। মনে কর কতকগুলি লোহার চামচের উপব বৌপ্য কলাই কবিতে হইবে। একটি কাচেব বা মাটিব পাত্রে সিলভাব সায়ানাইডেব দ্রবণ (Silver cyanide solution) রাখ। যে চামচ গুলি কলাই করিতে হইবে তাহাদিগকে ঘসিয়া পবিষ্কাব ও তৈলমুক্ত কবিযা ধাতব তাবেব সাহায্যে পাত্রেব উপব আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত ধাতু দণ্ডেব উপব হইতে এমন ভাবে ঝুলাইয়া দাও যেন সেগুলি দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যায। একটি রূপাব পাত ঠিক ঐরূপ ভাবে পাত্রেব উপব হইতে দ্রবণেব ভিতব ডুবাইযা দাও। রূপাব পাত যে ধাতব দণ্ড হইতে লম্বিত আছে সেই দণ্ডটিকে কোন একটি ব্যাটাবীর নেগেটিভ্ প্রান্তে যোগ কব এবং অপব দণ্ডটি পজিটিভ্ প্রান্তেব সহিত যোগ কব। উহাদেব মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ হইলে দেখা যাইবে চামচ গুলিব উপব রূপার কলাই ধবিতেছে। সতর্ক হওয়া উচিত যেন তড়িৎপ্রবাহ খুব আস্তে আস্তে হয।



১১৪নং চিত্র—ধাতুর কলাই

তড়িৎ-প্রবাহ — একটি কাঁটাচুম্বক আনিযা টেবিলেব উপব বাখ। ইহা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দুলিবাব পব উত্তব-দক্ষিণে

স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। একটি লম্বা তামার তার লইয়া তাহার একপ্রান্ত একটি তড়িৎ-কোষের পজিটিভ্ প্রান্তের সহিত সংযুক্ত কর। তারের কিয়দংশ দুই হাতে টানিয়া সোজা করিয়া কাঁটাচুম্বকের উপর তাহার



১১৫নং চিত্র তড়িৎ-প্রবাহ ও কাঁটাচুম্বক ১১৬নং চিত্র—আম্পিয়ারের নিয়ম

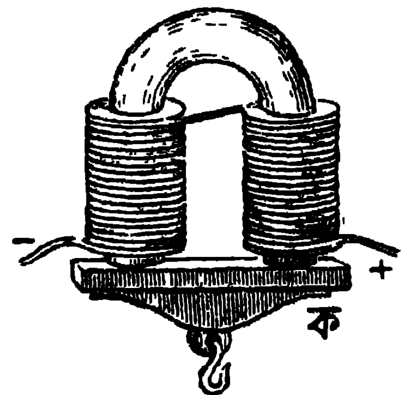
সহিত সমান্তরাল ভাবে ধর (১১৫নং চিত্র)। এই অবস্থায় তারের অপরপ্রান্ত তড়িৎ-সেলের নেগেটিভ্ প্রান্তের সহিত সংযুক্ত হইলে তার দিয়া যেমন তড়িৎ বহিতে আরম্ভ করিবে, অমনই কাঁটাচুম্বক আর উত্তর-দক্ষিণে স্থির হইয়া থাকিবে না। তার দিয়া তড়িৎ উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইলে কাঁটার উত্তরমেরু পূর্বদিকে সরিয়া দাঁড়াইবে। তারের প্রান্ত দুইটি তড়িৎ-সেলের প্রান্ত দুইটির সহিত অদল বদল করিয়া সংযুক্ত কর এবং তারটিকে পূর্বের মত কাঁটাচুম্বকের উপরে ধর। এখন তড়িৎপ্রবাহ দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে যাইতেছে, কাঁটাচুম্বকের উত্তরমেরুও বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাইতেছে দেখ। তড়িৎবাহী তারটি কাঁটাচুম্বকের নিচে ধরিয়াও এরূপ ভাবে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, তারে **তড়িৎ-প্রবাহ চলিতে থাকিলে তাহার চতুষ্পার্শ্বে চুম্বকশক্তির লক্ষণ** প্রকাশ পায়।

তড়িৎ-বাহী তার কাঁটাচুম্বকের নিকটে আনিলে উহা কোন্ দিকে ঘুরিবে, ইহা মনে করিয়া রাখিবার জন্য **আম্পিয়ার** (Ampere) নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটি সহজ নিয়ম বাহির করিয়াছেন। তাহা এই,—মনে কর যেন কোন লোক কাঁটাচুম্বকের দিকে মুখ করিয়া তড়িৎ-প্রবাহের অনুকূলে সাঁতার দিয়া চলিতেছে। কাঁটাচুম্বকের উত্তরমেরু সর্বদা তাহার বাম হস্তের দিকে ঘুরিয়া যাইবে।

আম্পিয়ার সাহেবের এই নিয়মের সাহায্যে, কোনও তারে তড়িৎ-প্রবাহ চলিতেছে কিনা এবং চলিলে তাহা কোন দিকে চলিতেছে, তাহাও নির্ধারণ করা যায়। কাঁটাচুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক হইতে কতটুকু ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহা দেখিয়া দুই বা ততোধিক তারে তড়িৎ-প্রবাহশক্তির তুলনাও করা যায়। অধিকন্তু, এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া **'তড়িৎ-মাপক'** যন্ত্র (Galvanometer) নির্মিত হইয়াছে।

তড়িৎ-চুম্বক—পূর্বে চুম্বকীকরণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, একটি কাঁচা লোহার দণ্ডকে রেশম জড়িত তার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ঐ তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ চালাইলে লৌহদণ্ডটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয় (১১৭নং চিত্র), অর্থাৎ যতক্ষণ তড়িৎ চলিতে থাকে, দণ্ডটিতে চুম্বকধর্মও ততক্ষণ থাকে এবং তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করিলে ইহার চুম্বকত্ব লোপ পায়। তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে চুম্বকীকৃত লৌহদণ্ডটিকে **তড়িৎ-চুম্বক** (Electro Magnet) বলে। এইরূপ তড়িৎ-চুম্বকে স্থায়ী চুম্বকের ন্যায় দুইটি মেরু থাকে।

তড়িৎ-চুম্বক সাধারণত অশ্বখুরাকৃতি হয়। তখন উহার দণ্ডটিতে সূতা বা রেশমজড়িত তামার তার স্ক্রুর প্যাঁচের মত জড়ান থাকে। তড়িৎ-ঘণ্টা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, তড়িতোৎপাদক 'ডায়নামো' (Dynamo) নামক যন্ত্র প্রভৃতিতে এইরূপ তড়িৎ-চুম্বক ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ প্রবাহের শক্তি যতই বাড়ান যাইবে এবং এই তড়িৎবাহী তারের পাকের সংখ্যা যতই অধিক হইবে তড়িৎ-চুম্বকের শক্তি ততই বাড়িবে। বড় বড় কারখানায় লোহার ভারী কড়ি, বরগা, চাদর প্রভৃতি তড়িৎ-চুম্বক

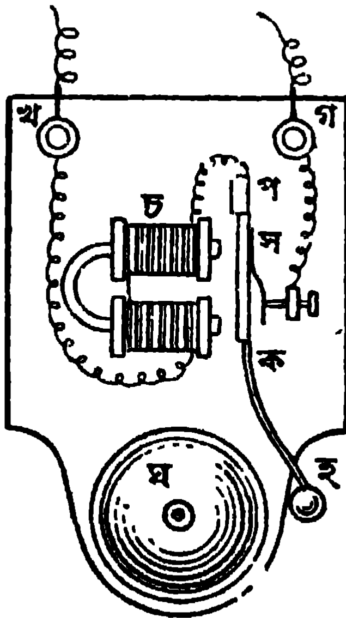


১১৭নং চিত্র—তড়িৎ-চুম্বক

সাহায্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়। যুদ্ধের সময় গোলাগুলির লোহার গুঁড়া সৈনিকদের চোখে পড়িলে বা লোহার কারখানায় কাজ করিবার সময়

কাহারও চোখে লোহাব গুঁডা পডিয়া গেলে অত্যধিক-শক্তিসম্পন্ন তডিৎ চুম্বকেব সাহায্যে লোহাব গুঁডা টানিযা বাহিব কবা হয়।

তড়িৎঘণ্টা (Electric Bell)—আজকাল প্রায় সকল অফিসে এবং বড় বড বাডীতে কাহাকেও ডাকিতে হইলে তাডিৎঘণ্টা ব্যবহাব কবা হয। ইহাব গঠন কিরূপ ও উহা কিরূপে চালিত হয় দেখ। ১১৮নং চিত্রে **চ** একটি অশ্বখুবাকৃতি তডিৎ-চুম্বক। ইহাব দুইধাবে যে বেশমে মোড়া তাব জডান আছে, তাহাব একপ্রান্ত **খ** চিহ্নিত স্ক্রুব সহিত সংযুক্ত এবং অন্য প্রান্তটি **প** চিহ্নিত স্ক্রুতে লাগানো আছে। **প** স্ক্রুব সহিত একটি কাঁচালোহাব ফলক **চ** এব দুই মেরুব সম্মুখে অবস্থিত। এই লৌহফলকেব অপব প্রান্ত একটু বাঁকান এবং তাহাব মুখে একটি ছোট লোহাব গুলি **হ** লাগানো আছে, **ঘ** একটি ঘণ্টা **স** একটি স্প্রীং, ইহা লৌহফলকেব সহিত সংযুক্ত আছে। **ক** আব একটি স্ক্রু, স্প্রীংটিকে আল্‌গা ভাবে ছুঁইযা আছে। **ক** আবাব **গ** চিহ্নিত স্ক্রুব সহিত তাব দ্বাবা সংযুক্ত। **খ** ও **গ** স্ক্রু-দ্বয় একটি চাবিব (Bell-pushএব) ভিতব দিয়া একটি তডিৎ সেলেব দুই প্রান্তেব সহিত সংযুক্ত। চাবিটি টিপিলে, তাবেব মধ্য দিযা তডিৎ-প্রবাহ আবম্ভ হয়। তখন **চ**এব কুণ্ডলীকৃত তাবেব ভিতব দিযা তড়িৎ চলিবামাত্র ইহাব ভিতবকাব কাঁচা লোহা চুম্বক হইয়া সম্মুখেব লৌহফলককে টানিযা লয়। ইহাব ফলে লোহাব গুলিটি ঘণ্টায ঘা মাবিযা শব্দোৎপাদন কবে। কিন্তু এদিকে সেই মুহূর্তে **স** স্প্রীং ও **ক** স্ক্রুব সংযোগ নষ্ট হওযায তডিৎ-প্রবাহ বন্ধ হইযা যায়। তখন **চ** এব কাঁচা লোহা চুম্বকশক্তি হাবাইয়া সম্মুখেব লৌহফলকটিকে আব টানিয়া বাখিতে না পাবিয়া, ছাডিয়া দেয়। লৌহফলকটি স্বস্থানে ফিবিবা মাত্র **স** স্প্রীংটি **ক** এব সহিত সংযুক্ত



১১৮নং চিত্র—তড়িৎ ঘণ্টা

হওয়ায় পুনরায় তড়িৎপ্রবাহ আরম্ভ হয়। তখন ফলকটিও পুনরায় চ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় আর একবার শব্দ হয়। এইরূপে যতক্ষণ চাবি টিপিয়া রাখা হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত ঘণ্টার শব্দ হইতে থাকে।

টেলিগ্রাফ (Telegraph):—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ দূরবর্তী স্থানে অল্প সময়ে সংবাদ প্রেরণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে **সমারিং** (Scommering) সাহেব এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন তাহাতে জল বিশ্লেষণ করিয়া সঙ্কেত পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে যখন বৈদ্যুতিক চুম্বকের প্রচলন ছিলনা তখন অ্যাম্পিয়ার সাহেব কাঁটা চুম্বকের উপর তারের সাহায্যে তড়িৎ প্রেরণ করিয়া ঐ কাঁটাচুম্বকের গতির উপর নির্ভর করিয়া সঙ্কেত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহার পর ক্রমে **গস্** (Gauss) ও **ওয়েবার** (Webber) এবং **ষ্টেনহিল** (Steinheil) ও **হুইটষ্টোন** (Wheatstone) এই যন্ত্রের প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হন।

আজ পর্যন্ত যত রকমের বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সকলকেই প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথম **বৈদ্যুতিক পথ** (Circuit), ইহাতে দুইটি স্থানকে ধাতব তারের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া একস্থান হইতে অপর স্থানে বিদ্যুৎ চালিত করিতে পারা যায়। দ্বিতীয়:—**প্রেরকযন্ত্র** (Transmitter) অর্থাৎ যে যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণ করা হয়। তৃতীয়:—**গ্রাহক-যন্ত্র** (Receiver) অর্থাৎ যে যন্ত্রের সাহায্যে সঙ্কেত গ্রহণ করা হয়।

এক একটি অংশ আবার বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত হয়। বিশেষ করিয়া প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র বহু প্রকারের দেখা যায়। তন্মধ্যে কাঁটা চুম্বক টেলিগ্রাফ (Needle telegraph), চক্র টেলিগ্রাফ (Dial telegraph) এবং **মোরস্** সাহেবের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ (Morse telegraph) প্রধান।

বর্তমান যুগে আমাদের দেশে মোরস্ সাহেবের আবিষ্কৃত যন্ত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। নিম্নে ঐ প্রকার যন্ত্রের কার্য প্রণালী বর্ণিত হইল।

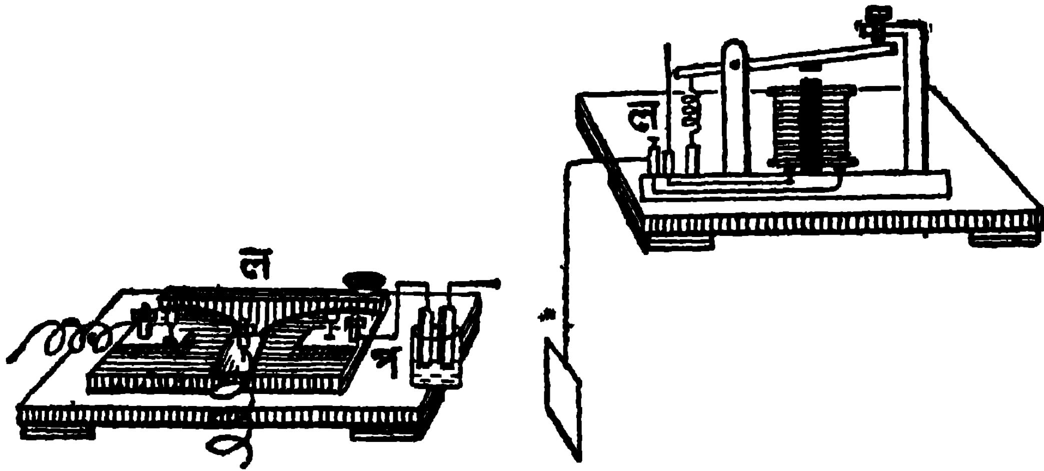
প্রথমাংশ—বৈদ্যুতিক প্রবাহ পথ (Circuit) :—তোমরা সকলেই লক্ষ করিয়াছ রেল পথের দুই ধারে কিছুদূর অন্তর ধাতব খুঁটি প্রোথিত থাকে এবং ঐ সকল খুঁটির মাথায় চিনামাটির গুল বসান থাকে এবং ঐ সকল চিনামাটির গুলের সহিত ধাতব তার বাঁধিয়া বরাবর একস্থান হইতে অন্যস্থান পর্যন্ত ঐ তার লম্বিত থাকে। চিনামাটির গুলগুলি ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য এই যে টেলিগ্রাফে সঙ্কেত প্রেরণকালে ধাতব তারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রেরণ করা হয়, যদি তারগুলি ধাতব দণ্ডের সহিত বাঁধা থাকে তবে ধাতব খুঁটি বাহিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ মাটির ভিতর চলিয়া যাইতে পারে, তাহাতে প্রবাহ নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বিদ্যুদন্তরক চিনামাটির গুল ব্যবহার করা হয়। এইরূপে এক স্থানের সহিত অন্য স্থানের যোগ হইলে ঐ দুই স্থানে ধাতব তারের দুই প্রান্ত মাটির ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত পুঁতিয়া দেওয়া হয়। পৃথিবী বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ। কাজেই যদি ধাতব তারের মধ্যে কোথাও তড়িৎসেল সংযুক্ত করা হয় তবে ঐ ধাতব তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ হইয়া মাটির ভিতর যায় এবং মাটির ভিতর দিয়া উক্ত ধাতব তারের অন্য প্রান্তে প্রবেশ করিয়া চক্র পথে (Circuit) যাতায়াত করে। ইহাই হইল প্রবাহ পথের (Line) কায। মাটির ভিতর দিয়া তড়িৎ যাতায়াত করিলে ধাতব তারের খরচা বাঁচিয়া যায় বলিয়া এরূপ করা হয়। যন্ত্রাগারে তারের প্রান্ত এইরূপে ভূমি সংলগ্ন করিতে অসুবিধা হইলে ঐ দুইটি প্রান্তকে তারের সাহায্যে যোগ করিয়াও দেখান যাইতে পারে।

দ্বিতীয়াংশ—প্রেরক যন্ত্র (Transmitter) :—এক প্রান্তে হাতল ও অপর প্রান্তে স্প্রিং যুক্ত একটি লেভার (Lever) ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। লেভারটির মধ্যে একটি আঁকশলি (Axle) থাকায় হাতল টিপিলে ইহা নামিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলে উঠিয়া যায়। এইরূপ পর্যায় ক্রমে টেপা ও ছাড়ার ফলে ইহাতে টক্‌কা ও টরে এই দুই প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। লেভারের এক প্রান্ত পথের সহিত ও অপর প্রান্ত তড়িৎ সেলের সহিত যুক্ত থাকে।

তৃতীয়াংশ—গ্রাহক যন্ত্র (Receiver) :—একটি অশ্বখুরাকৃতি বৈদ্যুতিক চুম্বকের সম্মুখে একটি ধাতব লেভার এমন ভাবে আটকান থাকে যে যখন এই

বৈদ্যুতিক চুম্বকেব ভিতব দিয়া তাড়িৎ প্রবাহ চলে তখন লেভাবটি আকৃষ্ট হইয়া প্রেবক যন্ত্রের হাতল টিপিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেইরূপ শব্দ উৎপন্ন কবিতে পাবে। এবং যখন তাড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায় তখন লেভাবটি ছাড পাইয়া পূর্বস্থানে আসে, ফলে ইহাতেও প্রেবক যন্ত্রেব অপব প্রকাব শব্দেব ন্যায শব্দ হয়।

নিম্নে টেলিগ্রাফ যন্ত্রেব ব্যবস্থা চিত্র সাহায্যে বুঝান হইল। প্রেবক যন্ত্রেব **ল** লেভাবেব হাতলটি টিপিলে ইহাব সহিত **প** স্ক্রুব সংযোগ হয়। ফলে তড়িৎ-সেল হইতে প্রবাহ আসিযা আঁকশলিব সহিত সংযুক্ত স্ক্রু দিযা পথে (Line) বাহিব হইয়া যায। এই পথেব তাবেব সঙ্গে দুবস্থ একটি গ্রাহক যন্ত্রের **ল** স্ক্রুব যোগ থাকে। এখান হইতে তড়িৎ প্রবাহ একটি বৈদ্যুতিক চুম্বকেব মধ্য দিযা

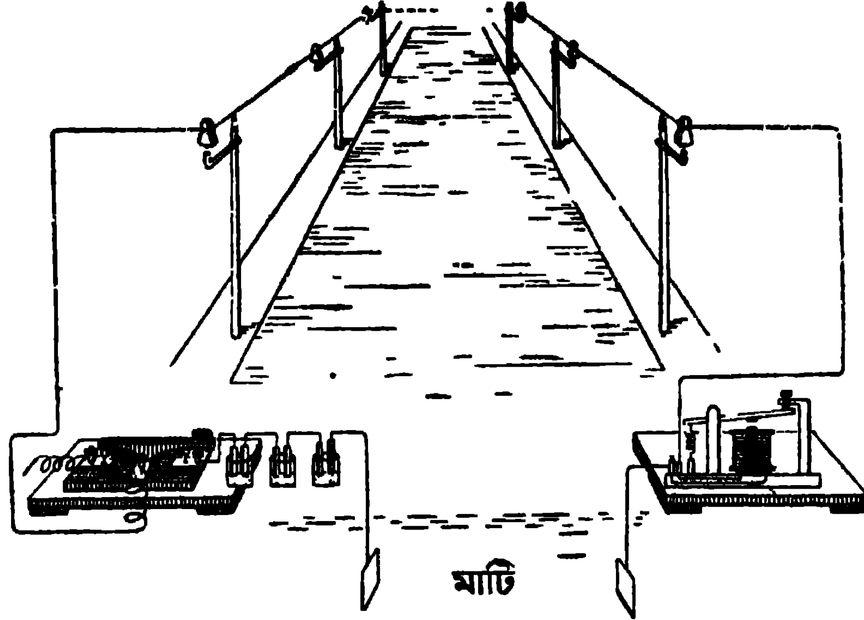


১১৯নং চিত্র—টেলিগ্রাফ, প্রেরক-যন্ত্র

১২০নং চিত্র—টেলিগ্রাফ, গ্রাহক-যন্ত্র

যাইবাব সময উপবেব একটি শব্দ কবিবাব লেভাবকে আকর্ষণ কবে, ফলে প্রেবক যন্ত্রের ন্যায় এখানেও শব্দ হয়। বৈদ্যুতিক চুম্বকেব অপব প্রান্ত পৃথিবীব সহিত সংযুক্ত থাকায তড়িৎপ্রবাহ পৃথিবীব মধ্য দিযা পূর্বোক্ত তড়িৎ সেলে গিয়া পৌঁছে। এইরূপে সমস্ত পথ সম্পূর্ণ হয। প্রেবকেব হাতল ছাড়িযা দিলে এই যোগ ছিন্ন হয, পুনবায় টিপিলে আবাব পূর্বোক্ত ব্যাপাব ঘটে। এইরূপে উৎপন্ন টবে, টক্কা শব্দ গুলিব সমাবেশে সমগ্র বর্ণমালাব সঙ্কেত কবা হয়; তাহাতেই একস্থান হইতে অন্য স্থানে বার্তা প্রেবণ কবিবার ব্যবস্থা হয। মনে

কবা যাউক 'Ant' কথাটি একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেবণ কবিতে হইবে। ইহাতে তিনটি অক্ষব A, n ও t পব পব বসান আছে। 'টবে' শব্দ এবং 'টক্কা'



১২১নং চিত্র—সমগ্র টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা

শব্দ দুইটিব সমন্বযে A অক্ষবটি বুঝান হয়, সেরূপ 'টক্কা' এবং 'টবে' শব্দ দুইটিব সমন্বয়ে n শব্দটিব সঙ্কেত বুঝান হয এবং কেবলমাত্র 'টক্কা' শব্দ দিয়া t অক্ষবটি বুঝান হয়। অতএব পব পব ঐরূপ শব্দ কবিয়া সমগ্র 'Ant' শব্দটি বুঝান হয।

টবে এবং টক্কা শব্দগুলিব সঙ্কেত লিখিয়া বাখিতে হইলে মাত্র দুইটি চিহ্ন মনে কবিযা বাখিলেই চলে। টবে একটি বিন্দ্ দিয়া এবং টক্কা একটি বেখাব দ্বাবা সূচিত হয।

যথা ঃ— A = · –

B = – · · ·

C = – · – ·

D = – · ইত্যাদি

সংক্ষেপ ঃ—তড়িৎ সেল হইতে তড়িৎ প্রবাহেব সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বহু প্রকারের তড়িৎ সেল আছে। কতকগুলি পদার্থের মধ্য দিযা তড়িৎ সহজে যাতায়াত করে, কতকগুলিব

মধ্য দিয়া যায় না বলিলেই চলে। প্রথমগুলি তড়িৎ পরিবাহী অপরগুলি বিদ্যুদন্তরক। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে তাপ, আলো সৃষ্ট হয়, পদার্থে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। তড়িৎবাহী তারের চতুষ্পার্শে চুম্বক শক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অ্যাম্পিয়ার এই চুম্বক শক্তির গতি সম্বন্ধে একটি সূত্র বাহির করিয়াছেন। তড়িৎবাহী তার লৌহদণ্ডে জড়াইয়া ইচ্ছামত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রস্তুত করা যায়। তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে তড়িৎ ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি বহু নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মিত হইয়াছে।

একাদশ প্রশ্নমালা

১। তড়িৎ-সেল কাহাকে বলে? যে কোন একটি তড়িৎ-সেল বর্ণনা কর? (What is an electric cell? Describe any one of such cells.)

২। একটি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিতেছে কিনা এবং চলিলে কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে চলিতেছে তাহা কিরূপে পরীক্ষা করিবে? (How would you test whether electric current is flowing through a wire? If it flows, from which direction?)

৩। তড়িৎ-চুম্বক কাহাকে বলে? উহা প্রধানত কোন্ কোন্ কার্যে ব্যবহৃত হয়? কি উপায়ে ইহার চুম্বক-শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে? (What is an electro-magnet? What are its main uses? How its strength can be increased?)

৪। তড়িৎ-ঘণ্টার একটি পরিষ্কার চিত্র দিয়া উহার কার্য প্রণালী বুঝাও। (Describe the principle of an electric bell with the help of a clear diagram.)

[কঃ বিঃ ১৯৪০]

৫। চিত্র সাহায্যে সমগ্র টেলিগ্রাফ যন্ত্রের কার্য প্রণালী বুঝাইয়া দাও। (Describe the whole system of a telegraph circuit by the help of a diagram.)

৬। টেলিগ্রাফ পথের ধাতব তারের দুই প্রান্ত মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়ায় কি সুবিধা হয়? (What advantage do we derive by earthing the terminals of the telegraph circuit?)

রসায়ন বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিশ্র পদার্থ ও দ্রবণ

কিছু লৌহচূর্ণ ও কিছু গন্ধকচূর্ণ একটি পাত্রে রাখিয়া ভাল করিয়া মিশাও। দেখ এই মিশ্রিত পদার্থের রং লোহার কাল রং ও গন্ধকের হলদে রংএর মাঝামাঝি হইয়াছে। একটি আতস-কাচ (Magnifying glass) দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, লৌহ ও গন্ধকের কণাগুলি পাশাপাশি অবস্থিত রহিয়াছে। মিশ্রিত পদার্থে লৌহ এবং গন্ধক উভয়েরই গুণ বর্তমান থাকে। এই মিশ্রিত পদার্থের কিয়দংশ এক টুকরা কাগজের উপর রাখ, একটি চুম্বক লইয়া তাহার মধ্য দিয়া বার কয়েক নাড়িলে সমস্ত লৌহচূর্ণগুলি ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া লাগিয়া যাইবে এবং গন্ধকচূর্ণ পড়িয়া থাকিবে। মিশ্রিত পদার্থের কিয়দংশ একটি পরীক্ষা নলে (Test tube এ) লইয়া কারবন বাই সালফাইড্ নামক তরলপদার্থ ঢালিয়া নাড়িলে গন্ধক ইহাতে দ্রবীভূত হইবে। পরে পরিস্রুতি কাগজের ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লইলে লৌহচূর্ণ কাগজের উপর আটকাইয়া যাইবে ও গন্ধকের দ্রাবণ নিচের পাত্রে সংগৃহীত হইবে। বাতাসে কারবন্ বাইসাল্ফাইড্ উবিয়া গেলে পাত্রে গন্ধক পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এই মিশ্রণের ফলে কোন নূতন পদার্থ প্রস্তুত হয় নাই। লবণ জলের সহিত মিশিয়া গেলে এইরূপ মিশ্রপদার্থের সৃষ্টি হয়। দুই বা ততোধিক পদার্থের এইরূপ মিশ্রণের ফলে যে পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহাকে **মিশ্র** (Mixture) বলে। মিশ্রপদার্থের গুণ ইহার উপাদানগুলির গুণের সমষ্টিমাত্র, ইহা কোন নূতন পদার্থ নহে এবং ইহার উপাদানগুলিকে সহজেই পৃথক করা যায়।

এইরূপ কিছু বালি ও কিছু চিনি মিশাইলে দেখা যাইবে মিশ্রিত পদার্থের রং, চিনির রং এবং বালির রংএর মাঝামাঝি হইয়াছে এবং বালি ও চিনির দানাগুলি পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে যদি পুনরায় কেবলমাত্র বালি মিশান হয় তবে দেখা যাইবে মিশ্রপদার্থের রং ক্রমশ বালির রংএর মত হইয়া যাইতেছে। এইরূপ যত ইচ্ছা বালি ইহাতে মিশাইতে পারা যাইবে। যেমন করিয়াই মিশ্রিত করা হউক না কেন এখন যদি এই মিশ্র পদার্থের খানিকটা লইয়া সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হয় তবে দেখা যাইবে একই মিশ্রপদার্থে উপাদান-গুলির পরিমাণের অনুপাত সকল অংশে সমান নহে।

মিশ্র পদার্থ হইতে বিভিন্ন পদার্থ কিরূপে পৃথক করা যায় দেখা যাউক। বহুবিধ মিশ্র পদার্থ হইতে বিভিন্ন পদার্থের পৃথক করিবার উপায়ও বহুবিধ, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সহজসাধ্য উপায় নিম্নে বিবৃত হইল।

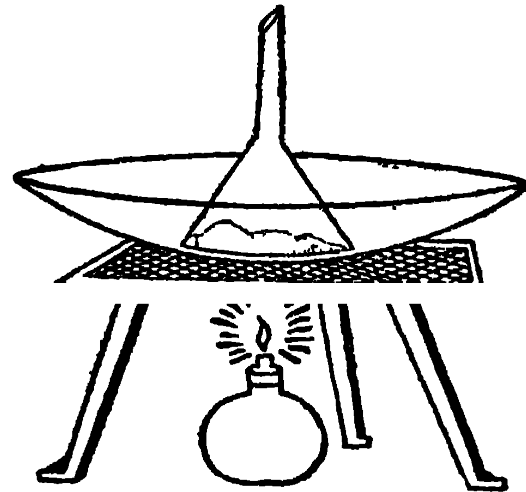
১। হাত বাছাই-যখন কোন বড় আয়তনের পদার্থ ক্ষুদ্র আয়তনের পদার্থের সহিত মিশিয়া যায়, কিংবা যখন কোন বিভিন্ন রংএর দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র মিশ্রিত থাকে, তখন হাত বাছাই দ্বারা সহজেই পদার্থগুলিকে পৃথক করা যায়। মনে কর চালের সহিত চিনির দানা মিশিয়া গিয়াছে। হাত বাছাই দ্বারা চালের দানাগুলি সহজেই চিনির দানা হইতে পৃথক করা যায়। কিংবা যদি চাল এবং ডাল একত্র মিশাইয়া যায় তখনও হাত বাছাই দ্বারা ইহাদিগকে পৃথক করা যায়।

২। চালুনি দিয়া ছাঁকা—মোটা দানা ও সূক্ষ্ম দানার মিশ্রণ হইতে একটিকে পৃথক করিবার ইহা সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ চাল গুঁড়াইয়া সর্বদা প্রস্তুত করিবার সময় চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া মোটা দানা গুলি কেমন করিয়া পৃথক করা হয়। চাল গুঁড়াইয়া চালুনির উপর ঢালিয়া নাড়িলে সূক্ষ্ম দানাগুলি চালুনি গলিয়া নিচে পড়িয়া যায়; ইহাই সর্বদা, এবং চালুনির উপর বড় দানাগুলি থাকিয়া যায়। তাহা-দিগকে পুনরায় গুঁড়াইয়া সূক্ষ্ম করা হয়।

৩। চুম্বক সাহায্যে—কিছু গন্ধক ও লোহাচূর্ণ একত্র মিশাইয়া একটি কাচের পাত্রের উপর ছড়াইয়া দাও। পরে একটি চুম্বক লইয়া আস্তে আস্তে ঐ মিশ্রিত পদার্থের উপর বুলাইতে থাক, দেখিবে চুম্বকের গায়ে লোহাচূর গুলি লাগিয়া যাইতেছে আর গন্ধক পড়িয়া আছে।

৪। দ্রব করিয়া—মনে কর বালি ও চিনি এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মিশ্রিত দ্রব্যকে একটি পাত্রের জলে ঢালিয়া নাড়া চাড়া কর, চিনি জলে গুলিয়া যাইবে কিন্তু বালি গুলিবে না। পরে একটি পাত্রের উপর ফানেল বসাইয়া তাহার উপর পরিস্রুতি কাগজ ভাঁজিয়া ঠিক ফানেলের মত করিয়া বসাইয়া দাও। পরে উহাতে পূর্বোক্ত দ্রবণ ঢালিয়া দাও। দেখিবে বালি ফানেলের উপর পরিস্রুতি কাগজে জমিয়া থাকিবে এবং চিনির জল নিচের পাত্রে সঞ্চিত হইবে। এখন বালি রোদে শুকাইয়া বা গরম করিয়া অথবা শুক্‌না ব্লটিং কাগজের সাহায্যে শুকাইয়া লইতে পারা যায় এবং চিনির জল ফুটাইয়া ঘন করিয়া পুনরায় চিনি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তরল পদার্থে অন্য পদার্থ দ্রব করিয়া যে দ্রবণ প্রস্তুত করা যায় তাহা হইতে পুনরায় পদার্থগুলিকে পৃথক করিবার অনেকগুলি উপায় আছে। দ্রবণ সম্বন্ধে বলিবার সময় সেগুলি যথাযথভাবে বর্ণিত হইবে।

৫। ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার দ্বারা—কিছু বালির মধ্যে কিছু কর্পূর মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগকে পৃথক করিতে হইলে একটি লোহার তেপায়ার উপর লোহার জাল দিয়া তাহার উপর একটি বড় ঘড়ির কাচ (Watch glass) রাখ। ঐ ঘড়ির কাচের উপর বালি মিশানো কর্পূর রাখিয়া যাহাতে ঐ বালি মিশানো কর্পূর সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে এমন



১নং চিত্র—ঊর্ধ্বপাতন

ভাবে একটি কাচের ফানেল উহার উপর ঢাকা দাও (১নং চিত্র)। পরে নিচে একটি স্পিরিট লম্ফ জ্বালিয়া দাও। যত সময় যাইবে ততই ফানেলের ভিতর একপ্রকার শাদা বাষ্প উঠিয়া আবার ফানেলের গায়ে গিয়া শাদা গুঁড়ার মত জমিয়া যাইবে। শাদা গুঁড়াগুলি কর্পূরের বাষ্প—ফানেলের অপেক্ষাকৃত শীতল গাত্রে লাগিয়া জমিয়া পুনরায় কর্পূর হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কঠিন পদার্থের উত্তাপ পাইয়া তরল না হইয়া একেবারে গ্যাসীয় আকার ধারণ এবং শীতলতা পাইয়া গ্যাসীয় পদার্থের একেবারে কঠিন আকার ধারণ করাকে **উর্ধ্বপাতন** (Sublimation) বলে।

জলে ডুবিয়া যায় অথচ জলে দ্রব হয় না এমন পদার্থ, যদি জলে ভাসে অথচ জলে গুলিয়া যায় না এমন পদার্থের সহিত মিশিয়া যায় তবে ঐ মিশ্রিত পদার্থগুলিকে জলে ফেলিয়া সহজেই পৃথক করা যায়। যেগুলি ভাসে সেগুলিকে ছাঁকিয়া লইতে হয় এবং যেগুলি ডুবিয়া যায় তাহাদিগকে পরিস্রুতি কাগজের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া লইয়া পৃথক করা যায়। আরও বহুবিধ উপায়ে মিশ্র পদার্থের উপাদানগুলি পৃথক করা যায়। তাহা তোমরা পরে জানিতে পারিবে।

দ্রবণ

এক গ্লাস জলে কিছু বালি কিম্বা খড়িগুঁড়া ফেলিয়া একটি কাঠি দিয়া ভাল করিয়া নাড়িলে দেখিবে এই জল ঘোলা হইয়া গেল। জলকে স্থির হইতে দিয়া কিছুক্ষণ পরে দেখ, সমস্ত গুঁড়া গ্লাসের তলায় থিতাইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, বালি বা খড়ি জলের সহিত মিশে না।

একটি কাচের ফ্লাস্কে কিছু পরিস্রুত জল লইয়া উহাতে কিছু তুঁতে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া দাও এবং একটি কাচদণ্ড দ্বারা নাড়িতে থাক। দেখিবে জল ক্রমশ নীল হইয়া আসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে এমন অবস্থা আসিবে যে সমস্ত জল একরূপ নীল হইয়া যাইবে, আর যতই নাড় না কেন, ইহার রংএর পরিবর্তন

হইবে না। কিন্তু যদি আবার কিছু তুঁতে দিয়া নাড়িতে থাক তবে দেখিবে জলের রং গাঢ় নীল হইতেছে। এইরূপ গাঢ়তারও একটি সীমা আছে। যখন জল ও তুঁতে এইরূপ মিশিয়া যায় তখন আমরা তুঁতের দ্রবণ পাই।

এইরূপ একটি কাচের গ্লাসে পরিষ্কৃত জল লইয়া উহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া দিয়া জল নাড়িতে থাক। অল্পক্ষণ পরে এই চিনি আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। গ্লাসের জল একটু মুখে দিয়া দেখ, উহার স্বাদ মিষ্ট হইয়াছে। ঐরূপ এক চামচ লবণ কিঞ্চিৎ জলে ফেলিলে ওই লবণও আর দেখা যায় না এবং জলের স্বাদ কিঞ্চিৎ লোণা হয়। অতএব বুঝা গেল, চিনি বা লবণ জলে গুলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। কোনও জিনিষ জলে গুলিয়া গেলে আমরা বলিয়া থাকি যে, জিনিষটি জলে **দ্রব** হইয়াছে। এইজন্য জল, চিনি বা লবণের **দ্রাবক** (Solvent), চিনি বা লবণ জলের **দ্রাব** (Solute) এবং এই চিনি বা লবণ মিশ্রিত জলকে চিনি বা লবণের **দ্রবণ** (Solution) বলা হয়। এইরূপ ফট্‌কিরি, সোরা, নিশাদল, হীরাকস প্রভৃতি দ্রব্য জলে দ্রবণীয়।

জল দেখিতে পরিষ্কার হইলেই যে তাহাতে কোন দ্রব্য মিশ্রিত নাই এ কথা বলা যায় না। বারণ নলকূপ বা ঝরণার জল সাধারণত বেশ স্বচ্ছ দেখা যায়, কিন্তু ওই জল মুখে দিলে বুঝা যায় ইহা নির্মল জলের মত স্বাদহীন নহে এবং একটি পাত্রে এই জল লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে যখন সমস্ত জল উবিয়া যায়, তখন দেখা যায় পাত্রে গুঁড়া গুঁড়া কি পড়িয়া আছে। তাহা হইলে জলে ঐ গুঁড়া দ্রব্য মিশ্রিত ছিল।

এখন একগ্লাস জলে কিছু গালার গুঁড়া ফেলিয়া নাড়িলে দেখিবে যে, গালা জলে দ্রবণীয় নহে। কিন্তু জলের পরিবর্তে যদি স্পিরিট্ ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে গালা তাহাতে গুলিয়া যায়। অতএব গালা জলে অদ্রাব্য হইলেও স্পিরিটে দ্রবণীয়। এইরূপ গন্ধকও জলে দ্রব হয় না, কিন্তু উহা কার্বন্ বাইসাল্‌ফাইড (Curbon Bisulphide) নামক তরল পদার্থে সহজেই গুলিয়া যায়। সুতরাং জানা গেল যে, কোন পদার্থ জলে দ্রবণীয় না হইলেও অন্য কোন তরল

পদার্থে দ্রব হইতে পারে। আমরা যে ডাক্তারী ঔষধ সেবন করি, তাহার অনেকগুলিই স্পিরিটে দ্রবীভূত থাকে। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যে টিংচার আইওডিন (Tinc. Iodine) ব্যবহার করা হয়, তাহা স্পিরিট্ ও আইওডিনের দ্রবণমাত্র। হোমিওপ্যাথী ঔষধ বিশুদ্ধ স্পিরিট্ ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। এই সকল দ্রবণের খানিকটা করিয়া বিভিন্ন পাত্রে লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাব বিদ্যমান থাকে। নতুবা একই মিছরির দ্রবণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নরূপ মিষ্ট হইত। এইরূপ যে কোন পদার্থে যদি অপর পদার্থ এমনভাবে মিশ্রিত করা হয় যে মিশ্রিত পদার্থের যে কোন অংশে বিভিন্ন পদার্থের অংশের অনুপাত সমান থাকে তবে ঐ মিশ্রিত পদার্থটিকে পদার্থগুলির দ্রবণ বলা হয়।

পদার্থগুলির মধ্যে একটি তরল হইলেই এরূপ সংমিশ্রণ সম্ভব হয় বলিয়া দ্রবণ মাত্রই তরল।

খানিকটা জলে অল্প অল্প করিয়া ক্রমাগত চিনি ঢালিয়া কাঠি দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাক। প্রথমে চিনি বেশ গুলিয়া যাইবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখিবে চিনি আর দ্রবীভূত হইতেছে না। জল নাড়া বন্ধ করিলে গ্লাসের তলায় খানিকটা চিনি পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় এই জলকে চিনি দ্বারা **সংপৃক্ত** (Saturated) বলা হয়। জলের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে গ্লাসের তলায় যে চিনি পড়িয়া থাকে, তাহাও ক্রমশ গুলিয়া যায়। অতএব বুঝা গেল যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ জল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত অবস্থায় ধারণ করিতে পারে। অবশ্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে সকল বস্তু সমপরিমাণে দ্রবীভূত হয় না। এক সের জলে যত চিনি গুলিয়া যায়, লবণ তত গুলিবে না। এইজন্য আমরা বলিয়া থাকি জলে চিনির **দ্রাব্যতা** (Solubility) লবণের দ্রাব্যতা অপেক্ষা অধিক।

চিনির দ্বারা সংপৃক্ত জলের তলায় যে চিনি পড়িয়া থাকে, জলের পরিমাণ না বাড়াইয়া উহাতে উত্তাপ দিলেও সেই চিনি ক্রমশ গুলিয়া যাইতে

থাকে। আবার এই জল ঠাণ্ডা হইলে, যে চিনি তাপ দেওয়ায় জলে দ্রব হইয়াছিল, তাহা পুনরায় পাত্রের তলায় থিতাইয়া পড়ে। অতএব, বস্তুর দ্রাব্যতা উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়।

আরও দেখ, জলে সোরা বা নিশাদল দ্রবীভূত করিলে সেই জল বেশ কিছু ঠাণ্ডা হয়। সাধারণত কঠিন পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইলে দ্রবণের উষ্ণতা কিছু কমাইয়া দেয়।

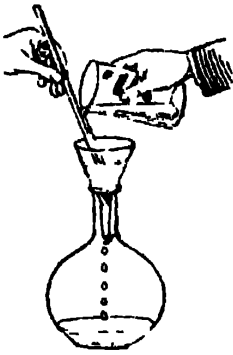
কেবল যে কঠিন পদার্থই দ্রব হয়, তাহা নহে। তরল বা বায়বীয় পদার্থও কঠিন পদার্থের ন্যায় দ্রবীভূত হইতে পারে। স্পিরিট্ ও গ্লিসারিণ জলের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু তেল এরূপ হয় না। তবে তেল স্পিরিটে দ্রব হয়, সেইজন্য হাতে তেল লাগিলে জল দিয়া ধুইলে তেল উঠে না, কিন্তু একটু স্পিরিট্ দিলেই হাত পরিষ্কার হইয়া যায়। তোমরা বোধ হয় জান, সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিলেই একটি গ্যাস জোরে বাহির হইতে থাকে। এই গ্যাসটি কার্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon Dioxide) নামক গ্যাস। বস্তুত সোডা-ওয়াটারে সোডা মোটেই থাকে না, কেবল এই গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বৃষ্টির জলও পড়িবার সময় বায়ুমণ্ডলস্থ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করিয়া লয়।

এক্ষণে তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত অন্য পদার্থ পৃথক করিবার উপায়গুলি দেখা যাউক :—

পূর্বে দেখা গিয়াছে বালি, খড়িমাটি প্রভৃতি জলে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু চিনি, মিছরি, লবণ প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়। এক একটি তরল পদার্থে কয়েকটি পদার্থ দ্রবীভূত হয় আবার কতকগুলি দ্রবীভূত হয় না। যে সকল পদার্থ তরল পদার্থে দ্রবীভূত না হইয়া উহাতে মিশ্রিত থাকে, তাহাদিগকে সাধারণত থিতাইয়া বা **আস্রাবণ** দ্বারা (Decanting) পৃথক করা যায়। নদীর জল বর্ষাকালে ঘোলা হয়। কারণ বৃষ্টির জলে মাটি ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ ধুইয়া নদীতে আসিয়া পড়ে। ইহাদের কিয়দংশ জলে দ্রব হইলেও অধিকাংশই ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই ঘোলা জল কোন পাত্রে স্থির

ভাবে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে, ওই ময়লা পাত্রের তলদেশে কাদার আকারে জমে ও উপরের জল অনেকটা স্বচ্ছ হয়। ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার জল উপর হইতে আস্তে আস্তে ঢালিয়া লওয়া হয়। কিন্তু স্বচ্ছ দেখাইলেও এই জলের সমস্ত ময়লা দূরীভূত হয় নাই।

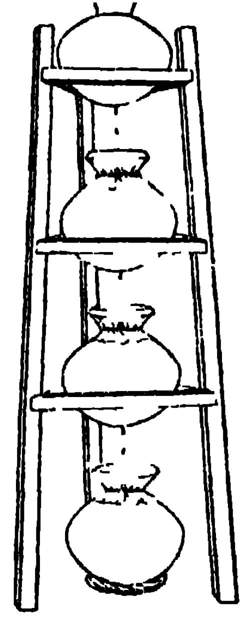
ওই কাদাজল যদি কোন কাপড়ে ছাঁকিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে অনেক মাটি কাপড়ের উপর আটকাইয়া যায়। থিতান জল অপেক্ষা এই জল অনেকটা পরিষ্কৃত হইলেও সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত নহে। কারণ, কাপড়ের ছিদ্রপথে সমস্ত মাটি আটকাইতে পারে না। পরিস্রুতি কাগজ (Filter-paper) দ্বারা এই ছাঁকন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরিস্রুতি কাগজ ব্লটিং কাগজের মত সছিদ্র, তবে উহার ছিদ্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে, ইহার মধ্যে জল যাইলেও মাটি প্রভৃতির কণা যাইতে পারে না। একটি কাচের ফানেল (Funnel) এর মধ্যে একখানি পরিস্রুতি কাগজ ভাঁজিয়া ঠোঙ্গার মত করিয়া বসাইয়া দাও। ফানেলের তলায় একটি পাত্র বসাইয়া একটি কাচদণ্ডের গা বাহিয়া ঘোলা জল পরিস্রুতি কাগজের উপর ধীরে ধীরে ঢাল (২নং চিত্র)। দেখ ফানেলের নল দিয়া যে জল চুয়াইয়া পড়িতেছে, তাহা বেশ পরিষ্কার ও সমস্ত কাদা পরিস্রুতি কাগজের উপর থাকিয়া গিয়াছে।


২নং—পরিস্রুতি

কোন তরল পদার্থকে ছাঁকিয়া উহাতে ভাসমান পদার্থগুলি হইতে উহাকে পৃথক করিয়া লওয়ার প্রক্রিয়াকে **পরিস্রুতি** বা **পরিস্রাবণ** (Filtration) বলে।

এক্ষণে একবাটি ঘোলাজলে এক চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জল উপরিউক্ত উপায়ে ছাঁকিয়া লও। ফানেলের নিচের পাত্রের পরিষ্কৃত জল মুখে দিয়া দেখ লোণা লাগিবে। লবণ জলে দ্রব হইয়া পরিস্রাবণকালে জলের সহিত পরিস্রুতি কাগজের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত পদার্থকে জল হইতে পৃথক করা যায় না, কেবলমাত্র অদ্রাব্য পদার্থগুলিই দূরীভূত হয়।

বালি ও কয়লার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া গেলে জলে অদ্রবীভূত সমস্ত ময়লা ওই বালি ও কয়লাতে আটকাইয়া যায়। যে স্থানে পরিষ্কৃত জলের জল পাওয়া যায় না, সেস্থানে এই উপায়ে জল পরিষ্কার করিবার জন্য ফিল্টার (Filter) ব্যবহৃত হয়। ৩নং চিত্রে দেখ, একটি কাঠের ফ্রেমে চারিটি কলসী উপর উপর বসান আছে। উপরের তিনটি কলসীর তলায় ছিদ্র আছে। উপরের প্রথম কলসীতে অপরিষ্কার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, দ্বিতীয় কলসীতে কিছু পরিষ্কৃত কাঠকয়লা ও তৃতীয়টিতে পরিষ্কৃত বালি থাকে। কয়লা ও বালির মধ্য দিয়া জল যাইবার সময় উহাতে ভাসমান ময়লাগুলি কয়লা ও বালিতে আটকাইয়া যায়, সুতরাং সর্বনিম্ন কলসীতে স্বচ্ছ জল পাওয়া যায়। ইন্দারা ও ঝরণার জল মাটির ভিতর দিয়া আসিবার সময় এইরূপে পরিষ্কৃত হয় বলিয়া সকল সময়ই স্বচ্ছ।

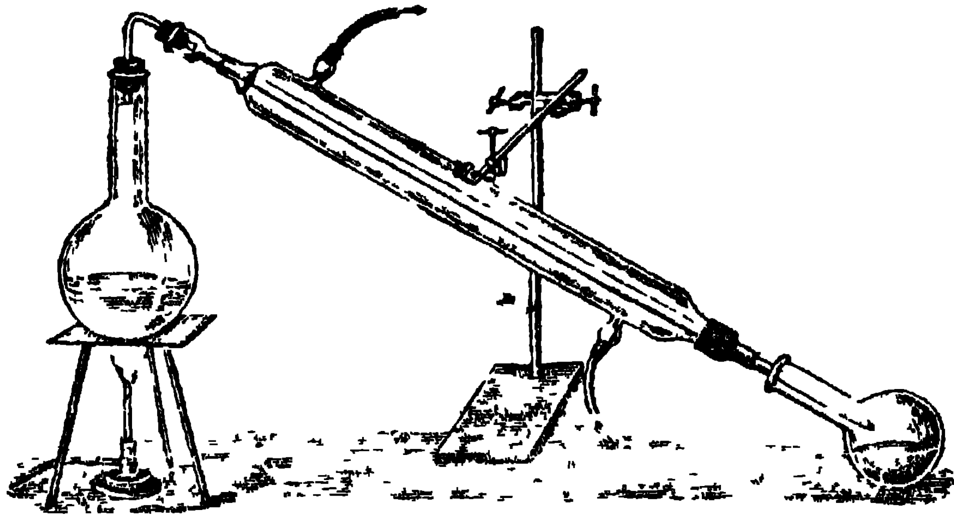


৩নং চিত্র—ফিল্টার

পাতন—দেখা গিয়াছে যে, বালি, খড়ি, মাটি প্রভৃতির ন্যায় যে সকল পদার্থ জলে দ্রবীভূত না হইয়া ভাসিয়া থাকে, পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে জল হইতে পৃথক করা যায়। কিন্তু চিনি, লবণ, তুঁতে প্রভৃতির ন্যায় যে সকল পদার্থ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাহাদিগকে এই উপায়ে দূরীভূত করা যায় না। জল ফুটাইলে কেবল বিশুদ্ধ জলকণাগুলিই বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং চিনি, লবণ ইত্যাদি মিশ্রিত পদার্থগুলি পড়িয়া থাকে। এই উষ্ণ জলীয় বাষ্পকে শীতল করিয়া জমাইলে আমরা বিশুদ্ধ জল পাইতে পারি। জলের ন্যায় অন্য কোন তরল পদার্থকেও, উহাতে দ্রবীভূত পদার্থ হইতে এই উপায়ে বিশুদ্ধ করা যায়। এই শোধন-প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় **পাতন** (Distillation) ও চলতি কথায় 'চোলাই করা' বলে। তবেই দেখিতেছ যে, পাতন প্রক্রিয়ায় প্রথমে বাষ্পীভবন ও পরে

ঘনীভবন হইয়া থাকে। সমুদ্রজল প্রাকৃতিক উপায়ে পাতিত হইয়া বৃষ্টিব জলে পবিণত হয।

অল্প পবিমাণ জল পাতিত কবিতে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ৪নং চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। চিত্রটিব বাম পার্শ্বেব কাচকূপীতে (Flask) কিছু চিনিব জল ফুটান হইতেছে। জল বাষ্প হইযা পাত্রটিব মুখেব নল দিযা অন্য একটি লম্বা কাচনলেব মধ্য দিযা যাইবাব সময শীতল হইযা পুনবায জমিয়া জল হয়। এই জল উক্ত নলেব অপব প্রান্তে বক্ষিত আব একটি পাত্রে আসিযা জমিতেছে। পাত্রস্থ জল বিশুদ্ধ ও নির্মল। চিত্রে দেখ, এই লম্বা নলটিব বাহিবে আবও একটি বড় নল বহিযাছে। এই দুই নলেব মধ্যবর্তী স্থান দিযা শীতল জল



৪ নং চিত্র—পাতন

প্রবাহিত কবিবাব বন্দোবস্ত বহিয়াছে। বড নলটিব গাযে উপবেব মুখটি দিযা ঐ জল বাহিব হইযা যায।

বাসাযনিক পবীক্ষাব জন্য, ডাক্তাবী ঔষধ প্রস্তুত কবিতে ও মোটব গাড়ীব ব্যাটাবীতে পাতিত জল (Distilled water) যথেষ্ট পবিমাণে ব্যবহৃত হয়।

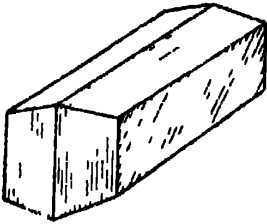
এতদ্ভিন্ন একটি তবল পদার্থে একটি কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে তাহাকে স্ফটিকীকবণ প্রক্রিয়া দ্বাবা পৃথক কবা যায়।

স্ফটিকীকরণ—এক টুক্‌রা লবণ ভাঙ্গিলে তাহা অনেকগুলি দানায় বিভক্ত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখ, এই দানাগুলি দেখিতে ছোটবড় হইলেও ইহাদের সকলগুলিরই আকৃতি একরূপ। একখণ্ড মিছরি ভাঙিলেও যে দানাগুলি বাহির হয়, তাহাদেরও আকৃতি পরস্পর একই রূপ। কিন্তু দেখ, লবণ-দানার আকৃতি মিছ্‌রি-দানার আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, লবণের দানা (৫নং চিত্র) ষট্‌তলবিশিষ্ট ঘনক

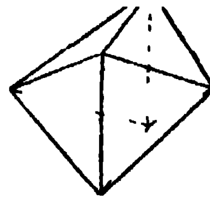


৫নং চিত্র—লবণের দানা

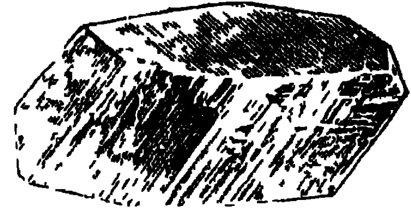
(Cube) এবং মিছ্‌রির দানায় (৬নং চিত্র) আটটি তল দেখিতে পাওয়া যায়। ফট্‌কিরির দানা আটতলবিশিষ্ট বটে, কিন্তু ইহা দেখিতে মিছ্‌রির দানার মত নহে। ৮নং চিত্রে তুঁতের দানার আকৃতি কিরূপ হয় দেখ। এইরূপে দেখা যায়, বিভিন্ন দ্রব্যের দানাগুলি দেখিতে একরূপ নয় এবং প্রত্যেক



৬নং চিত্র
মিছ্‌রির দানা



৭নং চিত্র
ফট্‌কিরির দানা



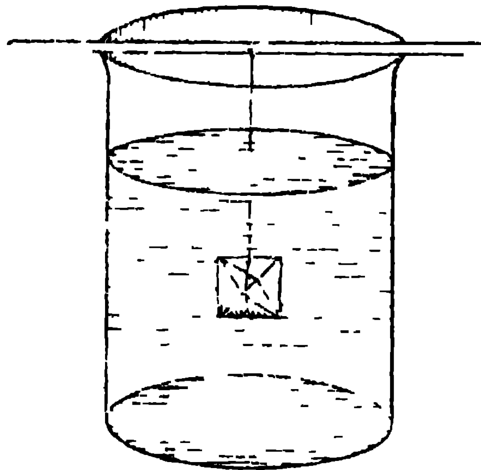
৮নং চিত্র
তুঁতের দানা

দ্রব্যের দানাগুলির আকৃতির একটা বিশেষত্ব আছে। অনেক সময়ে দানার আকৃতি দেখিয়াই উহা কোন্ পদার্থের দানা বলিতে পারা যায়।

একটি পাত্রে খানিকটা জল লইয়া উহাতে তুঁতের গুঁড়া মিশাইয়া উহার সংপৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত কর। এই সংপৃক্ত দ্রবণের কিয়দংশ একটি অগভীর পাত্রে ঢালিয়া পাত্রটি একধারে সরাইয়া রাখ। দ্রবণের

অবশিষ্টাংশে তাপ দিলে দেখা যায়, নীলবর্ণের তুঁতের দানা বাহির হইতেছে। এই দানাগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রথমোক্ত পাত্রটি দিনের পর দিন পরীক্ষা করিয়া দেখ, জল যেমন ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে, পাত্রের তলায় অমনই সুন্দর সুন্দর নীলবর্ণের দানা বাধিতেছে এবং দিনে দিনে দানাগুলি পুষ্ট হইতেছে। যে কোনও দ্রবণে উত্তাপ দিয়া দ্রাবকের পরিমাণ কমাইয়া দিলে উহাতে যে কঠিন পদার্থের কণাগুলি পূর্বে দ্রব অবস্থায় ছিল, তাহারা দানার আকারে পুনরায় দেখা দেয়। এই দানাগুলি জ্যামিতি-সম্মত বিশিষ্ট আকৃতি পায়, ইহাদিগকেই **স্ফটিক** (Crystal) বলে।

উপরে দেখা গিয়াছে, দ্রবণে তাপ প্রয়োগ করিলে যে দানাগুলি বাহির হয়, তাহারা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্রাবক ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হইলে বৃহদাকারের দানা পাওয়া যায়। জলে মিছ্রির পরিপূরিত দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে একটি ছোট মিছ্রির দানা সূতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে দেখা যায় যে, জল ধীরে ধীরে উবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিছ্রি দানা বাধিয়া সূতার পার্শ্বে জমিয়া একটি বড় তাল গঠিত করে। দোকানে তোমরা যে মিছ্রির কুঁদা দেখ, তাহা এই রূপেই প্রস্তুত হয়। ৯নং চিত্রে দেখ, এইরূপে সূতায় ঝুলান একটি ফট্‌কিরির দানা ক্রমশ কেমন বড় হইতেছে। স্ফটিক প্রস্তুত করণের এই প্রক্রিয়াকে **স্ফটিকীকরণ** (Crystallisation) কহে।



৯নং চিত্র—স্ফটিকীকরণ

পূর্বেই দেখিয়াছ যে, পদার্থের দ্রাব্যতা দ্রাবকের পরিমাণ ও উত্তাপের উপর নির্ভর করে। এক সের ফুটন্ত জলে যে পরিমাণ চিনি দ্রবীভূত হয়, এক সের

ঠাণ্ডা জলে সে পরিমাণ চিনি দ্রব হয় না। সুতরাং এই ফুটন্ত জল শীতল হইলেও চিনি পাত্রের তলায় দানা বাধিয়া পড়িবে। দানার আকৃতি সুগঠিত ও বড় করিতে হইলে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন দ্রবণ দ্রুত শীতল না হইয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয় ও কোনরূপ নাড়াচাড়া না পায়।

দুইটি লবণজাতীয় পদার্থ কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে স্ফটিকীকরণ-প্রক্রিয়া দ্বারা তাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে। কিছু তুঁতে ও ফট্‌কিরিচূর্ণ খানিকটা উষ্ণ জলে ফেলিয়া উহাদের সংপৃক্ত মিশ্র-দ্রবণ প্রস্তুত কর। ঐ মিশ্র-দ্রবণ শীতল হইলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে তুঁতের নীল-দানা ফট্‌কিরির শাদা দানা পাশাপাশি জমিতেছে।

দ্রবণ, পরিস্রাবণ, পাতন ও স্ফটিকীকরণ প্রণালীগুলি আমরা অনেক সময়ে কাজে লাগাইয়া থাকি। মনে কর কিছু চিনি ধূলাবালির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ঐ চিনি অব্যবহার্য বলিয়া না ফেলিয়া সহজেই তাহা পরিষ্কার করা যাইতে পারে। চিনি জলে দ্রব হয়, কিন্তু ধূলাবালি তাহা হয় না। সুতরাং কিছু জলে ঐ অপরিষ্কৃত চিনি ফেলিয়া দিয়া জল গরম কর, উষ্ণ জলে চিনি গুলিয়া গেল, এক্ষণে ঐ দ্রবণ পরিস্রুতি কাগজের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে ধূলাবালি উহার উপর পড়িয়া থাকিবে এবং নিচের পাত্রে পরিষ্কৃত চিনির জল পাওয়া যাইবে। এই জল শীতল হইলে চিনি দানা বাঁধিতে থাকিবে। দানাগুলি পৃথক করিয়া লইয়া বাকী জল ফুটাইয়া জলটুকু উবিয়া যাইতে দিলে, আরও চিনি পাওয়া যাইবে। লবণের সহিত পাথরকুচা মিশ্রিত থাকিলে উহা হইতে বিশুদ্ধ লবণ এইরূপেই পৃথক করা যাইতে পারে।

সংক্ষেপঃ—দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র হইয়া যদি স্ব স্ব গুণ বজায় রাখে তবে সকলগুলির সমষ্টিকে মিশ্র বলে। তরল পদার্থে অন্য পদার্থ একরূপভাবে মিশ্রিত থাকিলে দ্রবণ কহে। মিশ্র পদার্থ হইতে উপাদান পৃথক করিবার উপায়—হাত-বাছাই, চালুনি দিয়া ছাঁকা, চুম্বকের সাহায্যে আকর্ষণ, দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া, ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া প্রভৃতি। দ্রবণ হইতে উপাদান পৃথক করিবার উপায়—আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, পাতন, স্ফটিকীকরণ প্রভৃতি। যাহা তরল পদার্থে

দ্রব হয় তাহাদিগকে দ্রাব এবং তরল পদার্থকে দ্রাবক বলে। নির্দিষ্ট উত্তাপে একটি তরল পদার্থে যখন সর্বাধিক পরিমাণ একটি পদার্থ দ্রব থাকে তখন তাহাকে সংপৃক্ত দ্রবণ বলা হয়। উত্তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের দ্রাব্যতা বাড়ে এবং সংপৃক্ত হইবার জন্য পদার্থের পরিমাণও অধিক লাগে।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। মিশ্র ও দ্রবণ কাহাকে বলে? উহাদের পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও।

(What is meant by a mixture and a solution? Tabulate their differences)

২। মিশ্র এবং দ্রবণের উপাদানগুলি পৃথক করিবার পাঁচটি সহজ উপায় বর্ণনা কর। (Describe five simple methods of separating the ingredients from a mixture and a solution)

৩। দ্রবণ, পরিস্রাবণ, পাতন ও স্ফটিকীকরণ এই চারিটি প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Describe —Solution, Filtration, Distillation and Crystallisation)

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও:—

দ্রবণ, সংপৃক্ত দ্রবণ, দ্রাব, দ্রাবক ও স্ফটিক।

(Explain the following with example —a solution, a saturated solution, a solute, a solvent and a crystal)

৫। বালির সহিত চিনি, লবণের সহিত বালি, খড়ির সহিত সোরা এবং বালির সহিত কর্পূর মিশিয়া গেলে উহাদিগকে কিরূপে পৃথক করা যায়? (How would you separate the ingredients of the following mixtures —sand and sugar, salt and sand, nitre and chalk and sand and camphor)

৬। গন্ধকের গুঁড়া হইতে কিরূপে গন্ধকের দানা প্রস্তুত করা যাইতে পারে?

(How crystals of sulphur may be made from dust of sulphur?)

৭। সোরা, গন্ধক ও কাঠকয়লার গুঁড়া মিশাইয়া বারুদ প্রস্তুত হয়। বারুদ হইতে কি উপায়ে উহাদিগকে পৃথক পৃথক পাওয়া যাইতে পারে, তাহা বিশদরূপে বুঝাও।

(Gun powder is a mixture of nitre, charcoal and sulphur How each of these can be separated?)

৮। জলে দ্রবণীয় কতকগুলি কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের নাম কর। স্বভাবজ জল বিশুদ্ধ

অবস্থায় পাওয়া যায় না কেন ? (Name some solids, liquids and gases which are soluble in water. Why pure water does not occur in nature ?)

৯। জলে তুঁতের দ্রবণ কিরূপে প্রস্তুত করা যায় ? চিনির জল হইতে চিনি এবং সমুদ্রের জল হইতে লবণ কিরূপে পাওয়া যায় ? (How a solution of copper sulphate in water may be made ? How can we recover sugar from a sugar solution and salt from sea water ?)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

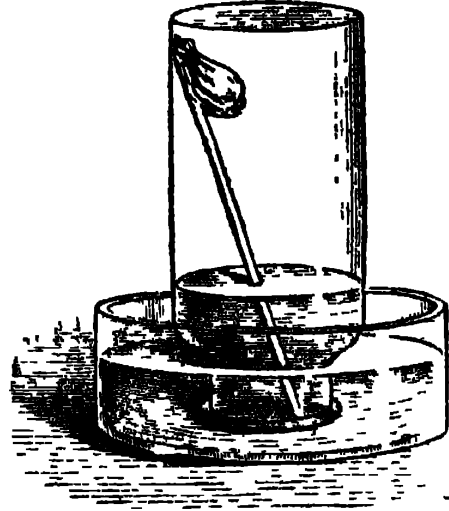
মরিচা ধরা ও দহন

লৌহ যদি বেশী দিন ধরিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সেই লোহায় মরিচা ধরে, ইহা তোমরা জান। ছুরি, কাচি, ক্ষুর প্রভৃতি লোহার জিনিষ অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে ঐগুলিতেও মরিচা ধরে। লৌহ বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি করে, তাহা ঐ মরিচা। কিন্তু এই মিলনের ফলে তাপ ও আলোক পাওয়া যায় না বলিয়া, আমরা মনে করি লৌহ দাহ্য নয়। বস্তুত, মরিচা পড়াও একরকম দহন, সাধারণ দহনের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, এরূপ দহনে একসঙ্গে তাপ ও আলোক সৃষ্ট হয় না বলিলেই চলে।

মরিচা ধরিলে লোহের ওজন বাড়িয়া যায়। কতকটা নূতন উজ্জ্বল লোহাচুর একটি চীনামাটির মুচিতে লইয়া ওজন কর। ইহাতে অল্প জল ছিটাইয়া দিয়া দুই একদিন রাখিয়া দিলে দেখিবে যে লোহাচুরগুলি আর উজ্জ্বল নাই, তাহাতে মরিচা ধরিয়াছে। এক্ষণে ঐ মুচিটি অল্প গরম করিলে উহাতে যে সামান্য জল আছে, তাহা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে। পরে ওজন করিলে দেখা যায় যে মরিচা ধরা লোহাচুরের ওজন বেশী হইয়াছে।

লৌহে মরিচা পড়িবার পর উহাতে বায়ুর যে একাংশ ব্যয়িত হয়, তাহা নিম্নের পরীক্ষা হইতে বুঝিতে পারিবে। একটি ছোট কাপড়ের থলিতে কিছু নূতন উজ্জ্বল লোহাচুর ভরিয়া উহা উত্তমরূপে জলসিক্ত কর। পরে থলিটি একটি কাচদণ্ডের এক প্রান্তে বাঁধিয়া দণ্ডটি জলপূর্ণ কাচপাত্রের উপর ধর এবং ১০নং চিত্রে প্রদর্শিতভাবে একটি বিস্তৃত মুখবিশিষ্ট কাচের বোতল উহার উপর চাপা দিয়া দুই একদিন রাখিয়া দাও। বোতলের মধ্যের জল ও নিম্নপাত্রের জল

প্রথমে এক সমতলেই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল, বোতলের জল কিছু উপরে উঠিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় বোতলের মধ্যে এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহার জন্য উহার মধ্যস্থ বায়ুর কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়াছে, যে অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়া যায় বলিয়া উহা প্রজ্জ্বলন-পোষক নহে। এইবার থলিটি খুলিয়া দেখ, লৌহচূর্ণগুলিতে পূর্বের ঔজ্জ্বল্য নাই এবং সেগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে। তাহা হইলে বায়ুর অপর একটি উপাদান



১০ নং চিত্র—মরিচা ধরা

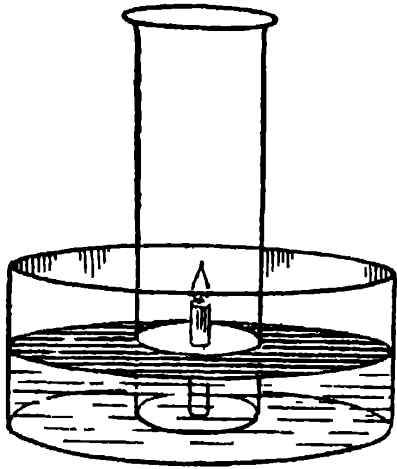
লৌহের সহিত মিলিত হইয়া মরিচা উৎপন্ন করিয়াছে। পরে জানিতে পারিবে এই উপাদান সমস্ত বায়ুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ। বোতলের মধ্যে জল উঠিলে দেখিবে এই জল সমস্ত ফাঁকা জায়গার $\frac{১}{৫}$ অংশ অধিকার করিয়া আছে। বায়ুর এই উপাদানটির নাম অক্সিজেন। তুলাদণ্ডের সাহায্যে প্রমাণ করিতে পার, মরিচা ধরিবার পর লৌহচূর্ণগুলির ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। ভাল ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহনির্মিত দ্রব্যে যাহাতে মরিচা না ধরিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবহারের পর ইহাদের গায়ে ভেস্‌লিন (Vaseline) মাখাইয়া রাখিতে হয়। কারণ, বায়ুর অক্সিজেন ভেস্‌লীন ভেদ করিয়া লৌহের সহিত মিলিত হইতে পারে না। লৌহের উপর কলাই (Enamel) করিলেও ইহাতে মরিচা ধরিতে পারে না। এইরূপ কলাই করা লৌহের পাতে কেরোসিনের ক্যানেস্তারা, বাল্‌তি, কারোগেট্ টিন, চায়ের কাপ ও কেট্‌লী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি উন্মুক্ত বায়ুতে পড়িয়া থাকিলে উহাদের উপরেও মরিচা পড়ে।

—

একটি জ্বলন্ত মোমবাতি একটি কাচপাত্রের মধ্যে বসাইয়া মোমবাতির

উপর একটি কাচের জার (Gas-Jar) উপুড় করিয়া রাখ। যাহাতে জারের ভিতর বাতাস না ঢুকিতে পারে, তজ্জন্য পাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া দাও



১১ নং চিত্র—প্রজ্বলন

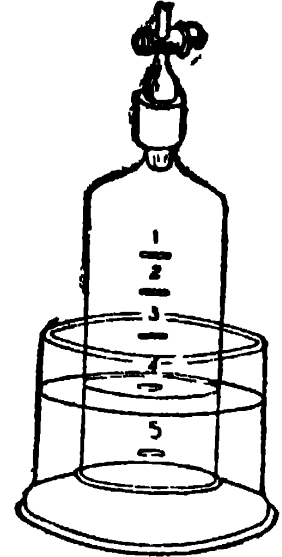
(১১ নং চিত্র)। দেখ বাতির শিখা ক্রমে নিষ্প্রভ ও ছোট হইয়া একেবারে নিভিয়া গেল। প্রকৃত-পক্ষে বাতাসের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহার সহযোগে জ্বলনকার্য চলে এবং তাহা না থাকিলে প্রদীপাদি জ্বলিত না। বায়ুমধ্যস্থ এই পদার্থের নাম অক্সিজেন (Oxygen)। দহন বা জ্বলন কালে এই অক্সিজেন ব্যয়িত হয়। কাজেই এই পরীক্ষায় জারের ভিতরে বাতাসের অক্সিজেন ব্যয়িত হইলে নূতন বাতাসের অভাবে বাতি নিভিয়া যায়। এই ব্যয়িত অক্সিজেন ও মোমবাতির অংশ আপাতদৃষ্টিতে নষ্ট হইল বলিয়া মনে হইলেও, তাহারা কোনও নূতন পদার্থের সৃষ্টি করিল কিনা দেখা যাউক।

মোমবাতি নিভিয়া যাইবার পর জারটিকে সোজা করিয়া ধরিয়া উহাতে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল ঢালিয়া দাও এবং একটি চাকৃতি দ্বারা গ্লাসের মুখ বন্ধ করিয়া গ্লাসটি নাড়িলে দেখিবে স্বচ্ছ, চুনের জল দুধের মত শাদা হইয়া গেল। কিন্তু একমাত্র কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসই (Carbon-dioxide gas) চুনের জলকে এইরূপ ঘোলাটে করিয়া দেয়। অতএব মোমবাতি পুড়িয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করিয়াছে। বাতির উপাদানে যে কার্বন (Carbon) ছিল তাহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

বাতির কার্বন এইরূপে অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় তাপ ও আলোকের সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়াকে তোমরা দহন বা জ্বলন বলিয়া জান। এক্ষেত্রে দহন শীঘ্র হয় কিন্তু মরিচা ধরা মৃদু বা মন্থর দহন।

এতদ্ভিন্ন ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) নামক ধাতু কিংবা গন্ধকের যে অনুরূপ ভাবে দহন হয় তাহাও দেখ।

একটি চীনা মাটির মুচিতে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর কিছু গুঁড়া লইয়া ঐ মুচিটি একটি জলপূর্ণ পাত্রে ভাসাইয়া দাও। এই পাত্রের উপর একটি ছিপিবদ্ধ কাচের বেলজার (Bell jar) ঢাকা দাও। বেলজারের মুখের ছিপি খুলিয়া দিলে দেখিবে বেলজারের ভিতরের ও বাহিরের জল এক সমতলে আছে। এইবার বেলজারের মুখ দিয়া একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া ম্যাগনেসিয়াম ধাতুতে আগুন ধরাইয়া তাড়াতাড়ি কাঠিটি বাহির করিয়া বেলজারের মুখ ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া দাও। দেখিবে প্রথমে ম্যাগনেসিয়াম বেশ জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া নিভিয়া যাইবে। এদিকে জারের ভিতরে জলতল উঠিয়া যখন পূর্বের ফাঁকা স্থানের $\frac{1}{5}$ অংশ অধিকার করিবে তখন আর জল উপরে উঠিবে না। এইবার যদি জারের ভিতর একটি জ্বলন্ত কাঠি প্রবেশ করাও তাহা নিভিয়া যাইবে। সুতরাং প্রজ্বলনের পর বেলজারের মধ্যে যে গ্যাসীয় পদার্থ আছে তাহা প্রজ্বলন পোষক নহে। প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ইহা নাইট্রোজেন (Nitrogen)। বায়ুর অক্সিজেন অংশ প্রজ্বলন কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এইবার যদি মুচির দগ্ধ ম্যাগনেসিয়াম লইয়া সূক্ষ্ম রাসায়নিক তুলাদণ্ডের সাহায্যে ওজন কর দেখিবে ম্যাগনেসিয়ামের ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ দহনের ফলে ইহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড প্রস্তুত করিয়াছে। দহনের ফলে বায়ুর অক্সিজেন অংশের সহিত অন্য পদার্থের সংযোগ হইলে যে পদার্থের ওজন বৃদ্ধি হয় তাহা সকল সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কারণ তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কাঠ পোড়াইলে যে কয়লা বা ছাই পড়িয়া থাকে তাহা কাঠের চেয়ে ভারী ত নয়ই অধিকন্তু কাঠের চেয়ে অনেক হাল্কা। ইহার কারণ কাঠের একটি উপাদান কার্বন (Carbon), তাহার সহিত বায়ুর অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড হয় তাহা



১২নং চিত্র
ম্যাগনেসিয়াম দহন

ধুমাকারে উবিয়া যায়। বাকি যেটুকু কার্বন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিতে পারিল না তাহা ছাই বা কয়লাকারে পড়িয়া থাকে।

দেশে সংক্রামক ব্যাধি আসিলে ঘরে গন্ধক জ্বালান হয়। ফলে এক প্রকার তীব্র গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide)। সালফার ডাইঅক্সাইড জীবাণু নাশক ও জলে শীঘ্র দ্রব হয়।

উপরের প্রক্রিয়াটির মত গন্ধক লইয়া পরীক্ষা করিলে একই রূপ ফল পাওয়া যায়। তবে গন্ধক পুড়িয়া যে সালফারডাইঅক্সাইড নামক গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হইল তাহার জন্য জলতলের উন্নতি কিরূপ হয় বলিতে পার? সালফার ডাইঅক্সাইড জলে অত্যধিক দ্রবণীয় বলিয়া জলতলের উন্নতি পূর্ব প্রক্রিয়ার জল তলের উন্নতির মতই হইয়া থাকে।

অতএব আমরা বলিতে পারি কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগের নাম দহন বা প্রজ্বলন। দহন বা প্রজ্বলন কালে সকল ক্ষেত্রেই আলোক ও উত্তাপের উদ্ভব না হইতে পারে। যখন আলোক ও উত্তাপের উদ্ভব হয় না তখন অক্সিজেনের সংযোগ ধীরে ধীরে হয় বলিয়া সেই প্রক্রিয়াকে আমরা মৃদু দহন বলিয়া থাকি। দহনের ফলে অক্সিজেনের সংযোগ হওয়ায় পদার্থের ওজন বৃদ্ধি সকল সময়ে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায় না।

সংক্ষেপ ঃ—মরিচা ধরা ও দহন, বলিতে গেলে একই প্রক্রিয়া। উভয় ক্ষেত্রে অক্সিজেন অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আলোক ও উত্তাপের উদ্ভব বুঝিতে পারা যায় না, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলোক ও উত্তাপের উদ্ভব হয়। যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করিবার উপায় না থাকিলে কোন পদার্থ প্রজ্বলিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। মরিচা ধরা কাহাকে বলে? দহনের সহিত উহার পার্থক্য কোথায়? (What is rusting? What are the differences of burning and rusting?)

২। প্রজ্বলিত বাতির উপর ঢাকা চাপা দিলে বাতির শিখার কি অবস্থা হয় বল এবং কেন হয় বল ? (What happens when the flame of a burning candle is covered with a jar ? State the reasons.)

৩। লৌহে মরিচা ধরিলে কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় লিখ। (Write, what changes are found when a piece of iron gets rusted.)

৪। দহন কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। মরিচা ধরাও এক প্রকার দহন কেন ? (Explain burning with an example. Why rusting is also a kind of burning ?)

৫। মরিচা ধরার সহিত বায়ুর কি সংশ্রব আছে বিস্তৃতভাবে বল। (State in detail what connection there is between burning and air.)

৬। কি ঘটে তাহার রাসায়নিক ব্যাখ্যা লিখ, যখন—(ক) একটি লৌহ খণ্ড আর্দ্র বায়ুতে রাখা হয় (খ) একটি কেরোসিন লম্ফ জ্বলে। (Explain chemically what happens when —(a) a piece of iron is exposed to moist air (b) a kerosene lamp burns.) [কঃ বিঃ ১৯৪১]

৭। কাঠ, কয়লা বা গন্ধক পোড়াইলে ইহাদের ওজন কমিয়া যায়, অথচ ম্যাগনেসিয়াম পোড়াইলে ইহার ওজন বাড়িয়া যায়। সবিস্তার কারণ নির্দেশ কর। (When charcoal and sulphur are burnt they lose weight, whereas magnesium gains weight when burnt. Ascertain the reasons in detail.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

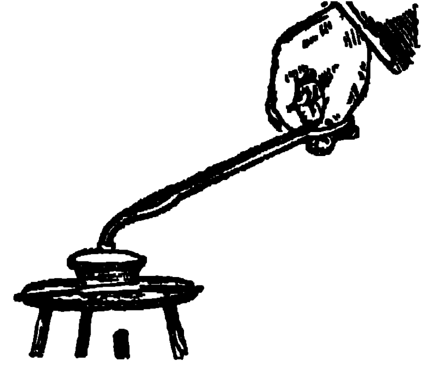
যৌগিকের বিশেষত্ব

আভ্যন্তবিক উপাদান ও তৎসমূহেব বিন্যাস প্রণালী অনুসাবে পদার্থ সমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—মূল, মিশ্র ও যৌগিক। বৈজ্ঞানিকগণ স্থিব কবিয়াছেন জগতেব যাবতীয পদার্থেব মূলে মাত্র কয়েকটি মূল পদার্থ বহিয়াছে। তাহাদেব মিশ্রণে বা বাসাযনিক সংযোগে জগতেব যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

বোন একটি পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এমন অবস্থায় পৌছান যাইতে পাবে যে ইহাকে পদার্থেব সমগুণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতব অংশে আব বোনও প্রকাবে বিভক্ত কবা যাইবে না। যদি ভাঙ্গা হয তবে অংশগুলি আব পূর্ব পদার্থেব সমগুণ বিশিষ্ট থাকিবে না। সমগুণ বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্রতম অংশকে উক্ত পদার্থেব **অণু** (Molecule) বলা হয়। অণুকে আবাব যদি ভাঙ্গা যায তবে বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদার্থ পাওযা যাইতে পাবে। যখন ইহা-দিগকেও বিভাগ কবিতে কবিতে এমন অবস্থায পৌছান যাইবে যে, ঐ বিভক্ত অংশগুলি হইতে আব অন্য গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থেব উদ্ভব একেবাবে কল্পনাব অতীত হইযা পডিবে সেই অবস্থায় এক একটি ক্ষুদ্রতম অংশকে এক একটি পদার্থেব **পরমাণু** (Atom) বলা হয। এই পবমাণুব সমবাযে এক একটি মূল পদার্থেব সৃষ্টি হয়। মূল পদার্থেব যে যে গুণ থাকে তাহাব পবমাণুবও ঠিক সেই সেই গুণ থাকে। আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথবীতে যতগুলি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদেব সংখ্যা একশতেব অধিক নহে। এই প্রায় একশত মূল পদার্থেব মিশ্রণে বা সংযোগে জগতে কোটি কোটি পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

মিশ্র পদার্থেব কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের কথা এখানে বলিতেছি।

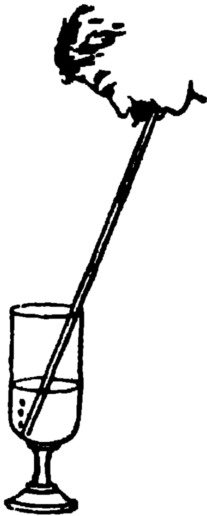
একটি ঢাকনিওয়ালা চীনা মাটির পরিষ্কার মুচি একটি সূক্ষ্ম রাসায়নিক তুলাদণ্ডে ওজন করা হইল। পরে ইহাতে একখণ্ড পরিষ্কার ম্যাগনেসিয়াম তার লইয়া পুনরায় ওজন করা হইল। এই দুইটি ওজনের বিয়োগফল ম্যাগনেসিয়াম তারের ওজন। এইবার ঐ মুচিটিকে স্পিরিট্ ল্যাম্পের শিখায় উত্তপ্ত কর। উত্তপ্ত করিবার সময় মাঝে মাঝে যাহাতে মুচির ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য একটু ঢাকনি খুলিয়া দিতে হইবে অথচ সাবধান হইতে হইবে যেন এই সময়ে মুচির ভিতর হইতে শাদা ধোঁয়ার ন্যায় পদার্থ বহির্গত হইয়া না যায়। দেখিতে দেখিতে ম্যাগনেসিয়ামের তারটি ছাই হইয়া যাইবে। তখন ইহাকে সাবধানে ঠাণ্ডা করিয়া (যেন ইহাতে জলীয় বাষ্প না থাকে) ওজন করিতে হইবে। আবার উত্তপ্ত করিয়া পূর্বোক্ত উপায়ে শীতল করিয়া ওজন করিতে হইবে। এইরূপ কয়েকবার করিবার পর যখন দেখা যাইবে এই ওজন কম বেশী হইতেছে না, ঠিক আছে, তখন আর উত্তপ্ত করিতে হইবে না। তখন দেখা যাইবে পূর্বে ম্যাগনেসিয়াম তারের যে ওজন ছিল, ছাই হইয়া তাহা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বায়ুতে অক্সিজেন নামক একপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থের কিয়দংশ উত্তাপের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়ামের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, ফলে উহার ওজন বাড়িয়া গিয়াছে।


১৩নং চিত্র—ম্যাগনেসিয়াম দহন

এক্ষেত্রে কিন্তু বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যে ম্যাগনেসিয়ামের সংযোগ হইয়াছে তাহা ঠিক জলের সহিত চিনি বা মিছরির মিশ্রণের মত নয়, কিংবা বালির সহিত চিনি অথবা গন্ধকের সহিত লোহাচুরের মিশ্রণের মত নয়। এখানে অক্সিজেন ম্যাগনেসিয়ামের সহিত মিশিয়াছে বটে কিন্তু ঐ মিশ্রণের ফলে যে পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ম্যাগনেসিয়াম বা অক্সিজেন কাহারও গুণ বর্তমান নাই—একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ হইয়াছে। ইহার গুণ, ইহার

উপাদান দুইটিব গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদানেব সহিত কেবল মাত্র আর একটি নির্দিষ্ট পবিমাণ পদার্থেব সংযোগ ঘটিয়াছে। অধিক পবিমাণ অক্সিজেন উহাতে সংযুক্ত করিতে পাবা যাইবে না অথবা যে পবিমাণ অক্সিজেন ব্যয়িত হইযাছে সেই পবিমাণ অক্সিজেনেব সহিত যদি অধিক পবিমাণ ম্যাগনেসিযাম যোগ কবা হয তবে ম্যাগনেসিযামেব কিয়দংশ পডিযা থাকিবে, তাহাব পবিবর্তন হইবে না। এরূপ নির্দিষ্ট পবিমাণ পদার্থেব সহিত নির্দিষ্ট পবিমাণ অপব পদার্থেব সংযোগে যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থেব সৃষ্টি হয তখন সমস্ত প্রক্রিযাটিকে **রাসায়নিক সংযোগ** (Chemical Combination) বলা হয। যখন যৌগিক পদার্থ হইতে বাসায়নিক ক্রিযাব ফলে কোন পদার্থ নির্গত হইযা যায় তখন প্রক্রিযাটিকে **রাসায়নিক বিয়োগ** (Chemical dissociation বলা যাইতে পাবে। বস্তুত বাসাযনিক সংযোগ বা বিযোগ উভয়েই বাসাযনিক ক্রিযা (Chemical action)।

একটি কাচেব পাত্রে খানিকটা পবিষ্কাব চুনের জল লইযা একটি কাচ নল দিয়া উহাব ভিতব নিঃশ্বাস ত্যাগ কবিলে (১৪নং চিত্র) দেখা যায় চুনেব জল ঘোলাটে হইযা গিয়াছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইডেই চুনেব জল এরূপ ঘোলাটে হয। আমাদেব নিঃশ্বাস-বাযব সহিত কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকে। চুনেব জলেব সহিত এই কার্বন-ডাইঅক্সাইডেব বাসায়নিক সংযোগ হওয়ায যে শাদা শাদা পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা চা-খডি। চা-খডিব গুণ, কার্বন-ডাইঅক্সাইড বা চুনেব জলেব গুণেব সহিত সমান নয়। রাসাযনিক সংযোগে যে পদার্থেব উদ্ভব হয় তাহাকে **যৌগিক** (Compound) বলে। যৌগিক পদার্থের গুণ ইহাব উপাদান গুলিব গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন যদি ক্রমাগত ঐ চুনেব জলে নিঃশ্বাস ত্যাগ কবা হয় তবে দেখা যাইবে ক্রমে চুনেব জল অধিকতর ঘোলাটে



১৪নং চিত্র—চুনের জলে নিঃশ্বাস ত্যাগ

হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এমন এক সময় আসিবে যখন চুনেব জল আব ঘোলাটে হইবে না, নিঃশ্বাস-বায়ু নির্গত হইয়া পাত্রেব মধ্য দিয়া উডিযা যাইবে। তখন বুঝিতে হইবে সমস্ত চুনের জলটিতে যত পবিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড দিলে ইহা হইতে সর্বাধিক পরিমাণ চা-খড়ি প্রস্তুত হইতে পাবে তাহা দেওয়া হইযাছে এবং এই পবিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় অধিক কার্বন-ডাইঅক্সাইড ইহাতে প্রয়োগ কবিলেও কোন কাজে আসে না। তাই তাহাবা যেমন আমাদেব নিঃশ্বাস হইতে নির্গত হয তেমনই পাত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায।

এই সঙ্গে পূর্বে বর্ণিত মোমবাতি জ্বলনেব কথা লইয়া তিনটি পবীক্ষাব আমবা এইরূপ তুলনা কবিতে পাবি—

প্রথম - ম্যাগনেসিয়াম একটি মূল পদার্থ ও ধাতু, ইহাব সহিত অন্য কোন প্রকাব পদার্থ কোন প্রকাবে সংযুক্ত ছিল না। অক্সিজেনও তদ্রূপ একটি মূল গ্যাসীয পদার্থ। উত্তাপ সাহায্যে এই দুইটি মূল পদার্থেব বাসাযনিক সংযোগে একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থেব সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাব প্রকৃতি ও গুণাবলী ইহাব উপাদানগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যখন ইহাদেব একপ বাসাযনিক সংযোগ ঘটে তখন প্রত্যেক উপাদানটিব পবিমাণ নির্দিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয়—চুনেব জল নিজেই ক্যালসিযাম নামক একটি মূল ধাতু ও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুইটি মূল গ্যাসীয় পদাথেব সংযোগে প্রস্তুত একটি যৌগিক। তেমনই আমাদের নিঃশ্বাসে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় তাহা কার্বন নামক একটি কঠিন মূল পদার্থ ও অক্সিজেন ঘটিত একটি যৌগিক। এই দুইটি যৌগিক সংযোগে আবাব একটি নূতন যৌগিক সৃষ্টি কবিয়াছে, যাহাব প্রকৃতি উপাদানগুলির প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তৃতীয়—মোমবাতি কার্বন ঘটিত একটি যৌগিক পদার্থ—পুড়িয়া বাযুব অক্সি-জেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থ

সৃষ্টি কবিয়াছিল। সেই যৌগিক চুনেব জলেব সহিত সংযুক্ত হইয়া আব একটি নূতন যৌগিকেব সৃষ্টি করিল।

তাহা হইলে এক্ষণে আমবা বলিতে পাবি বাসায়নিক সংযোগে—

(১) দুই বা ততোধিক মূল পদার্থ, এক বা একাধিক মূল পদার্থ এবং এক বা একাধিক যৌগিক, অথবা কেবলমাত্র এক বা একাধিক যৌগিক একত্রে সংযুক্ত হইযা এক বা একাধিক নূতন পদার্থেব সৃষ্টি কবে। তাহাদেব গুণ সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন।

(২) যৌগিকেব উপাদানগুলিব পবিমাণেব অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে।

(৩) উপাদানগুলি পবিবর্তিত হইয়া যে নূতন পদার্থেব সৃষ্টি কবে তাহাদেব গুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া যাষ।

(৪) যৌগিকেব উপাদান সহজে পৃথক কবা যায় না।

(৫) তাপেব অল্পতা কিংবা আধিক্য ঘটে।

পূর্বোক্ত পবীক্ষা কযটিতে তাপেব অল্পতা কিংবা আধিক্য কি ঘটিয়াছে তাহা বিশেষভাবে বুঝিতে না পাবিলেও বিশেষ পবীক্ষা দ্বাবা জানা যায এই প্রক্রিয়াগুলিতে তাপেব তাবতম্য ঘটে।

তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি দিয়া আমবা মিশ্র এবং যৌগিক পদার্থেব পার্থক্য স্থিব কবিতে পাবি ঃ—

মিশ্র	যৌগিক
১। উপাদানগুলির গুণের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায না।	১। উপাদানগুলির গুণ একটিও বর্তমান থাকে না।
২। উপাদানগুলি সহজেই পৃথক করা যায়।	২। উপাদানগুলি সহজে পৃথক করা যায় না।
৩। মিশ্রণকালে তাপেব হ্রাসবৃদ্ধি হয না।	৩। সংযোগকালে হয় তাপ টানিয়া লয়, না হয তাপ ছাড়িয়া দেয।
৪। উপাদানগুলিব পরিমাণের কোন নির্দিষ্ট অনুপাত নাই।	৪। উপাদানগুলিব ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে।

দুই বা ততোধিক পদার্থের যেমন রাসায়নিক সংযোগ হইতে পারে এবং ফলে ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ সৃষ্ট হইতে পারে তেমনই একটি যৌগিকের রাসায়নিক বিয়োগ ঘটিতে পারে এবং ফলে একাধিক ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে। জল একটি যৌগিক—রাসায়নিক বিয়োগ ঘটিলে জল হইতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন নামক দুইটি মূল পদার্থ পাওয়া যায়, চা-খড়ি হইতে ক্যালসিয়াম নামক মূল পদার্থ ও কার্বনডাইঅক্সাইড নামক যৌগিক পাওয়া যায়।

সংক্ষেপ:—মূল পদার্থকে ভাঙ্গিয়া পরমাণু পর্যন্ত ছোট করিলে ইহা হইতে বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইবে না। নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থের সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ অপর পদার্থের সংযোগে যখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয় তখন সমস্ত প্রক্রিয়াকে রাসায়নিক সংযোগ বলে। তেমনই রাসায়নিক বিয়োগ হইতে পারে। রাসায়নিক যোগ বা বিয়োগ উভয়ই রাসায়নিক ক্রিয়া। রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা যৌগিক উৎপন্ন হইতে পারে বা ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক মূল বা যৌগিক অথবা মূল ও যৌগিক উভয় পদার্থই সৃষ্ট হইতে পারে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় উত্তাপ উদ্ভূত হইতে পারে অথবা উত্তাপ টানিয়া লইতে পারে। যৌগিকের উপাদানগুলির গুণ বর্তমান থাকে না এবং তাহাদিগকে সহজে পৃথক করা যায় না। উপাদানগুলির ওজনের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকে।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। অণু, পরমাণু ও মূল পদার্থ কাহাকে বলে। (Define —a molecule, an atom and an element)

২। নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিতে কি ফল পাওয়া যায় তুলনা করিয়া বিস্তৃতভাবে বল:—

ম্যাগনেসিয়াম তার একটি মুচিতে রাখিয়া পোড়ান হইল, পরিষ্কার চুনের জলে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা হইল। (State by comparison what happens in the following cases —a piece of magnesium wire is burnt in a crucible, the product of exhalation is led into clear lime water) [ক: বি: ১৯৪০]

৩। রাসায়নিক সংযোগ কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। রাসায়নিক সংযোগকালে কি কি ব্যাপার ঘটে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বল। (Explain with an example, chemical synthesis What happens when chemical synthesis takes place)

৪। রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন যৌগিক ও মিশ্রে কি কি প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় লিখ। (Write what are the differences found in a mixture and a chemical compound)

৫। চুনে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। কি দেখিবে? ফল স্বরূপ কি পাওয়া যায় এবং তাহা কি পদার্থ—মিশ্র না যৌগিক? Water is poured into quick lime What will you see? What will be the resultant product and what are they—mixture or compound ?)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বায়ুর উপাদান

পূর্বে তোমরা দেখিয়াছ বায়ুর এক অংশ দ্রব্যাদির প্রজ্বলনকার্যে সহায়তা করে, ইহা না থাকিলে প্রজ্বলন ক্রিয়া চলিতে পারে না। চিত্রে দেখিয়াছ, জ্বলন্ত মোমবাতির উপর একটি কাচের জার উপুড় করিয়া দিলে তন্মধ্যস্থ বায়ুর এই অংশটুকু ব্যয়িত হইবার পর বাতির শিখা নিভিয়া যায়। বায়ুর এই প্রজ্বলন-পোষক অংশটিকে **অক্সিজেন** (Oxygen) বলে তাহাও তোমাদিগকে বলা হইয়াছে।

বায়ুতে অক্সিজেন ব্যতীত অন্য পদার্থ আর কি আছে দেখা যাউক। মরিচাধরা প্রসঙ্গে ১০ নং চিত্রে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখিয়াছ যে, লৌহচূর্ণে মরিচাধরা কার্যে বোতলমধ্যস্থ বায়ুর অক্সিজেন অংশটুকু ব্যয়িত হয় বলিয়া বোতলের ভিতরের জল পাত্রের জলতল অপেক্ষা উচ্চে উঠিয়া যায়। মাপিলে দেখিতে পাইবে যে, বোতলের যতখানি স্থান বায়ু পূর্বে অধিকার করিয়াছিল তাহার $\frac{1}{5}$ অংশ এক্ষণে জলপূর্ণ হইয়াছে, অতএব বায়ুর $\frac{1}{5}$ অংশই অক্সিজেন। অবশিষ্ট $\frac{4}{5}$ অংশ সাধারণ বায়ু নয়। বোতলের মুখ একটি কাচের চাকতি দ্বারা বন্ধ করিয়া বোতলটি সোজা করিয়া রাখ। উহার ভিতর একটি জ্বলন্ত দেশা-লাই কাঠি ফেলিলে উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে, অতএব ইহা অক্সিজেনের মত প্রজ্বলন-পোষক নহে। আবার ইহার ভিতর চুনের জল ফেলিয়া নাড়িলেও চুনের জল ঘোলাটে হয় না, অতএব ইহা কার্বন-ডাইঅক্সাইড নহে। বায়ুর এই অংশের নাম **নাইট্রোজেন** (Nitrogen)।

মরিচা ধরার পরীক্ষা করিতে কিছু বেশী সময় লাগে, কিন্তু ফস্ফরাস (Phosphorus) নামক একটি সহজ-দাহ্য পদার্থ লইয়া অতি সহজেই এই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। একটি বড় পাত্রে জল লইয়া তাহাতে একটি ছোট মুচি

ভাসাইয়া দাও। ঐ মুচির মধ্যে ক্ষুদ্র এক টুকরা ফস্ফরাস্ দিয়া একটি গরম দণ্ড উহাতে ঠেকাইলে ফস্ফরাস্ জ্বলিয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি কাচের জার উপুড় করিয়া ঐ জ্বলন্ত ফস্ফরাসের উপর ঢাকা দাও। জারটি জ্বলন্ত ফস্ফরাসের উপর ঢাকা দিবামাত্রই শাদা ধুমে পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং জ্বলিয়া শেষ হইবার পূর্বেই ফস্ফরাস্ টুকরা নিভিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে দেখা যাইবে, এই ধোঁয়া দ্রবীভূত হওয়ায় পাত্রটি পূর্বের মত পরিষ্কার হইয়াছে। প্রথমে জারের মধ্যে ও বাহিরে জল এক সমতলেই ছিল, কিন্তু এখন জারের মধ্যে জল উঠিয়া গিয়াছে দেখিবে। মাপিয়া দেখিলে পূর্ব পরীক্ষার মতই দেখা যায়, পাত্রের যে অংশ পূর্বে সাধারণ বায়ুর দ্বারা পূর্ণ ছিল, তাহার ১/৫ অংশ জলের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। ফস্ফরাস্ জ্বলিয়া বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া শাদা ধুম উৎপন্ন করিয়াছিল। সেই ধুম জলে দ্রবীভূত হওয়ায় জারের ভিতরে ও বাহিরে চাপের পার্থক্য হেতু পাত্রের জল জারে উঠিয়া গিয়াছে।

একটি বাটিতে কিছু পরিষ্কৃত চুনের জল যদি বাতাসে দুই একদিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে উহার উপর দুধের সরের মত একটি পদার্থ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। উহাও কার্বন-ডাইঅক্সাইড ঘটিত যৌগিক পদার্থ। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে।

একটি গ্লাসের বাহিরের দিক ভাল করিয়া মুছিয়া গ্লাসের মধ্যে বরফ জল রাখিয়া দিলে দেখিবে, গ্লাসের বাহিরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া যায়। গ্লাসের পার্শ্বে বাহিরের বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে, সেই বাষ্প শীতল গ্লাসের সংস্পর্শে জমিয়া এই জল হইয়াছে। এই পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পও আছে।

তাহা হইলে তোমরা দেখিলে যে, মোটামুটি বায়ুর ১/৫ অংশ অক্সিজেন ও ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন। অক্সিজেন অংশ দহন কার্যে বা মরিচাধরা কার্যে অন্য পদার্থের সহিত মিশিয়া যায়। ইহা না থাকিলে আলো জ্বলিত না, কাঠ পুড়িত না। নাইট্রোজেন এরূপ কার্যকরী নয়, ইহা প্রজ্বলন-পোষকও নয়। অক্সিজেন ও

নাইট্রোজেন ভিন্ন বায়ুতে অল্প মাত্রায় জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড বিদ্যমান আছে ; কিন্তু তাহাদের পরিমাণ স্থির থাকে না, কমে বাড়ে। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি পদার্থ বায়ুতে মিশ্রিত আছে, তাহাদের পরিমাণ নিতান্তই অল্প। বায়ুর উপাদানগুলির আনুপাতিক পরিমাণের তালিকা নিচে দেওয়া হইল।

নাইট্রোজেন—শতকরা		৭৭·১৬	ভাগ
অক্সিজেন—	„	২০·৬০	„
জলীয় বাষ্প—	„	১·৪০	„
কার্বন-ডাইঅক্সাইড—		·০৪	„
অন্যান্য বাষ্প—	„	·৮০	„

চতুর্থ প্রশ্নমালা

১। বায়ুর প্রধান উপাদান দুইটির নাম কর, তাহাদের আনুপাতিক পরিমাণ কত? যে পরীক্ষা দ্বারা এই আনুপাতিক পরিমাণ প্রমাণ করিতে পার তাহা লিখ। (Name two principal constituents of air, give the percentage of the quantities. State the experiment by which this percentage can be ascertained.)

২। বায়ুর উপাদান কয়টির আনুপাতিক পরিমাণের একটি তালিকা দাও। (Give the table of percentage of the constituents of air.)

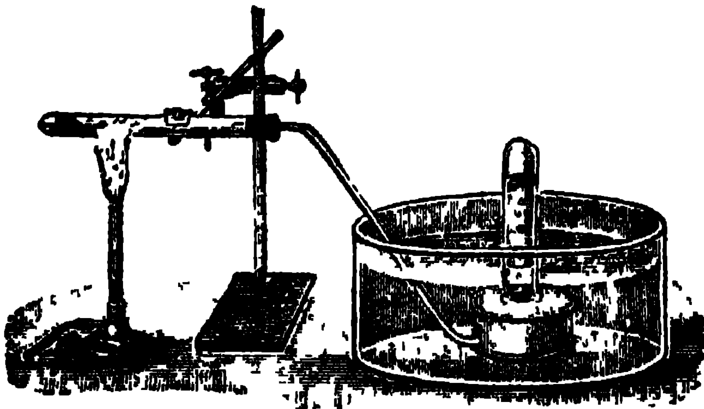
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সমগ্র বায়ু মণ্ডলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ অক্সিজেন তাহাও তোমরা দেখিয়াছ। জলের ওজনের নয় ভাগের আট ভাগ অক্সিজেন। পৃথ্বীমণ্ডলের (Earth's crust) প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ অক্সিজেন। এতদ্ভিন্ন নানা পদার্থের সহিত মিশ্রিত বা সংযুক্ত হইয়া অক্সিজেন প্রকৃতির ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। কাজেই ঐ সকল পদার্থ হইতে অন্য উপাদান গুলি সরাইয়া লইলে অক্সিজেন পৃথক করিতে পারা যায়।

রসায়নাগারে যত প্রকার উপায়ে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টি অতিশয় সাধারণ অথচ সহজ।

পরীক্ষা—ওজন করিয়া চারিভাগ পটাশিয়াম ক্লোরেট (Potassium chlorate) এবং এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (Manganese dioxide) একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি ছয় ইঞ্চি লম্বা পরীক্ষা নলের প্রায় দুই ইঞ্চ পূর্ণ কর। একটি বাঁকান সরু কাচনল ছিপির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ছিপি সমেত ঐ পরীক্ষানলের মুখে আঁটিয়া



১৫নং চিত্র—অক্সিজেন প্রস্তুতকরণ

দাও। ছিপিটি পরীক্ষানলের মুখে এমন ভাবে আঁটিতে হইবে যেন কোনরূপে

পরীক্ষানলের মধ্যে কোন গ্যাসীয় পদার্থ যাতায়াত করিতে না পারে। এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষানলটিকে একটি ক্ল্যাম্পে (Clamp) আটকাইয়া একটি খুঁটিতে (Stand) লাগাইয়া রাখ যেন ইহার মুখ তলার দিক হইতে অল্প নিচে থাকে। একটি এনামেলের গামলা কিংবা চীনা মাটির গামলা জলে প্রায় ভর্তি করিয়া তাহার ভিতরে একটি বি-হাইভ্ সেলফ্ (Bee-hive shelf) রাখ। এই সেলফের গর্তের মধ্য দিয়া পরীক্ষানলের সহিত সংযুক্ত বক্র কাচনলটি এমন ভাবে প্রবেশ করাইয়া দাও যেন ইহার মুখটি উপর দিকে থাকে। এই অবস্থায় একটি জলপূর্ণ গ্যাস-জার (Gas-jar) উপুড় করিয়া রাখ। এইবার স্পিরিট লম্ফ দিয়া পরীক্ষা নলটিকে উত্তাপ দাও। কিছুক্ষণ পরে জারের ভিতর হইতে জল বাহির হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। যখন সমস্ত জারটি এইরূপে খালি হইয়া গেল বলিয়া মনে হইবে সেই সময় একটি কাচের প্লেট মুখে ঢাকা দিয়া জলের ভিতর হইতে জারটি বাহির করিয়া মুখ উপরদিকে করিয়া রাখিয়া দাও। এইরূপ পাচ সাতটি জার ভর্তি করিয়া লও। প্রমাণ করিয়া দেখান যাইবে জার গুলি খালি নহে ইহাদের ভিতর অক্সিজেন গ্যাস আছে।

একটি জারের মুখ খুলিয়া শুঁকিয়া দেখ ইহার গন্ধ নাই। দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় ইহার বর্ণও নাই। একটি জ্বলন্ত কাঠি আর একটি জারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যাইবে জ্বলন্ত কাঠিটি অধিক উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে, অথচ ভিতরের পদার্থটি জ্বলিতেছে না। ইহাতে বুঝা যায় অক্সিজেন নিজে জ্বলে না বটে কিন্তু ইহা প্রজ্বলন পোষক।

অক্সিজেন বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া ইহাকে একটি জার হইতে অপর জারে জলের মত ঢালিতে পারা যায়। একটি শূন্য জার লইয়া তাহাতে একটি অক্সিজেন পূর্ণ জার উপুড় করিয়া ধর। পরে প্রথম জারটিতে জ্বলন্ত কাঠি ধর। দেখিবে কাঠিটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। অথচ যে জারটি উপুড় করা হইয়াছিল তাহার ভিতর কাঠিটি ধরিলে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে না।

অক্সিজেন জলে দ্রবীভূত হয় না বলিলেই চলে। তাহা না হইলে ইহাকে

জলের মধ্য দিয়া সংগ্রহ করা দুরূহ হইত। কেবলমাত্র অক্সিজেন গ্যাসে জীবগণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহা এত অধিক ক্রিয়াশীল যে দুই একটি ছাড়া প্রায় সকল প্রকার মূল পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া ইহা নানা প্রকার যৌগিক সৃষ্টি করে। অক্সিজেন ঘটিত মূল পদার্থের যৌগিক সমূহ অক্সাইড (Oxides) নামে খ্যাত।

মরণোন্মুখ রোগীদিগকে কিছুক্ষণ বাচাইয়া রাখিবার জন্য অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ধাতু গলাইবার জন্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংযোগে এক প্রকার শিখা প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অধুনা তড়িৎ শক্তি সাহায্যে ধাতব দ্রব্য গলান হয়।

নাইট্রোজেন

পূর্বে জানিয়াছ বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৭·১৬ ভাগ নাইট্রোজেন (Nitrogen)। কোন প্রকারে বায়ুর অন্য উপাদানগুলিকে সরাইয়া লইতে পারিলে নাইট্রোজেন পড়িয়া থাকিবে। বাতি জ্বালাইয়া, ম্যাগনেসিয়াম, ফস্‌ফরাস, গন্ধক প্রভৃতি পুড়াইয়া কিরূপে অক্সিজেন সরাইয়া লইতে পারা যায় তাহা পূর্ববর্তী কয়েকটি পরীক্ষা হইতে জানিয়াছ। এইরূপে পরিত্যক্ত নাইট্রোজেনে জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে। কাজেই এইরূপ নাইট্রোজেন যদি নির্জলা সালফিউরিক অ্যাসিডের (Sulphuric acid) মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয় তবে ইহার জলীয় বাষ্পকে সালফিউরিক আসিড শোষণ করিয়া লইতে পারে। ক্রমে অন্যান্য পদার্থগুলিকেও পৃথক করিতে হয়।

রসায়নাগারে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট্‌ (Ammonium nitrite) নামক পদার্থকে গরম করিলে যে গ্যাসীয় পদার্থ উহা হইতে গ্যাসরূপে নির্গত হইয়া যায় তাহাই নাইট্রোজেন। অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে যে সকল যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ইহাতেও তাহাই করিলে চলিবে। পরীক্ষানলে পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ না লইয়া অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট্‌ লইতে হয়।

নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, স্বচ্ছ, গ্যাসীয পদার্থ। ইহা নিজেও জ্বলে না কিংবা প্রজ্বলন পোষকও নহে। ইহার ভিতর কোন প্রাণী রাখিলে দমবন্ধ হইয়া শীঘ্রই মরিযা যায। ইহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয পদার্থ সহজে কাহারও সহিত যুক্ত হয না। ইহা জলে সামান্য পরিমাণে দ্রব হয়।

সাধারণ অবস্থায মানুষ কেবলমাত্র অক্সিজেন গ্রহণ করিলে সুস্থ থাকিতে পারে না। নাইট্রোজেন ইহার সহিত মিশ্রিত থাকায় আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা হয়।

কার্বনডাই অক্সাইড

বায়ুর সহিত অল্প পরিমাণে কার্বনডাই অক্সাইড পাওযা যায। সমগ্র বায়ু মণ্ডলের শতকরা '০৪ ভাগ কার্বনডাই অক্সাইড। জীবগণের শ্বাস ত্যাগ কালে এই গ্যাস নির্গত হয। কাঠ, কযলা, চুন প্রস্তুত করিবার সময ঘুটিং, মার্বেল পাথর অথবা চা খড়ি পোড়াইলেও এই গ্যাস পাওয়া যায। বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিতে পারা যায তাহা বায়ুর উপাদান কালে জানিযাছ।

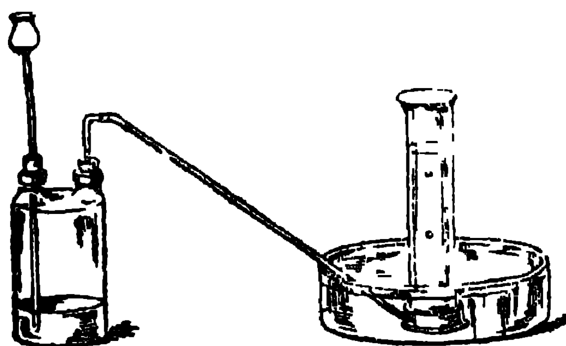
পরীক্ষাগারে চা খড়ি বা মার্বেল পাথরের উপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) ঢালিযা এই গ্যাস প্রস্তুত করা হয। একটি চেপ্টা তলা বিশিষ্ট কাচ কূপীতে (Flask) কিছু চা-খড়ি বা মার্বেল পাথরের খণ্ড লইযা কাচ কূপীর মুখটি ছিপি দ্বারা বন্ধ কর। এই ছিপির মধ্য দিযা একটি দীর্ঘনাল ফানেল (Thistle funnel) ও একটি বাকান সরু কাচনল প্রবেশ করাইতে হইবে। ফানেলের ডাঁটিটি যেন চা-খড়ি বা মার্বেলের উপর আসিযা ঠেকে। কিন্তু কাচনলটি যেন মাত্র ছিপির নিচেই শেষ হয। এই বাকা কাচ নলের অপর প্রান্ত অক্সিজেন প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের মত ব্যবস্থায রাখিতে হইবে। এইবার ফানেলের ভিতর দিযা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিযা দিলে অন্য নল দিযা কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস জারে গিয়া উঠিবে। কযেকটি জার এইরূপে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস পূর্ণ করিযা ইহার গুণাবলী পরীক্ষা করিবার জন্য রাখ।

কার্বনডাই অক্সাইড বর্ণহীন গ্যাসীয পদার্থ বটে কিন্তু ইহাব অল্প গন্ধ ও অম্ল স্বাদ আছে। কার্বনডাই অক্সাইড পূর্ণ জাবে জলন্ত কাঠি নিভিয়া যায অথচ ঐ গ্যাস নিজে জ্বলে না। চুনেব জলে কার্বনডাই অক্সাইড দিলে উভয়েব সংযোগে চা-খডি হয বলিয়া চুনেব জল ঘোলাটে হইযা যায। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভাবী বলিয়া ইহাকে জলেব ন্যায এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায়। এইরূপ ভাবী বলিযা মানুষেব বাস গৃহে বায় চলাচলেব বিশেষ ব্যবস্থা বাখা দবকাব, নতুবা মানুষেব নিঃশ্বাস হইতে নির্গত হইয়া নিচে জমিযা এই গ্যাস ঘবেব বায়ুকে দুষিত কবিযা বিপদেব কাবণ হয, একটি বদ্ধ পাত্রে জীবন্ত একটি ইঁদুব বাখিযা দিলে কিছুক্ষণ পবে ইহা মবণাপন্ন হইযা পডে। কাবণ আব কিছু নহে উহা পাত্রেব অক্সিজেন প্রশ্বাসবায়ুতে টানিযা লইযা নিঃশ্বাসেব সহিত কাবনডাইঅক্সাইড ত্যাগ কবিযাছে। ফলে পাত্রে কাবনডাইঅক্সাইড জমিয়া উহাকে ঐরূপ কবিযাছে। ইহা জলে দ্রব হয়। আমবা যে 'সোডা ওযাটাব' খাই তাহা কাবনডাই অক্সাইড মিশ্রিত জল ভিন্ন আব কিছু নহে।

সোডা ওযাটাব প্রস্তুত কবিবাব জন্য এবং আগুন নিভাইবাব যন্ত্রে ইহা প্রচুব পবিমাণে ব্যবহৃত হয। কাপড কাঁচা সোডা প্রস্তুত কবিতেও ইহা যথেষ্ট পবিমাণে ব্যবহৃত হয।

হাইড্রোজেন

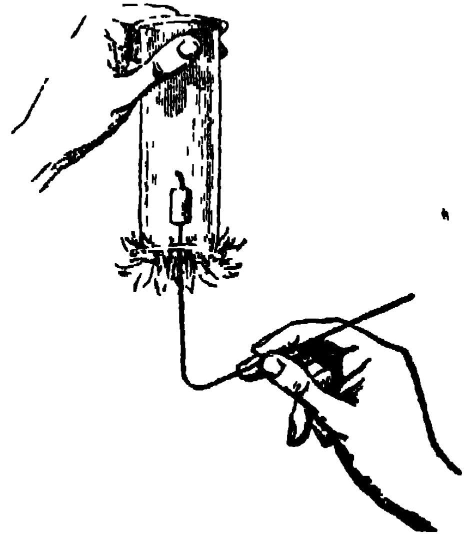
এইবাব তোমাদিগকে হাইড্রোজেন (Hydrogen) গ্যাসেব কথা বলিতেছি। এই গ্যাস জলেব অন্যতম উপাদান বলিযা ইহাব এইরূপ নাম দেওযা হইযাছে। ইহা কিরূপে প্রস্তুত হয এবং ইহাব গুণ কি দেখ।



১৬নং চিত্র—হাইড্রোজেন বায়ুর নিঃসরণ

দুইটি মুখ-বিশিষ্ট একটি কাচেব বোতল (Woulf's bottle) লও (১৬ নং চিত্র)। উহাব এক মুখে ছিপিব মধ্য দিয়া একটি সরু লম্বা নল বিশিষ্ট

ফানেলটি একরূপভাবে বসাইয়া দাও, যেন এই নলটির নিম্নপ্রান্ত প্রায় বোতলের তলদেশ পর্যন্ত যায়। বোতলের অপর মুখ দিয়া কতকগুলি দস্তার টুক্‌রা ফেলিয়া একটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দ্বারা ঐ মুখও আঁটিয়া দাও। এই ছিপির ছিদ্রে আর একটি বক্র কাচনলের একপ্রান্ত এরূপে প্রবেশ করাও যেন, এই প্রান্ত বোতলের ভিতরে বেশী নিচে না যায়। বাঁকা নলটির অপরপ্রান্ত একটি গ্যাস-দ্রোণী (Pneumatic trough) জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। ফানেল দিয়া জলমিশ্রিত কিছু সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ ঢালিয়া দাও। দস্তার উপর অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায় এক প্রকার গ্যাসীয়পদার্থ বাঁকা নলের ভিতর দিয়া আসিয়া গামলার জলের ভিতর বুদ্‌বুদ আকারে বাহির হইবে। ইহাই হাইড্রোজেন বায়ু। একটি পরীক্ষানল জলপূর্ণ করিয়া গামলার ভিতর উপুড় করিয়া বসাইয়া তাহা এই বায়ু দ্বারা পূর্ণ কর। পরে ঐ পরীক্ষা-নলটির মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া কিছু দূরে একটি আলোর নিকটে ধর। ইহাতে সামান্য বিস্ফোরণ শব্দ করিয়া হাইড্রোজেন জ্বলিয়া উঠিবে। হাইড্রোজেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া বিস্ফোরক গ্যাস প্রস্তুত করে। সুতরাং হাইড্রোজেন প্রস্তুতকালে তাহার নিকটে উন্মুক্ত দীপশিখা রাখা উচিত নয়। অ্যাসিড ঢালিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে বোতলের সমস্ত বায়ু হাইড্রোজেনের সহিত বাহির হইয়া যাইবে। তাহার পর হাইড্রোজেন বায়ু সংগ্রহ করা নিরাপদ। একটি জলপূর্ণ কাচের জার (Gas-jar) গ্যাসদ্রোণীর গ্যাস নিঃসরণকারী নলের উপর উপুড় করিয়া বসাও এবং উহাকে হাইড্রোজেন গ্যাস পূর্ণ করিয়া গামলার ভিতর সরাইয়া রাখ। এইরূপে আরও কয়েকটি জার বা বড় বোতল হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ কর।



১৭নং চিত্র—হাইড্রোজেনের জ্বলন

হাইড্রোজেন পূর্ণ একটি জার জলের গামলা হইতে মুখ নিচু রাখিয়াই বাহির

কর। একটি বাঁকান তারের উপর জ্বলন্ত বাতি বসাইয়া ঐ জারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে (১৭ নং চিত্র) দেখিবে যে, উহা তৎক্ষণাৎ নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু জারের মুখে হাইড্রোজেন বায়ু ঈষৎ নীল বর্ণের শিখা উৎপন্ন করিয়া জ্বলিতেছে। এই পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যায় যে হাইড্রোজেন বায়ু অক্সিজেনের ন্যায় দহন কার্য্যে সহায়তা করে না, কিন্তু নিজে একটি সহজদাহ্য পদার্থ।

হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিয়া কোন্ পদার্থ উৎপন্ন করে? পূর্ব-বর্ণিত বোতলটির সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস নিঃসরণকারী যে বক্র নলটি লাগান আছে, তাহার পরিবর্তে একটি সূক্ষ্মমুখ-বিশিষ্ট সোজা কাচনল লাগাইয়া দাও। বোতলের ভিতরের সমস্ত গ্যাস যখন বাহির হইয়া যাইবে, তখন সরল নলের মুখে হাইড্রোজেন জ্বালাইয়া উহার নীলাভ শিখার উপর একটি শীতল কাচের গ্লাস উপুড় করিয়া ধর, কিছুক্ষণ পরে দেখিবে গ্লাসের ভিতরের গায়ে জলকণা জমিয়াছে। জারের হাইড্রোজেন বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত পুড়িয়া এই জল সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব জল, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক।

হাইড্রোজেন সাধারণ বায়ু অপেক্ষা লঘু। আমরা যত প্রকারের গ্যাসীয় পদার্থ জানি তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা হাল্কা। একটি বায়ুপূর্ণ বোতলের মুখ নিচু করিয়া ধর পরে একটি হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতলের মুখ উপরের বোতলের মুখের সহিত লাগাইয়া ১৮ নং চিত্রে প্রদর্শিতভাবে কাৎ করিয়া ধর। হাইড্রোজেন লঘু বলিয়া ঊর্দ্ধ্বদিকে উঠিয়া উপরের বোতলে যাইয়া জমিতে থাকিবে। বাহিরের বায়ু আসিয়া নিচের বোতলের শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে। কিছুক্ষণ পরে একটি জ্বলন্ত কাঠি নিচের বোতলে ধরিলে উহা আর নিভিয়া যাইবে না, কিন্তু কাঠিটি



১৮নং চিত্র—হাইড্রোজেন

উপরের বোতলের মুখে ধরিলে তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে এবং বোতলের মুখে

ঐ গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে। রবারের বেলুনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলে বেলুনটি সহজেই শূন্যে উঠিতে থাকে, হাইড্রোজেন হাল্কা বলিয়াই এরূপ হয়। সাবান-গোলা জলে হাইড্রোজেন নিঃসরণকারী বক্র নলটি ডুবাইলে হাইড্রোজেনে পূর্ণ সাবানের বুদ্বুদগুলি বেলুনের মতই উড়িতে থাকিবে।

সুতরাং দেখা গেল হাইড্রোজেন বর্ণ বিহীন ও গন্ধহীন গ্যাসীয় পদার্থ। ইহা দহন কার্য্যে সহায়তা করে না, কিন্তু নিজে দাহ্য, ইহা অক্সিজেনের সহিত পুড়িয়া জল উৎপন্ন করে। ইহা যাবতীয় পদার্থ হইতে লঘু।

সংক্ষেপ ঃ—অক্সিজেন বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, গ্যাসীয় পদার্থ, প্রজ্বলন পোষক কিন্তু দাহ্য নহে, জলে দ্রাব্য নহে। নিঃশ্বাসে আমরা ইহাই টানিয়া বাঁচিয়া থাকি। চারিভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেট ও এক ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড শক্ত পরীক্ষানলে উত্তপ্ত করিয়া এই পদার্থ পাওয়া যায়।

বায়ু হইতে অন্যান্য উপাদান সরাইয়া লইয়া নাইট্রোজেন পরিত্যক্ত হইতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উত্তপ্ত করিলে গ্যাসীয় পদার্থরূপে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নাইট্রোজেন বর্ণ স্বাদ, গন্ধহীন, স্বচ্ছ, গ্যাস, দাহ্য বা প্রজ্বলন পোষক নহে। ইহাতে প্রাণী বাঁচে না। সামান্য পরিমাণে জলে দ্রব হইতে পারে। ইহা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয়।

চা-খড়ি বা মার্বেল পাথরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিয়া কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। ইহা বর্ণহীন গ্যাসীয় পদার্থ। ইহার অম্ল গন্ধ ও অম্লস্বাদ আছে। ইহা দাহ্য বা প্রজ্বলন পোষক নহে। ইহাতে জীবগণ বাঁচিতে পারে না। ইহা চুনের জল ঘোলাটে করিয়া দেয়। বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া ইহাকে জলের ন্যায় এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিতে পারা যায়।

দস্তার টুকরার উপর জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলে উহা হইতে হাইড্রোজেন বাহির হয়। ইহা বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন, গ্যাস, দাহ্য কিন্তু প্রজ্বলন পোষক নয়। ইহা সকল প্রকার গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে লঘুতম। ইহা জলে দ্রব হয় না।

অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও হাইড্রোজেনের তুলনা

অক্সিজেন	নাইট্রোজেন	কার্বন ডাই অক্সাইড	হাইড্রোজেন
১। বায়ু শতকরা ২০.৬০ অংশ অক্সিজেন	বায়ুর শতকরা ৭৭.১৬ অংশ নাইট্রোজেন	বায়ুর শতকরা .০৪ অংশ কার্বন ডাই অক্সাইড	বায়ুতে নাই
২। পটাশিয়াম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয়	অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উত্তপ্ত করিবা প্রস্তুত করা হয়	মার্বেল পাথরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিয়া প্রস্তুত হয়	দস্তায় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিয়া প্রস্তুত করা হয়
৩। বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন গ্যাস	বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন গ্যাস	বর্ণহীন, অল্প অম্লস্বাদযুক্ত ও অল্প গন্ধযুক্ত গ্যাস	বর্ণ, স্বাদ, গন্ধহীন গ্যাস
৪। জলে অল্প দ্রব হয়	জলে অল্প দ্রব হয়	জলে দ্রব হয়	জলে অল্প দ্রব হয়
৫। বায়ু অপেক্ষা ভারী	বায়ু অপেক্ষা লঘু	বায়ু অপেক্ষা বেশ ভারী	লঘুতম গ্যাস
৬। দহন সহায়ক কিন্তু দাহ্য নয়	দহন সহায়ক নয়, দাহ্যও নয়	দহন সহায়ক নহে, দাহ্যও নহে	দহন সহায়ক নয় কিন্তু দাহ্য
৭। শ্বাসকার্যের সহায়ক	শ্বাসকার্যের পরোক্ষভাবে সহায়ক	শ্বাসকার্যের সহায়ক নয়	শ্বাসকার্যের সহায়ক নয়
৮। চুনের জল ঘোলা করে না	চুনের জল ঘোলা করে না	চুনের জল ঘোলা করে	চুনের জল ঘোলা করে না।

পঞ্চম প্রশ্নমালা

১। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড বা হাইড্রোজেন প্রস্তুত প্রণালী ও উহার গুণাবলী বিস্তৃতভাবে লিখ। উহা আমাদের কি কি প্রধান ব্যবহারে আসে লিখ। (Describe experiments by which Oxygen, Nitrogen, Carbon-dioxide or Hydrogen may be prepared, state its properties and uses)

২। তিনটি জারে যথাক্রমে হাইড্রোজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন আছে। কিরূপে তাহাদের কোনটিতে কি আছে বুঝিতে পারিবে বল। (How can you detect Hydrogen, Carbon dioxide and Nitrogen, each of which is kept in a separate bottle ?)

৩। খেলনার বেলুনে কি গ্যাস পুরিলে ইহারা অধিক উচ্চে উঠিতে পারে লিখ। (Which gas being introduced into toy baloons raises it high up ?)

৪। একটি বদ্ধ পাত্রে একটি জীবন্ত ইঁদুর রাখিয়া দিলে কি ঘটে লিখ ও তাহার রাসায়নিক কারণ লিখ। (Explain chemically what happens when a mouse is put in a closed jar ?) [কঃ বিঃ ১৯৪১]

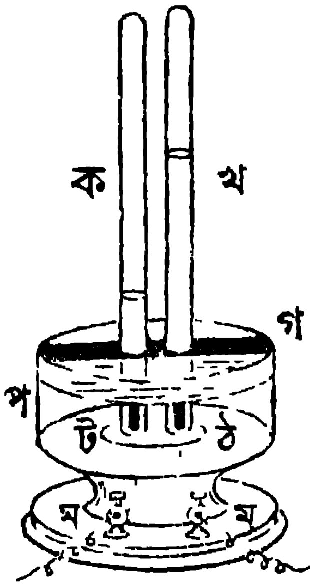
৫। কার্বনডাইঅক্সাইড সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। শুষ্ক বরফ কাহাকে বলে ? (Write all you know about Carbon dioxide What is dry ice ?) [কঃ বিঃ ১৯৪১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জলের উপাদান, স্বভাবজ ও বাতান্বিত জল, মৃদু ও খর জল

জলের উপাদান

তোমরা দেখিয়াছ, হাইড্রোজেন দাহ্য পদার্থ ও বায়ুতে ইহা জ্বালাইলে জলকণা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে পরীক্ষায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন বস্তু জ্বলিবার সময় উহা বায়ুস্থ অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। অতএব হাইড্রোজেনও প্রজ্বলনকালে অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং জলের সৃষ্টি করে সুতরাং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলের দুইটি উপাদান।



১৯নং চিত্র- জল বিশ্লেষণ

বিশ্লেষণ দ্বারাও জলের উপাদান ও তাহাদের পরিমাণ বাহির করা যায়। ১৯নং চিত্রে যে কাচের পাত্র দেখিতেছ, উহার তলায় দুইটি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রপথে দুইটি তামার তার গালা দিয়া আঁটা আছে। তামার তার দুইটির যে প্রান্তদ্বয় পাত্রের ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদের সহিত প্লাটিনাম্ নামক ধাতুর দুইটি পাত লাগান আছে। পাত্রটির ভিতরে জল ঢালিয়া প্রায় পূর্ণ কর। বিশুদ্ধ জল তড়িদন্তরক বলিয়া কয়েক ফোঁটা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ ঐ জলে ঢালিয়া দাও। পরে দুইটি সমায়তন একমুখ বন্ধ কাচনল জলে পূর্ণ করিয়া প্লাটিনাম পাত দুইটির উপর উল্টাইয়া বসাও। এক্ষণে তারের বাহিরের প্রান্ত, দুই বা ততোধিক তড়িৎ-সেলযুক্ত ব্যাটারীর প্রান্তদ্বয়ে সংযুক্ত কর। তড়িৎ-প্রবাহ আরম্ভ হইলে দেখিবে, দুইটি প্লাটিনাম্ পাত হইতেই বুদ্বুদ উঠিতেছে এবং নল দুইটির ভিতরে জমিতেছে। ১৫।২০ মিনিট পরে দেখিবে যে, একটি নলে যত গ্যাস সঞ্চিত

হইয়াছে, অপর নলে প্রায় তাহার দ্বিগুণ গ্যাস জমিয়াছে। কম গ্যাসপূর্ণ নলটির ভিতরে একটি নির্বাপিত প্রায় জ্বলন্ত কাঠি ফেলিয়া দিলে, উহা উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতে থাকিবে, অতএব ইহা অক্সিজেন। অপর নলটি একটি দীপশিখার নিকট লইয়া গেলে তন্মধ্যস্থ গ্যাস জ্বলিয়া উঠে, অতএব উহা হাইড্রোজেন। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহকালে পাত্রের জল বিশ্লিষ্ট হওয়ায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পাওয়া যায় এবং হাইড্রোজেনের পরিমাণ অক্সিজেনের পরিমাণের দ্বিগুণ।

পরিমাণে দুইভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন দ্বারা একটি সোডা ওয়াটারের বোতল পূর্ণ করিয়া উহার মুখটি একটি জ্বলন্ত বাতির শিখার কাছে ধর। তৎক্ষণাৎ একটি ভীষণ শব্দ উৎপন্ন হইয়া গ্যাস দুইটি সংযুক্ত হইবে ও জল উৎপন্ন করিবে।

স্বভাবজ জল

ভূপৃষ্ঠের প্রায় ¾ অংশ জলে পূর্ণ এবং সমুদ্র, নদনদী, প্রস্রবণ প্রভৃতি নানা আকারে জলরাশি দেখিতে পাওয়া যায়, অবশ্য সব জলই সুপেয় নয়। কোনটি অত্যন্ত লবণাক্ত, কোনটি কষায় বা অন্যপ্রকার স্বাদযুক্ত। দেখিতেও কোনটি বা ঘোলা, কোনটি বা স্বচ্ছ। জলে দ্রবীভূত ও ভাসমান বহু পদার্থের জন্যই উহাদের এরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বস্তুত, প্রকৃতিতে একেবারে বিশুদ্ধ জল পাওয়া অসম্ভব।

বৃষ্টির জল—প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হইয়া উপরে উঠে এবং পুনরায় ঘনীভূত হইয়া মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক পাতন-প্রক্রিয়ার ফলে বৃষ্টির জল বিশুদ্ধ হইবারই কথা, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া বৃষ্টির জল পড়িবার সময় বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড উহাতে দ্রবীভূত হয় এবং বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা প্রভৃতিও উহাতে মিশ্রিত হয়। এইজন্য বৃষ্টির জলকেও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলা চলে না। পল্লীগ্রামে অনেকে বৃষ্টির সময়

উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে একটি পরিষ্কার চাদর খাঁটাইয়া এবং তাহার নিচে একটি কলসী বসাইয়া বৃষ্টির জল সংগ্রহ করেন। প্রথম বৃষ্টির জল ত্যাগ করিয়া, অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টির জল ধরিলে অনেকটা বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। কার্বন-ডাইঅক্সাইডযুক্ত বৃষ্টি-জলে বহু ভূমিজ পদার্থ দ্রব হয়।

প্রস্রবণ ও কূপের জল—কূপ ও ঝরণার জল বিশুদ্ধতায় বৃষ্টির জলের পরে ধরা যাইতে পারে। এই জল মাটির নানা স্তর ভেদ করিয়া আসে বলিয়া উহাতে ভাসমান ময়লাগুলি থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে লবণজাতীয় খনিজপদার্থ যথা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতুসকলের যৌগিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য ইহার স্বাদ সাধারণত একটু কটু হইলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

নদীর জল—নদীর জল সাধারণত ঘোলা। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া যাইবার সময় ধুলা, বালি, মাটি ও নানাবিধ জৈব পদার্থ ভাসমান অবস্থায় সঙ্গে লইয়া নদীতে পতিত হয়। তাহা ছাড়া লবণ ও লবণজাতীয় পদার্থও নদীর জলে দ্রব থাকে। নদীর জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে হইলে ফুটাইয়া ও পরে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত।

সমুদ্র-জল—সমুদ্র-জল অতিশয় লবণাক্ত এবং পানের অনুপযোগী। বহু নদ-নদী শেষে সমুদ্রে যাইয়া পতিত হয় বলিয়া সমুদ্রে দ্রবীভূত লবণ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

বাতান্বিত জল

বিশুদ্ধ জল স্বাদহীন। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারে বিশুদ্ধ জল একেবারে পাওয়া যায় না বলিলেই চলে। এমন কি বৃষ্টির জল যাহা পাতিত জলের ন্যায় বিশুদ্ধ, তাহাও পৃথিবীর বুকে পড়িবার সময় বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণা, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত করিয়া আনে। নানা প্রকার পদার্থ

জলে মিশ্রিত থাকে বলিয়া জলের আমরা কিছু না কিছু স্বাদ পাই। জল ফুটাইয়া লইলে অনেক দ্রবীভূত বাষ্প উড়িয়া যায় বলিয়া সিদ্ধজল বিস্বাদ লাগে। বৃষ্টির জলের কতকাংশ মাটির ভিতর প্রবেশ করে। ইহা যতই মাটির ভিতর যায় ততই ইহার সহিত নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয়, প্রস্রবণ আকারে এই জল যখন বাহিরে আসে তখন ঐ সকল দ্রবীভূত পদার্থের জন্য ইহার স্বাদ পাই। যখন প্রস্রবণের জলে কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে এবং তজ্জন্য কোনও একটি বিশেষ স্বাদ পাওয়া যায় তখন ঐ জলকে **খনিজ জল** (Mineral water) বলা হয়। কোন বাষ্প জলে অধিক মাত্রায় দ্রবীভূত থাকিলে তাহাকে **বাতান্বিত** (Aerated) **জল** বলা চলে—ইহা নামের দ্বারাই বুঝা যায়। কিন্তু আমরা সাধারণত যে সোডার জল বা লেমনেড খাই তাহা কার্বন-ডাইঅক্সাইডমিশ্রিত জল ভিন্ন আর কিছু নহে। অধিক তাপে অধিক পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করা থাকে। সাধারণত ইহাদিগকেই আমরা বাতান্বিত জল বলি। বোতলে ছিপি খুলিয়া দিলে বোতলের ভিতর হইতে জোরে একটি বাষ্প নিৰ্গত হইয়া যায় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাই কার্বন-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-ডাইঅক্সাইড অধিক মাত্রায় ছিল—চাপ কমিয়া যাওয়ায় বোতল হইতে কিছু নির্গত হইয়া গেল।

জলে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকিলে অনেক সময় সেই জল খাইয়া আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। আমরা যখন কোথাও জল হাওয়া পরিবর্তনে যাই তখন সেখানকার জলে যে জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে আমাদের শরীরের পক্ষে ভাল হইবে দেখি, সেখানেই যাই। এমন অনেক স্থানের জল আছে যাহা ঔষধের ন্যায় কার্যকরী। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, ইউরোপে কার্লসবাড ও মারিয়নবাডের জল বাস্তবিকই ঔষধের ন্যায় উপকারী। সোডার জল বা লেমনেড আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ উপকারী তাহা তোমাদের কাহারও অবিদিত নাই।

খর ও মৃদু জল

তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, সাবান দিয়া কাপড় পরিষ্কার করিবার সময় কোন জলে বেশ সহজেই ফেনা হয় ও কাপড় শীঘ্র কাচা হয়, আবার কোনও জলে সহজে সাবানের ফেনা হইতে চাহে না, অনেকটা সাবান খরচ হইবার পর সেই জলে ফেনা হয়। কূপের জলে সাবান অনেক বেশী লাগে কিন্তু অনেক পুকুরের জলে অল্প সাবান লাগে। যে জলে সাবান গুলিলে বেশ সহজে ফেনা হয়, তাহাকে **মৃদু** জল (Soft water) বলে এবং যে জলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাকে **খর** জল (Hard water) বলে।

জল এইরূপ খর বা মৃদু হইবার কারণ কি? বৃষ্টির জল ভূমির উপর দিয়া আসিবার সময় অনেক পদার্থকেই দ্রব করিয়া সঙ্গে লইয়া আসে। কূয়া, ঝরণা ও সমুদ্রজলে বহু খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। নদী বা কূয়ার জল কোনও পাত্রে লইয়া ফুটাইলে যখন জল উবিয়া যায়, তখন পাত্রের তলায় গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ পড়িয়া থাকে। সাধারণত, খর জলে ক্যালসিয়াম-বাইকার্বনেট্ (Calcium bi-carbonate), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট্ (Magnesium sulphate), ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium chloride) প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে। ইহারাই সাবানের সহিত যুক্ত হইয়া যায় বলিয়া প্রথম প্রথম জলে ফেনা হইতে দেয় না।

খর জলও আবার দুই প্রকারের দেখা যায়,—অস্থায়ী (Temporary) খর জল ও স্থায়ী (Permanent) খর জল। কেবলমাত্র ফুটাইলে যে জলের খরতা দূর হয়, তাহাই অস্থায়ী খর জল। স্থায়ী খর জলের খরতা এরূপে দূর করা যায় না।

একটু চুনের জল লইয়া তাহাতে ফুঁ দিলে জল শাদা হইয়া যায়। নিঃশ্বাসবায়ুর কার্বনডাইঅক্সাইড চুনের সহিত মিশ্রিত হইয়া খড়িমাটি উৎপন্ন

করে, উহাই জলে ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া জল ঘোলা করে। জল স্থির হইলে কিছুক্ষণ পরে খড়িগুঁড়া ক্রমশ অদৃশ্য হয়। তাহা হইলে দেখিলে, খড়িমাটি বিশুদ্ধ জলে দ্রবণীয় নয় কিন্তু উহা কার্বনডাইঅক্সাইড মিশ্রিত জলে দ্রবীভূত হয়। বাস্তবিক এই খড়িমাটি বা ক্যালসিয়াম্ কার্বনেট কার্বনডাই-অক্সাইডের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্যালসিয়াম্ বাইকার্বনেট্ নামক পদার্থে পরিণত হয়, উহা জলে দ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট ও ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেটের উপস্থিতি জলের অস্থায়ী কর্কশতার কারণ। বৃষ্টিপাতকালে বায়ুস্থ কার্বনডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং মাটিতে পড়িয়া প্রস্তরাদির উপর দিয়া যাইবার সময় পাথরের কিয়দংশ দ্রব করিয়া ক্যালসিয়াম্ বাইকার্বনেট্ প্রস্তুত করে। এইরূপ খরজল ফুটাইলে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস জল হইতে দূরীভূত হওয়ায় খড়িমাটি জাতীয় বস্তু আর দ্রবঅবস্থায় থাকে না, নিচে পড়িয়া যায়।

অস্থায়ী খরজলে কিছু চুন মিশাইলেও উহা মৃদু হইয়া যায়। কারণ, চুনের জল ক্যালসিয়াম্ বাইকার্বনেটের সহিত যুক্ত হইয়া উহাকে ক্যালসিয়াম্ কার্বনেট্ বা খড়িমাটিতে পরিবর্তিত করে এবং ঐ খড়িমাটি থিতাইয়া জলকে মৃদু করে।

ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ সালফেট্, ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড্ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ বিশুদ্ধ জলে দ্রাব্য, এইজন্য ইহারা যে জলে দ্রবীভূত থাকিয়া উহাকে খর করে, সে জল ফুটাইলেও ইহারা দ্রব অবস্থায় থাকে, সুতরাং জলের খরতা দূর হয় না। অতএব ইহাদের উপস্থিতিই জলের স্থায়ী খরতার কারণ। জলে কাপড়কাচা সোডা বা সাবান দিলে সেই সোডার সহিত ইহাদের রাসায়নিক ক্রিয়া হওয়ায় ম্যাগনেসিয়াম্ কার্বনেট্ ও ক্যালসিয়াম্ কার্বনেট্ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এইগুলি জলে অদ্রাব্য বলিয়া থিতাইয়া পড়িলে জল মৃদু হয়। তখন সেই জলে সাবানের যথেষ্ট ফেনা হয়।

এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে বৃষ্টি-জল কি জন্য সর্বাপেক্ষা মৃদু।

সংক্ষেপ ঃ—তড়িৎশক্তি সাহায্যে জল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় ইহার উপাদান, দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন। স্বভাবজ জল বিশুদ্ধ নহে, ইহাতে কোন না কোন পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। স্বভাবজ জলের মধ্যে সমুদ্রের জল সর্বাপেক্ষা অবিশুদ্ধ এবং বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। জলে কোন বায়বীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকিলে সেই জলকে বাতান্বিত জল বলা হয়। যে জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা হয় না তাহাদিগকে খরজল এবং যাহাতে ফেনা হয় তাহাকে মৃদু জল বলা হয়। খরজল আবার দুই রকম, স্থায়ী ও অস্থায়ী। যে খরজলকে মাত্র ফুটাইয়া লইয়া তাহাতে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা পাওয়া যায় তাহাকে অস্থায়ী খরজল বলা হয়। ক্যালসিয়াম বাই-কারবনেট প্রভৃতি লবণ জাতীয় পদার্থ জলে দ্রবীভূত থাকিলে জল অস্থায়ী খর হয়, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি থাকিলে স্থায়ী খর হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্নমালা

১। জলের উপাদান কি কি এবং কিরূপে তাহা স্থির করা যায় বিস্তৃতভাবে লিখ। উপাদানগুলি কি অনুপাতে বর্তমান তাহাও লিখ। (Write in detail what are the constituents of water and how they can be ascertained. Write down the percentage composition of water also.)

২। বিশুদ্ধতার দিক দিয়া স্বভাবজ কোন্ জল কোন্ পর্যায় পড়িবে সাজাইয়া লিখ। (Arrange the water occuring in nature according to their purity.)

৩। খনিজ এবং বাতান্বিত জল কাহাকে বলে? মৃদু, স্থায়ী খর ও অস্থায়ী খর জল কাহাকে বলে লিখ। কিজন্য জলের এরূপ অবস্থা হয় ও তাহার প্রতিকার কি? (What are mineral water and aerated water? Write when water is called soft, permanent hard and temporary hard. What are the causes of hardness and how it can be removed.)

৪। কিরূপে খানিকটা স্বচ্ছ জল পাইতে পারা যায়? নদীর জল হইতে একেবারে বিশুদ্ধ জল কিরূপে পাওয়া যায়? (How will you prepare a sample of (a) clear water and (b) very pure water, from river water?) [কঃ বিঃ ১৯৪০]

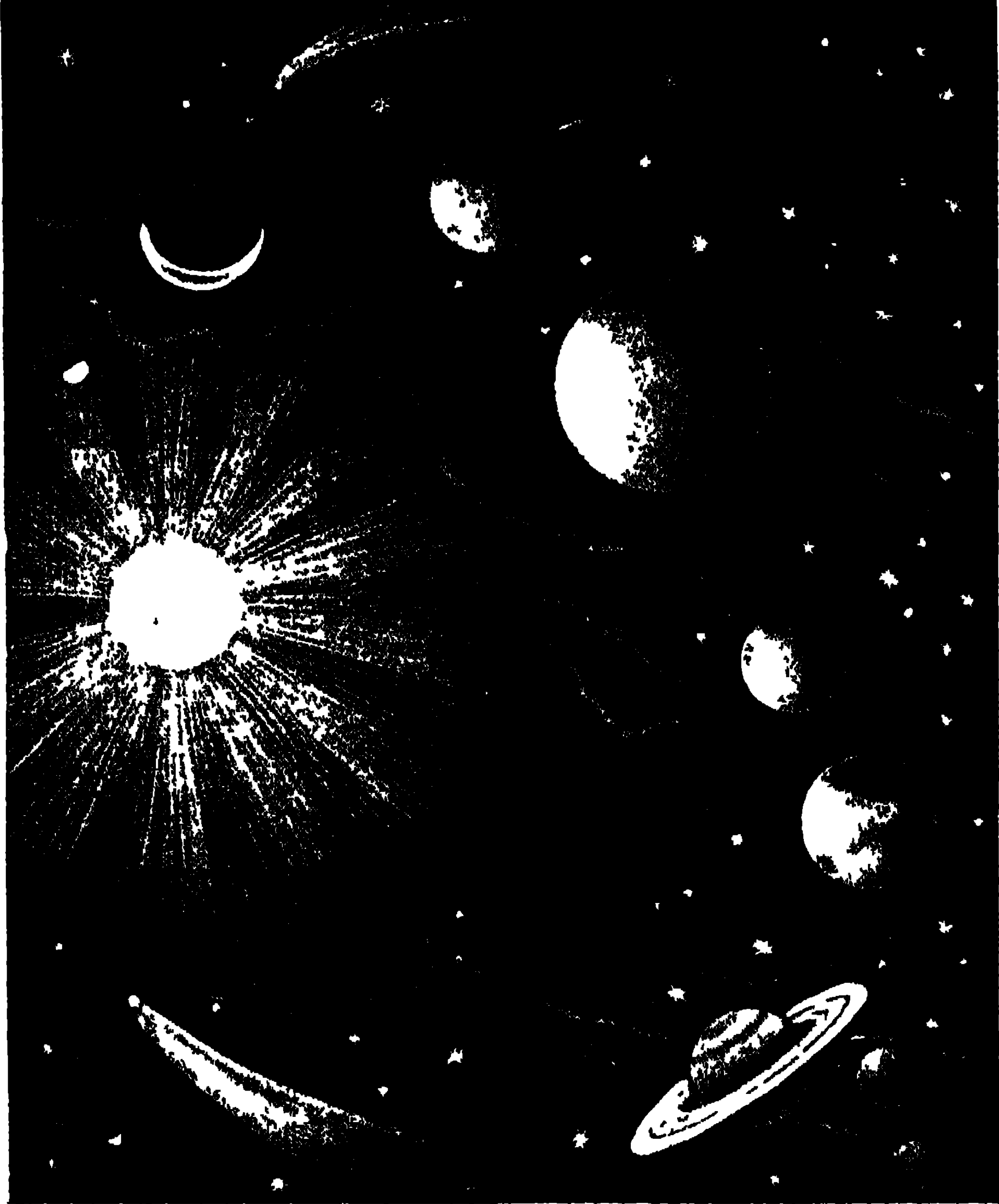
জ্যোতির্বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আকাশ ও জ্যোতিষ্ক

মেঘমুক্ত রাত্রিতে খোলা মাঠে, উপর দিকে চাহিলে দেখিতে পাই আমাদের চারিদিক ঘেরিয়া এক নীলবর্ণের অসীম গুম্বজ, তাহাতে যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কি জ্বলিতেছে। মনে হয় একটি নীল চন্দ্রাতপে কে যেন কতকগুলি হীরকখণ্ড বসাইয়া দিয়াছে। খালি চোখে ইহাদের যতগুলি দেখা যায় তাহাদের সংখ্যা ছয় সাত হাজারের অধিক হইবে না, দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে দেখা যায় ইহাদের সংখ্যা অত্যধিক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও অধিক। ব্রহ্মাণ্ডে উহাদের সংখ্যা নির্ণয় করিবার মত সাধ্য আমাদের নাই। আপাত দৃষ্টিতে ইহাদিগকে যত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় প্রকৃত পক্ষে ইহারা তত ক্ষুদ্র নহে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে ইহাদের এমন এক একটি আছে যাহাদের আকার আমাদের এই পৃথিবীর আকার হইতে বহু লক্ষ গুণ বড়। কিন্তু বহুদূরে আছে বলিয়া আমাদের এই দৃষ্টি ভ্রম হয়। এই দূরত্বের পরিমাণ নির্ণয় করাও এক মহাসমস্যার বিষয়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ একশত ছিয়াশি হাজার মাইল গমন করে। এক বৎসরে ইহা কত মাইল যাইবে ধারণা কর, এই দূরত্বকে **আলোক বৎসর** (Light year) বলে। বস্তুত এক আলোক বৎসর বলিতে বুঝায় ১৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল = ৫৮৬৫৬৯৬০০০০০০০ মাইল। এমন এক একটি জ্যোতিষ্ক আছে যাহাদের নিকট হইতে আমাদের পৃথিবীর দূরত্ব আলোক বৎসর দিয়া প্রকাশ করিলেও এত বড় সংখ্যা হয় যাহা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন কি পণ্ডিতেরা

ইহাও বলেন যে জ্যোতিষ্কগুলির এক একটি এত দূরে আছে যে পৃথিবীর জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত যত কাল গিয়াছে ইহার মধ্যেও উহাদের নিকট হইতে



১ নং চিত্র

"Heaven declares the glory of God"

আলোক আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পৌছাইতে পারে নাই। পৃথিবী হইতে

নিকটতম নক্ষত্রটির নাম **প্রক্সিমো সেণ্টরি** (Proximo centauri)। ইহা হইতেও আলোক পৃথিবীতে পৌঁছাইতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে। তবে ভাবিয়া দেখ কিরূপ কল্পান্তকর ব্যাপার। জ্যোতির্বিদ্যায় আমাদিগকে কত যে এইরূপ আপাত অসম্ভব ব্যাপারের বিষয় অবগত হইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় নিজেদের এমন কি বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের গবেষণার সত্যফলকেও বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আসিবে না। অথচ বিচার ও বিবেক দিয়া গণনা করিলে বুঝা যায় তাহারা মহাসত্য। এই সকল অসম্ভব ব্যাপার বিশ্বনিয়ন্তার অনন্ত মাহাত্ম্য অনুভব করিবার সুযোগ আমাদের কাছে আনিয়া দেয়।

এই যে অসীম নীল গুম্বজ বা গোলকার্ধ যাহার চারিধার, আমরা যে সমতলে দাঁড়াইয়া আছি সেই সমতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে বলিয়া মনে হয় ইহাকে আমরা **আকাশ** বলিয়া থাকি। আকাশ পৃথিবীকে এক বিশাল চক্ররেখায় স্পর্শ করিয়া আছে। সেই রেখাই আমাদের দৃষ্টি পথের সকল দিকের শেষ সীমা বলিয়া ইহাকে **দিগন্ত** বা ক্ষিতিজ (Horizon) রেখা বলা হয়। বস্তুত আকাশ নিছক কল্পনা মাত্র। মহাশূন্য আমাদের চোখে নীলবর্ণের আভা আনিয়া দেয় তাই আমরা আকাশ নীল দেখি। কিন্তু যতই ঊর্ধ্বে উঠা যাক না কেন আকাশ এমনই আমাদের নাগালের বাহিরে থাকিবেই। প্রকৃত পক্ষে আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। আকাশে যে অসংখ্য আলোকের ফুটকি দেখি তাহাদিগকে আমরা সাধারণত **জ্যোতিষ্ক** বলি। আমাদের পৃথিবীও এমনই একটি জ্যোতিষ্ক। অন্যান্য জ্যোতিষ্ক হইতে আমরা যত দূরে আছি, পৃথিবী হইতে যদি ঠিক তত্দূরে আমরা থাকিতে পাইতাম তাহা হইলে পৃথিবীকেই আমরা একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের ন্যায় মহাশূন্যে ভাসিতে দেখিতাম।

আকাশে দৃশ্যমান এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে কতকগুলি বেশ উজ্জ্বল এবং ইহাদের জ্যোতি স্থির, ইহাদিগকে **গ্রহ** (Planet) বলি, কতকগুলি জ্যোতিষ্ক তত উজ্জ্বল নহে, মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলে, ইহাদিগকে **নক্ষত্র** (Star) বলা হয়। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে জ্যোতিষ্কগুলির

রঙ এক রকম নহে। কোনটির আলো লাল, কোনটির হলদে আবার কোনটির বা শাদা। দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহগুলি বৃহত্তর দেখায় কিন্তু নক্ষত্রগুলি যেমন খালি চোখে দেখা যায় দূরবীক্ষণ সাহায্যেও তেমনই দেখায়।

সূর্য একটি বিরাট জ্যোতিষ্ক—ইহার চারিদিকে যে সকল গ্রহ মহাকর্ষের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহারা সূর্যের গ্রহ। আবার মহাকর্ষের জন্য গ্রহের চারিদিকে যে সকল জ্যোতিষ্ক ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে উক্ত গ্রহের **উপগ্রহ** (Satelite) বলে। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ এবং চন্দ্র পৃথিবীর একটি উপগ্রহ।

নক্ষত্রগুলি সূর্যের ন্যায় এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড—অনেক দূরে থাকে বলিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র দেখায়, কিন্তু গ্রহগুলির নিজের আলোক নাই। ইহারা যে জ্যোতিষ্কের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারই আলোক ইহারা প্রতিফলিত করে। সূর্যের আলোক পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতি গ্রহগুলির উপর প্রতিফলিত হয় বলিয়া আমরা গ্রহগুলিকে উজ্জ্বল দেখি। অতএব ইহা ধারণা করা যাইতে পারে প্রত্যেক নক্ষত্রেরই সূর্যের ন্যায় গ্রহ এবং উপগ্রহ থাকা সম্ভব।

বহুদিন অন্তর এক একবার আকাশে দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট ঝাঁটার মুড়ার মত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। ইহাদের পরিভ্রমণ পথ অত্যন্ত অধিক বলিয়া বহু দিন পরে পরে দেখা যায়। গ্রহের বিপরীত দিকে ইহাদের গতি। ইহাদিগকে **ধূমকেতু** (Comet) বলে। গ্রহ নক্ষত্র ছাড়া আকাশের কোথাও কোথাও মেঘের মত ছেঁড়া ছেঁড়া আলোক সমষ্টি দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই **নীহারিকা** (Nebula)। নির্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর একটি ক্ষীণ শাদা আলোক নির্মিত পথ দেখা যায়। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোক ভিন্ন কিছুই নহে। ইহাকে **ছায়াপথ** (Milky way) বলা হয়। কখনও কখনও আকাশে ঝাঁটার আকৃতি বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক গুলির ভগ্ন অংশ সমষ্টি কিছুদিনের জন্য দেখা যায়। পরে ইহারা অদৃশ্য হইয়া থাকে এবং হয়ত বহুকাল পরে আবার দেখা দেয়। ইহাদিগকে **উল্কা** (Meteor) বলা হয়।

এক একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের চারিদিকে ভ্রাম্যমান গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদির সমষ্টি লইয়া এক একটি **সৌরজগৎ** (Solar system)। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কত যে সৌরজগৎ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

নক্ষত্রগুলি আকাশের পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে নিয়ত চলিয়াছে। প্রত্যেকেই এক রকম ভাবে চলিয়াছে বলিয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান এবং অবস্থানের কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। ইহারা পূর্বাকাশে উঠে ও পশ্চিমাকাশে নামিয়া যায়। ইহাদের তথাকথিত উদয়াস্ত লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যে কোন দুইটি তারার উদয়কালের ব্যবধান সকল সময়েই এক। ইহারা প্রত্যেকেই ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেকেণ্ড মোটামুটি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট অন্তর আকাশে উঠে বা আকাশ হইতে নামিয়া যায়। যদিও ইহাদের উঠিবার ও নামিবার ঠিক সময় নির্দেশ করা কঠিন তথাপি ইহাদের খ-মধ্য রেখা (Meridian) অতিক্রম করিবার সময় ঠিক করা যায়। একটি তারার পর পর দুইবার খ-মধ্য রেখা অতিক্রম করিবার সময়ের ব্যবধান মোটামুটি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট। এই সময়কে **নাক্ষত্র দিন** (Sidereal day) বলে। লক্ষ্য করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে নক্ষত্রগুলি ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে। বস্তুত ধ্রুবতারা হইতে পৃথিবীর উত্তর মেরু যোগ করিয়া দিলে যে সরল রেখা পাওয়া যায় সেই রেখাকে অক্ষ (Axis) করিয়া পৃথিবী তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া নক্ষত্রগুলিকে ঐরূপ ঘুরিতে দেখা যায়। সূর্যও তাই ঐরূপ ভাবে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। কাজেই সূর্য এবং নক্ষত্রের পরিভ্রমণ পথ সমান্তরাল এবং পৃথিবীর মেরুদণ্ডের সহিত সমকোণ করিয়া আছে।

কতকগুলি নক্ষত্র সকল সময়েই দেখা যাইতে পারে। তাহার কারণ ধ্রুব-তারার কাছাকাছি কতকগুলি নক্ষত্র পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির ফলে কোন স্থানের ক্ষিতিজ তলের নিচে কখনই নামিয়া যায় না, কাজেই তাহাদিগকে সকল সময়ে দেখা যাইতে পারে।

নক্ষত্রগুলির আবর্তনের সময় যেমন ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ, সূর্যের আবর্তনের

সময় কিন্তু পুরা ২৪ ঘণ্টা। কাজেই প্রত্যেক দিন সূর্য নক্ষত্রগুলির অনুপাতে ৪ মিনিটের পথ পিছাইয়া পড়ে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টায় ইহা একবার আবর্তন করে অর্থাৎ ৩৬০° ঘুরে। তাহা হইলে ৪ মিনিটে ইহা ১° ঘুরিতে পারে। অতএব প্রত্যেক দিন ১° করিয়া সূর্য নক্ষত্রের অনুপাতে পিছাইয়া পড়ে। তাহা হইলে মোটামুটি এক বৎসরে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে ইহা নক্ষত্রের অনুপাতে একটি সম্পূর্ণ আবর্তন কম করিবে। তাহা হইলে দেখা গেল আকাশে সূর্যের পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে আহ্নিক গতি ছাড়াও নক্ষত্রের অনুপাতে ইহার একটি পশ্চাদ্গতি আছে তাহার পরিমাণ প্রতিদিন ১° এবং ইহা পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে।

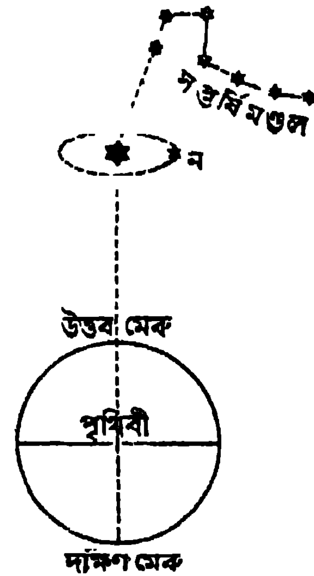
আমরা সাধারণত নক্ষত্র দেখিতে পাই রাত্রিকালে অর্থাৎ সূর্য যে সময়ে ক্ষিতিজ তলের নিচে নামিয়া যায়। ঐ সময়ে সূর্য ক্ষিতিজ তলের যেদিকে থাকে তাহার বিপরীত দিকে নক্ষত্র দেখা দেয়। সূর্য এবং নক্ষত্রের মধ্যে ব্যবধান প্রত্যেক দিন ১° করিয়া বাড়িতেছে, এক সময় যদি সূর্য হইতে একটি তারকার ব্যবধান ১৮০° থাকে, তবে ছয় মাস পরে সে ব্যবধান আর থাকিবে না, কারণ ঐ সময়ের মধ্যে আরও ১৮০° ব্যবধান বাড়িয়া ৩৬০° হইবে, অর্থাৎ আকাশের যে স্থানে সূর্য সেই স্থানেই ঐ নক্ষত্র থাকিবে, তখন ঐ নক্ষত্রটিকে দেখা যাইবে না। তাহা হইলে প্রত্যেক নক্ষত্রই এইরূপে প্রত্যেক দিন আকাশে ইহার অবস্থান পরিবর্তন করিতেছে। অতএব বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে বিভিন্ন তারকা দেখা যাইবে।

বিরাট নীল আকাশের কোথায় কি গ্রহ নক্ষত্র আছে বা থাকিতে পারে তাহার অবস্থান নির্দেশ করিতে হইলে সমস্ত আকাশের বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচয় থাকা আমাদের যেমন প্রয়োজন তেমনই নক্ষত্র মণ্ডলীর সহিত পরিচয় থাকা দরকার। ভূপৃষ্ঠে যেমন গ্রাম, জেলা ইত্যাদি অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ সাহায্যে নির্দিষ্ট করা হয়, আকাশেও ঐরূপ কতকগুলি স্থান, বিন্দু ইত্যাদি নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। পরে ইহাদের তুলনায় অপরগুলি চিনিয়া লওয়া হয়।

দেখা যায় জ্যোতিষ্কগুলির আবর্তনকালে তাহারা যে যেখানেই যাউক না

কেন তাহাদেব পবস্পবেব মধ্যে ব্যবধান সকল সময়েই ঠিক থাকে। কাজেই ইহাদেব দুই একটি চিনিয়া বাখিলে তাহাদেব অবস্থানেব সহিত তুলনা কবিয়া অপবগুলি বাহিব কবা যায়। নক্ষত্রগুলিকে এক একটি পৃথক ভাবে চিনিয়া বাখা অসম্ভব। কিন্তু যখন কযেকটি নক্ষত্র মিলিযা একটি কাল্পনিক চিত্রেব ন্যায় অবস্থান কবে তখন তাহাদিগকে চিনিযা বাখা সহজ হয। যতগুলি নক্ষত্র মিলিযা ঐ চিত্রটি প্রস্তুত কবে তাহাদেব সমষ্টিকে এক একটি **নক্ষত্রপুঞ্জ** (Constellation) বলা হয। চিত্রেব আকৃতি অনুযাযী নক্ষত্রপুঞ্জগুলিব নামকবণ হইযা থাকে। কতকগুলি নক্ষত্র লইযা কুকুবেব আকাব সৃষ্টি কবিযাছে বলিযা মনে হয, সেইজন্য ঐ কযটি নক্ষত্রকে একসঙ্গে **শ্বা** (Dog) নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হয। তেমনই **সপ্তর্ষি মণ্ডল** (Constellation of Great Bear), **প্রশ্বা** নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation of little dog) ইত্যাদি আছে। ইহাদেব মধ্যে দুই একটিকে চিনিযা বাখিলে অপবগুলিকে খুঁজিযা বাহিব কবা যায।

পূর্বেই বলা হইযাছে পৃথিবীব নিজেব অক্ষেব চতুর্দিকে দৈনিক আবর্তন হেতু তাবাগুলিকে পূর্বদিকে উদিত হইযা পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতে দেখা যায, কিন্তু পৃথিবীব মেরুদণ্ড ববাবব উত্তব দিকে বর্ধিত কবিলে ধ্রুবতাবা উহাব উপব পডে বলিযা, ধ্রুবতাবাব এরূপ কোন গতি আছে বলিযা মনে হয না। এই ধ্রুবতাবাব কযেকটি বৈশিষ্ট্য আছে বলিযা ইহাকে চিনিযা বাখা যায়, ইহা অপব নক্ষত্রেব ন্যায় আকাশেব বিভিন্ন স্থানে ঘুবিযা বেডায না, এইজন্যই ইহাব নাম ধ্রুবতাবা। অনেকে ইহাকে অচলতাবাও বলে। ইহা খুব বেশী উজ্জ্বল নহে।



২ নং চিত্র
ধ্রুবতাবা ও সপ্তর্ষিমণ্ডল

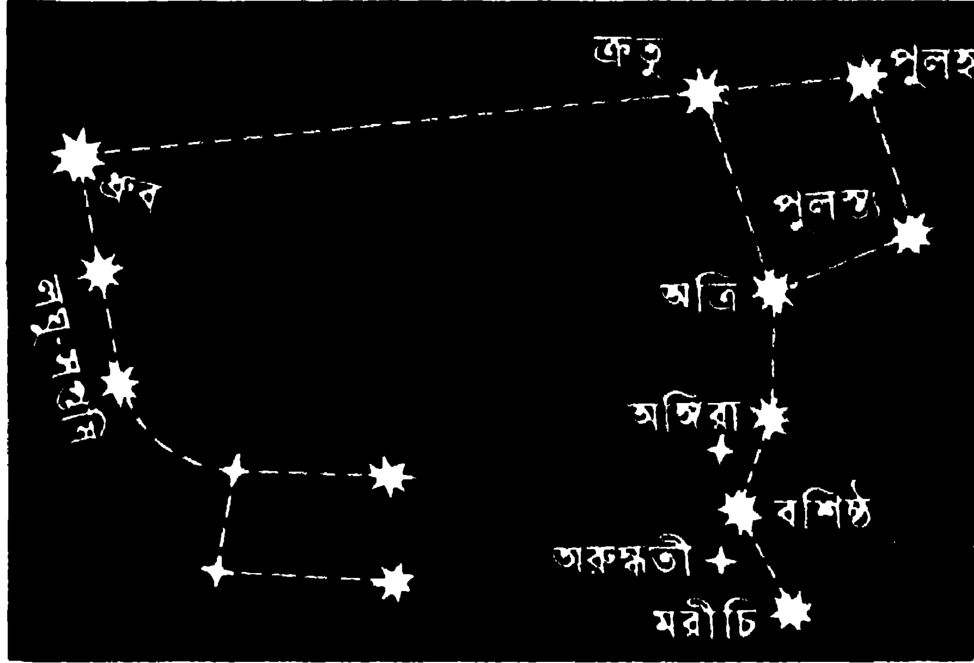
পার্শ্বেব চিত্রে কোন এক বাত্রিব পৃথিবী, ধ্রুব নক্ষত্র এবং ধ্রুব নক্ষত্রেব চতুর্দিকে ঘূর্ণাযমান অপব একটি নক্ষত্র **ন** এবং

সপ্তর্ষি মণ্ডল নামক নক্ষত্র পুঞ্জের অবস্থান দেওয়া গেল। আমাদের দেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত উত্তর আকাশের দিকে তাকাইলে লাঙ্গলের ফলার মত সাজানো সাতটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, উহাদিগকেই **সপ্তর্ষি মণ্ডল** (Great Bear) বলে। এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের এক প্রান্তে কেবলমাত্র দুইটি তারাকে এক রেখায় দেখা যায়। এই রেখাকে বর্ধিত করিলে উহা ধ্রুব তারাকে প্রায় ছুঁইয়া যায়। ধ্রুবনক্ষত্রের দিক হইতে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি নক্ষত্রের নাম, যথাক্রমে **ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি**। বশিষ্ঠের নিকটে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটি দেখা যায় তাহার নাম **অরুন্ধতী।** সাতটি ঋষির নামে নাম করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সপ্তর্ষি বলা হয়। কিন্তু ইংরাজেরা এই সাতটি নক্ষত্রে একটি ভল্লুকের চিত্র কল্পনা করিয়া ইহার নাম দিয়াছেন Great Ber বা Ursa Major নিরক্ষ প্রদেশ হইতে যতই উত্তর দিকে যাওয়া যাইবে, ধ্রুব নক্ষত্রকে ততই মাথার উপর উঠিতে দেখা যাইবে। অবশেষে উত্তর মেরুতে উহাকে ঠিক মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যদি উত্তর মেরু হইতে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে আসা হয় তবে উহাকে ক্রমাগত দিগন্তের দিকে নামিতে দেখা যাইবে এবং নিরক্ষ বৃত্তের উপর যাইলে ইহাকে ঠিক দিগন্তে মিশিয়া যাইতে দেখা যাইবে, নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণে যাইলে ইহাকে আর দেখা যাইবে না।

চৈত্র বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সময় সপ্তর্ষি মণ্ডলকে উত্তরাকাশে দেখা যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে উহা ক্রমাগত একটু একটু করিয়া পশ্চিম দিকে হেলিয়া অবশেষে কার্তিক মাস হইতে দিগন্তের নিচে নামিয়া যায়। এই সপ্তর্ষি মণ্ডলকে ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিলে ধ্রুবতারা চিনিতে কষ্ট হয় না।

পৃথিবীর অক্ষকে দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করিলে উহা ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় অপর একটি নক্ষত্রে গিয়া পৌঁছিবে। ইহার নাম **হ্যাডলীর অক্ট্যাণ্ট** (Hadley's Octant), ইহা কেবলমাত্র দক্ষিণ গোলার্ধেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

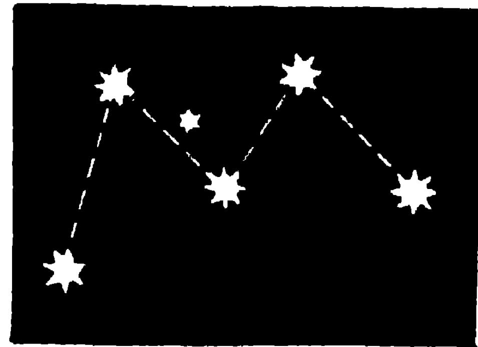
ধ্রুব তাবাব নিকটে ছয়টি নক্ষত্র লইয়া **লঘু সপ্তর্ষি** (The Little Bear) নামে একটি নক্ষত্র মণ্ডল আছে। ইহা সপ্তর্ষি মণ্ডলেব দিকে অবস্থিত। ইহাব চাবিটি



৩ নং চিত্র—ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি ও লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডল

নক্ষত্র একটি চতুর্ভুজ সৃষ্টি কবিযা অবস্থিত আছে। অপব দুইটি, চতুর্ভুজেব এক কোণেব একটি তাবকা হইতে ধ্রুবতাবাব দিকে প্রায এক সবল বেখায অবস্থিত। চিত্রে ধ্রুব নক্ষত্র, সপ্তর্ষি ও লঘু সপ্তর্ষি মণ্ডল দেখান হইল। লঘু সপ্তর্ষিকে শিশুমাবও বলা হইয়া থাকে। ইংবাজীতে ইহাকে Ursa Minorও বলা হয।

ধ্রুব তাবাব যেদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থাকে তাহাব বিপবীত দিকে **ক্যাসিওপিয়া** (Cassiopeia) নামে পাঁচ নক্ষত্রেব একটি নক্ষত্র মণ্ডল আছে। কার্তিক, অগ্রহাযণ মাসে যখন সপ্তর্ষি মণ্ডল দিগন্তেব নিচে নামিযা যায তখন ইহাবা দেখা দেয়।



৪ নং চিত্র—ক্যাসিওপিযা

যখন সপ্তর্ষি মণ্ডল ধ্রুব তারার নিচে নামিয়া যায় তখন ক্যাসিওপিয়ার উত্তর পূর্ব দিক হইতে সাতটি নক্ষত্র লেজওয়ালা ঘুঁড়ির মত দেখা যায়। প্রথম চারিটি মিলিয়া ঘুঁড়ি ও বাকি তিনটি ঐ ঘুঁড়ির লেজের মত দেখায়। কিন্তু প্রথম চারিটি নক্ষত্র মিলিয়া **পেগাসস** (Pegasus) নামক নক্ষত্র পুঞ্জ এবং অপর তিনটি **অ্যানড্রোমিডা** (Andromeda) নামক পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার অ্যানড্রোমিডার শেষ নক্ষত্রটির দুই পাশে দুইটি নক্ষত্র এবং আরও কয়েকটি নক্ষত্র লইয়া যে মণ্ডল তাহার নাম **পারস্যুস** (Perseus)। চিত্রে একসঙ্গে উক্ত তিনটি মণ্ডলই দেখান হইল।



৫ নং চিত্র—পেগাসস্, অ্যাণ্ড্রোমিডা ও পারস্যুস

পেগাসস মণ্ডলের তিন কোণের তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম **পূর্বভাদ্রপদ** (Markab), **গোপদ** (Algenib) ও **উত্তরভাদ্রপদ** (Alpheratiz)। যে নক্ষত্রটি পারস্যুস ও অ্যানড্রোমিডা দুই মণ্ডলের মধ্যে আছে তাহার নাম **আলগল** (Algol) অর্থাৎ দৈত্য তারা। ইহার জ্যোতি প্রতি তিন দিন ধরিয়া হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ইহার বর্ণ ঘোর লাল।

আলগল তারার কিছু দূরে একসঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি তারকা মিলিয়া **সাতভাই** বা **কৃত্তিকা** মণ্ডল (Pleiades) রচনা করিয়াছে।

পরে কালপুরুষের চিত্র দেওয়া হইল। **আর্দ্রা** (Betelgeux), **বাণরাজা** (Rigel) এবং **কার্ত্তিকেয়** (Bellatrix) প্রমুখ আরও কতক

গুলি নক্ষত্র লইয়া যে মনুষ্যমূর্তি কল্পনা করা হয় তাহাই **কালপুরুষ** (Orion) নামক নক্ষত্র মণ্ডল। কাল্পনিক রেখা দ্বারা ইহার নক্ষত্রগুলি যোগ করিলে শুধুই একটি মনুষ্য মূর্তি হইবে না, মনে হইবে ঐ মানুষটির কোমরে কোমরবন্ধ, যেন তাহাতে তলোয়ার ঝুলান এবং হাতে ধনুক রহিয়াছে। শীতকালে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর পূবাকাশে ইহাদিগকে দেখা যায় এবং ভোর বেলা পশ্চিমাকাশে ডুবিয়া যায়। ঐ সময় কালপুরুষের পায়ের কাছে একটি অতিশয় উজ্জ্বল নক্ষত্র



৬ নং চিত্র—কালপুরুষ, লুব্ধক, রোহিণী ও সাতভাই

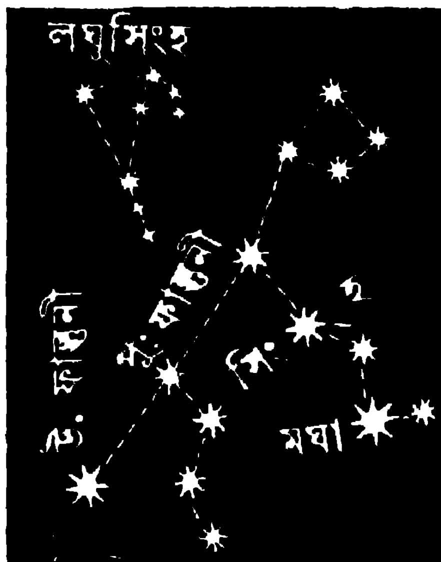
দেখা যায়, তাহার নাম **লুব্ধক** (Sirius)। আকাশে যে সকল তারা দেখা যায় তাহাদের মধ্যে এইটি উজ্জ্বলতম। ইহা বৃহৎ কুকুর বা শ্বা মণ্ডলের (Canis-major) নক্ষত্র। এই মণ্ডলটিকে কালপুরুষের কুকুর বলিয়া কল্পনা করা হয়।

কালপুরুষের পূর্বদিকে **সরমা** (Procyon) নামক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। ইহা **ক্ষুদ্র কুকুর** বা **প্রশ্বা** (Canisminor) মণ্ডলের একটি নক্ষত্র।

প্রশ্বামণ্ডলের দক্ষিণে আছে **আর্গোন্যাভিস** (Argonavis) মণ্ডল। **অগস্ত্য** (Canopas) ইহার প্রধান নক্ষত্র।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের ক্রতু ও পুলহ নক্ষত্রকে সরল রেখাদ্বারা যোগ করিয়া বাড়াইয়া দিলে ইহা ধ্রুব নক্ষত্রে গিয়া পৌছায়। আরও বাড়াইয়া দিলে রেখাটি **লঘু সিংহ** (Leo minor) মণ্ডল নামক ছোট ছোট কতকগুলি নক্ষত্রের একটি মণ্ডলে গিয়া পৌছিবে।

এইবার সূর্যের আপাত পরিভ্রমণ পথের কাছাকাছি যে কয়টি নক্ষত্র মণ্ডল পড়ে তাহাদের পরিচয় লওয়া যাউক। আমরা সকলেই জানি সূর্য প্রতিদিন এক স্থানে খাড়া ভাবে কিরণ দেয় না, প্রত্যহ এক বৃত্ত পথে একটু একটু করিয়া সরিয়া সারা বৎসরে ঐ বৃত্ত অতিক্রম করে। বৃত্তটির নাম দেওয়া হইয়াছে **ক্রান্তি** বৃত্ত (Ecliptic)। এই বৃত্ত পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের সহিত ২৩½ ডিগ্রী কোণ করিয়া অবস্থিত। এই বৃত্তকে বারটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহা হইলে এক এক ভাগে সূর্য এক এক মাস অবস্থান করে। এই ভাগ গুলিকে এক একটি **রাশি** বলা হয়।

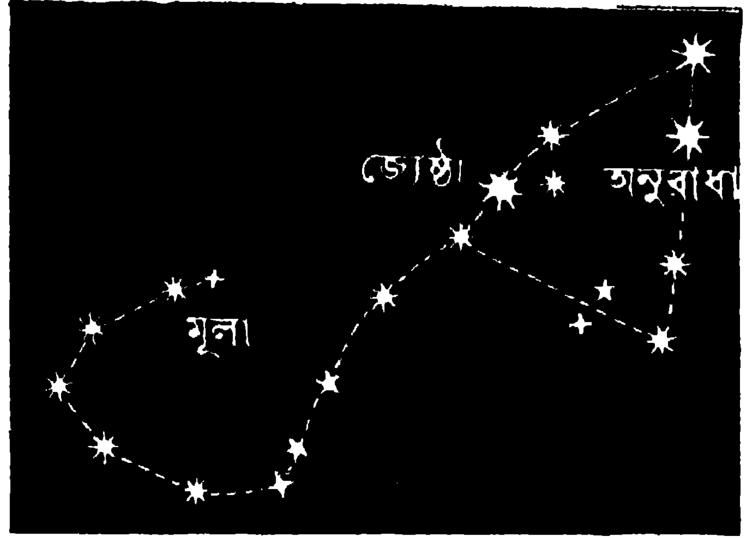


৭ নং চিত্র—লঘুসিংহমণ্ডল

বৈশাখ মাসে সূর্য যে রাশিতে থাকে তাহার নাম **মেষ** রাশি। পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে **বৃষ** রাশিতে, আষাঢ় মাসে **মিথুন** রাশিতে এবং পর পর এইরূপ বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন রাশিতে থাকে। সূর্যের এই পরিভ্রমণ পথে বারটি রাশির এক একটিতে যে নক্ষত্র মণ্ডল বা নক্ষত্র আছে, তাহাদের সমষ্টিতে যে বস্তুর চিত্র কল্পনা করা যায় তাহাদের নামানুসারে রাশিগুলির নামকরণ হইয়াছে। আবার নক্ষত্র মণ্ডল গুলির অন্তর্গত নক্ষত্র গুলিকে যোগ করিয়া দিলে এক একটি মণ্ডলের যে কাল্পনিক চিত্র পাওয়া যাইবে সেই চিত্রের মূর্তি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু নামের সহিত চিত্রের সাদৃশ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি বহুকাল হইতে তাহারা এই সকল নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আজিও তাহারা সেই সকল নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

সূর্যের পরিভ্রমণ পথে পূর্বোক্তরূপ সাতাশটি নক্ষত্রমণ্ডল বা সাতাশটি

ভাগ কল্পনা কবা হয। ইহাব এক এক ভাগে অশ্বিনী, ভবণী, কৃত্তিকা, বোহিণী প্রভৃতি এক একটি নক্ষত্রেব অবস্থান কাল ধবা হয। তাহা হইলে ১টি বাশি=$\frac{২৭}{১২}$ নক্ষত্র =২$\frac{১}{৪}$ নক্ষত্র। বৈশাখ মাস যেখান হইতে আবম্ভ হয সেখান হইতে মেষ বাশি এবং অশ্বিনী নক্ষত্রেব আবম্ভ হয। বৈশাখ মাসেই সূর্য দুইটি নক্ষত্র পাব হইয়া আর একটি নক্ষত্রেব $\frac{১}{৪}$ অংশ চলিযা যায। সূর্য কোন্ মাসে কোন্ বাশি এবং কোন্ নক্ষত্রেব সম্পূর্ণ ও কোন্ নক্ষত্রেব মাত্র কতক অংশ পাব হইযা যায তাহাব একটি তালিকা ১৪শ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

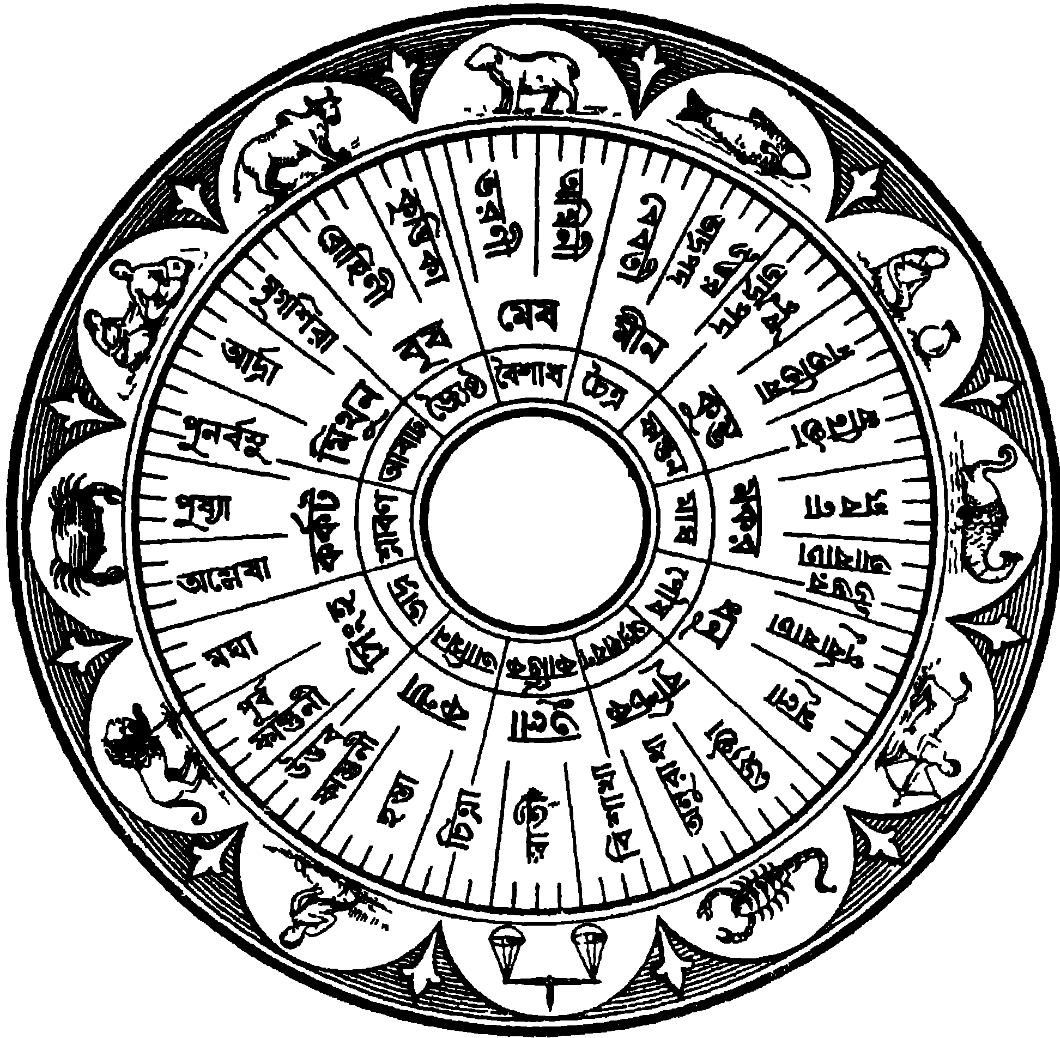


৮ নং চিত্র—বৃশ্চিক বাশি

পৃথিবীতে কোথায় কোন্ দেশ, নদী, পাহাড, সাগব, হ্রদ, উপসাগব প্রভৃতি আছে জানিবাব জন্য ভৌগোলিকগণ যেমন মানচিত্র প্রস্তুত কবিযাছেন, তেমনই আকাশেব কোথায কোন নক্ষত্র বা বাশি আছে তাহা জানিবাব জন্য জ্যোতির্বিদগণ তাবকা ও নক্ষত্রেব মানচিত্র প্রস্তুত কবিযাছেন। এই মানচিত্র সাহায্যে আকাশেব নক্ষত্রগুলি সহজেই ধবা যায।

পৃথিবীব মানচিত্র এবং আকাশেব মানচিত্রে একটু প্রভেদ আছে। ভৌগোলিক মানচিত্রেব ব্যবহাব প্রণালী এবং আকাশেব মানচিত্র ব্যবহাব কবিবাব প্রণালী একটু ভিন্ন। ভৌগোলিক মানচিত্র যখন যে ভাবেই রাখা হউক না কেন দক্ষিণ দিক পূর্ব, বাম দিক পশ্চিম, উপব দিক উত্তব এবং নিচেব দিক দক্ষিণ দিক সূচিত কবে। কিন্তু আকাশেব মানচিত্রেব সঙ্গে আকাশেব তাবাব অবস্থান মিলাইতে হইলে মানচিত্র খানিকে মাথাব উপব

বাখিযা মানচিত্রেব লিখিত দিক গুলি যথাক্রমে আকাশেব দিক গুলির সঙ্গে মিলাইতে হয। কিন্তু এ অবস্থায মানচিত্র দেখা অসুবিধা জনক। কাজেই



৯ নং চিত্র—রাশি চক্র

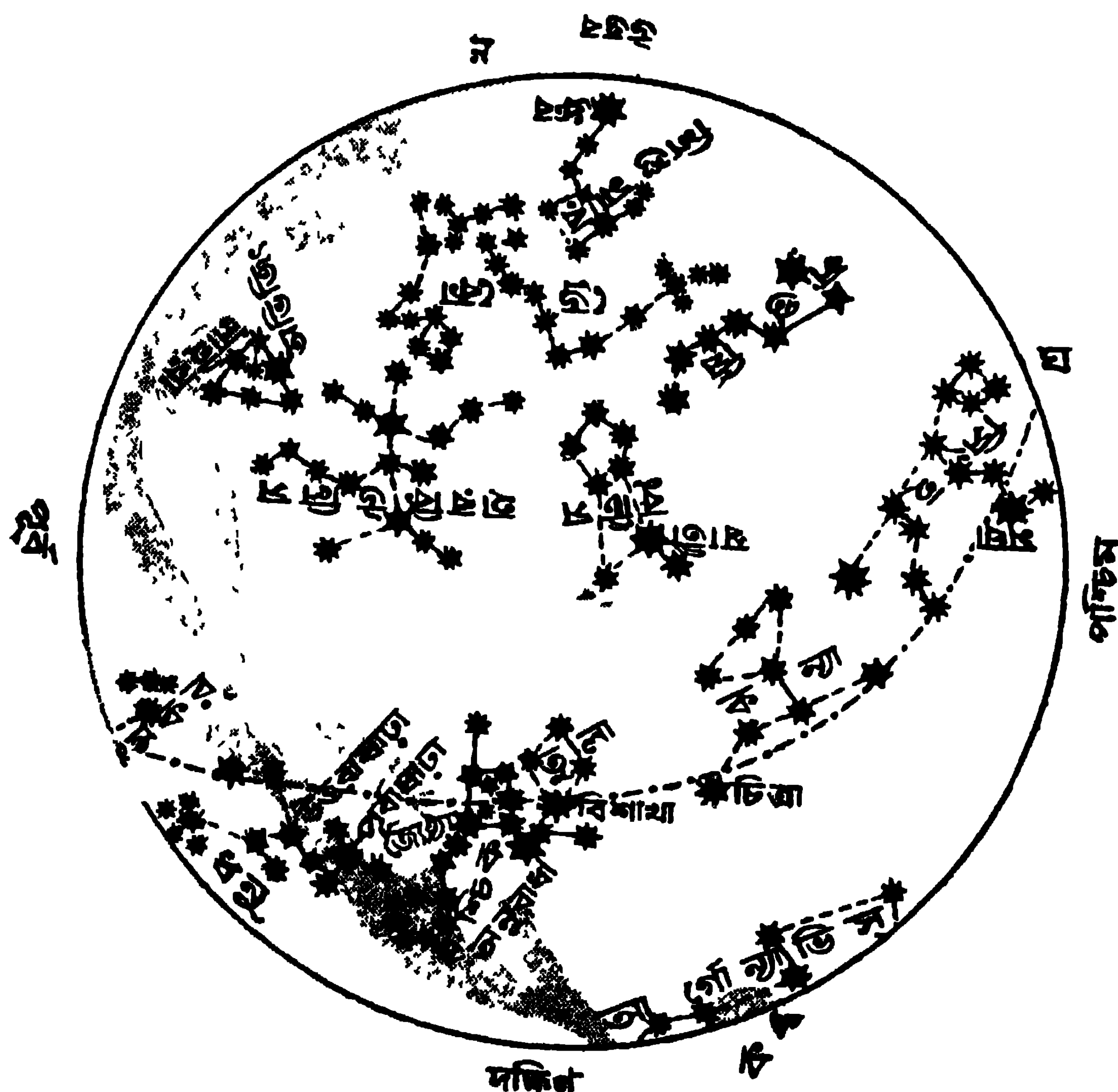
মানচিত্র খানি চোখেব সামনে ধবিলে আকাশেব দিক হইতে ইহাব দিকগুলি অন্যরূপ হইযা যায। তাই উত্তব আকাশেব নক্ষত্র দেখিতে হইলে উত্তব দিকে মুখ কবিযা বসিযা সাম্নে মানচিত্র খানি এমন ভাবে ধবিতে হয় যেন মানচিত্রেব উত্তব দিক মানচিত্র দর্শকেব কোলেব দিকে থাকে। এই অবস্থায় মানচিত্রে লিখিত দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকগুলি যথাক্রমে আকাশেব উত্তব, পূর্ব ও পশ্চিম দিকেব সঙ্গে মিলিযা যাইবে। এখন মানচিত্রেব উপবেব অর্ধ দ্বাবা দক্ষিণ আকাশ এবং নিচেব অর্ধ দ্বাবা উত্তব আকাশ নির্দিষ্ট হয়।

মাস	রাশির বাংলা ইংরাজী ও আরবী নাম।	নক্ষত্র
বৈশাখ	মেষ Aries হামল	অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকার ১/৪ (Pleiades)
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ Taurus সত্তর	কৃত্তিকার ৩/৪ রোহিণী (Hyades) মৃগশিরার ১/২
আষাঢ়	মিথুন Gemini যওযা	মৃগশিরার ১/২ আর্দ্রা (Betelgeux) পুনর্বসুর ৩/৪ (Pollux)
শ্রাবণ	কর্কট Cancer সরতান	পুনর্বসুর ১/৪ পুষ্যা অশ্লেষা
ভাদ্র	সিংহ Leo আসদ্	মঘা (Regulus) পূর্ব্বফাল্গুনী উত্তরফাল্গুনীর ১/৪ (Denebola)
আশ্বিন	কন্যা Virgo সম্বালা	উত্তরফাল্গুনীর ৩/৪ হস্তা চিত্রার ১/২ (Spica)
কার্তিক	তুলা Libra মিয়ান	চিত্রার ১/২ স্বাতী বিশাখার ৩/৪
অগ্রহায়ণ	বৃশ্চিক Scorpio আকরব	বিশাখার ১/৪ অনুরাধা জ্যেষ্ঠা (Antares)
পৌষ	ধনু Sagittarius কওস	মূলা পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়ার ১/৪
মাঘ	মকর Capricornus জদি	উত্তরাষাঢ়ার ৩/৪ শ্রবণা (Altair) ধনিষ্ঠার ১/২
ফাল্গুন	কুম্ভ Acquarius দলাও	ধনিষ্ঠার ১/২ শতভিষা পূর্বভাদ্রপদের ৩/৪ (Markab)
চৈত্র	মীন Pisces হুত	পূর্ব্বভাদ্রপদের ১/৪ উত্তরভাদ্রপদ (Alpheratiz) রেবতী

১ নং চিত্রে মাস, রাশি ও নক্ষত্রের নাম সাজাইয়া দেখান হইল।

দক্ষিণ আকাশেব নক্ষত্র দেখিতে হইলে বিপবীত উপায় অবলম্বন কবিতে হয।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে শ্রাবণ মাসেব প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আকাশেব সপ্তর্ষি মণ্ডল, শিশুমাব, লাইবা, হাবকিউলিস, ড্রেকো মণ্ডল,

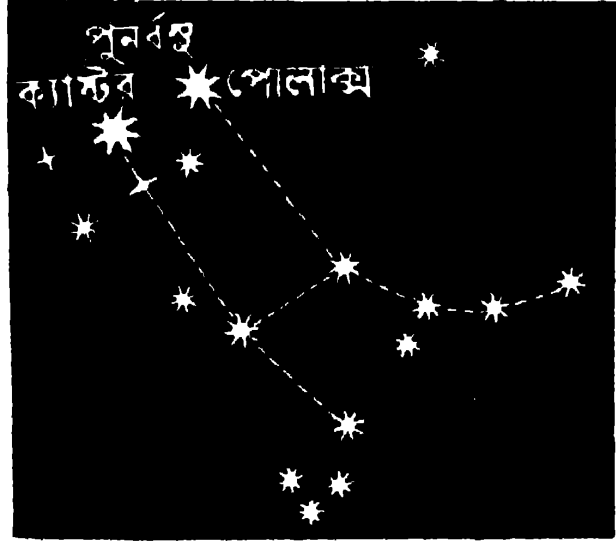


১০ নং চিত্র—আকাশেব মানচিত্র (বৈশাখেব শেষ হইতে শ্রাবণের প্রথম)

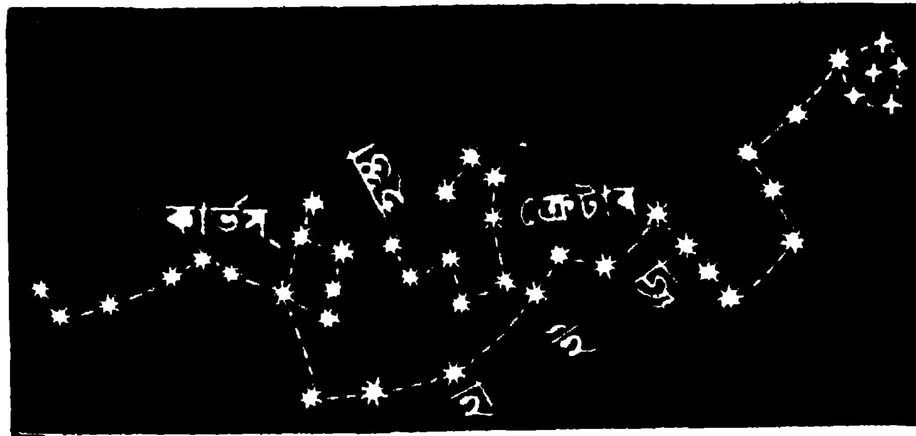
বুটিস মণ্ডল, সিংহ বাশি, কন্যা বাশি, তুলা রাশি, বৃশ্চিক বাশি, আর্গোন্যাভিস,

ধনুরাশি, মকর রাশি প্রভৃতি নক্ষত্রগুলি আকাশে যেরূপ দেখা যায় তাহাদের অবস্থান নিম্নলিখিত মানচিত্র হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়।

বৈশাখ মাসের রাত্রিতে আকাশের প্রায় মধ্যস্থলে সিংহ রাশি দেখা যায়। সিংহের মুখের দিকে মঘা ও লেজে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র। সিংহ রাশির পরে কর্কট ও মিথুন রাশি। মিথুন রাশির দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, একটি **ক্যাষ্টর** (Castor) ও অপরটি **পুনর্বসু** (Pollux)। সিংহ রাশির যে দিকে **কর্কট** ও **মিথুন** তাহার বিপরীত দিকে **কন্যা** ও **তুলা** রাশি। কন্যা রাশির উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম **চিত্রা** (Spica)। সিংহ রাশির নিচের দিকে **হাইড্রা** (Hydra) মণ্ডল। ইহাকে দেখিতে অনেকটা সাপের মত। ইহার প্রধান নক্ষত্র **অশ্লেষা**।



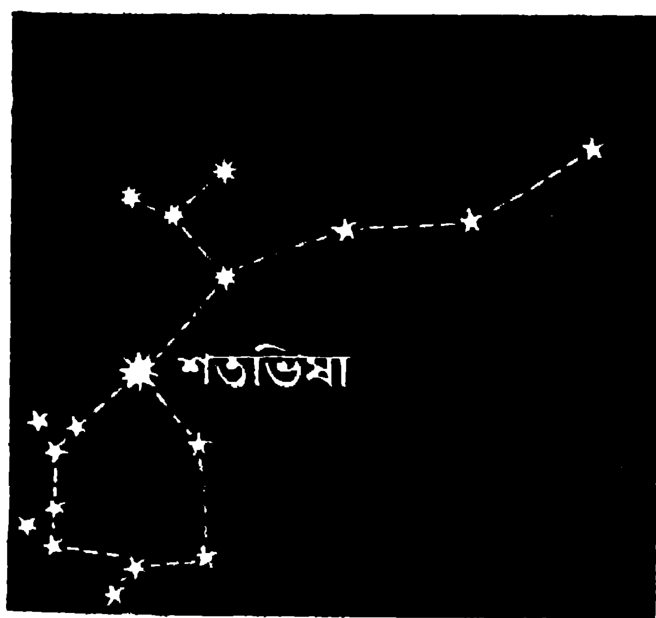
১১ নং চিত্র—মিথুন রাশি



১২ নং চিত্র—হাইড্রামণ্ডল

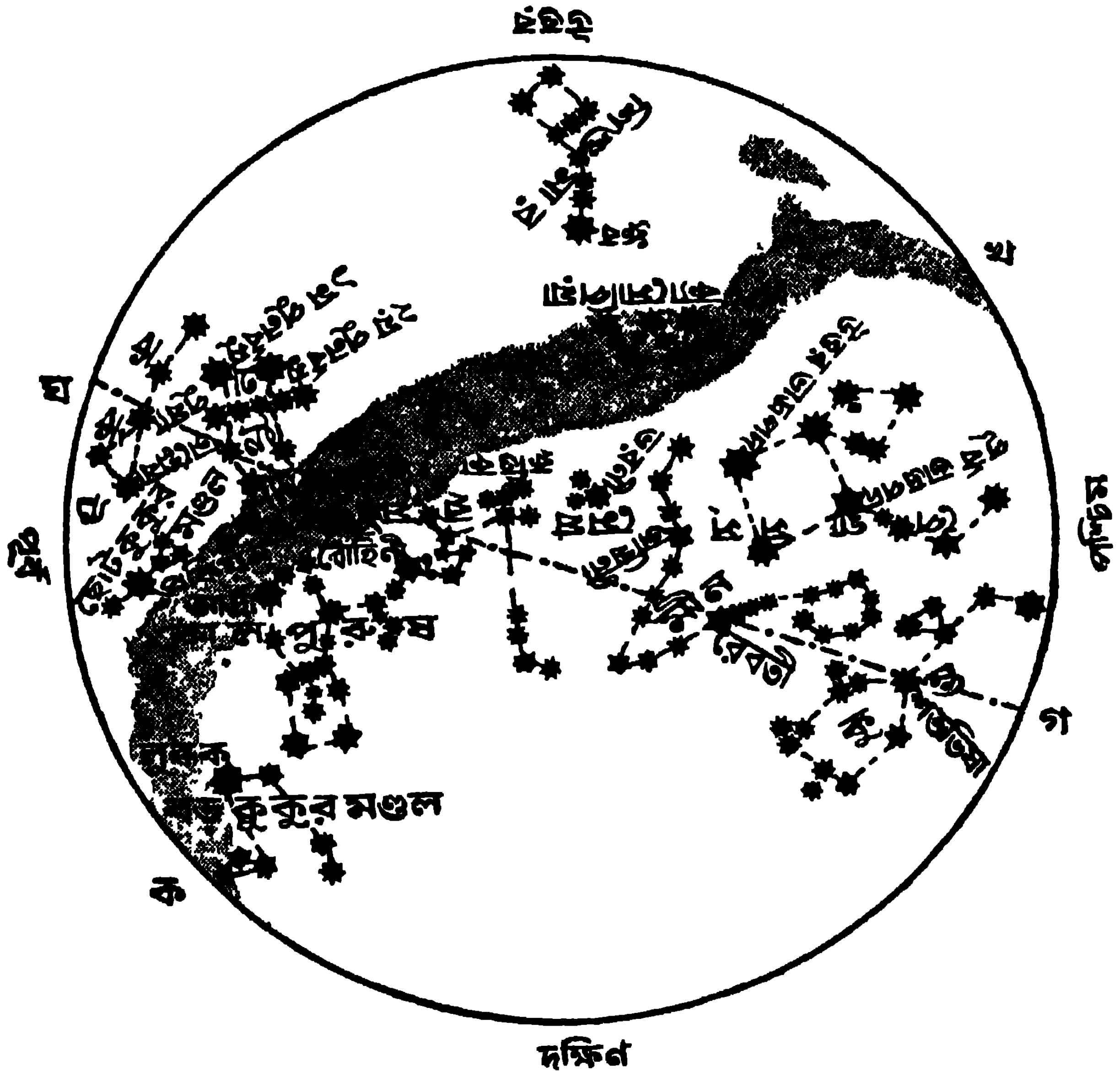
অবশ্য অশ্লেষা নক্ষত্র কর্কট রাশির অন্তর্গত। কন্যা রাশির উত্তর পূর্ব দিকে

বুটিস (Bootes) এবং তাহাব উত্তব পূর্বদিকে **হার্কিউলিস** (Hercules) মণ্ডল। বুটিসেব প্রধান নক্ষত্র **স্বাতী** (Arcturus)। প্রবাদ আছে স্বাতী নক্ষত্রেব জল বাঁশ গাছেব উপব পড়িলে বংশলোচন নামক পদার্থ এবং সাপেব মাথায় পড়িলে মণি হয়। হাবকিউলিসেব উত্তব পূর্বদিকে **লাইরা** (Lyra) মণ্ডল, **অভিজিত** (Vega) ইহাব প্রধান নক্ষত্র। **তুলা** বাশিব নিচে **বৃশ্চিক** বাশি এবং ইহাব উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটিব নাম **জ্যেষ্ঠা** (Antares)। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেব রং একটু লালাভাযুক্ত। বৃশ্চিক বাশিব দক্ষিণে **সেণ্টরাস** (Centaurus) মণ্ডল। **আলফা সেণ্টরি** (Alfa centauri), **বিটা সেণ্টরি** (Bita centauri) এবং **প্রক্সিমা সেণ্টরি** (Proxima centauri) নামক নক্ষত্রগুলি ইহাব অন্তর্গত। প্রথমোক্ত দুইটি উজ্জ্বল, শেষোক্তটি পৃথিবীব নিকটতম নক্ষত্র। বৃশ্চিক বাশিব পূর্ব পার্শ্বে **ধনু-রাশি** এবং তাহাব উত্তবে **একুইলা** (Aquilla) মণ্ডল। ইহাব উজ্জ্বল নক্ষত্রটিব নাম **শ্রবণা** (Altair)। ধনুবাশিব পূর্বদিকে **মকর ও কুম্ভ-রাশি**, এই বাশি দুইটিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। কুম্ভেব উত্তরে পেগাসস্, ইহাব কথা পূর্বে বলা হইযাছে। মকব বাশিব দক্ষিণে **পিসিস** (Piscis) মণ্ডল, ইহাব উজ্জ্বল নক্ষত্রেব নাম **ফোমালহট্** (Fomulhaut)। কুম্ভবাশিব পূর্বদিকে **মীনরাশি** (Pisces), তাহাব উত্তব পূর্বদিকে **মেষ** এবং মেষ বাশিব পূর্বদিকে **বৃষ** বাশি। মেষ রাশিব প্রধান নক্ষত্রটিব নাম **অশ্বিনী**



১৩ নং চিত্র – কুম্ভরাশি

বৃষ বাশিব প্রধান দুইটি নক্ষত্রেব নাম **কৃত্তিকা** (Pleiades) এবং **রোহিনী** (Hyades)। মীনবাশির নিচে **সিটাস** (Cetus) মণ্ডল, **মাইরা** (Myra) ইহাব প্রধান নক্ষত্র। **আর্দ্রা** (Betelgeux) নক্ষত্রেব কিছু উপবে **প্রজাপতি** (Auriga) মণ্ডল, **ব্রহ্ম-হৃদয়** (Capella) ইহাব প্রধান নক্ষত্র।



১৪নং চিত্র—আকাশেব মানচিত্র (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষেব মাঝামাঝি)

নক্ষত্রগুলিব অবস্থান নির্নীত হইলেও সকল গুলি সকল সময়ে দেখা যায় না। সূর্য যখন যে বাশিতে অবস্থান কবে তখন সেই বাশিব নক্ষত্র বা তন্নিকটবর্তী

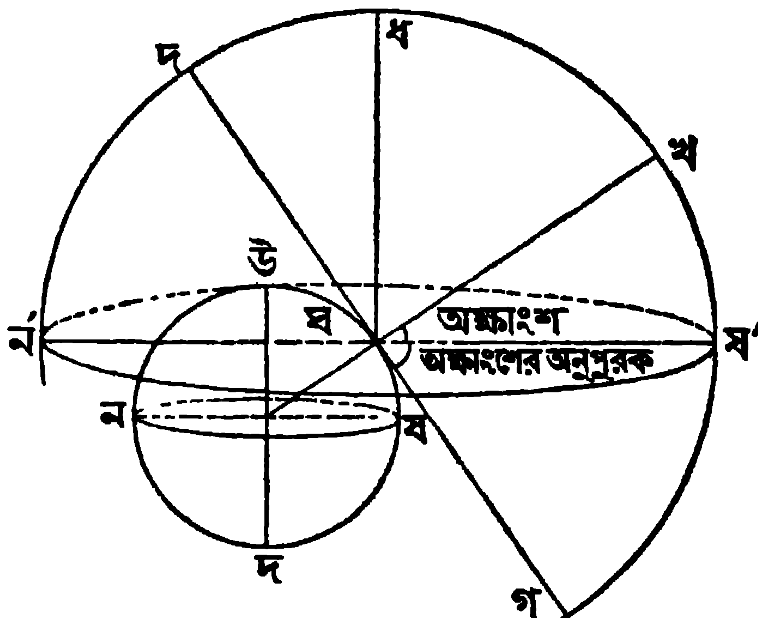
অপর নক্ষত্রগুলি সূর্যের জ্যোতির নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায় বলিয়া দেখা যায় না।

বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নক্ষত্র দেখা যায়। এবং তাহাদের একটির তুলনায় অপরটির অবস্থান না বদলাইলেও আকাশের বিভিন্ন অংশে তাহারা প্রত্যহই সরিয়া যায় বলিয়া আকাশের মানচিত্র বৎসরের বিভিন্ন সময়ানুসারে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত নক্ষত্রগুলির মোটামুটি অবস্থান পূর্ব পৃষ্ঠায় দেখান হইল।

প্রতিদিন যেমন আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তিত হইতেছে, তেমনই পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের আকাশ বিভিন্নরূপে দেখা যাইবে। নিরক্ষ-প্রদেশের আকাশ যেরূপ দেখাইবে মেরুপ্রদেশের আকাশ সেরূপ দেখাইবে না। কোন স্থানের আকাশের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

মনে করা যাউক চিত্রের ছোট বৃত্তটি পৃথিবী, **উ** এবং **দ** যথাক্রমে ইহার উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু এবং **ন, য** ইহার নিরক্ষবৃত্ত ও **ক** ইহার কেন্দ্র। ইহার উপর **ঘ** স্থানের আকাশ অঙ্কিত করিতে হইবে।



১৫ নং চিত্র—কোন স্থানের আকাশ অঙ্কিত করিবার প্রণালী

কঘ যোগ করিয়া **খ** পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল। **ঘ** দিয়া **ঘখ** এর সহিত সমকোণী ভাবে **দগ** রেখা টানা হইল। ইহাই **ঘ** স্থানের দিগন্ত রেখা। এক্ষণে **ঘ**কে কেন্দ্র করিয়া এবং **ঘগ**—

দঘ—ঘখকে ব্যাসার্ধ লইয়া যে বৃত্ত আঁকা যায় তাহাই **ঘ** স্থানেব আকাশ।

উ ক এব সহিত সমান্তরাল কবিয়া **ঘধ** বেখা যেখানে আকাশে ঠেকিযাছে বলিয়া মনে হয সেই স্থানে ধ্রুব তাবাকে দেখা যাইবে।

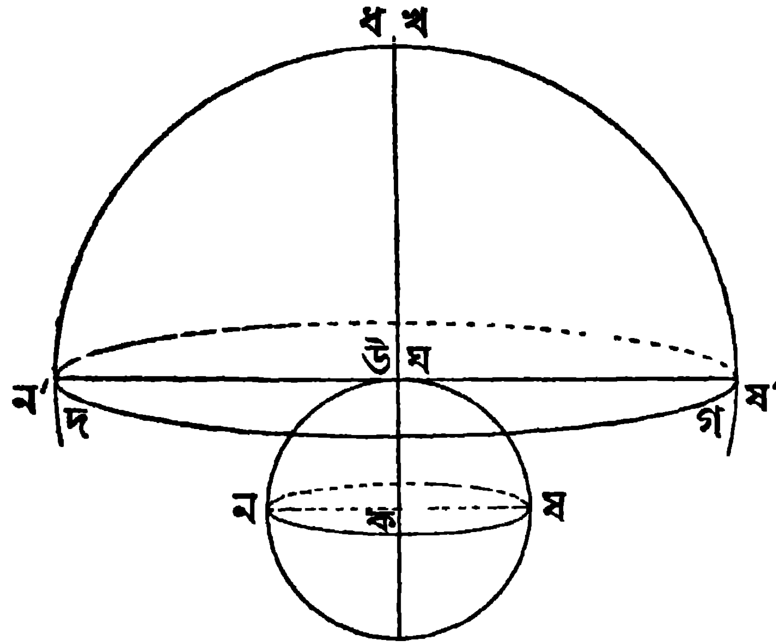
তাহা হইলে **ঘ** হইতে আকাশেব মাত্র **দধখগ** অংশ দৃষ্ট হইবে। এইবাব যদি **নষ** এব সমান্তবাল কবিযা আকাশ গোলকে অদৃশ্যাংস্থ **ন´** এবং দৃষ্টাংশস্থ **ষ´** দিযা একটি বৃত্ত কল্পনা কবা হয তাহা **নৈসর্গিক নিরক্ষ বৃত্ত** (Celestial equator)। **ধ** ধ্রুবতাবাব অবস্থান নির্দেশ কবিবে।

ক্রান্তি বৃত্ত নৈসর্গিক নিবক্ষ বৃত্তেব সহিত সমান্তবাল। দিগ্বলয এবং নিবক্ষবৃত্ত পবস্পব যেখানে ছেদ কবিযাছে সূর্য একদিন সেই বিন্দুতে উদিত হইবে। সেদিন ক্রান্তিবৃত্তেব তল এবং নিবক্ষবৃত্তের তল এক হইযা যাইবে। সেদিন যতক্ষণ সূর্য ক্ষিতিজ তলেব উপবে থাকিবে ততক্ষণ নিচে থাকিবে। কাজেই সেদিন, দিন, বাত্রি সমান হইবে। তাহাব পব ক্রমে সবিযা স্য একদিন এমন স্থানে আসিবে যেখানে সূর্য কেবলমাত্র ক্ষিতিজ তলেব নিচেই থাকিবে। অতএব তখন সেখান হইতে যত বেশী অক্ষাংশে যাওযা যাইবে ততই সেখানে কেবল দিন পাওযা যাইবে। তাহাব পব ফিবিযা সূর্য পুনবায পূর্বোক্ত স্থানে আসিবে যেখানে দিন বাত্রি সমান। তাহাব পব ক্রমে আবও এমন স্থানে যাইবে যেখান হইতে কেবলমাত্র বাত্রি আবন্ত হইবে।

চিত্র দেখিলে মনে হইবে সূর্যেব দৈনিক পথ এক একটি আলাদা বৃত্ত, কিন্তু তাহা নহে। প্রত্যহ অল্প অল্প সবিযা সূর্যেব পথ কুণ্ডলিত (Spiral) আকাবেব হয।

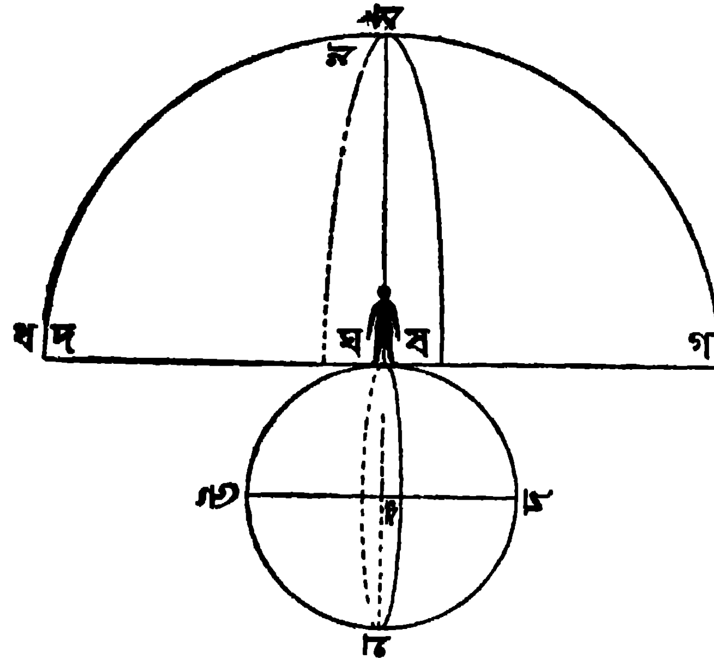
উত্তর মেরুর আকাশ ঃ—১৬ নং চিত্রে দেখ এখানে **ধ খ** বিন্দু এক হইয়া যায় অর্থাৎ নিবক্ষবৃত্ত এবং ক্ষিতিজ তল বা দিগ্বলয় এক হইয়া যায। অতএব সূর্য ক্রমাগত ছয়মাস ক্ষিতিজ তলেব উপবে থাকিবে এবং ক্রমাগত ছয়মাস ক্ষিতিজ তলেব নিচে থাকিবে। অতএব এখানে ছয়মাস ক্রমাগত দিন এবং

ছয়মাস ক্রমাগত বাত্রি। এখানে ধ্রুবতাবাকে ঠিক মাথাব উপর দেখা যাইবে



১৬ নং চিত্র—উত্তব মেরুব আকাশ

নিরক্ষ প্রদেশের আকাশঃ—এখানে দিগন্ত ধ্রুবতাবাব উপব দিযা



১৭ নং চিত্র—নিরক্ষ প্রদেশেব আকাশ

গিযাছে বলিযা মনে হয। তাই নিবক্ষ প্রদেশে ধ্রুবতাবা চক্রবালেব ঠিক উত্তব

বিন্দুতে থাকে। সূর্য প্রত্যহই যতক্ষণ চক্রবালেব উপব থাকে ততক্ষণ ইহাব নিচে থাকে। কাজেই এই প্রদেশে বাবোমাস দিনবাত্রি সমান।

সংক্ষেপ ঃ—আমাদেব মাথাব উপবে যে অসীম নীল গুম্বজ চাবিদিকে ভূমি স্পর্শ কবিযাছে বলিযা মনে হয় তাহাকে আমরা আকাশ বলি এবং ইহাতে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকমালা দেখা যায তাহাদিগকে সাধাবণত জ্যোতিষ্ক বলি। জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে যেগুলি উজ্জ্বলতর এবং স্থিব তাহাবা গ্রহ এবং যেগুলি মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া মনে হয় সেগুলি নক্ষত্র। গ্রহগুলি দূরবীণে বড় দেখায কিন্তু নক্ষত্রগুলি খালি চোখে যেমন দেখায দুববীক্ষণ সাহায্যে তেমনই দেখায়। গ্রহ বা নক্ষত্র ক্ষুদ্র দেখাইলেও ইহাদের এক একটিব আয়তন এমন বড় আছে যে তাহারা পৃথিবী অপেক্ষা বহু লক্ষ গুণ বড়। অত্যধিক দূবে থাকে বলিয়া এত ক্ষুদ্র দেখায। পৃথিবীব নিকটতম জ্যোতিষ্ক প্রক্সিমো সেণ্টবিব আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৪½ বৎসব লাগে। অথচ আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল যায়। এমন জ্যোতিষ্ক আছে যাহাব আলো পৃথিবীব জন্মেব পব হইতে এখনও পৃথিবীতে আসিযা পৌছিতে পাবে নাই। সূর্য একটি বিরাট জ্যোতিষ্ক। মহাকর্ষেব বলে ইহা কতকগুলি গ্রহকে টানিযা আপনাব চারিদিকে ঘুরাইতেছে। আবার গ্রহগুলি আপনাপন উপগ্রহগুলিকে আপনাব চারিদিকে ঘুরাইতেছে। আকাশে নীহাবিকা, ছায়াপথ, উল্কা, ধূমকতু প্রভৃতি দেখা যায। সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া একটি সৌব জগৎ। ব্রহ্মাণ্ডে এরূপ কত সৌব জগৎ আছে বলা যায না। খালি চোখে মাত্র ছয় সাত হাজাব জ্যোতিষ্ক দেখা যায। দূববীক্ষণ সাহায্যে তদপেক্ষা অধিক জ্যোতিষ্ক দেখা যায, কিন্তু আবও যে কত অদৃশ্য জ্যোতিষ্ক আছে তাহাব সংখ্যা নাই।

পৃথিবী ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র কবিযা ঘবিতেছে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে আমবা দেখি নক্ষত্রগুলি ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেকেণ্ডে একবাব ধ্রুব নক্ষত্রেব চাবিদিকে ঘুবে। ইহাদেব গতি পূর্ব হইতে পশ্চিমে। সূযেব পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকেব আহ্নিক গতি ছাড়াও নক্ষত্রেব অনুপাতে ইহাব একটি বিপরীত গতি আছে—তাহা প্রত্যহ ১° ডিগ্রী। এই পশ্চাদ্গতির জন্য বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে নক্ষত্রগণের অবস্থান একরূপ থাকে না। অথচ জ্যোতিষ্কগুলিব পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান একই থাকে। তাই একটি নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জ চিনিযা স্থির কবিতে পারিলে তাহার অনুপাতে আকাশেব কোন্ অংশে কোন্ গ্রহ বা নক্ষত্র থাকিবে চিনিযা লইতে পাবা যায। সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ দুইটি নক্ষত্র যোগ করিযা সেই বেখা বর্ধিত করিলে ধ্রুবনক্ষত্র স্পর্শ কবে। সপ্তর্ষিব অনুপাতে লঘু সপ্তর্ষি, স্বা, প্রশ্বা, কালপুরুষ

প্রভৃতি মণ্ডল চিনিয়া লওয়া যায়। নক্ষত্র মণ্ডল গুলির অন্তর্গত এক একটি নক্ষত্রেরও আবার নাম বিভিন্ন। অনেক সময় নক্ষত্র মণ্ডলকেও কেবলমাত্র নক্ষত্র বলা হয়। সূর্য সারা বৎসরে যে যে স্থানে খাড়া ভাবে কিরণ দেয় সেই স্থানগুলি যোগ করিয়া যে বৃত্ত কল্পনা করা হয় তাহাকে বার ভাগ করিয়া এক একটি ভাগকে রাশি বলা হয়। বারটি রাশি আবার ২৭টি নক্ষত্রের সমান। সুতরাং এক রাশি সমান ২$\frac{১}{৪}$ নক্ষত্র। সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে থাকে এবং বৈশাখ মাসের মধ্যে সে অশ্বিনী, ভরণী নক্ষত্র পার হইয়া কৃত্তিকার $\frac{১}{৪}$ অংশ অতিক্রম করে। আকাশের মানচিত্র সাহায্যে কখন কোথায় কোন নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থির করিতে পারা যায়। চিত্রে কোন স্থানের আকাশ আঁকিতে হইলে সে স্থানের অক্ষাংশ জানা দরকার।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। নিম্নলিখিতগুলি বলিতে কি বুঝ লিখ:—আকাশ, জ্যোতিষ্ক, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, রাশি। (What do you understand by—The sky, heavenly bodies, planets, stars, milky way and zodiac ?)

২। নক্ষত্রের আকার, দূরত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে কি জান লিখ। সৌর জগৎ কাহাকে বলে ? (Write what you know about the shape, size and distance from the sun of the stars. What is a solar system ?)

৩। চিত্র সাহায্যে ধ্রুবতারা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থান দেখাইয়া দাও। (Show the positions of the Pole star and the Great Bear with the help of a diagram.)

৪। নিম্নলিখিত নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলগুলির অবস্থান আকাশের কোথায় এবং তাহাদের আকৃতি কিরূপ তাহা চিত্র সাহায্যে দেখাইয়া দাও:—কালপুরুষ, ক্যাসিওপিয়া ও লঘুসপ্তর্ষি। (Show by a diagram the position and appearance of the following stars or constellations in the sky.—Orion, Cassiopoea and Little Bear.)

৫। রাশিচক্র আঁকিয়া কোন্ রাশিতে সূর্য কোন্ মাসে অবস্থান করে এবং কোন্ কোন্ নক্ষত্র ও কোন্ নক্ষত্রের কত অংশ লইয়া এক একটি রাশি হয় তাহা বুঝাইয়া দাও। (Draw the zodiacal circle and show the position of the sun in different months with their corresponding stars.)

৬। বৎসরের সকল সময়ে আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্র দেখা যায় না কেন তাহার কারণ বিস্তৃত ভাবে লিখ। (Explain in detail why a certain star is not found in a certain fixed place in the sky throughout the year)

৭। নক্ষত্রের অনুপাতে প্রতিদিন সূর্যের ১° ডিগ্রী পশ্চাদ্গতি বলিতে কি বুঝ লিখ। (What do you understad by the retrograde motion of the earth with respect to the stars at the rate of 1° per day ?)

৮। কলিকাতার (২২ ৫° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ) আকাশ আঁকিয়া দেখাও। Draw the diagram of the sky of Calcutta (Lat. 22 5° N)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহ চিনিবার জন্য পঞ্জিকা

পূর্ব পরিচ্ছেদে রাশিগুলি চিনিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রহগুলি কিরূপে চিনিতে পারা যায় দেখা যাউক। পঞ্জিকায় প্রত্যেক দিনের গ্রহগুলির অবস্থান নিম্নোক্তরূপে দেওয়া থাকে। মনে করা যাক সন ১৩৪৭ সালের ১১ই পৌষ তারিখে গ্রহগুলির অবস্থান পঞ্জিকায় নিম্নলিখিতরূপে দেওয়া আছে।

মং ৬।২৯।৮।২৩

বু ৮।৩।৫২।১৮

বৃ ০।১৩।৪।৫৪

শু ৭।১৪।৯।১৯

শ ০।১৪।২৪।৪৪

ইহাতে বুঝিতে হইবে যে প্রথম সংখ্যাটি দ্বারা গ্রহগুলি মেষরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি যে রাশি পার হইয়াছে তাহার ক্রমিক নম্বর, এবং বাকি পর পর তিনটি সংখ্যা, গ্রহটি উক্ত রাশির যথাক্রমে কত ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ড পথ অতিক্রম করিয়াছে তাহা নির্দেশ করে।

উপরে মঙ্গলের পাশে ৬ প্রথম সংখ্যা। ইহাতে বুঝিতে হইবে মঙ্গলগ্রহ মেষ রাশি হইতে ৬টি রাশি পার হইয়া তুলা রাশিতে অবস্থান করিতেছে। ক্রান্তিবৃত্ত, ইহার কেন্দ্রে মোট ৩৬০ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থিত। ১২ মাসে সূর্য এই পথ অতিক্রম করে—কাজেই এক মাসে সূর্য ৩৬০ – ১২ = ৩০ ডিগ্রী পথ অতিক্রম করে। অতএব এক এক রাশি ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্রে ৩০° ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করিয়া অবস্থিত। মঙ্গল গ্রহের পাশে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে ঐ পর্যন্ত মঙ্গল গ্রহের মোট

৩০° পথেব মাত্র ২৯ ডিগ্রী ৮ মিনিট ও ২৩ সেকেণ্ড পথ মঙ্গল গ্রহ কর্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছে। একটি পবিচিত বাশি পূর্ব পবিচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে বাহিব কবিযা সহজেই মঙ্গল গ্রহকে খুঁজিযা বাহিব কবা যাইতে পাবে। এইরূপে অন্যান্য গ্রহগুলিকেও খুঁজিযা বাহিব কবা যায।

কিন্তু কোন একদিন সূর্য যে বাশিতে থাকে সেদিন সে রাশিতে যে গ্রহ থাকে তাহাকে দেখিতে পাওযা যায না, সূর্যেব ঔজ্জ্বল্য ইহাকে ঢাকিযা ফেলে। উক্ত তাবিখে ঐ গ্রহকে বাত্রে আকাশে দেখা যাইবে না। কাবণ ঐ দিন সূর্য ঐ বাশিতে অবস্থান কবে। এই গ্রহকে আকাশে খুঁজিযা বাহিব কবিতে হইলে কিছুদিন অপেক্ষা কবিতে হইবে। যখন সূর্য এবং উক্ত গ্রহেব অবস্থান বিভিন্ন বাশিতে হইবে তখনই গ্রহটিকে দেখা যাইবে। কোন একদিন কোন নক্ষত্র দেখিতে হইলে সেদিন সূর্যাস্তকালে সূর্যেব নিকট যে বাশি থাকে তাহাব পববর্তী যে কযেকটি বাশি আকাশে দেখা যাইবে তাহাব মধ্যে ইহা থাকিলে তবেই দেখা যাইবে।

জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত কবিবাব সময় আমবা জাতকেব লগ্ন নিরূপণ কবিবাব সময়ে দেখি যে জাতকেব জন্ম সময়ে কোন্ বাশি পৃথিবীব সহিত পূর্বাকাশে লগ্ন থাকে, অর্থাৎ উদিত হয। ঐ সময়ে যে বাশি উদিত হয তাহাই জাতকেব লগ্ন। জন্ম সময়েব চন্দ্র যে বাশিতে থাকে তাহাই জাতকেব বাশি এবং ঐ সময়ে চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকে তাহাই জাতকেব নক্ষত্র। অতএব দেখা যাইতেছে হিন্দুদিগেব কোষ্ঠিবিচাবে চন্দ্রেব সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতব। পর্ব বা ধর্মানুষ্ঠানে মুসলমানগণ যে গণনা কবেন তাহাব সম্বন্ধও চন্দ্রেব সহিত অধিক।

সংক্ষেপ ঃ—পঞ্জিকায় গ্রহগুলিব এবং চন্দ্রেব পার্শ্বে লিখিত সংখ্যাগুলি হইতে উহাদেব অবস্থান নির্দেশ কবা যায়। প্রথম সংখ্যায বাশিটি মেষবাশি হইতে এতগুলি বাশি পার হইযা পববর্তী বাশিতে অবস্থান করিতেছে বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক রাশি ক্রান্তি বৃত্তেব কেন্দ্রে ৩৬০ – ১২ = ৩০ ডিগ্রী কোণ করিয়া অবস্থিত। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায় ঐ

৩০ ডিগ্রী পথের কত ডিগ্রী, মিনিট এবং সেকেণ্ড পথ উক্ত রাশি কর্তৃক অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহাই বুঝায়। ইহা হইতে আকাশে কখন কোন গ্রহ কোথায় থাকিতে পারে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। সূর্যের কাছে কোন গ্রহ থাকিলে তাহাকে সূর্যের উজ্জ্বলতার জন্য দেখা যায় না।

জন্ম সময়ে যে রাশি পূর্বাকাশে পৃথিবীর সহিত লগ্ন থাকে তাহাই জাতকের লগ্ন, ঐ সময় চন্দ্র যে রাশিতে থাকে তাহাই জাতকের রাশি এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকে তাহাই জাতকের নক্ষত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। কোন একদিন পঞ্জিকাতে গ্রহ গণের অবস্থান নিম্নলিখিতরূপ দেখা গেল। ইহাতে কি বুঝা যাইবে:—র ১০।৪।১৩।৪১ চং ১।১২।৩২।৪৪ মঃ ০।৬।০২৭ বু ১০।১৮।২০।৩৫ বৃ ১১।১৬।৩৩।১৬ শু ১১। ১৩।৩৫।৪৫ শ ০।২।৩৫।৫২। (On a certain day the positions of the planets written in the Panjika are —Sun 10-4-13-41, M 1-12-32-44, Moon 0-6-0-27, Mercury 10-18-20-35, J 11-16-33-16, V 11-13-35-45, Saturn 0-2-35-5. What is understood by this ?)

২। গ্রহগণকে আকাশে খুঁজিয়া বাহির করিবার সহজ উপায় কি? (What is the easiest method of finding out the planets in the sky ?)

৩। একদিন সূর্যাস্তকালে দেখা গেল শনি গ্রহ পূর্বাকাশে পৃথিবীর সহিত লগ্ন আছে। সেদিন শনিগ্রহ আকাশে দেখা যাইবে কি না বল—এবং কারণ লিখ। (On a day at the time of sun set the Saturn was just on the horizon. Say whether the Saturn will be visible in the sky in the night or not. State reason)

৪। জাতকের লগ্ন, রাশি ও নক্ষত্র কিরূপে নির্ণয় করা হয় লিখ। (Write in making a horoscope how the Lagna, Rashi and the Star are determined ?)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য

সূর্য এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেব অফুবন্ত তাপেব প্রধান উৎস। সূর্য হইতে অজস্র তাপ মহাশূন্যের চাবিদিকে বিকিবিত হইতেছে। পৃথিবীতে তাহাব অতি অল্পাংশ মাত্রই পৌঁছায। সূর্য ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য যাহা কিছু হইতে আমবা তাপ পাই, তাহাও সূর্যতাপেবই রূপান্তব মাত্র। সূর্যেব তাপ ব্যতীত মনুষ্য, জীবজন্তু ও গাছপালাব জীবন ধাবণ অসম্ভব হইত, শস্য-শ্যামল উর্বব ক্ষেত্রগুলি উষব মরুভূমিতে পবিণত হইত। উপর্যুপবি কয়েকদিন সূর্যতাপ না পাইলে সকলেই যেন শক্তিহীন ও ম্রিয়মান হইযা পড়ে। সূর্য-তাপেই বাযু বহে, জোযাব-ভাঁটা ও বন্যা হয, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা ও শিশিবেব উৎপত্তি হয এবং নদী ও জলপ্রপাত প্রভৃতিব সৃষ্টি হয। অতি আদিমকাল হইতেই মানুষ প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ ভাবে তাহাদেব কল্যাণ-সাধনে সূর্য শক্তিব নানাভাবে বিকাশেব জন্য সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কবিযা আসিতেছে।

এই সূর্যেব আযতন, উষ্ণতা এবং পৃথিবী হইতে ইহাব ব্যবধান সম্বন্ধে কখনও চিন্তা কবিয়াছ কি? ইহাব সমস্ত বিষযগুলি অবগত হইলে তোমবা চমৎকৃত হইবে এবং বিশ্বনিযন্তাব অসীম সৃষ্টি কৌশল সম্বন্ধে যে আভাষ পাইবে তাহাতে তাঁহাব কাছে স্বতই মাথা অবনত কবিতে ইচ্ছা হইবে।

জ্যোতির্বিদগণ স্থিব কবিযাছেন সূর্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূবে অবস্থিত। আলো এক সেকেণ্ডে একশত ছিযাশি হাজাব মাইল যায়, সূর্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে ৮ মিনিট লাগে। এত দূব হইতে আসিতেছে তথাপি তাহাব উত্তাপ কত প্রখব তাহা তোমবা জান। চৈত্র বৈশাখ মাসে দুপুব বেলায় খোলা মাঠে কয়েক মিনিটের জন্য বাহিব হইলে সর্বশবীর যেন পুড়িযা যায়।

থার্মমিটার সাহায্যে দুপুবেব বোদেব উষ্ণতা মাপা যায়। পৃথিবীতে

এইরূপ উষ্ণতা হইলে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরস্থ সূর্য পৃষ্ঠেব যে উষ্ণতা তাহা বৈজ্ঞানিকগণ হিসাব করিয়া স্থিব কবিয়াছেন ৬০০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ইহাব অভ্যন্তবেব উষ্ণতা সাত কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। উনানে কযলা যখন জ্বলে তখন তাহাব উষ্ণতা প্রায ১২০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। গলিত লৌহেব উষ্ণতা ১৬০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেব অধিক নহে। অতএব ভাবিযা দেখ সূর্য পৃষ্ঠেব যে উষ্ণতা তাহা কিরূপ ভয়ঙ্কব এবং ইহাব আভ্যন্তবীণ উষ্ণতাব তো কথাই নাই। এই উত্তাপে পার্থিব কোন পদার্থই নিজ অবস্থায থাকিতে পাবে না। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সর্বাধিক কঠিন পদার্থগুলিও ইহাপেক্ষা বহু অল্প উষ্ণতায বাষ্পাকাবধাবণ কবে। সেই হিসাবে পণ্ডিতগণ স্থিব কবিযাছেন সূর্যে সকল পদার্থই বাষ্পাকাবে বর্তমান। এবং সমস্ত সূর্যটি একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড। কঠিন পদার্থে সৃষ্ট নয বলিযা ইহাব পৃষ্ঠ সমতল বা একই রূপ উঁচু নিচু থাকিতে পাবে না।

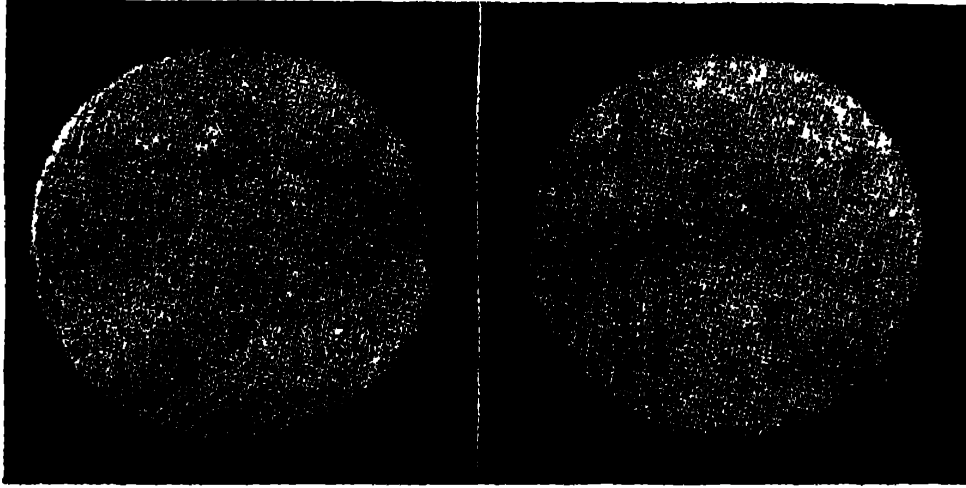
পৃথিবীব ব্যাস প্রায আট হাজাব মাইল, কিন্তু সূর্যেব ব্যাস প্রায ৮৬৬৫০০ আট লক্ষ ছযষট্টি হাজাব পাঁচ শত মাইল-অর্থাৎ পৃথিবীব ব্যাসেব ১১০ গুণ বড। সেই হিসাবে সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা তেব লক্ষ গুণ বড।

বাষ্প গঠিত বলিযা সূর্য পৃথিবী হইতে তেব লক্ষ গুণ বড হইলেও তেব লক্ষ গুণ ভাবী নহে। মোটামুটি ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ৩৩৩০০০ গুণ ভাবী। বৈজ্ঞানিকগণেব হিসাবে পৃথিবীব ওজন প্রায ১৮×১০^{২৩} মন। তাহা হইলে সূযেব ওজন $১.৮ \times ১০^{২৩} \times ৩৩৩০০০ = ৫৯৯৪০০ \times ১০^{২৩}$ — প্রায ৬×১০^{২৮} মন। আয়তন এবং ওজন হিসাব কবিযা দেখিলে বুঝা যায় সূর্যেব ঘনত্ব পৃথিবীব ঘনত্বেব চাবি ভাগেব এক ভাগ।

খালি চোখে সূর্যেব দিকে তাকান যায না। দূববীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে নিবীক্ষণ কবিলে ইহাব তিনটি মণ্ডলের সন্ধান পাওযা যায। প্রথমটি আলোক মণ্ডল, দ্বিতীয় বর্ণমণ্ডল এবং তৃতীয়টি ছটামণ্ডল।

আলোক মণ্ডল—সাধাবণত সূর্যেব সর্বাপেক্ষা বহিবাবরণটিই আমাদেব

চোখে পড়ে। ইহাই **আলোক মণ্ডল** (Photosphere)। দূরবীক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় মাঝখান অপেক্ষা সূর্যের ধারের উজ্জ্বলতা অনেক কম। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ইহাতে কাল কাল অনেকগুলি **সৌর কলঙ্ক** (Sun-spot) দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি এবং আয়তন নানা রকমের। এক একটি কলঙ্ক



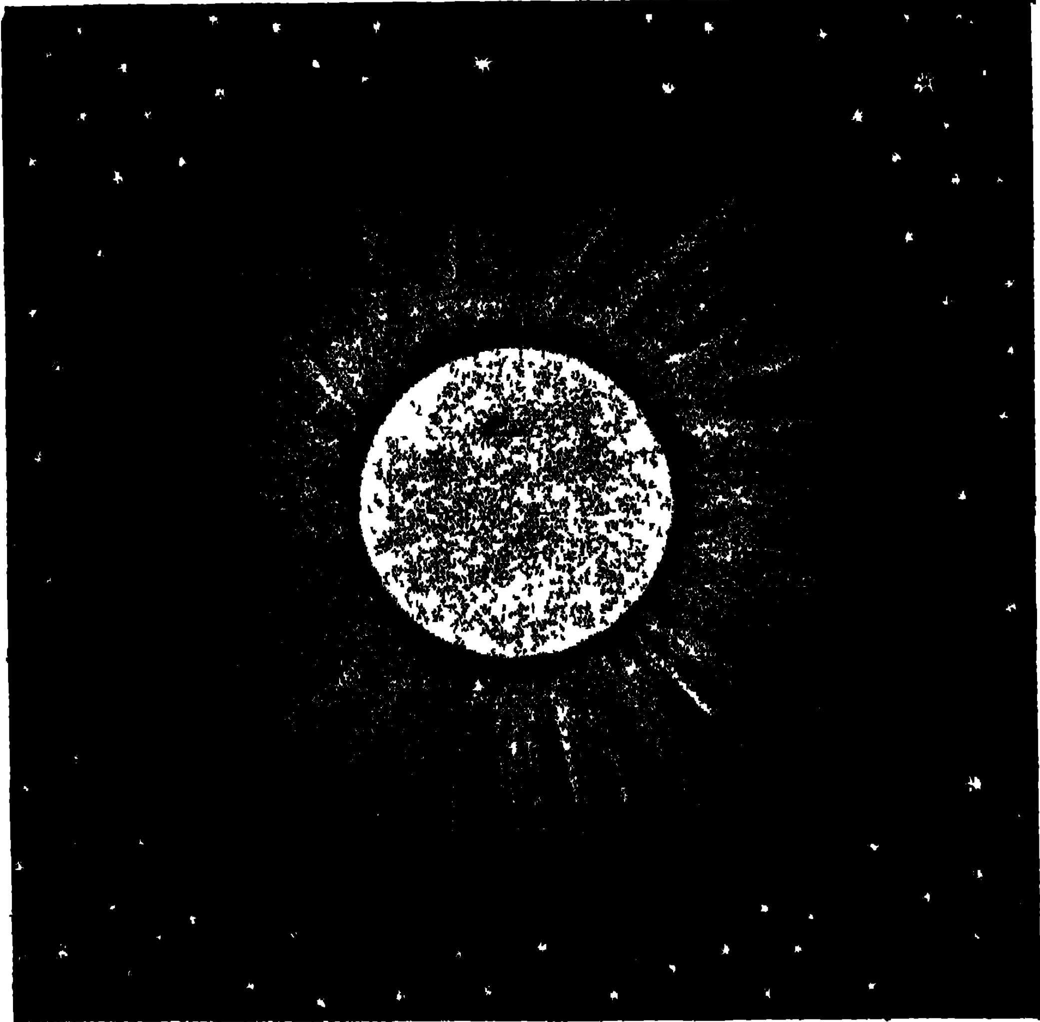
১৮ নং চিত্র—সৌর কলঙ্ক

আয়তনে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণ বড়। ইহাদের মধ্যভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু চারিধার অপেক্ষাকৃত কম কাল। একটি নির্দিষ্ট বৎসর হইতে এগার বৎসর অন্তর কলঙ্কগুলির সংখ্যা এক বৎসরের জন্য বাড়িয়া যায়। ১৯০৬, ১৯১৭ এবং ১৯২৮ সালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন অত্যধিক চাপে সূর্যগর্ভস্থ উষ্ণ বাষ্পরাশি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জোরে বাহির হইয়া আসিলে যে গর্ত হয় তাহার চারিপাশে ঐ সকল বাষ্প রাশি ছড়াইয়া পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত শীতল হয়, কাজেই ইহাদের জ্যোতিও কমিয়া যায়। সেইজন্য সৌরকলঙ্কের মধ্যভাগ অপেক্ষা প্রান্তভাগ কম কাল দেখায়।

কাল কাচের ভিতর দিয়া অনেক সময় বড় বড় সৌর-কলঙ্কগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকদিন উপর্যুপরি ঐ কলঙ্কগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়

যেন ইহাবা পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে সবিয়া যায় এবং সাতাশ দিন অন্তর ইহাদের পূর্বেব অবস্থান ফিবিযা আসে। তাহা হইলে আমবা ইহা অনুমান কবিতে পাবি পৃথিবীর ন্যায় সূর্যও ইহাব অক্ষের চারিদিকে ঘুবে। সৌব-কলঙ্ক গুলি ইহাব পৃষ্ঠেব উপব থাকিয়া ২৭ দিনে একবাব আবর্তন কবে বলিযা মনে হয—কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীও খানিকটা ঘুবিযা যায। তাহা হইলে সূর্যেব নিজেব অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে যে সময় লাগে তাহা ঐ সৌব-কলঙ্কগুলির



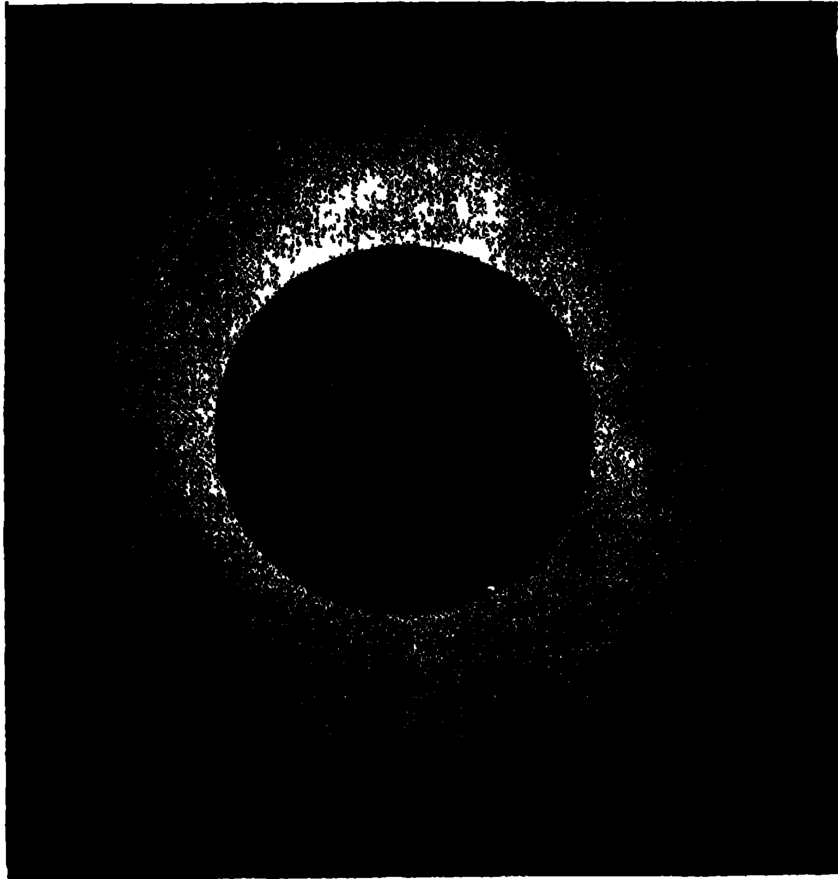
১৯ নং চিত্র—সৌর প্রক্ষেপ

আবর্তনেব সময়াপেক্ষা কম। বস্তুত বৈজ্ঞানিকগণ স্থিব কবিয়াছেন সৌব

কলঙ্কগুলি যদিও ২৭ দিনে একবার আবর্তন করিতেছে বলিয়া মনে হয় বটে সূর্য কিন্তু ইহার অক্ষের চারিপাশে মাত্র ২৫½ দিনে একবার আবর্তন করে।

বর্ণমণ্ডল ঃ—সূর্যের আলোক মণ্ডলের ভিতরে চারিদিকে যে বাষ্পময় উজ্জ্বল আবরণ দেখা যায় তাহাই সূর্যের **বর্ণমণ্ডল** (Chromosphere)। ইহা নানা প্রকার ধাতু-বাষ্পের সমষ্টি এবং ইহার জন্য সূর্যের আলো বা তাপ আমরা কম পাই। এই আবরণ না থাকিলে আরও অধিক তাপ এবং আলো সূর্য হইতে আসিত।

পূর্বে বলা হইয়াছে বাষ্পময় পিণ্ড বলিয়া সূর্যের পৃষ্ঠ সমতল নয়। সূর্যের আভ্যন্তরীণ উত্তাপের জন্য ইহার গর্ভ হইতে বাষ্পরাশি বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ইহার



২০ নং চিত্র—ছটা মণ্ডল

পৃষ্ঠদেশ আলোড়িত করিতেছে। ফলে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি

এবং এই পবিচলন স্রোতের জন্য বর্ণমণ্ডল হইতে সর্বদা জ্বলন্ত বাষ্প ঊর্ধ্ব দিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে বিবাট অগ্নিশিখাব সৃষ্টি কবে তাহাই **সৌর-প্রক্ষেপ** (Corona)। পূর্ণ-গ্রাস সূর্য-গ্রহণের সময সূর্যেব আবৃত অংশের চাবিদিকে ইহাদিগকে মুকুট-শীর্ষেব ন্যায় দেখা যায বলিয়া অনল শিখা গুলিকে **ছটামুকুট** এবং সমস্ত মণ্ডলটিকে **ছটামণ্ডল** বলা হয, বস্তুত সৌব-প্রক্ষেপ ছটামুকুট বা চটামণ্ডল এক। সূর্যেব বাহিবে লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া ছটামুকুটেব বিস্তৃতি দেখা যায। সূর্যগ্রহণ না হইলে বর্ণমণ্ডল বা ছটা মণ্ডল কিছুই দেখা যায না—সূর্যেব তীব্র জ্যোতিব জন্য ইহাবা অদৃশ্য হইয়া যায। বর্ণমণ্ডল বক্তাভ কিন্তু ছটামণ্ডল শাদা।

সংক্ষেপ ঃ—সূর্য একটি জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড—পৃথিবী হইতে নযকোটি ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার পৃষ্ঠের উষ্ণতা ছয হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং গর্ভেব উষ্ণতা সাতকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সূযেব ব্যাস প্রায আটলক্ষ ছযষট্টি হাজাব পাঁচশত মাইল—পৃথিবীর ব্যাসেব একশত দশগুণ বড। সেই হিসাবে সূর্যেব আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা তেব লক্ষগুণ বড়। কিন্তু ইহা পৃথিবা অপেক্ষা মাত্র তিনলক্ষ তেত্রিশ হাজাব গুন বেশী ভারী। অর্থাৎ সূযেব ঘনত্ব পৃথিবীব ঘনত্বের চারিভাগের এক ভাগ। সূর্যেব ওজন প্রাব ৬×১০^{২৮} মন। পৃথিবীর ন্যায় ইহাও নিজ অক্ষের চারি দিকে ঘুরিতেছে এবং একবার ঘুরিতে ২৫$\frac{১}{২}$ দিন লাগে। ইহাকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল এবং ছটামণ্ডল নামক তিনটি মণ্ডল আছে। বর্ণ-মণ্ডলের চাবিদিকে অগ্নি শিখাব ন্যায় সৌর প্রক্ষেপ দেখা যায। সূর্যেব গাযে যে কাল দাগ দেখা যায, তাহাদিগকে সৌর কলঙ্ক বলা হয়। ইহাদেব আযতন বিভিন্ন রকমেব।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। সূর্যের বিস্তৃত বর্ণনা দাও। সূর্য না থাকিলে পৃথিবীতে জীব থাকা সম্ভব হইত কি? উত্তরের কারণ দাও। (Give a full description of the sun. Would life be possible on the earth without the sun? Give reasons for your answer.)

[কঃ বিঃ ১৯৪১]

২। অনুক্ত পদ পূরণ কর:—সূর্য পৃথিবী হইতে—— মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস———মাইল, ওজন———মন। ইহার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ——গুন এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের———গুন। (Fill up the gaps:—The sun is at a distance of——miles from the earth Its diameter is——miles, weight——maunds. Its density is——times that of the earth and volume——times that of the earth)

৩। সূর্যের মণ্ডল তিনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give brief descriptions of the three spheres of the sun)

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:—সৌর কলঙ্ক, বর্ণমণ্ডল, ছটামুকুট। (Give short-description of:—Sun spots, Chromosphere, Corona)



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রহ জগৎ

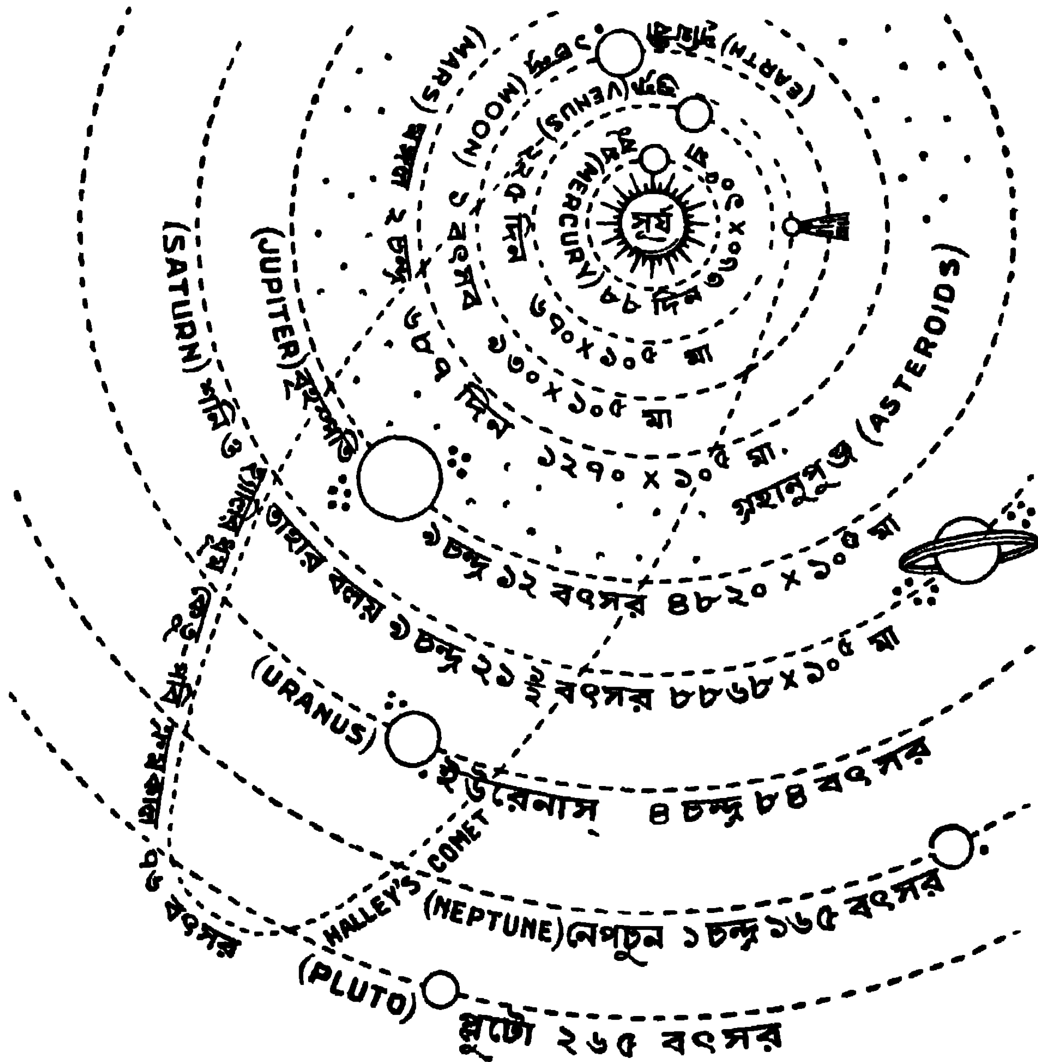
একটি স্থতাব এক প্রান্তে একটি, এবং তাহার পব আবও দু তিনটি ঢিল বাঁধিয়া উহাব অপব প্রান্ত ধবিযা ঘুবাইলে দেখা যাইবে, যে হাতে স্থতা ধবা আছে সেই হাতকে কেন্দ্র কবিযা ঢিলগুলি বৃত্তাকাব পথে ঘুবিতে থাকিবে। যে ঢিলটি হাত হইতে দূবে থাকিবে তাহাব ভ্রমণ পথও বড হইবে এবং হাতের জোব সমস্ত ঢিল গুলিব গতি নিযন্ত্রিত কবিবে। এই রূপ সূর্যকে কেন্দ্র কবিযা গ্রহগুলি ইহাব চতুর্দিকে ঘুবিতেছে, অবশ্য গ্রহগুলিব সহিত কোন সূত্র, দড়ি বা চেন বাঁধা নাই যাহা ধবিয়া সূর্য গ্রহগুলিকে আপনাব চাবিদিকে ঘুবাইতেছে।



২১নং চিত্র—একটি বালক একসঙ্গে কতকগুলি ঢিল ঘুরাইতেছে

তাহাব পবিবর্তে আছে মাত্র গ্রহগুলির এবং সূর্যেব পবস্পব আকর্ষণ। এই আকর্ষণই গ্রহগণকে আপনাপন পথে অবস্থিত রাখিযা প্রায় বৃত্তাকাব পথে

সূর্যেব চাবিদিকে ঘুবাইতেছে। তফাৎ এই যে হাত হইতে ঢিলগুলি যত দূরে থাকিবে ঢিলগুলিব গতিও তত বেশী হইবে কিন্তু সূর্য হইতে গ্রহগুলি যত দূরে থাকে ততই তাহাদেব গতি মন্থব হইয়া থাকে। একে গতি মন্থব, তাহাব উপর পথ অধিক, কাজেই সূর্যেব চাবিদিকে পবিভ্রমণ কবিতে দূরস্থ গ্রহগণের সময অধিক লাগে। বুধ গ্রহ সূর্যেব সর্বাপেক্ষা নিকটে, কাজেই ইহাব পবিভ্রমণ পথ সর্বাপেক্ষা ছোট অথচ গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত, সে জন্য ভ্রমণ কাল সর্বাপেক্ষা কম। আমাদেব জানা শোনা গ্রহেব মধ্যে প্লুটোই সূর্য হইতে সর্বাধিক দূবে,



২২ নং চিত্র—সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব ও তাহাদের প্রদক্ষিণ কাল

তাই ইহাব গতি বেগ সকল গ্রহের গতিবেগ অপেক্ষা কম এবং ইহার প্রতি

সূর্যের আকর্ষণ অন্যান্য গ্রহগণের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা কম। সূর্যের চারিদিকে একবার পরিভ্রমণ করিতে ইহার সর্বাধিক সময় লাগিয়া থাকে। সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব এবং তাহাদের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় চিত্রে দেখান হইল।

আজ পর্যন্ত আমরা নয়টি প্রকৃত গ্রহের সন্ধান পাইয়াছি, **বুধ** (Mercury), **শুক্র** (Venus), **পৃথিবী** (Earth), **মঙ্গল** (Mars), **বৃহস্পতি** (Jupiter), **শনি** (Saturn), **ইউরেনাস** (Uranus), **নেপচুন** (Neptune) ও **প্লুটো** (Pluto)। নিচে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিচয় দেওয়া হইল।

বুধ :—সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটতম গ্রহ, সূর্য হইতে তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে ইহার তিন মাস লাগিয়া থাকে। বুধ গ্রহ বিশেষ উজ্জ্বল নয়। সূর্যের খুব নিকটবর্তী বলিয়া সূর্য উঠিবার অল্প আগে ইহাকে উঠিতে দেখা যায় এবং সূর্যাস্তের পরে ইহা অস্ত যায়। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহাকে অধিক সময় দেখা যায় না। সন্ধ্যা তারা বা ঊষাতারা রূপে ইহাকে বৎসরে মাত্র আটবার দেখা যায়। পণ্ডিতগণ গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ইহার উপরিভাগে পৃথিবীর ন্যায় বায়ুমণ্ডল নাই।

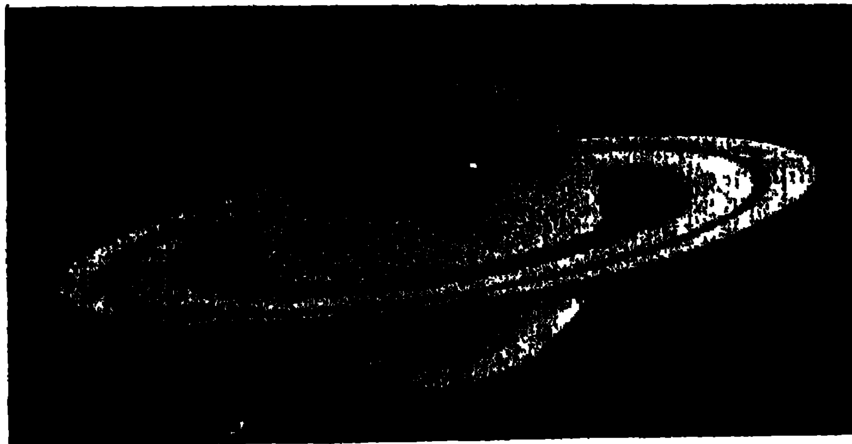
শুক্র :—সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে বুধের পর শুক্র। ইহা সূর্য হইতে ছয় কোটি সত্তর লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে ইহার ২২৫ দিন লাগে। ইহা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহ, আয়তনে বুধ অপেক্ষা বড—প্রায় পৃথিবীর মত। ইহাকেও সন্ধ্যার সময় এবং ভোরের বেলা আকাশে দেখা যায়। ইহাকে সকল সময় মেঘে ঢাকা বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবী :—শুক্রের পর পৃথিবী। পৃথিবী সম্বন্ধে তোমরা অনেক কথাই জান। ইহার একদিকে শুক্রগ্রহ অন্যদিকে মঙ্গলগ্রহ। মঙ্গলই পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। ইহা শুক্র অপেক্ষা ঈষৎ বৃহত্তর।

মঙ্গল—সূর্য হইতে চৌদ্দকোটি একলক্ষ মাইল দূরে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৬৮৭ দিন লাগিয়া থাকে। ইহাকে দেখিতে ঈষৎ লাল বর্ণের। ইহা পৃথিবী হইতে নিকটতম বলিয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর কেহ কেহ এখান হইতে উজ্জ্বল আলো মঙ্গল গ্রহে পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অবশ্য তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। মঙ্গল গ্রহ কিন্তু আকারে পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। পৃথিবীর ন্যায় ইহা নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

বৃহস্পতিঃ—সূর্য হইতে আটচল্লিশ কোটি দুই লক্ষ মাইল দূরে এবং বার বৎসরে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। ইহা গ্রহগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড, আকারে পৃথিবী হইতে প্রায় ১২০০ বার শত গুণ বড। ইহা আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

শনিঃ—ইহার আকার একটু বিচিত্র ধরণের। গোল পিণ্ডকে ঘিরিয়া



২৩নং চিত্র—শনিগ্রহ

একটি বলয় আছে, পিণ্ড এবং বলয় লইয়া শনি গ্রহ। ইহা সূর্য হইতে

চুয়াল্লিশ কোটি চারি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ত্রিশ বৎসর লাগে। ইহা নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

ইউরেনাস :—১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হার্শেল সাহেব এই গ্রহ আবিষ্কার করেন; ইহা সূর্য হইতে একশত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৮৪ বৎসর ২৮ দিন লাগে। ইহা নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে।

নেপচুন :—সূর্য হইতে ইউরেনাসের দূরত্ব হিসাব করিবার জন্য যে আলোচনা হয় তাহার ফলে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ইহা সূর্য হইতে দুইশত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ১৬৬ বৎসর লাগে।

প্লুটো :—১৯২৪ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কর্তৃক প্লুটো গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ইহা সূর্য হইতে চারিশত আঠার কোটি মাইল দূরে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ২৪৬ বৎসর ২১৩ দিন লাগে। সূর্য হইতে ইহাই সর্বাপেক্ষা দূরতম গ্রহ।

আকার হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া যত সূর্য হইতে দূরে যাওয়া যায় বৃহস্পতি পর্যন্ত ততই গ্রহগণের আকার বড় হইতে থাকে। মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা ছোট কিন্তু বৃহস্পতি আবার সর্বাপেক্ষা বড় গ্রহ। বৃহস্পতির পর আবার গ্রহগণের আকার কমিতে থাকে। প্লুটোর আকার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব এবং সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে যে সময় লাগে, ২২ নং চিত্র সাহায্যে তাহা বুঝান হইয়াছে। সূর্য হইতে গ্রহ-গণের দূরত্ব হিসাব করিবার যে গবেষণা হয় তাহার ফলে কেপলার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা নিচে দেওয়া হইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে **কেপলার** (Kepler) নামক ডেনমার্কবাসী জ্যোতির্বিদ স্থির করেন, কোন একটি গ্রহের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালের বর্গকে অপর একটি গ্রহের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কালের বর্গ দিয়া ভাগ করিলে

যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সূর্য হইতে পূর্বোক্ত গ্রহটির দূরত্বের ঘনকে সূর্য হইতে অপর গ্রহটির দূরত্বের ঘন দিয়া ভাগ করিলেও সেই সংখ্যা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ অনুপাত দুইটি সমান। এই নিয়মে হিসাব করিলে দেখা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে আরও একটি গ্রহ থাকা উচিত। কেপলারের প্রায় দুই শত বৎসর পরে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ একত্র গ্রথিত দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা প্রায় বার শত হইলেও সকল গুলির সমবেত আয়তন, যে কোন একটি ক্ষুদ্রতম গ্রহের আয়তন অপেক্ষা কম নয়। ইহাই হইল কেপলারের পূর্ব কথিত গ্রহ।



২৪নং চিত্র—গ্রহগণের আপেক্ষিক আকার

কেপলারের পর **বোড** (Bode) আর একটি সূত্র বাহির করিলেন। ০,৩ এবং ইহার পর ক্রমশ দুই গুণ করিয়া কয়েকটি সংখ্যা ধরা হইল। তাহা হইলে আমরা পাইলাম ০, ৩, ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২ ইত্যাদি। প্রত্যেক সংখ্যায় ৪ যোগ দিলে ৪, ৭, ১০, ১৬, ২৮, ৫২, ১০০, ১৯৬ হয়। বুধ হইতে গ্রহগণের দূরত্ব এই অনুপাতে হিসাব করা হয়। এই হিসাবে বুধের সংখ্যা ৪, শুক্রের ৭, পৃথিবীর ১০ ইত্যাদি। কোন গ্রহের সংখ্যাকে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া তাহাকে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব দিয়া গুণ করিলেই সূর্য হইতে সেই

গ্রহের দূরত্ব পাওয়া যাইবে। মনে করা যাউক সূর্য হইতে শনি গ্রহের দূরত্ব বাহির করিতে হইবে। বোডের তালিকা অনুযায়ী শনির সংখ্যা হইল ১০০। ১০০কে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইলকে সেই ভাগফল দিয়া গুণ করিলে সূর্য হইতে শনির দূরত্ব পাওয়া যায়।

কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিল ইউরেনাসের বেলায়। সূর্য হইতে উক্ত হিসাবে প্লুটোর যত দূরে থাকা উচিত ঠিক তত দূরে থাকে না। কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নেপচুনগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। তাহার আকর্ষণেই সূর্য হইতে ইউরেনাসের হিসাব মত দূরত্বের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগণ ঘুরিতেছে, আবার গ্রহগণের চারিদিকে তাহাদের নিজ নিজ উপগ্রহ ঘুরিতেছে। চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। ইহা ২৯ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরে। কোন কোন গ্রহের একের অধিক উপগ্রহ আছে। যে গ্রহের আকার যত বড়, সাধারণত সেই গ্রহের উপগ্রহের সংখ্যা তত বেশী। বৃহস্পতির নয়টি এবং বলয় ছাড়া শনিরও নয়টি এবং ইউরেনাসের চারিটি উপগ্রহ আছে।

সংক্ষেপ ঃ—সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগণ উহার চারিদিকে ঘুরিতেছে—আবার গ্রহগণের চারিদিকে উপগ্রহ ঘুরিতেছে। আজ পর্যন্ত নয়টি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে বুধ সূর্যের নিকটতম এবং প্লুটো দূরতম গ্রহ। দূরের গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে দীর্ঘতর সময় লয়। সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব লইয়া কেপলার যে সূত্র বাহির করেন তাহার সাহায্যে অজ্ঞাত গ্রহগণের অবস্থান বা দূরত্ব হিসাব করিয়া বাহির করা যায়।

চতুর্থ প্রশ্নমালা

১। পদপূরণ কর :—সূর্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব যত .... হইবে, গ্রহগণের গতি তত .. হইবে, সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিবার সময়ও তত . .. . . হইবে।

(Fill up the gaps :—The . the distance of the planets from the sun, the··· · will be their velocity and the . will be the time of its complete revolution round the sun.)

২। সর্বাপেক্ষা বড় এবং ছোট গ্রহ দুইটির নাম কর ও তাহাদেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Give a brief account of the greatest and the smallest planets.)

৩। সূর্য হইতে কোন্ গ্রহের কত দূরত্ব এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে কাহাব কত সময় লাগে তাহাদের একটি ক্রমিক তালিকা প্রস্তুত কর। (Tabulate the distances of the planets from the sun and the period o their complete revolution, in order)

৪। গ্রহানুপুঞ্জ এবং নেপচুন গ্রহ কিরূপে আবিষ্কৃত হইল এবং তাহার মূলে কি কি সূত্র আছে লিখ। অথবা বোড এবং কেপলার সাহেবের সূত্র কি বুঝাইয়া দাও। (Write, how the Asteroids and the Neptune were discovered and state the theory relating to their discovery. Or, Explain the theories of Bode and Kepler)

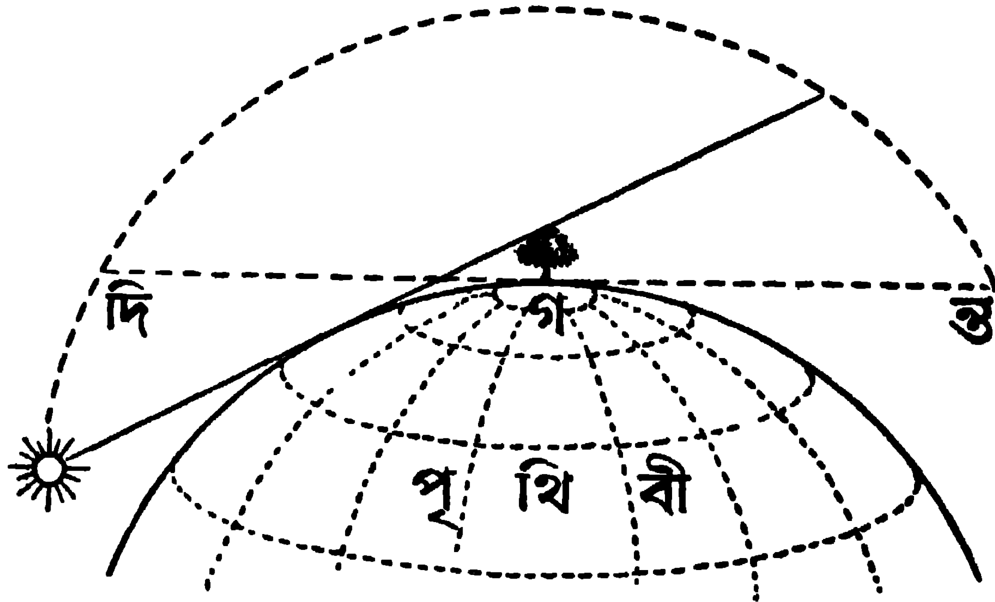
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সৌর বৎসর ও ঋতু

আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর একদিন বা ২৪ ঘণ্টা লাগে। পৃথিবীর এই আবর্তনের জন্য ইহার উপর দিন রাত্রি সৃষ্টি হয়। আমরা আপাত দৃষ্টিতে দেখি সকালে সূর্য পূর্ব দিগন্ত হইতে উঠিয়া ক্রমে দুপুরে মধ্য আকাশে উঠিয়া সন্ধ্যায় আবার পশ্চিম দিগন্তে নামিয়া যায়। যতক্ষণ সূর্য দিগন্তের উপর থাকে ততক্ষণ আমরা রোদ পাই, এই সময় দিন। কিন্তু দিগন্তের নিচে নামিয়া গেলে আমরা রোদ পাই না। ক্রমে সূর্য যত দিগন্তের নিচে নামিয়া যায় বলিয়া মনে হয় ততই অন্ধকার পৃথিবীর একদিক জুড়িয়া বসে। এই ব্যাপারটি তোমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু তোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছ ভোরের সময় সূর্য দিগন্তের উপর উঠিবার কিছু আগেই বেশ ফর্সা হইয়া যায়, কোন অদৃশ্য দেশের আলো আসিয়া অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেয়। তখন ঐ আলো যে সূর্যের তাহা মোটেই মনে হয় না। ক্রমে গাছ পালার মাথার উপর রোদের ঝিকিমিকি দেখা যায়। পরে এই রোদ ছড়াইয়া পড়ে। তেমনই সূর্য অস্ত যাইবার পর রোদ ক্রমে ভূমি হইতে গাছপালার মাথায় দেখা যায় পরে একেবারে অদৃশ্য হয়, অথচ তখনও পৃথিবীতে আলো দেখা যায়। সকালে রোদ উঠিবার পূর্বে সূর্যের এই স্তিমিত আলো যতক্ষণ পাই তাহাকে **উষা** এবং সন্ধ্যার ঠিক পূর্বের ঐরূপ সময়কে **গোধূলি** (Twilight) বলে। বস্তুত উষা বা গোধূলি একই কারণে হইয়া থাকে।

চিত্র দেখিলে বেশ বুঝা যায় গাছটির মাথায় সূর্যের রশ্মি পড়িলেও উহার পাদদেশে মোটেই সূর্যের রশ্মি পৌছায় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন দিগন্ত হইতে ১৮° নিচে নামিয়া যাইতে যে সময় লাগে সেই সময় টুকুতে

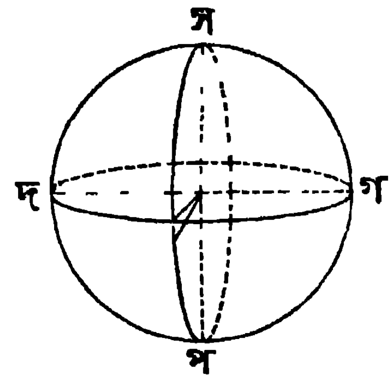
সূর্যের রশ্মি না পাইলেও আমরা আলোক পাই, অন্ধকার থাকে না—কাজেই



২৫ নং চিত্র—গোধূলির সময় সূর্যের অবস্থান

এই সময় গোধূলি। কিন্তু দিগন্তের নিচে ১৮° নামিতে সূর্যের সকল দেশে একই সময় লাগে না। কাজেই বিভিন্ন দেশে গোধূলির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন।

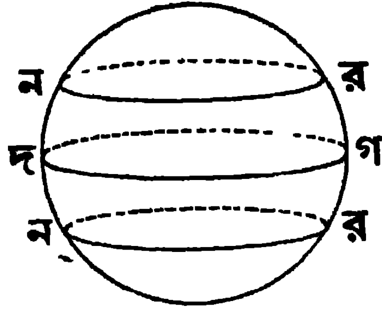
নিরক্ষ প্রদেশে গোধূলির দৈর্ঘ্য ঃ—নিরক্ষ প্রদেশে সূর্যের পথ **স প** দিগন্ত রেখা **দ গ** এর সহিত সমকোণী ভাবে থাকে। কাজেই চক্রবাল বা দিগন্ত হইতে এই খাড়াপথ ধরিয়া ১৮° ডিগ্রী যাইতে সূর্যের যে সময় লাগে তাহা সূর্যের অন্য সকল স্থানে এইরূপ চক্রবালের নিচে ১৮° পথ যাইবার সময় অপেক্ষা কম।



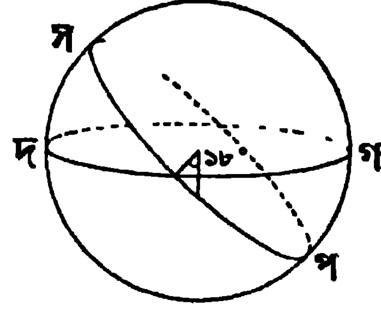
২৬নং চিত্র—নিরক্ষ প্রদেশে গোধূলির দৈর্ঘ্য

মেরুপ্রদেশে গোধূলি ঃ—তোমরা হয়ত ভূগোলে পড়িয়াছ মেরুপ্রদেশে ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি। সেখানে দিগন্ত রেখা **দ গ** ও নিরক্ষ বৃত্ত **ন র** সমান্তরাল হইয়া যায় এবং সূর্যের পথ উহাদের সহিত ২৩½° কোণ করিয়া অবস্থিত থাকে। কাজেই সূর্য সেখানে ছয় মাস চক্রবালের উপরে ২৩½° পর্যন্ত উচ্চে উঠে এবং ছয়মাস চক্রবালের নিচে ২৩½° পর্যন্ত নামিয়া যায়। কিন্তু সূর্যের চক্রবালের

১৮° নিচে যাওয়া পর্যন্ত সময় গোধূলি। অতএব যে ছয় মাসে সূর্য চক্রবালের নিচে ২৩½° পর্যন্ত থাকে তাহাব বেশীব ভাগ সময়ই নিচেব ১৮° ডিগ্রীব মধ্যে



২৭নং চিত্র—মেরু প্রদেশে গোধূলি



২৮নং চিত্র—নিবক্ষ প্রদেশ ও মেরু প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে গোধূলি

থাকে। কাজেই সেই সময় গোধূলি। অতএব মেরুদেশে যে ছযমাস বাত্রি বলিয়া আমবা ধবি তাহাব অধিকাংশ সময়ই গোধূলি। অতএব এত দীর্ঘ বাত্রি বলিযা আমাদেব প্রাণে যে এক অজ্ঞাত আতঙ্কেব সৃষ্টি হয প্রকৃত পক্ষে মেকপ্রদেশেব লোক ততটা আতঙ্ক অনুভব কবে না। নিবক্ষ প্রদেশ ও মেকপ্রদেশেব মধ্যবর্তী স্থানে কি হয দেখ। সূর্যেব পথ **স প** এবং দিগন্ত **দ গ** পবস্পব একটি কোণ কবিযা অবস্থিত। কাজেই সূর্য তির্যক পথ দিয়া দিগন্তে নামিযা যায। নিবক্ষ প্রদেশ হইতে যতই মেকব দিকে যাওয়া যাইবে এই তির্যকতা ততই বাডিতে থাকিবে। এই তির্যক পথে ১৮ ডিগ্রী নামিতে যে সময় লাগে খাডাপথে সেই ১৮° ডিগ্রী যাইতে তদপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। মেরু প্রদেশে এই তির্যকতা সর্বাপেক্ষা অধিক। অতএব এই সকল স্থানে গোধূলি, মেরুপ্রদেশেব গোধূলি অপেক্ষা কম অথচ নিবক্ষ প্রদেশের গোধূলি অপেক্ষা দীর্ঘ। তাহা হইলে দেখা গেল নিবক্ষ প্রদেশে গোধূলির স্থায়িত্ব সর্বাপেক্ষা কম, মেরু প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং মধ্যবর্তী দেশ সমূহে আনুপাতিক ভাবে কম বেশী।

সৌর ও সমক দিন ঃ—একবাব সূর্য আকাশেব সর্বোচ্চ স্থান হইতে পুনরায় আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবাব মধ্যবর্তী সময়কে **সৌর দিন**

(Solar day) বলা হয়। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির সহিত সূর্যের চারিদিকে ঘুরিবার জন্য ইহার বার্ষিক গতি থাকায় উপর্যুক্ত সময়টুকু সমান থাকে না, কখনও ২৪ ঘণ্টা হয় কখনও ২৪ ঘণ্টার কম আবার কখনও বা ২৪ ঘণ্টার বেশী হইয়া থাকে। বৎসরে এই সমস্ত দিনগুলির গড় ধরিয়া আমরা পুরা ২৪ ঘণ্টায় একদিন ধরিয়া লইয়াছি, ইহাকেই **সমক দিন** (Mean Solar day) বলে। বৎসরের মধ্যে ৮ই আশ্বিন ও ৮ই চৈত্র সৌর দিন ও সমক দিন সমান। ঐ দুই দিনের, রাত্রি ও দিনের স্থায়িত্ব সময় সমান।

সৌর ও লৌকিক বৎসর :—পূর্বে ধারণা ছিল ৩৬৫ দিনে পৃথিবী একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭½ সেকেণ্ড সময় লাগিয়া থাকে—এই সময়টুকুই **সৌর বৎসর** (Solar year) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ খণ্ড দিন সংখ্যা লইয়া বৎসর গণনা করিতে হইলে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ অখণ্ড সংখ্যক দিন লইয়া **লৌকিক বৎসর** (Civil year) গণনা করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে ৩৬৫ সমক দিনে এক লৌকিক বৎসর।

মল বৎসর :—খৃষ্ট পূর্ব ৪৬ অব্দে রোম সম্রাট জুলিয়াস সীজার স্থির করিলেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা লাগে। উপর্যুক্ত উপায়ে হিসাব করিলে দেখা যায় সৌর বৎসর এবং লৌকিক বৎসরে মোটামুটি প্রায় ৬ ঘণ্টা তফাৎ হইয়া যায়। তাহা হইলে প্রতি চারি বৎসরে একদিনের তফাৎ হইয়া যাইবে। সেইজন্য কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসর হইতে চতুর্থ বৎসরের দিন সংখ্যায় ১ দিন বেশী ধরিতে হয়। সেই বৎসর মোট দিন সংখ্যা ৩৬৬। এইরূপ বৎসরকে **মল বৎসর** (Leap year বা Bissextile year) বলা হয়। তাহা হইলে পর পর চারি বৎসরে দিন সংখ্যা ৩৬৫×৪+১=১৪৬১। রোম সম্রাটের নামানুসারে এইরূপ দিনপঞ্জির নাম **জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার** (Julian calendar)।

কিন্তু ইহাতেও কিছু ভুল থাকিয়া যায়। পূর্বে বলা হইয়াছে প্রায় ৩৬৫ দিঃ ৫ ঘঃ ৪৭ মিঃ ৪৭½ সেঃ এক সৌব বৎসব হয। তাহা হইলে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায এক বৎসব ধবিলে প্রতি বৎসবে ১১ মিনিট বেশী ধবা হয। ইহাতে প্রতি ৪০০ বৎসবে ৩ দিন বেশী ধবা হয। এই ভুল সংশোধন কবিবাব জন্য প্রতি চাবিশত বৎসবে পূর্বোক্ত নিয়মে গণিত দিন সংখ্যা হইতে ৩ বাদ দেওয়া হয়। তাহা হইলে ইংরাজী গণনায দেখা যায—যে সনকে ৪ দিয়া নিঃশেষে ভাগ কবা যাইতে পাবে তাহাবাই মল বৎসব, কিন্তু যে সনগুলি শতাব্দী অর্থাৎ যে সনেব শেষে দুইটি শূন্য থাকে তাহাবা ৪০০ দিযা বিভাজ্য হইলে তবে মল বৎসব হইবে নতুবা নয। সেইরূপ হিসাব কবিলে দেখা যায ১৮৪০, ১৯৩৬, ১৯৩২, ১৬০০, ১২০০ প্রভৃতি সনগুলি মল বৎসব, কিন্তু ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯২২, ১৯১৭ ১৯০০, ১৩০০, ৯০০ প্রভৃতি সনগুলি মল বৎসব নয। মল বৎসবেব ফেব্রুযাবী মাসে একদিন বেশী ধবা হয। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে পোপ ত্রযোদশ গ্রীগবী (Pope Gregory XIII) এইরূপ পঞ্জিকা সংস্কাব কবেন বলিযা এইরূপ দিনপঞ্জীব নাম গ্রীগবীয ক্যালেণ্ডার (Gregorian calendar)।

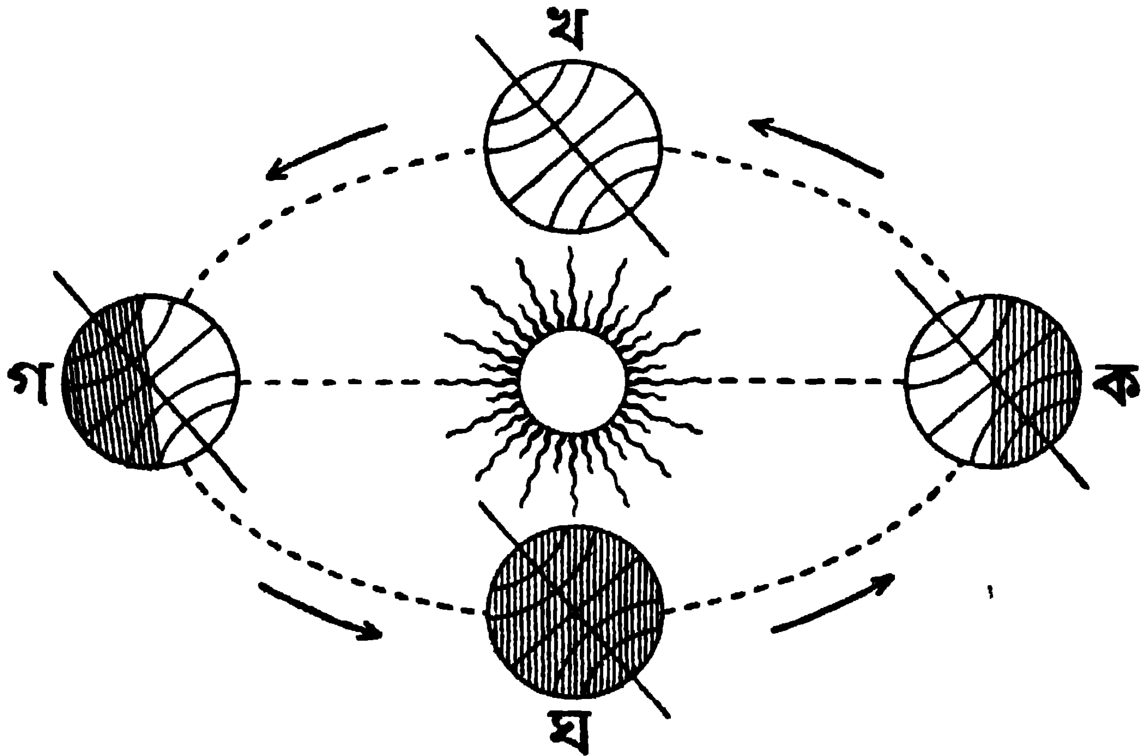
ভাবতীয হিসাবে প্রতি মাসেব দিন সংখ্যা ইংবাজী মাসেব দিন সংখ্যাব ন্যায স্থিব নহে। কাজেই ভাবতীয হিসাবে এরূপ ভাবে বৎসব গণনা হয না। এপ্রিল মাসেব ১৪ই হইতে ৩১শে ডিসেম্বব পর্যন্ত ইংবাজী সন হইতে ৫৯৩ বিযোগ কবিলে এবং ১লা জানুয়াবী হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত ইংবাজী সন হইতে ৫৯৪ বিযোগ কবিলে বঙ্গাব্দ পাওযা যায।

ভাবতীয হিসাবে সূর্য এক এক বাশিতে যতদিন অবস্থান কবে নির্দিষ্ট মাসগুলি ঠিক তত দিনে হয়। সূর্য যখন এক বাশি ছাডিযা অপব বাশিতে প্রবেশ কবে তখনই **সংক্রান্তি**। কিন্তু প্রত্যেক বৎসবেব নির্দিষ্ট মাসগুলিব দিন সংখ্যা সমান থাকে না। কোন বৎসব বৈশাখ মাস ৩১ দিনে হয় আবাব কোন বৎসবেব বৈশাখ মাস ৩০ দিনেও হয।

মনে বাখিও সাধাবণ বৎসরেব প্রথম দিন যে বার শেষ দিনও সেই বাব এবং

মল বৎসরেব প্রথম দিন যে বাব, শেষেব দিন তাহাব পববর্তী বাব হইবে। ইহাব কাবণ অবশ্য তোমবা নিজেবাই স্থিব কবিতে পাব।

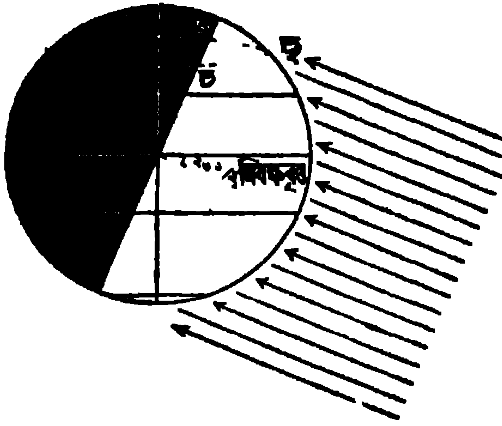
ঋতু পরিবর্তন—পৃথিবী সূর্যেব চাবিদিকে ঘুবিলেও আমরা লক্ষ্য কবিযা থাকি ধ্রুব নক্ষত্রেব তুলনায ইহাব অবস্থান অপরিবর্তনীয়। ইহা হইতে আমবা ধবিযা লইতে পাবি পৃথিবীব মেরুদণ্ডেব (Axis) অবস্থান একই প্রকাব। সূর্যেব চাবিদিকে পৃথিবী যখনই যেখানে থাকুক না কেন মেরুদণ্ডের অবস্থান সকল সময়েই পবস্পব সমান্তবাল। কিন্তু পৃথিবীর পবিভ্রমণ কবিবাব পথ যে তলে অবস্থিত কল্পনা কবা হয় তাহাব সহিত পৃথিবীব বিষুববেখা যে তলে অবস্থিত সেই তলটি ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিঃ কোণ কবিযা অবস্থিত। পৃথিবীব মেরুদণ্ড, বিষুববেখাব তলেব উপব লম্বভাবে অবস্থিত। তাহা হইলে পৃথিবীব মেরুদণ্ড সূর্যেব পবিভ্রমণ পথেব



২৯নং চিত্র—ঋতু পরিবর্তন

তলের সহিত ৬৬ ডিগ্রী ৩২ মিঃ কোণ কবিয়া অবস্থিত। পৃথিবীব মেরুদণ্ড সূর্যেব পবিভ্রমণ পথের তলেব সহিত তির্যক ভাবে আছে বলিযাই ঋতু পবিবর্তন হয।

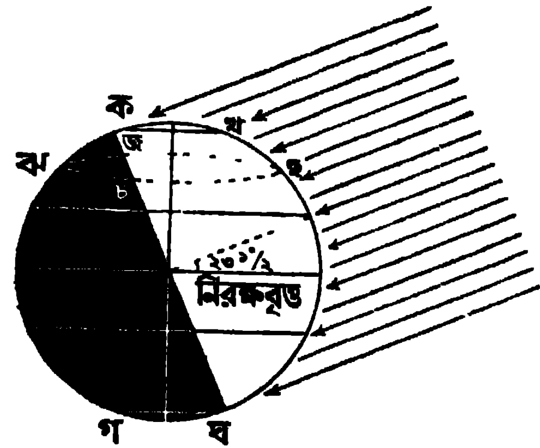
২৯ নং চিত্রে সূর্য, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ পথ এবং বৎসরের চারিটি নির্দিষ্ট দিনের পৃথিবীর অবস্থান দেখান হইল। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বৃত্ত দুইটি, ক্রান্তি বৃত্ত দুইটি ও নিরক্ষ বৃত্ত ইহাতে প্রদর্শিত হইল। **ক খ গ** ও **ঘ** এই চারিটি অবস্থান।



৩০নং চিত্র—সূর্যের মকর ক্রান্তিতে অবস্থান

২১শে ডিসেম্বর (**গ** অবস্থান) পৃথিবীর উত্তর মেরু হেলিয়া সূর্য হইতে সর্বাধিক দূরে থাকে। ফলে উত্তর মেরু, পৃথিবীর কেন্দ্র ও সূর্যের কেন্দ্র যোগ করিলে যে কোণ পাওয়া যায় সেই কোণটি ঐদিন বৃহত্তম অর্থাৎ ৯০° + ২৩° ২৮′ = ১১৩° ২৮′ হয়। ঐদিন সূর্য মকর ক্রান্তিতে (Tropic of capricorn) খাড়াভাবে কিরণ দেয়। ৩০ নং চিত্রে ব্যাপারটি বিশদ ভাবে বুঝিবে। **চ ছ জ** বৃত্তটির অধিকাংশ অন্ধকারময় আছে, অল্পই সূর্য কর্তৃক আলোকিত হইয়াছে। এইদিন সর্বাপেক্ষা দিন ছোট হয়। ঐদিন উত্তর মেরুর ছয়মাস দীর্ঘ রাত্রির মধ্য রাত্রি এবং দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস দিনের মধ্য দিন।

২১শে জুন (২৯ নং চিত্র ক) ঠিক বিপরীত অবস্থা ঘটে। উত্তর মেরু সূর্যের দিকে হেলিয়া থাকে এবং এই অবস্থায় পূর্বোক্ত কোণ ৯০° − ২৩° ২৮′ = ৬৬° ৩২′। এই দিন সূর্য কর্কট ক্রান্তির (Tropic of cancer) উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। এই সময় উত্তর মেরুতে ছয় মাস ব্যাপী



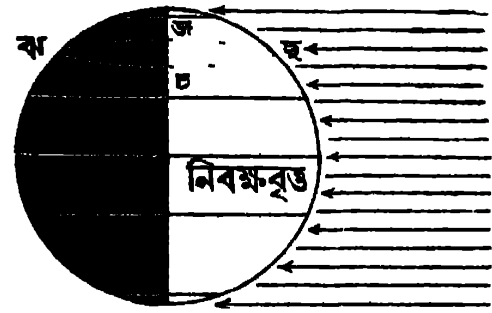
৩১নং চিত্র—সূর্যের কর্কট ক্রান্তিতে অবস্থান

দিনের মধ্যদিন এবং দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস রাত্রির মধ্যরাত্রি। ৩১ নং

চিত্রে দেখ **চ ছ জ ঝ** বৃত্তের অধিকাংশ আলোকিত হইয়াছে। এইদিন, দিন সবচেয়ে বড।

১০ই চৈত্র এবং ১০ই আশ্বিন পূর্বোক্ত কোণ সমকোণ হয়। আলো এবং অন্ধকারের সীমা এই দুই দিন দুই মেরু দিয়া যায় বলিয়া এই দুই দিন, দিন রাত্রি সমান (৩২ নং চিত্র)।

ধরিতে গেলে ঋতু প্রধানত চারিটি—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বর্ষা বলিয়া আমাদের সুবিধামত একটি ঋতু কল্পনা করিয়াছি এবং সেইরূপ হেমন্তও একটি ঋতু।

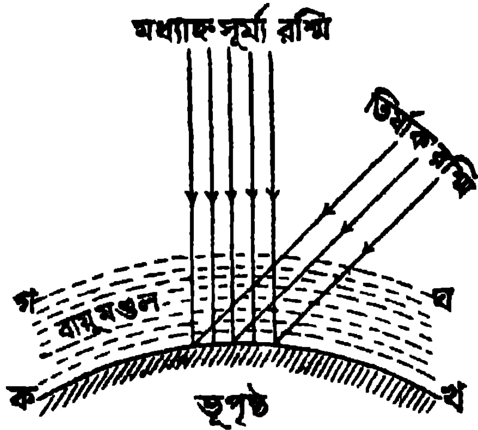


৩২নং চিত্র—সূর্যের নিরক্ষ বৃত্তে খাড়া কিরণ দান

তাহা হইলে দেখা গেল ২১শে ডিসেম্বর (১০ই পৌষ) সূর্য মকর ক্রান্তির উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয়। ঐদিন উত্তর গোলার্ধের সকল স্থানেই দিন বৃহত্তম এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম এবং দক্ষিণ গোলার্ধের দিন ক্ষুদ্রতম ও রাত্রি বৃহত্তম। আবার ২১শে জুন (১০ই আষাঢ়) ঠিক ইহার বিপরীত ব্যাপার ঘটে। ঐদিন সূর্য কর্কট ক্রান্তির উপর খাড়াভাবে কিরণ দেয় এবং ঐ দিন উত্তর গোলার্ধের সকল স্থানে দিন ক্ষুদ্রতম এবং রাত্রি দীর্ঘতম অথচ দক্ষিণ গোলার্ধের সকল স্থানে দিন দীর্ঘতম এবং রাত্রি ক্ষুদ্রতম।

তোমরা সকলেই জান, দুপুরে সূর্য যখন আমাদের মাথার উপরে উঠে তখন তাহার তেজ যেমন প্রখর, সকালে পূর্বাকাশে ইহা যখন উঠিতে থাকে, কিংবা বৈকালে পশ্চিমাকাশে যখন ঢলিয়া পড়ে, তখন তেমন প্রখর নয়। সূর্য যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ দিতেছে তাহা নহে, ইহা সকল সময়েই সমভাবে তাপ দেয়, কিন্তু পৃথিবী উহার যে অংশ পাইতেছে তাহা সকল সময় সমান নয়। ইহার কারণ দুপুরে সূর্যকিরণ লম্বভাবে কিংবা প্রায় লম্বভাবে

ভূপৃষ্ঠে পড়ে, কিন্তু সকালে ও বৈকালে ইহা তির্যকভাবে পড়ে। চিত্রে দেখ, **ক খ** ভূপৃষ্ঠেব অংশ বিশেষে লম্বভাবে আসিলে যে পবিমাণ সূর্য কিরণ পড়ে তির্যক্‌ভাবে আসিলে তদপেক্ষা কম পবিমাণ কিবণ পড়ে। সুতবাং শেষোক্ত ব্যাপাবে স্থানটি কম উত্তাপ পায়। তাহা ছাড়া সূর্যবশ্মিকে পৃথিবীতে আসিতে হইলে **কখঘগ** বায়ুমণ্ডল ভেদ কবিযা আসিতে হয়। এই বায়ুমণ্ডলেব জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ইত্যাদি কিঞ্চিৎ পবিমাণে সূর্যতাপ শোষণ কবিযা লয। চিত্র দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পাবিবে যে তির্যক ভাবে বশ্মি পড়িলে তাহাকে বাযুস্তব ভেদ কবিয়া আসিতে অধিকতব পথ অতিক্রম কবিতে হয, কাজে কাজেই ইহাতেও **সূর্যবশ্মিব** তেজ মন্দীভূত হয। এইজন্য আমবা সকাল ও বৈকাল অপেক্ষা **দুপুরে বেশী তাপ** পাই।



৩৩নং চিত্র—ভূপৃষ্ঠে সূর্যকিবণ সম্পাত

ঠিক এইপ্রকাব কাবণেই **শীতঋতুতে ও গ্রীষ্মকালে তাপের তারতম্য** হয। গ্রীষ্মকালে সূর্য ঠিক আমাদের মাথাব উপব দিয়া চলে, কিন্তু শীতকালে দক্ষিণ দিকে একটু হেলিযা আকাশপথে যায, এইজন্য শীতকালে সূর্যকিবণ তির্যক্‌ভাবে পৃথিবীতে পড়ে। ইহাব ফলে শীতকালে আমবা সূর্যতাপ কম পাই। ইহা ছাড়া গ্রীষ্মেব দিন শীতেব দিন অপেক্ষা বড হয়। আষাঢ মাসেব দিন প্রায় ১৩½ ঘণ্টা, কিন্তু পৌষ মাসেব দিন মাত্র ১০½ ঘণ্টা। দিনমান বেশী হওযায় গ্রীষ্মকালে মোট তাপ বেশী পাওযা যায়। এই একই কারণে নিবক্ষপ্রদেশ উষ্ণ, পক্ষান্তরে মেরুপ্রদেশ শীতল, কারণ সাবা বৎসবই সূর্যকিবণ প্রায় সোজাভাবে নিবক্ষপ্রদেশে পড়ে, কিন্তু মেরুপ্রদেশে বৎসরের সকল সময়েই তির্যক্‌ভাবে পড়িয়া থাকে।

উপবে বলা হইয়াছে যে, পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ অপেক্ষা মধ্যাহ্নে আমরা

বেশী তাপ পাই। কিন্তু তাই বলিয়া **পৃথিবী-পৃষ্ঠ ঠিক মধ্যাহ্নে সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত হয় না**। ইহার কারণ এই যে পৃথিবী সূর্য হইতে যেমন তাপ গ্রহণ করিতে থাকে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাপ বিকিরণও করে। পূর্বাহ্ণে যে পরিমাণ তাপ শোষণ করে, তাহার তুলনায় অতি অল্প তাপই বিকিরণ করে, এইহেতু উত্তাপ জমিয়া ক্রমেই ভূপৃষ্ঠকে গরম করে। বিকিরণের আর একটি নিয়ম এই যে, কোনও বস্তুর উষ্ণতা চতুপার্শ্বস্থ বস্তুর উষ্ণতা অপেক্ষা যতই অধিক হইবে, উহা হইতে বিকিরিত তাপের পরিমাণ ততই বেশী হইবে। অতএব বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠ যেমন ক্রমশ গরম হইতে থাকে, উহা ততই বেশী তাপ বিকিরণ করিতে থাকে। বেলা দেড়টা দুইটার সময় পৃথিবীর তাপ-শোষণ ও বিকিরণের হার সমান হয়। তখন তাপ আর জমিতে পারে না, যাহা কিছু জমিবার তাহা পূর্বেই জমিয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠের এই সময়ের উষ্ণতা সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহারপর বিকালের দিকে পৃথিবী যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে তদপেক্ষা অধিক তাপ বিকিরণ করায় তাহার তাপক্ষয় হইতে থাকে। রাত্রেও এই তাপ-বিকিরণ-কার্য চলিতে থাকে।

সূর্য্যরশ্মি পৃথিবীতে আসিবার সময় বিশুদ্ধ বায়ুকে প্রত্যক্ষভাবে মোটেই উত্তপ্ত করে না বলিলেও চলে। উহা বায়ুমণ্ডলস্থ জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড্, ধূলিকণা প্রভৃতিকে এবং শেষে পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়িয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে। এই উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ এবং উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া, বিশুদ্ধ বায়ু পরিচালনক্রিয়ার দ্বারা উত্তপ্ত হয় ও উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু উপরের বায়ু নির্মল, সেখানে জলীয় বাষ্প এবং ধূলিকণা নাই। তাই পরিচালনক্রিয়ার দ্বারা উর্ধ্বোত্থিত বায়ু ক্রমেই শীতল হইয়া যায়। এই কারণে **উর্ধ্বের বায়ু নিম্নের বায়ু অপেক্ষা শীতল**।

*ভূপৃষ্ঠে আসিতে*সূর্য রশ্মিকে যে পরিমাণ বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয়, পর্বত

শিখরে আসিতে তদপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ বায়ুরাশি ভেদ করিতে হয়। এই হিসাবে পর্বত শিখর ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা গরম হইবার কথা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যাহারা দার্জিলিং গিযাছ, তাহারা জান দার্জিলিং কলিকাতা হইতে গরম না হইয়া কত ঠাণ্ডা। ইহার কারণ কি? তীব্রতর সূর্যকিরণে পর্বত শিখর নিম্নভূমি অপেক্ষা বেশী তাপ পাইলেও চতুর্দিক হইতে শীতল বায়ুরাশি আসিযা ইহার তাপ প্রচুর পরিমাণে হরণ করিযা ইহাকে শীতল করে। অধিকন্তু, ভূপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প, ধূলিকণা ইত্যাদি যেমন ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণে বাধা দেয়, পর্বত শিখরের নির্মল বায়ু তাপ বিকিরণে সেরূপ বাধা মোটেই দেয না। এই দ্বিবিধ কারণে পর্বত শিখর অত্যন্ত শীতল।

ভূপৃষ্ঠ যখন সূর্যকিরণ দ্বারা উত্তপ্ত হয, নিচের বায়ু তাহার সংস্পর্শে আসিযা উত্তপ্ত হয এবং প্রসারিত হইযা লঘু হয। তখন পরিচলন ক্রিয়া আরম্ভ হয—গরম বায়ু উপরে উঠিযা যায এবং পার্শ্ববর্তী শীতল বায়ু ছুটিযা আসে। ফলে বায়ু রাশিতে বাতাসের সৃষ্টি হয।

সূর্যকিরণের তাপেই সমুদ্র, নদনদী ও তড়াগের জল বাষ্পে পরিণত হয। জলীয বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু বলিযা উপরে উঠিতে থাকে এবং উচ্চস্তরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিযা জমিযা মেঘের উৎপত্তি করে এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল আবার পর্বত গাত্র ও ভূপৃষ্ঠ বহিযা নদনদী পুষ্ট করে ও শেষে সমুদ্রে আসিয়া পতিত হয। বৎসরের যে সময সর্বাধিক বৃষ্টি হয সেই সময আমাদের বর্ষাকাল তাহা পূর্বেই বলা হইযাছে।

পৃথিবীর সকল স্থানে বৎসরের সকল সময সূর্য-একইরূপ কিরণ দেয না বলিযা ইহার পৃষ্ঠে শীতগ্রীষ্মের তারতম্য লক্ষিত হয। এই তারতম্যানুসারে পৃথিবী পৃষ্ঠকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয।

বিষুব রেখা হইতে ২৩½° উত্তরে মকর ক্রান্তিবৃত্ত এবং ২৩½° দক্ষিণে কর্কট-ক্রান্তি বৃত্ত। ইহার মধ্যবর্তীস্থানে সূর্য বারমাসই কোন না কোন অংশে খাড়াভাবে কিরণ দিযা থাকে। উক্ত বৃত্ত দুইটির মধ্যবর্তী যে কোন

স্থানে সূর্য খাড়া ভাবে কিরণ দেয় এবং অন্য স্থানগুলিতে তির্যকভাবে কিরণ পড়ে, কিন্তু তির্যকতা অধিক নহে। সেইজন্য এই অংশ পৃথিবীর অপরাংশ হইতে উষ্ণতর বলিয়া এই স্থানটুকুর নাম **উষ্ণমণ্ডল** (Torid zone)। সুমেরু এবং কুমেরু হইতে ২৩½° ডিগ্রী দূরে যথাক্রমে **সুমেরু বৃত্ত** ও **কুমেরু বৃত্ত**। সুমেরু বৃত্তের উত্তরদিকে এবং কুমেরু বৃত্তের দক্ষিণ দিকে সূর্যরশ্মির তির্যকতা সকল সময়ে অধিক বলিয়া ঐ স্থানগুলি সর্বাপেক্ষা শীতল। এই সকল স্থানে বারমাসই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। তাই ইহাদের নাম **হিমমণ্ডল** (Frizid zones)। ক্রান্তিবৃত্তদ্বয় হইতে মেরু বৃত্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান দুইটিতে সূর্যরশ্মির তির্যকতা মাঝামাঝি বলিয়া ঐ দুই স্থানে শীতের বা গ্রীষ্মের তীব্রতা নাই। সেই জন্য ঐ দুইটি স্থানের নাম **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল** (Temperate zones)।

৩৪ নং চিত্র—পৃথিবীর বিভাগ

পৃথিবীর মেরুদণ্ড হেলিয়া থাকার জন্যই পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্ম, দিন রাত্রির অল্পাধিক স্থায়িত্ব ইত্যাদি এত বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যদি পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্যের চারিদিকে ঘুরিবার জন্য পৃথিবীর পথের তলের সহিত সমকোণী ভাবে থাকিত তবে এ সকল বৈষম্য কিছুই ঘটিত না, পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রি সমান হইত এবং শীত গ্রীষ্মের অল্প তারতম্য হইলেও এত অধিক হইত না।

সংক্ষেপ :— পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া দিনরাত্রি সৃষ্টি করে। সূর্যের

চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে ইহার এক বৎসর লাগে। সৌর বৎসর ও লৌকিক বৎসর এক নহে। সৌরদিন বা সমক দিন তদ্রূপ এক নহে। মল বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস সাধারণ বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস অপেক্ষা এক দিন বেশী। যে সকল ইংরাজী সালকে ৪ দিয়া নিঃশেষে ভাগ করা যায় তাহারা মলবৎসর এবং যে সকল শতাব্দীকে ৪০০ দিয়া ভাগ করা যায় তাহারাও মল বৎসর। সাধারণ বৎসরের প্রথম দিন যে বার হয় শেষ দিনও সেই বার। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে যে পথে পরিভ্রমণ করে সেই পথের তলের সহিত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের তির্যকতার জন্য ঋতুপরিবর্তন হয়। মেরু-প্রদেশের দিকে কখনও দিন যেমন রাত্রি অপেক্ষা বড় হয় আবার কখনও তেমনই রাত্রি অপেক্ষা দিন বড় হয়। নিরক্ষ প্রদেশে দিন রাত্রি সমান। নিরক্ষ প্রদেশ উষ্ণতম, কারণ বৎসরের সকল সময়ই সূর্য ইহার কোন না কোন অংশে খাড়া ভাবে কিরণ দেয়। পক্ষান্তরে মেরুপ্রদেশগুলি শীতলতম, কারণ বারমাসই সেখানে সূর্যের কিরণ তির্যক ভাবে পড়ে। সন্ধ্যা বা সকল অপেক্ষা দুপুরে এবং শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি তীব্রতর হয়। ঠিক দুপুরে পৃথিবীপৃষ্ঠ অধিকতম উত্তপ্ত হয় না, একটু পরে হয়। ঊর্ধ্বের বায়ু সূর্যের নিকটতর হইলেও নিম্নের বায়ু অপেক্ষা শীতল। শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

পঞ্চম প্রশ্নমালা

১। গোধূলি বা ঊষা কেন হয়? কোন্ দেশে উহারা কতক্ষণ স্থায়ী হয় তাহার কারণ সবিস্তারে লিখ। অথবা মেরু প্রদেশ অপেক্ষা নিরক্ষ প্রদেশের গোধূলির দৈর্ঘ্য বেশী কেন?

(Why do the twilights happen? State the reason in detail how it lasts in different countries? or Why the twilights in Polar regions are longer than those in equatorial region?)

২। নিম্নলিখিতগুলি কি বুঝাইয়া দাও:

সৌর দিন, সৌর বৎসর, লৌকিক বৎসর ও মল বৎসর।

(Explain what are the following :—Solar day, Solar year, Civil year and leap year.)

৩। জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার এবং গ্রেগরীয় ক্যালেণ্ডারে প্রভেদ কি বুঝাইয়া দাও।

(Explain what is the difference between the Julian Calendar and the Gregorian Calendar?)

৪। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস বাংলার কত সাল ছিল এবং ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দের মে মাস বাংলার কত সাল হইবে?

(State the corresponding years of Bengali Calendar in March 1842 and May 1984)

৫। ঋতুপরিবর্তন কেন হয় চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

(Explain the change of seasons by a diagram.)

৬। দিন রাত্রি কোথায় কত পরিমাণ কমে বা বাড়ে এবং কেন কমে বা বাড়ে বুঝাইয়া লিখ।

(Explain with reasons of Variation in duration of days and nights in different countries)

৭। সকাল বা সন্ধ্যা অপেক্ষা দুপুরে এবং শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে সূর্য রশ্মি তীব্রতর বলিয়া বোধ হয় কেন? (Why the mid-day is hoter than the morning and the summer than the winter? (কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৪০)

৮। ঠিক দুপুরে কি পৃথিবীপৃষ্ঠ সর্বাধিক উত্তপ্ত হয়? কারণ কি?

(Is just mid-day the hotest part of the day? State reason)

৯। উর্দ্ধের বায়ু নিম্নের বায়ু অপেক্ষা শীতল কেন? উচ্চ বলিয়া দার্জ্জিলিং সূর্যের নিকট হইলেও কলিকাতা হইতে শীতল কেন?

(Why the upper atmosphere is colder than the lower? Darjeeling is at a higher altitute than Calcutta and nearer to the sun; why it is colder than Calcutta)

১০। শীতগ্রীষ্মের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীপৃষ্ঠ কয়ভাগে বিভক্ত তাহাদের নাম এবং অবস্থান চিত্র সাহায্যে দেখাইয়া দাও।

(Show by a diagram the different zones of the earth with their positions)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

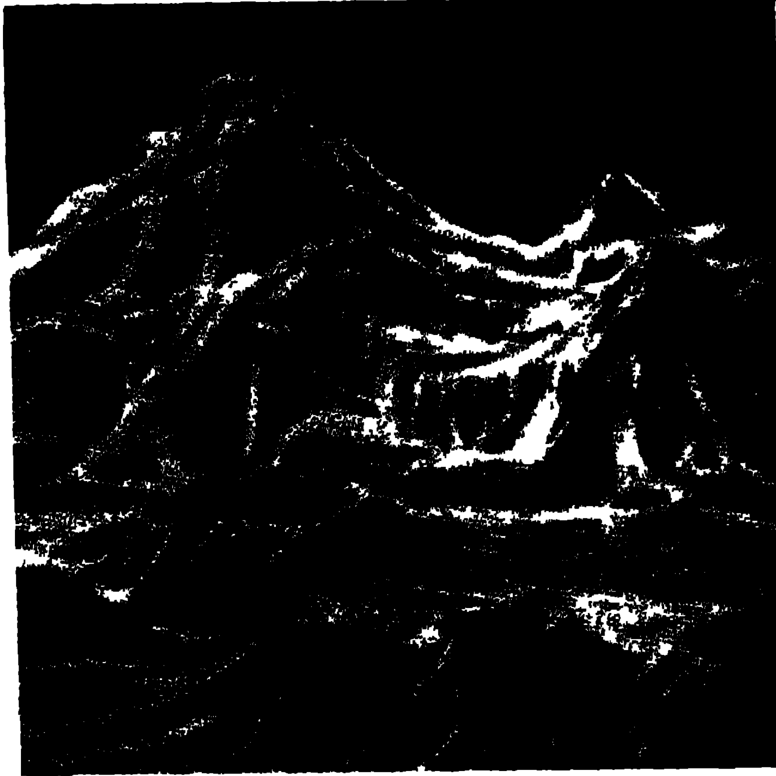
চন্দ্র, চন্দ্রকলা ও চান্দ্র বৎসর

চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ। খালি চোখে ইহাকে আয়তনে প্রায় সূর্যের মত দেখাইলেও ইহার আয়তন সূর্যের আয়তন অপেক্ষা অনেক ছোট। এমন কি ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ অংশের এক অংশ মাত্র। ইহার ব্যাস ২১৬০ মাইল অর্থাৎ প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের চারি অংশের একাংশ। নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক গণের মধ্যে ইহা আমাদের পৃথিবীর নিকটতম বলিয়া ইহাকে এত বড় দেখায়। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। চন্দ্রের ওজন পৃথিবীর ওজনের আশি ভাগের এক ভাগ মাত্র, জ্যোতির্বিদগণ বলেন ইহা পূর্বে পৃথিবীরই অংশ ছিল, কিন্তু জোরে ঘূর্ণনের ফলে পৃথক হইয়া গিয়াছে, যেমন অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে।

সূর্য যেমন কেন্দ্রে অবস্থিত থাকিয়া মহাকর্ষের নিয়মে গ্রহগণকে আপনার চারিদিকে ঘুরাইতেছে পৃথিবীও সেইরূপ চন্দ্রকে আপনার চারিদিকে ঘুরাইতেছে। চন্দ্র গোলাকার কঠিন বস্তু কিন্তু সূর্যের ন্যায় জ্বলন্ত নহে, শীতল। ইহার নিজের আলোক নাই, সূর্যের আলোক ইহার উপর পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইলে তবেই আমরা ইহাকে উজ্জ্বল দেখিতে পাই। খালি চোখে চন্দ্রকে দেখিলে ইহার মধ্যে অনেকগুলি কাল দাগ দেখা যায়—ইহাদিগকে চন্দ্রের **কলঙ্ক** বলে।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন চন্দ্রপৃষ্ঠ মসৃণ নহে—অত্যন্ত অসমান এবং ইহাতে বহু বড় বড় পাহাড় পর্বত এবং নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে। ঐ সকল পর্বতের ছায়া চন্দ্র পৃষ্ঠে পড়ে বলিয়া চন্দ্র পৃষ্ঠে এই কাল দাগ পড়িয়াছে। নির্বাপিত

আগ্নেয়গিরির মুখগুলি বড় বড় গহ্বরের ন্যায় দেখায়। ঐ সকল মুখ হইতে নিস্রাব নির্গত হইয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ ভস্মস্তূপে আচ্ছাদিত হইয়া আছে। চন্দ্রে যে সকল পাহাড় পর্বত আছে তাহাদের কোন কোনটি প্রায় বিশ হাজার ফুট উচ্চ।



৩৫নং চিত্র - চন্দ্র পৃষ্ঠে পাহাড়, পর্বত ও আগ্নেয় গিরি

সে তুলনায় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর ২৯০০০ ফুট উচ্চ। চন্দ্রের তিনটি বিখ্যাত আগ্নেয় গিরির নাম টাইকো (Tycho), কোপারনিকাশ (Copernicus), কেপ্লার (Kepler)। চন্দ্রের গভীরতম গহ্বরটি প্রায় ২০০০০ ফুট গভীর। পূর্বেই বলা হইয়াছে চন্দ্র শীতল। তথাপি ইহার যে দিক সূর্যের দিকে থাকে সেই দিক অত্যন্ত গরম এমন কি সেখানে ঠাণ্ডা জল রাখিয়া দিলে ফুটিয়া উঠিবে। সূর্যের বিপরীত দিকে তাহা অত্যন্ত শীতল এবং এত ঠাণ্ডা যে পৃথিবীর যে কোন পদার্থই সেখানে জমিয়া কঠিন হইয়া যাইবে। চন্দ্রে জল

বা বায়ু কিছুই নাই। অতএব যে সকল জীব বা উদ্ভিদ উহাদের উপর নির্ভর করে তাহারা চন্দ্রে অবস্থান করিতে পারে না।

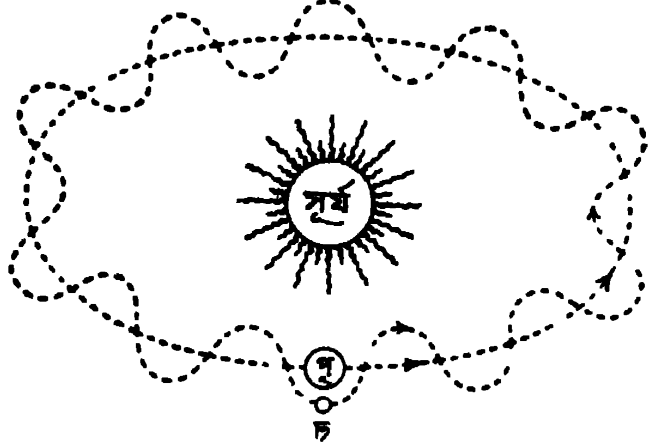
চন্দ্র আয়তনে ছোট এবং ওজনে কম বলিয়া ইহার অভিকর্ষও (Gravity) কম। তাই পৃথিবীতে যে লোক ৫ ফুট উচ্চ লাফাইতে পারে, চন্দ্রে গিয়া লাফাইতে পাইলে সেই লোকই বহু উচ্চে লাফাইতে পারিবে। এই জন্য যে সকল নিস্রাব আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত হয় তাহারা চন্দ্রের কেন্দ্রে বেশী আকর্ষিত হয় না বলিয়া সঙ্কুচিতও হয় না, কাজেই ইহার স্তূপ বা অন্য পাহাড় পর্বতগুলি এত উচ্চ হইবার সুবিধা পাইয়াছে। এই অভিকর্ষ কম হওয়ায় চন্দ্র পৃষ্ঠে বায়ু থাকিতে পায় নাই। চন্দ্র পৃষ্ঠে বায়ুর আমদানি করিলেও তাহারা চন্দ্র পৃষ্ঠ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। এই একই কারণে চন্দ্র পৃষ্ঠের জল সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই, পূর্বেই একথা বলা হইয়াছে। সূর্য কিরণ চন্দ্রের উপর পতিত হইলে তাহাই প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকিরণরূপে আমাদের চোখে লাগে।

অমাবস্যার দিন আকাশে চন্দ্র থাকে না, চন্দ্রের আলো পাই না বলিয়া সেদিন পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারমগ্ন থাকে। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চন্দ্র কাস্তের ফলার ন্যায় হইতে ক্রমে সপ্তমী, অষ্টমীতে অর্ধবৃত্তের ন্যায় হইয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণ বৃত্ত রূপে দেখা দেয়। সে দিন সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরিয়া যায়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত প্রায় ১৫ দিনকে **শুক্লপক্ষ** বলে। পূর্ণিমার পর পুনরায় প্রতিপদ হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যার দিন ইহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই পনর দিন **কৃষ্ণপক্ষ**। প্রতিদিন চন্দ্রের যতটুকু অংশ ক্ষয় পায় বা যতটুকু অংশ বৃদ্ধি হয় তাহাকে **চন্দ্রকলা** (Phase) বলে। চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ পরে বর্ণিত হইবে।

গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চারিদিকেও ঘুরিতেছে। কাজেই চন্দ্রকে আবার সূর্যের চারিদিকেও

ঘুবিতে হইতেছে, তাহা হইলে চন্দ্র একটি তাবেব পাকান স্প্রিংএব ন্যায় পথে সূর্যেব চাবিদিকে ঘুবিতেছে। চিত্র দেখিলেই পৃথিবী ও চন্দ্রেব গতিপথ বুঝিতে পাবিবে। পৃথিবী যদি স্থিব থাকিত তবে পৃথিবীব চাবিদিকে একবাব পরিভ্রমণ কবিযা আসিতে চন্দ্রেব প্রায় ২৭⅓ দিন লাগিত, কিন্তু ঐ সমযেব মধ্যে পৃথিবী আপন পথে কিছু অগ্রসব হইযা যায়। পৃথিবীর এই অগ্রগতিব জন্য

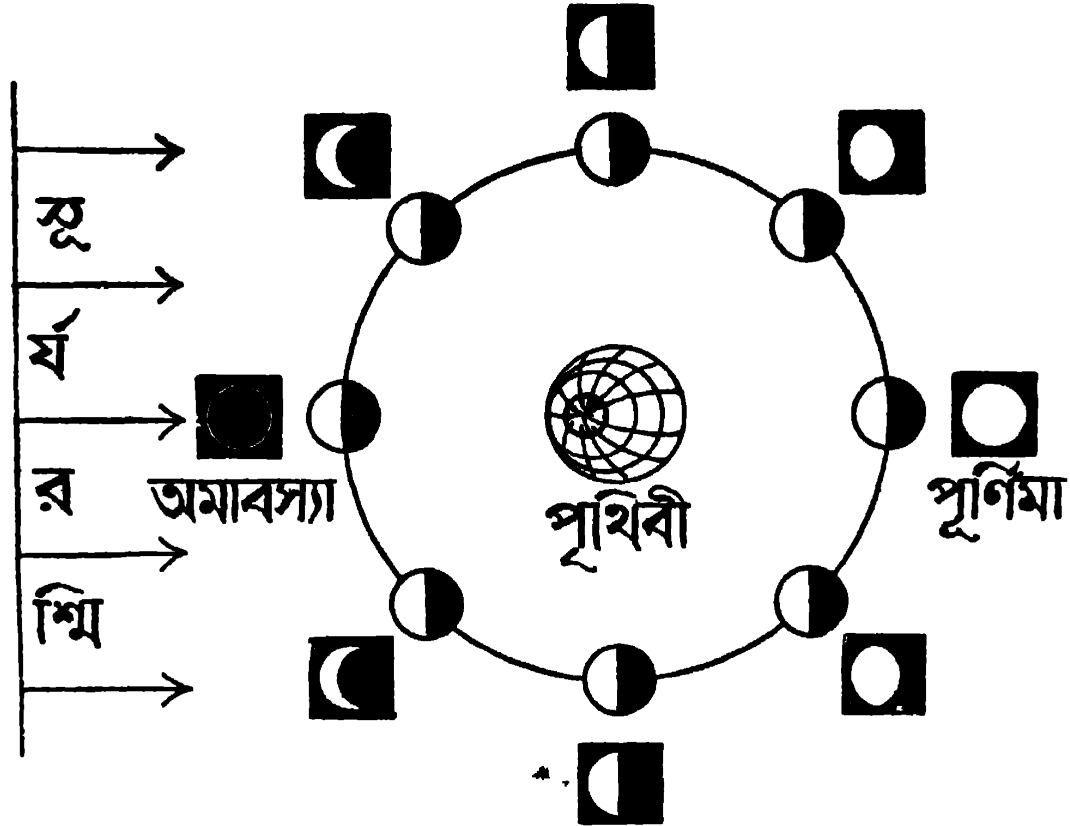


৩৬নং চিত্র—সূর্যেব চাবিদিকে পৃথিবী এবং তাহাব চাবিদিকে চন্দ্রের পথ

ইহাকে পবিক্রমণ কবিতে চন্দ্রেব আবও প্রায় দুইদিন অধিক লাগিযা যায। তাই প্রায় ২৯½ দিনে চন্দ্র পৃথিবীব চাবিদিকে ঘুবিযা আসে বলিযা মনে হয। এই ২৯½ দিনে দুই পক্ষ বা একটি **চান্দ্র মাস** (Lunar month)। এই সময পৃথিবীব তুলনায চন্দ্র বিভিন্ন অবস্থানে থাকে। কিন্তু সূয ইহাব মাত্র অর্ধাংশ আলোকিত কবে। পৃথিবী হইতে সকল সময় এই আলোকিত অর্ধাংশেব সমস্তটুকু দেখাব সুবিধা ঘটে না। কখন এই আলোকিত অংশেব কিছু মাত্র দেখা যায না, কোনদিন বা আলোকিত অংশের অংশ মাত্র, আবাব কোনদিন আলোকিত অংশেব সম্পূর্ণই দেখা যায়। যেদিন আলোকিত অংশ একেবাবে দেখা যায না সেদিন অমাবস্যা এবং যে দিন সম্পূর্ণ আলোকিত অংশ দেখা যায সেই দিন পূর্ণিমা এবং মধ্যবর্তী দিনগুলি এক একটি তিথি। কোন্ তিথিতে চন্দ্রকে কিরূপ দেখায় তাহা চিত্র হইতে বুঝিতে পাবা যাইবে।

চন্দ্র যখন ঘুবিতে ঘুরিতে ঠিক সূর্য ও পৃথিবীব মাঝে আসিযা পৌছায তখন সূর্য ইহাব যে অর্ধাংশ আলোকিত কবে সেই অর্ধাংশ পৃথিবী হইতে দূরে থাকে কাজেই সে অংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায় না, অন্ধকাবময অর্ধাংশ দৃষ্টিগোচব হয—কাজেই তখন অমাবস্যা। কিন্তু চন্দ্র যখন ঠিক বিপরীত অবস্থানে

আসে অর্থাৎ পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মাঝামাঝি থাকে তখন বিপরীত ব্যাপার ঘটে। কাজেই তখন পূর্ণিমা। অপরাপর দিন অন্যান্য তিথি।



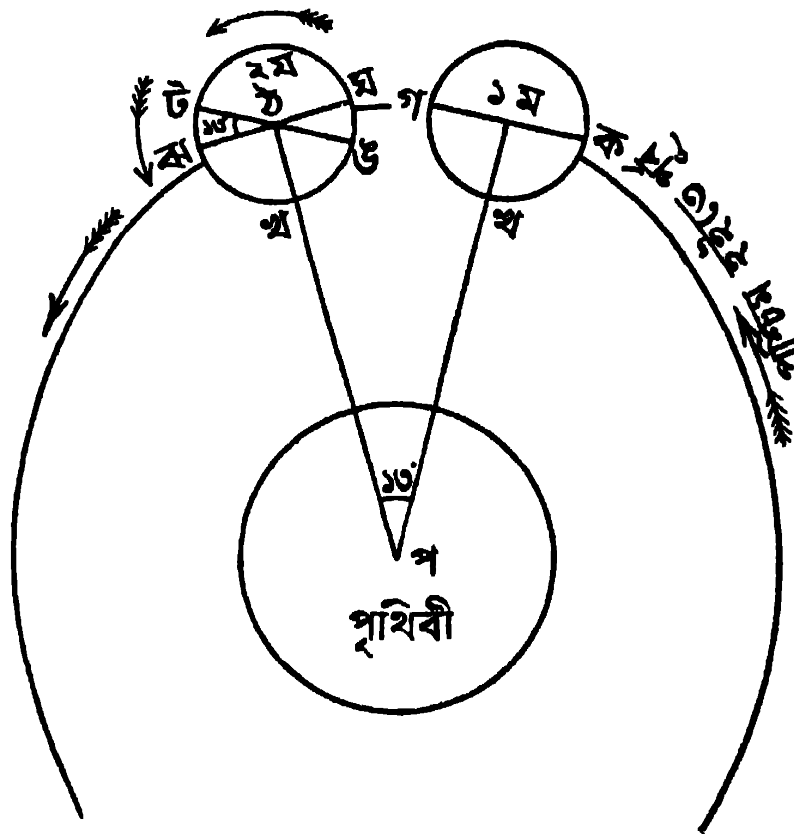
৩৭নং চিত্র—চন্দ্রকলা

পৃথিবীর চারিদিকে একবার পরিভ্রমণ করিতে চন্দ্রের ২৭⅓ দিন (২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিঃ) লাগে এবং ঐ সময়ের মধ্যেই একবার স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। কিন্তু চন্দ্রের একই দিক চিরকাল পৃথিবীর দিকে থাকে। ৩৮ নং চিত্রে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবার কালে চন্দ্রের দুইটি স্থানের অবস্থান ধরিয়া ব্যাপারটি বুঝান হইল।

মনে কর যেদিন চন্দ্র ১ম স্থানে আছে তাহার পরদিন ২য় স্থানে যায়। ২৭⅓ দিনে চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে অর্থাৎ ৩৬০° ঘুরে। অতএব একদিনে ৩৬০ + ২৭⅓ = ১৩° পথ পূর্বদিকে অতিক্রম করিবে।

যদি চন্দ্র আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে না ঘুরিত তাহা হইলে ইহার ব্যাস **কগ** ২য় অবস্থানে ইহার সহিত সমান্তরালভাবে **ঙট** অবস্থানে থাকিত এবং তাহা

হইলে **ঙ খ ট**, **ক খ গ** অংশের নূতন অবস্থান হইত। তাহা হইলে **ঘ ঙ ঝ** এই অংশটি দেখিতাম। কিন্তু একদিনে চন্দ্র ১৩° ডিগ্রী ঘুরিয়াছে, সুতরাং **ঙ ট**



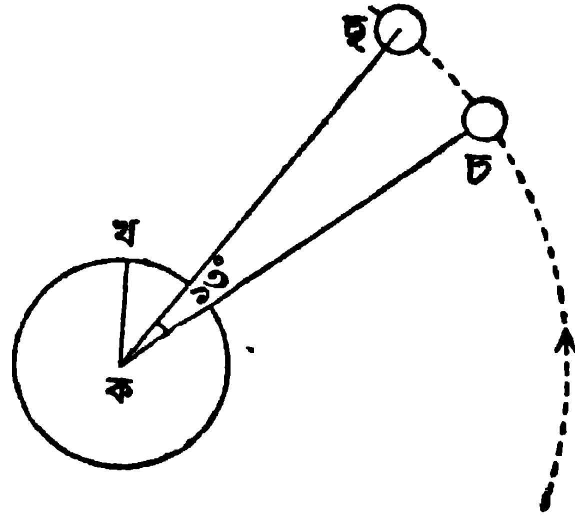
৩৮ নং চিত্র—প্রত্যহ চন্দ্রের একই অংশ দেখা যাইবার কারণ

ব্যাস পূর্বদিকে ঘুরিয়া **ঘ ঝ** অবস্থানে আসিবে। অর্থাৎ **ঙ ঝ ট** অংশ **ঘ ঙ ঝ** অংশের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে এবং এই অংশই পৃথিবী হইতে দেখা যাইবে। কিন্তু প্রথম অবস্থানে ঠিক এই অংশ দেখা গিয়াছিল। অতএব প্রত্যহই কেবলমাত্র চন্দ্রের একই অংশ দেখা যাইবে।

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ চন্দ্র প্রত্যহ একই সময়ে উদিত হয় না—প্রত্যহ প্রায় ৫০½ মিনিট বা দুই দণ্ড পর পর উদিত হয়।

মনে কর কোন একদিন পৃথিবী পৃষ্ঠে **ক** স্থানে আমাদের অবস্থিতি। সে দিন চন্দ্রের অবস্থিতি **চ** স্থানে। ২৪ ঘণ্টার পরে আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে পুনরায় ঠিক

ক স্থানেই আসিব , কিন্তু চন্দ্র তখন **চ** হইতে ১৩° পূর্বে সবিয়া **ছ** স্থানে অবস্থান কবিতেছে। এই ১৩° ডিগ্রী পথ অতিক্রম করিতে পৃথিবীব প্রায় ৫০½ মিঃ কাল লাগিয়া যায়। তাই প্রত্যহ এই ৫০½ মিঃ কাল পব পব চন্দ্র উদিত হয়।



৩৯ নং চিত্র—চন্দ্রের বিলম্বে উদয়েব কাবণ

পূর্বে নাক্ষত্র দিনেব কথা বলা হইযাছে। বাবটি বাশি অর্থাৎ সাতাইশ নক্ষত্র অতিক্রম কবিতে সূর্যেব এক বৎসব লাগে, কিন্তু এই সাতাইশটি নক্ষত্র অতিক্রম কবিতে চন্দ্রেব মাত্র ২৭ দিন লাগে। এই ২৭ দিনে পৃথিবী সূর্যেব চাবিদিকে ইহার পথে মোটামুটি ২৭° ডিগ্রী চলিযা যায়। এই ২৭ পথ অতিক্রম কবিতে চন্দ্রেব আবাব ২½ দিন লাগিযা যায়। তাই আপাত দৃষ্টি'ত চন্দ্রেব ২৭টি নক্ষত্রকে অতিক্রম করিতে মোট ২৭+২½=২৯½ দিন লাগে। এই ২৯½ দিনে এক চান্দ্রমাস। ইহাও এই পবিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ১২টি চান্দ্রমাসে এক **চান্দ্রবৎসর** (Lunar year)। পূর্বে সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েব মধ্যে চান্দ্রমাস বা চান্দ্রবৎসব প্রচলিত ছিল এবং সেই হিসাবে পার্বনাদি হইত। কিন্তু দেখা যায সাধাবণ বৎসবের তুলনায় চান্দ্রবৎসর ১১ দিন কম। কাজেই কোন

এক নির্দিষ্ট বৎসবেব কোন এক নির্দিষ্ট তিথিতে যে পার্বণ হয চান্দ্রবৎসব হিসাবে পববর্তী পার্বণ সাধাবণ বৎসবেব সেই দিনেব ১১ দিন আগে পড়িবে। তাহা হইলে যে পার্বণ একবার শীতকালে পড়ে, সময়ে সেই পার্বণই গ্রীষ্মকাল বা অন্য সময়েও পড়িতে পাবে। ইহাতে ব্যবহাবিক জগতে অনেক অসুবিধা হয বলিযা চান্দ্রবৎসব হিসাবে পার্বণাদিব গণনা মুসলমান সম্প্রদায ভিন্ন অন্য সম্প্রদাযেব মধ্যে দেখা যায না। তাই তাঁহাদেব পার্বণগুলি সময ক্রমে বৎসবেব যে কোন ঋতুতে ঘটিতে পাবে।

কিন্তু খৃষ্টানদিগেব এরূপ গণনা নহে। ২১শে মার্চেব পব যে পূর্ণিমা পড়ে এবং তাহাব পব যে সোমবাব, তাহাই তাঁহাদেব **ইষ্টার মনডে** (Easter Monday) এবং ঠিক তাহাব পূর্বেব শুক্রবাবটি তাঁহাদেব **গুড ফ্রাইডে** (Good Friday)। কাজেই ববাববই তাঁহাদেব এই পার্বণগুলি শীতকালেই পড়িতেছে এবং পড়িবে। সেইরূপ অন্যান্য পার্বণগুলিও বৎসবেব নির্দিষ্ট সময়ে পড়ে।

দেখা গিযাছে মোটামুটি ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসব এবং ৩৫৪ দিনে এক চান্দ্র বৎসব হয। ঐ দুইটি দিনসংখ্যাব ল. সা. গু. লইযা যে দিনসংখ্যা হয তাহাতে পূর্ণ সংখ্যক সৌববৎসব এবং চান্দ্রবৎসব হইবে। ইহা হইতে গণনা কবিযা দেখা যায উনিশ বৎসব অন্তব বাব, তিথি, নক্ষত্র, তাবিখ ইত্যাদি পুনবায পূর্বেব নিয়মে ঘটিতে আবম্ভ কবে। এই উনিশ বৎসব অন্তব বাব, তিথি, নক্ষত্র, তাবিখ ইত্যাদিব আবর্তনকে Mytonic cycle বলা হয।

সংক্ষেপ :—চন্দ্র পৃথিবীব উপগ্রহ, আয়তনে পৃথিবীব ১/৪৯ অংশ। ইহাব ব্যাস ২১৬০ মাইল, পৃথিবী হইতে চল্লিশ হাজাব মাইল দূরে—ওজনে পৃথিবীর ১/৮১ ভাগ। চন্দ্রেব কলঙ্ক চন্দ্র পৃষ্ঠে পাহাড়ের ছাযা মাত্র। ইহার পৃষ্ঠ অত্যন্ত অসমতল। চন্দ্রের উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গেব উচ্চতা ২০০০০ ফুট এবং গভীরতম গহ্ববগুলি ২০০০০ ফুট গভীর। ইহাব যে দিক সূর্যেব দিকে থাকে তাহা এত গরম যে জলও সেখানে টগবগ করিযা ফুটিতে পাবে, অথচ অপব পৃষ্ঠ অত্যন্ত শীতল। চন্দ্রলোকে জলবাযু নাই, প্রাণীও নাই। চন্দ্রেব অভিকর্ষ অত্যন্ত কম। চন্দ্রেব নিজেব আলো নাই—সূর্যেব আলোক পড়িলে ইহাব পৃষ্ঠ হইতে তাহা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাতাশ দিনে

ইহা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে পারিত, কিন্তু পৃথিবীর বাৎসরিক গতির জন্য পৃথিবীও আপনপথে অগ্রসর হয় বলিয়া ইহার আরও ২½ দিন বেশী লাগে। এই সাড়ে উনত্রিশ দিনে দুই পক্ষ বা এক চান্দ্র মাস। প্রত্যহ চন্দ্রের যেটুকু অংশ কমে বা বাড়ে তাহাকে চন্দ্রকলা বলে। দুই পক্ষের এক এক দিন সাধারণত এক এক তিথি। চন্দ্রের একই পৃষ্ঠ পৃথিবীর দিকে থাকে। তাহার কারণ চন্দ্র প্রত্যহ আপন মেরুদণ্ডের চারিদিকে মাত্র ১৩° ঘুরে। প্রত্যহ ইহা ৫০½ মিঃ পর পর উদিত হয়। ১২ চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর, অতএব সাধারণ বৎসর অপেক্ষা ইহা ১১ দিন কম। মুসলমানেরা চান্দ্র মাস বা বৎসর, হিসাবে পার্বণ করেন, ফলে বৎসরের যে কোন ঋতুতে তাঁহাদের যে কোন পার্বণ পড়িতে পারে। ২১শে মার্চের পর যে পূর্ণিমা তাহার পরবর্তী সোমবার খৃষ্টানদিগের ইষ্টার মনডে এবং ঠিক তাহার আগেকার শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে। উনিশ বৎসর অন্তর বার, তিথি নক্ষত্র, তারিখ পর পর একই রকম ভাবে ঘটিয়া থাকে।

ষষ্ঠ প্রশ্নমালা

১। চন্দ্রের আয়তন, ওজন, পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব, ইহার পৃষ্ঠের উষ্ণতা কত লিখ।
(Write —The dimensions of the moon, its weight, distance from the earth and the temperature on its surface)

২। চন্দ্রের কলঙ্ক থাকিবার কারণ কি? (What is the reason that Lunar spots are found on its surface?)

৩। চন্দ্র পৃষ্ঠে জল, বায়ু বা প্রাণী আছে কি না? যদি না থাকে তবে মোটামুটি তাহার কারণ কি? (Are their air, water and living being on the moon? If not, state reason)

৪। চন্দ্র কতদিনে পৃথিবীর চারিদিকে আবর্তন করে? কেন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়? চন্দ্রকলা কাহাকে বলে? (In how many days does the moon revolve round the earth What is the phases of the moon and does it vary in size?)

৫। কিরূপে প্রমাণ করিতে পার চন্দ্রের একই পৃষ্ঠ পৃথিবী হইতে দেখা যায়? (How can you prove that the same surface of the moon is turned towards the earth?)

৬। প্রত্যহ চন্দ্রের উদয়কাল ৫০½ মিঃ পিছাইয়া যাইবার কারণ কি? (Why does the moon rise 50½ minutes later every day?)

৭। এক বৎসব মুসলমানদের মহরম ১৯শে ফেব্রুযাবী পড়িল। ইহাব দুই বৎসর পরে কোন তারিখে মহবম পড়িবে এবং তিন বৎসব আগে কোন তাবিখে পড়িযা'ছল লিখ। (In a certain year the Maaharum fell on the 19th February On which day will it again occur for the second time and on which day did it happen three years ago ?)

৮। মোটামুটি কয বৎসব অন্তর বাব, তিথি, তাবিখ ইত্যাদি পুনরায পব পব ঘটিতে পারে এবং তাহার কাবণ কি লিখ। অথবা mytonic cycle কাহাকে বলে বুঝাইযা লিখ। (At an interval of how many years do the dates days etc reccur in regular succession and state the reason Or, Explain what is called the Mytonic cycle ?)



সপ্তম পরিচ্ছেদ

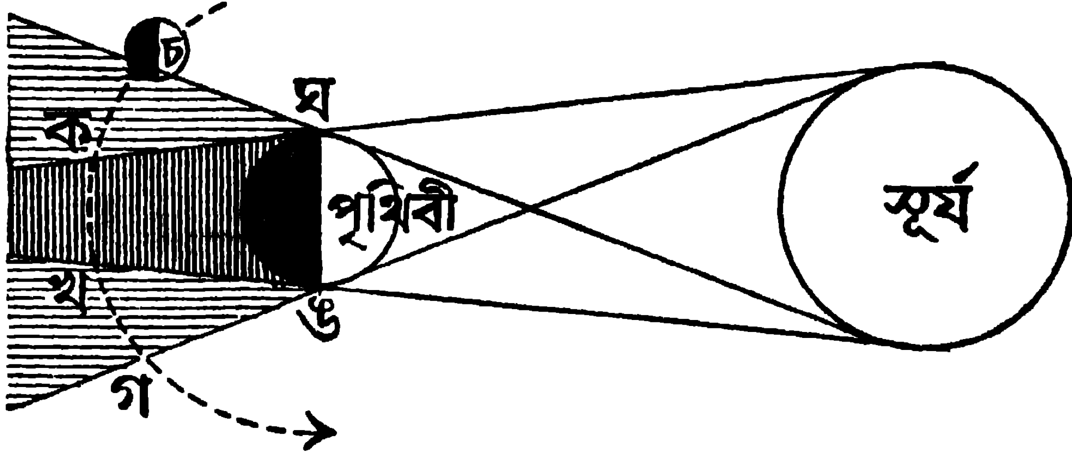
চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ

বৃহত্তর আলোক-উৎসের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রতর অনচ্ছ পদার্থ এবং তাহার পশ্চাতে একটি পর্দা রাখিলে ঐ পর্দায় কখন কি প্রকার ছায়া এবং উপচ্ছায়া পড়ে তাহা তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ এইরূপ ছায়া এবং উপচ্ছায়ার জন্যই সংঘটিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রগ্রহণ—সূর্য আলোকের উৎস, ইহার সম্মুখে যখন পৃথিবী থাকে এবং পরে চন্দ্র থাকে এবং সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরল রেখায় পড়ে তখন পৃথিবীর ছায়া গিয়া চন্দ্রে পড়ে, কাজেই তখন চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থান যখন এইরূপ হয় তখন পূর্ণিমা তিথি। তাহা হইলে ত প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হইত—তাহা হয় না কেন? পূর্বে বলা হইয়াছে সূর্য এবং পৃথিবী যে তলে অবস্থান করে চন্দ্র সকল সময় ঠিক সেই তলে থাকে না। ঐ তলের সহিত ৫° ডিগ্রী কোণ করিয়া চন্দ্রের পরিভ্রমণ পথ হেলিয়া থাকে। ঐ পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী প্রায় এক সমতলে আসিয়া পড়ে অথচ পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মাঝে থাকে তখনই চন্দ্রগ্রহণ হওয়া সম্ভব। সকল পূর্ণিমা তিথিতে এরূপ সুযোগ ঘটে না বলিয়া সকল পূর্ণিমা তিথিতেই চন্দ্রগ্রহণ ঘটে না।

৪০নং চিত্রের ন্যায় সূর্য, পৃথিবী এবং চন্দ্রের অবস্থান হইলে **ঘ চ ক** এবং **ঙ খ গ** এর ন্যায় উপচ্ছায়ার শঙ্কু (Cone) এবং **ঘ ক খ ঙ** ছায়া-শঙ্কুর অংশ পাওয়া যায়। মনে করা যাক **চ ক খ গ** চন্দ্রের পথ। কিন্তু এই পথের তল পৃথিবী ও সূর্য যে সমতলে আছে তাহার সহিত একটি

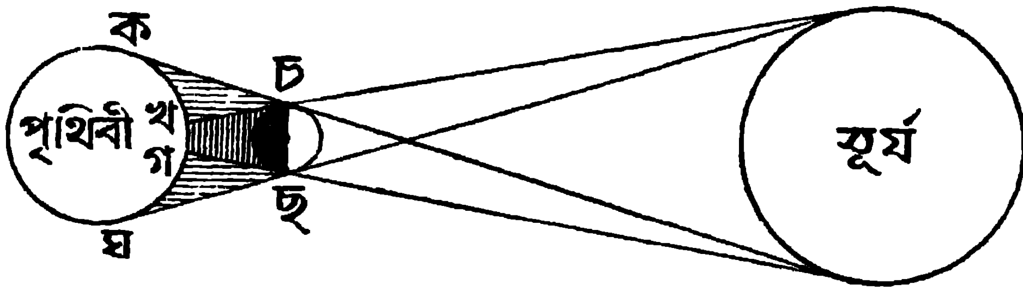
কোণ করিয়া অবস্থিত, কাজেই সকল সময় চন্দ্র **ঘ ক খ ঙ** এই ছায়াময় অংশে আসিতে পারে না, কখন উপর দিয়া কখনও বা ইহার নিচু দিয়া



৪০নং চিত্র—চন্দ্রগ্রহণ

চলিয়া যায়। সে ক্ষেত্রে চন্দ্র গ্রহণ ঘটে না। চন্দ্র যখন **ঘ চ ক** কিংবা **ঙ খ গ** অংশে থাকে তখন ইহার ঔজ্জ্বল্য কিছু কমিয়া যায় বটে কিন্তু ইহাতে গ্রহণ লাগে না। চন্দ্র যখন সম্পূর্ণরূপে **ঘ ক খ ঙ** অংশের মধ্যে থাকে তখন **পূর্ণগ্রাস** (Total) চন্দ্র গ্রহণ এবং যখন ইহার কিয়দংশ অপর দুই উপচ্ছায়া অংশের কোন এক অংশে এবং অপরাংশ **ঘ ক খ ঙ** ছায়ায় থাকে তখন **অংশ বা খণ্ডগ্রাস** (Partial) চন্দ্রগ্রহণ ঘটে।

সূর্যগ্রহণ—চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া পড়ে তখন চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেই অংশ হইতে সূর্যকে দেখা যায় না।



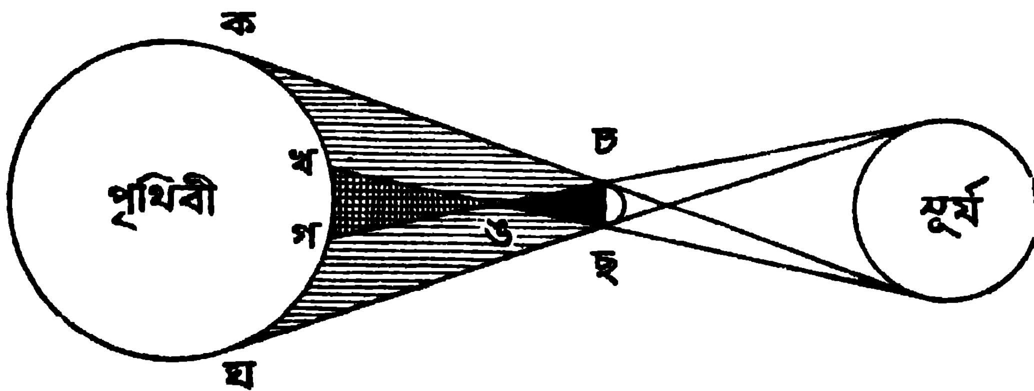
৪১নং চিত্র—সূর্যগ্রহণ

আবার কখনও বা অংশ মাত্র দেখা যায়, কিংবা সূর্যকে একটি জ্বলন্ত

বলযেব মত দেখায। প্রথম ক্ষেত্রে সূর্যেব **পূর্ণগ্রাস** দ্বিতীয ক্ষেত্রে **অংশ বা খণ্ডগ্রাস** এবং তৃতীয ক্ষেত্রে **বলয়গ্রাস** (Annular) গ্রহণ ঘটিযা থাকে।

৪১নং চিত্র দেখিলে বুঝা যায অমাবস্যাব দিন ব্যতীত সূর্য গ্রহণ ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু চন্দ্র গ্রহণ যেমন সকল পূর্ণিমাতে ঘটে না সূর্য গ্রহণ তেমনই সকল অমাবস্যায হয না।

সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীব অবস্থান পূর্ব চিত্রেব মত হইলে **চ ক খ** এবং **ছ গ ঘ** উপচ্ছাযাব শঙ্কু দুইটি পৃথিবী পৃষ্ঠে যথাক্রমে **ক খ** ও **গ ঘ** অংশে গিযা পড়ে এবং **চ খ গ ছ** ছাযাব শঙ্কুটি পৃথিবীব **খ গ** অংশে গিযা পতিত হয। এরূপ অবস্থায পৃথিবীব **খ গ** অংশ হইতে সূর্যকে একেবাবেই দেখা যায না এবং অপব দুই অংশ হইতে আংশিক ভাবে দেখা যায। কাজেই পূর্বোক্ত অংশ হইতে **পূর্ণগ্রাস** সূর্যগ্রহণ এবং অপব দুই অংশ হইতে **অংশ বা খণ্ডগ্রাস** সূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে। পৃথিবীব অবস্থান যদি আবও একটু চন্দ্রেব নিকটে হইত তবে পৃথিবীব দুই বিপবীত দিক হইতে সূর্যকে সম্পূর্ণ দেখা যাইত। অতএব সেই স্থান হইতে মোটেই সূর্যগ্রহণ দেখা যাইত না।

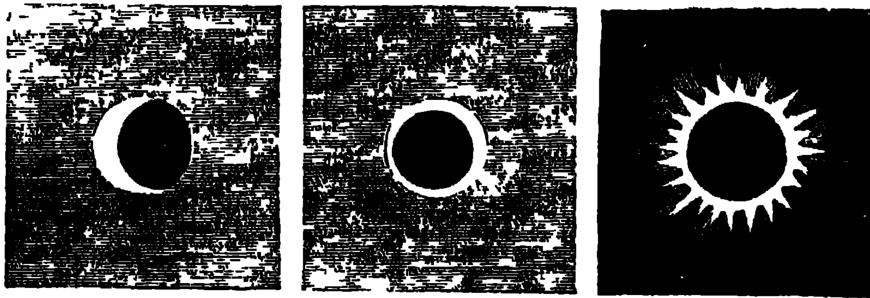


৪২নং চিত্র—পূর্ণগ্রাস এবং অংশগ্রাস সূর্য গ্রহণ

যখন সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী, উপবে অঙ্কিত চিত্রেব ন্যায অবস্থিত হয অর্থাৎ যখন চন্দ্রেব ছাযা পৃথিবীতে গিয়া পৌছায না তখন পৃথিবীব অংশ বিশেষ হইতে সূর্যকে একটি জ্বলন্ত বলয়েব মত দেখায়। তখনই পৃথিবীব সেই স্থানে

বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ দেখা যায়। ৪২নং চিত্রটি দেখিলে বুঝিবে **চন্দ্রের** ছায়ার **শঙ্কুটি** আসিয়া **ঙ** বিন্দুতে শেষ হইয়াছে। কিন্তু **চ** **ঙ** ও **ছ** **ঙ** রেখা বর্ধিত করিলে ঐ ছায়ার বিপরীত দিকে **ঙ খ গ** আর একটি শঙ্কু হইবে এবং পৃথিবীর **খ গ** অংশ অধিকার করিবে। এই **খ গ** অংশ হইতে **বলয় গ্রাস** দেখা যাইবে। অপর দুই অংশ **ক খ** ও **গ ঘ** অংশ হইতে খণ্ড গ্রাস দেখা যাইবে। পৃথিবীর অবস্থান যদি আরও একটু **ঙ** বিন্দুর নিকটতর হইত তবে পৃথিবীর এমন অংশ থাকিত যে অংশ হইতে সূর্যকে সম্পূর্ণ দেখা যাইত। অতএব এইরূপ অবস্থানে পৃথিবীর কোন কোন স্থান হইতে একেবারে গ্রহণ দেখা যাইত না, কোন কোন স্থানে খণ্ড গ্রাস এবং কোন কোন স্থানে বলয় গ্রাস দেখা যাইত। আবার খণ্ড বা পূর্ণ গ্রাসের সময়ও কোন কোন স্থান হইতে গ্রহণ দেখা যাইত না।

চন্দ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক এবং সূর্য হইতে বহু দূরে বলিয়া ইহার ছায়া বড় হয় না। সেইজন্য পৃথিবী ইহার ছায়ার ভিতর সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারে না বলিয়া পৃথিবীর সকল স্থান হইতে একই সময়ে পূর্ণগ্রাসচন্দ্র গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায় না।



৪৩ নং চিত্র—অংশগ্রাস, পূর্ণগ্রাস ও বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ

অংশগ্রাস, বলয়গ্রাস ও পূর্ণগ্রাসের সময় সূর্যকে যেরূপ দেখায় তাহাদের চিত্র উপরে দেওয়া গেল।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পথটি ঠিক বৃত্তাকার নয় এবং পৃথিবীর

চারিদিকে চন্দ্রের পথও ঠিক বৃত্তাকার নহে। কাজেই চন্দ্র হইতে পৃথিবীর কিংবা সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সকল সময় একরূপ থাকে না বলিয়া চন্দ্র বা পৃথিবীর ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সেইজন্য চন্দ্র বা সূর্যের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ ঘটিয়া থাকে।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটে আসে এবং সূর্য দূরে থাকে তখন সূর্য গ্রহণ হইলে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ এবং ইহার বিপরীত ক্ষেত্রে বলয় গ্রহণ দেখা যায়।

সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের উপর যে কাল ছায়া দেখা যায় তাহা অস্বচ্ছ চন্দ্র, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর যে কাল ছায়া পড়ে তাহা পৃথিবীর ছায়া মাত্র।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যে তলে ঘুরিতেছে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে যে তলে ঘুরিতেছে, এই দুইটি তল পরস্পর ৫ কোণ করিয়া ছেদ করিয়াছে। যখন চন্দ্র এই ছেদ বিন্দু দুইটির উপর অথবা কাছাকাছি থাকে তখনই গ্রহণ হয়। যখন চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে থাকে তখন সূর্য গ্রহণ এবং যখন পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ ঘটে।

আমাদের মধ্যে প্রবাদ আছে গলা কাটা রাহু চন্দ্র এবং সূর্যকে গিলিয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয়। রাহুর গলা কাটা বলিয়া চন্দ্র ও সূর্য উহার পেটে যায় না মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া গলা দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাই চন্দ্র বা সূর্যকে রাহু একেবারে হজম করিতে পারে না এবং চন্দ্রে বা সূর্যে স্থায়ী ভাবে গ্রহণ হয় না। এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ ইহা উপকথা ভিন্ন আর কিছু নহে।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ পূর্ব হইতে গ্রহণের অবস্থা, স্থান, কাল নির্ণয় করিয়া পঞ্জিকায় লিখিয়া রাখেন। বৎসরে কতগুলি গ্রহণ হইতে পারে তাহাও তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। একবৎসরে সর্বাধিক পাঁচটি সূর্যগ্রহণ এবং তিনটি চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাইতে পারে। এবং ন্যূনকল্পে দুইটি সূর্যগ্রহণ হইবেই। চন্দ্রগ্রহণ বৎসরে একবারও না হইতে পারে।

সংক্ষেপ :—সূর্যের সম্মুখে পৃথিবী এবং তাহার সম্মুখে চন্দ্র থাকিলে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিলে চন্দ্রগ্রহণ হইবার সম্ভাবনা। সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবীর এরূপ অবস্থান যেদিন হয় সেদিন পূর্ণিমা, অতএব পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ সম্ভব। কিন্তু যখন সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী প্রায় এক সরল রেখায় থাকে না বা পৃথিবী হইতে চন্দ্র অনেক দূরে থাকে তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হইতে পারে না—তাই সকল পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। চন্দ্রগ্রহণ দুইপ্রকার—খণ্ডগ্রাস ও পূর্ণগ্রাস। চন্দ্র যখন সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝে আসে তখন যদি চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে তবে পৃথিবীর যে স্থানে চন্দ্রের ছায়া পড়ে সেই স্থান হইতে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর এরূপ অবস্থান অমাবস্যার দিন হয়। কিন্তু সকল অমাবস্যার দিন উপরোক্ত কারণে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়িতে পারে না বলিয়া সকল অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না। সূর্যগ্রহণ তিনপ্রকার, পূর্ণগ্রাস, খণ্ডগ্রাস ও বলয়গ্রাস। বলয়গ্রাসের সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছায় না—মধ্য পথে শেষ হয়। চন্দ্রের ছায়া-শঙ্কুটি বিপরীত ভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত বাড়াইয়া দিলে যেখানে যায়, পৃথিবীর সেই অংশ হইতে বলয়গ্রাস দেখা যায়।

সপ্তম প্রশ্নমালা

১। কিরূপে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে চিত্র সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

(ক) পূর্ণগ্রাস ও খণ্ডগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ (কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৪০)

(খ) পূর্ণগ্রাস, খণ্ডগ্রাস ও বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ

(Explain with a diagram how the following natural phenomena happen :—

(a) Total and partial eclipses of the Moon

(b) Total, partial and annular eclipses of the sun)

২। চন্দ্র গ্রহণের সময় পৃথিবীর কোন অংশ হইতে কি প্রকারের চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের সময় পৃথিবী হইতে কি প্রকারের সূর্যগ্রহণ দেখা যাইতে পারে প্রত্যেকটির ভিন্ন চিত্র দিয়া বুঝাইয়া দাও। (Explain with separate diagrams, from which part of the earth different kinds of solar and lunar eclipses are found)

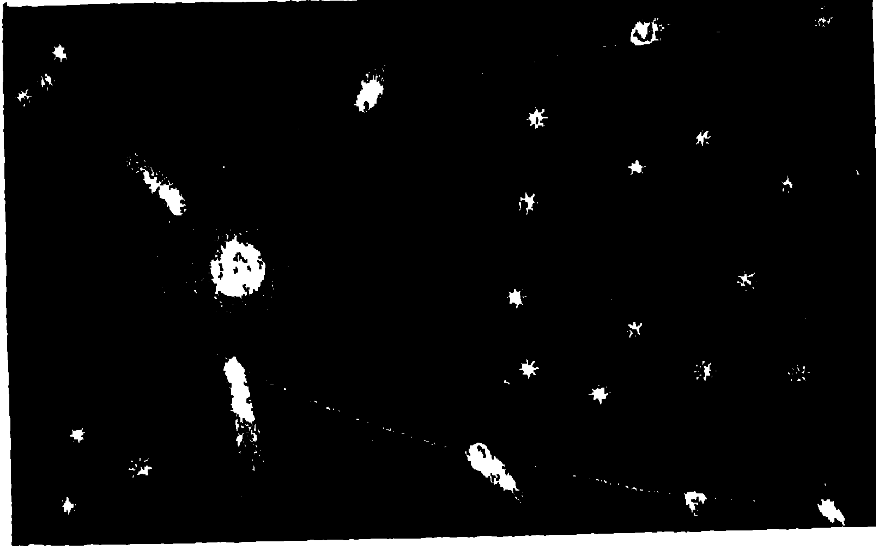
৩। কোন্ তিথিতে কোন্ গ্রহণ সম্ভব এবং কেন লিখ। ঐরূপ তিথির প্রত্যেকটিতে গ্রহণ হয় না কেন তাহাও বুঝাইয়া দাও। (Write on which days different kinds of lunar and solar eclipses may take place. Explain why on all such other days eclipses do not take place.)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধূমকেতু ও উল্কা

গ্রহ নক্ষত্র ছাড়া ধূমকেতু নামে কতকগুলি জ্যোতিষ্ক আকাশে দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি বিভিন্ন, ভ্রমণ পথ উপবৃত্তাকার (elliptic) অধিবৃত্তাকার (parabolaic) নয়ত পরাবৃত্তাকার (hyperbolaic)। যে ধূমকেতুগুলি উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে তাহাদের ভ্রমণ পথের নাভীতে (Focus) সূর্য থাকে। উপবৃত্তাকার পথে যাহারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ান্তর আকাশে দেখা যায়। যেগুলির পথ অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার তাহাদিগকে একবার কয়েক রাত্রি আকাশে দেখা যায়, পরে তাহারা চিরদিনের জন্য আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যায়। সাধারণত এই প্রকার জ্যোতিষ্কগুলিকে দেখিতে ঝাঁটার ন্যায়। ইহাদের সমস্ত দেহটির প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিভাগ। গোড়ার দিক গোল এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল এবং অপর অংশ লেজ। লেজটি বাষ্পময় এবং এত পাতলা যে ইহার মধ্য দিয়া অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র দেখিবার বিশেষ বাধা পাওয়া যায় না। সূর্যের নিকট আসিলে ইহাদিগকে দেখা যায় নতুবা নয়। ইহারা সূর্যের যত নিকটে আসে ততই ইহাদের গতি বৃদ্ধি পায় এবং লেজটি বর্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু সকল সময়েই লেজটি সূর্যের বিপরীত দিকে ফিরান থাকে। লেজ বৃদ্ধি পাইবার কারণ জ্যোতির্বিদগণ স্থির করিয়াছেন, সূর্যের নিকটবর্তী হইলে সূর্যোত্তাপে ইহারা উত্তপ্ত হওয়ায় ইহাদের চারিদিকে যে বাষ্পময় আবরণ থাকে তাহা লঘু হইয়া উৎক্ষিপ্ত হয় এবং লেজের আকারে দেখা দেয়। এই লেজ অনেক সময় বর্ধিত হইয়া লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি অনেক গ্রহের উপর দিয়া এই বাষ্পময় পুচ্ছ ছড়াইয়া পড়ে। এক একটি ধূমকেতুর একাধিক পুচ্ছ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ধূমকেতুর আয়তন অনেক সময় এক একটি গ্রহ অপেক্ষা

অনেকগুণ বেশী, কিন্তু ওজনে ইহারা অতিশয় লঘু। তাই বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন ইহারা বাষ্পপিণ্ড ভিন্ন কিছুই নহে। ইহারা গ্রহগণের আকর্ষণে



৪৪নং চিত্র—একটি ধূমকেতুর বিভিন্ন অবস্থান

ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। কখন কখন ইহারা এক সৌর জগৎ হইতে আকর্ষণের ফলে অন্য সৌর জগতে গিয়াও পৌঁছায়।

পূর্বে জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করিতেন ধূমকেতু একবার দেখা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে আর দেখা দেয় না। সকলগুলিই যে এরূপ চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ **হ্যালি** (Halley) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনেক কথা বলিয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন ১৫৩১, ১৬০৭, ১৬৮২ সালে যে ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল তাহাই পুনরায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দেখা দিবে। তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু উহার উদয়কাল কিছুদিন পিছাইয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ **ক্লারট** (Clarrot) নামক এক জ্যোতির্বিদ্ ঠিক করেন যে ঐ সময় বৃহস্পতি গ্রহ ঐ ধূমকেতুর কাছাকাছি হওয়ায় আকর্ষণে ইহার গতি মন্থর করিয়া দেয়, ফলে ঐ বিলম্ব হয়। হ্যালির নামানুসারে ঐ ধূমকেতু **হ্যালির ধূমকেতু** (Halley's comet) নামে অভিহিত হয়।

ইহাব দীর্ঘ পুচ্ছ পৃথিবীব উপব দিযা গিযাছিল কিন্তু পৃথিবীব কোন ক্ষতি হয নাই। কিন্তু পূর্বে এই পুচ্ছকে বিষাক্ত বাষ্পপূর্ণ ধাবণা কবিযা অনেকে আশঙ্কা কবিযাছিলেন। এই ধূমকেতুব উদযকাল হিসাব কবিলে দেখা যায ৭৫ বৎসব অন্তব ইহাকে দেখা যায। সেই হিসাবে আমবা ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহাকে পুনবায দেখিতে পাইব বলিযা আশা কবিতে পাবি।

প্রথমে একটি ছোট নক্ষত্রেব ন্যায হ্যালিব ধূমকেতুকে আকাশে দেখা গিযাছিল। কিন্তু কযেক দিনেব মধ্যেই ইহা লোকেব দৃষ্টিব মধ্যে আসিযা পৌছাইল। তখন ক্রমেই ইহাব লেজটি বাড়িতে দেখা গিযাছিল। প্রায ১০।১১ দিনেব মধ্যে ইহা পূর্ণাকাব প্রাপ্ত হইযা আবাব কমিতে আবম্ভ কবিল। অবশেষে তিন সপ্তাহেব মধ্যে ইহা একেবাবে মিলাইযা গেল।

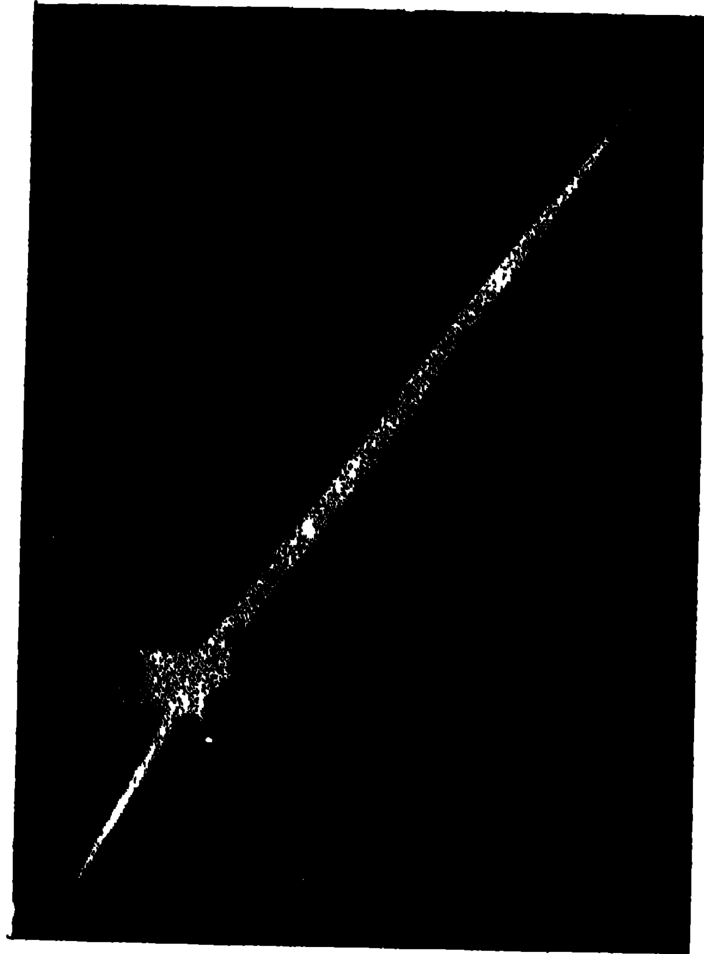
হ্যালিব ধূমকেতু ছাড়াও **বিয়েলার** এবং **এনকি** ও **দোনাতির** ধূমকেতু প্রসিদ্ধ।

চন্দ্র যেমন এক সমযে পৃথিবীবই অংশ ছিল বলিযা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন তেমনই তাঁহাবা বলেন ঐ সকল ধূমকেতুও এক সমযে না এক সমযে সূর্যেব অংশ মাত্র ছিল। নৈসর্গিক কাবণে তাহাবা বিচ্যুত হইযা গিযাছে। আবাব সূর্যেব আকর্ষণে এই ধূমকেতুও চূর্ণ ও ক্ষুদ্রতব হইযা উল্কাব আকাবে আকাশে ঘুবিযা বেড়ায। এইরূপ ঘুবিতে ঘুবিতে যখন ইহাবা পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহেব নিকটে আসিযা পড়ে তখন ঐ সকল গ্রহ উহাদিগকে আপনাপন বুকে টানিয়া লয। পৃথিবীব বুকে এইরূপ বহু উল্কা-পিণ্ড আসিয়া পৌছিযাছে। দেখা গিয়াছে ঐ উল্কাপিণ্ডগুলিতে লৌহ, নিকেল প্রভৃতি ধাতু বিদ্যমান—অপার্থিব দ্রব্য ইহাতে কিছু নাই। পৃথিবীব আকর্ষণে



৪৫ নং চিত্র—উল্কাপিণ্ড

যখন ইহারা প্রচণ্ড গতিতে ছুটিয়া আসে তখন ইহাদের সহিত পৃথিবীবক্ষস্থ বায়ুর ঘর্ষণে ইহারা উত্তপ্ত হইয়া ক্রমে জ্বলিয়া উঠে। তখন ইহাদিগকে দেখা যায় যেন একটি হাউই ছুটিতেছে। আকাশে এইরূপ উল্কাপাত প্রায়ই দেখা যায়। সাধারণত লোকে ইহাকে তারা খসা বলে। কিন্তু তারা এইরূপে খসিলে পৃথিবীর নিস্তার থাকিত না। এক একটি তারা পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বড় এবং ভারী। তাহাদের সহিত পৃথিবীর এইরূপ ঘর্ষণ হইলে পৃথিবী চূরমার হইয়া যাইত। পৃথিবীতে আসিবার সময় কোন কোন উল্কাপিণ্ড জ্বলিয়া একেবারে ছাই হইয়া যায়। তখন এগুলি আর পৃথিবীতে পড়িতে পারে না। অতএব বায়ু প্রকারান্তরে উল্কাপাতের বিপদ হইতে অনেক পরিমাণে পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছে। ছোট বড় অনেক উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পড়িয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। উল্কাপিণ্ডের নিজস্ব কোন জ্যোতি নাই।



৪৬নং চিত্র—উল্কাপাত

১৯০৮ সালে জুন মাসে সাইবেরিয়ায় যে উল্কাপাত হয় তাহার ওজন কয়েক হাজার টন। ইহা পড়িবার অনেক কাল পরে পিণ্ডটিকে এক জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া

যায়। শুনা যায় ইহার পতনকালে ইহার চতুর্দিকে ৪০।৪৫ মাইল পর্যন্ত ঘরবাড়ী পুড়িয়া যায় এবং ৪০০ মাইল দূর পর্যন্ত লোকে ইহার উত্তাপ অনুভব করিয়াছিল।

বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময় যেমন ২১শে এপ্রিল, ৯ই, ১০ই এবং ১১ই আগষ্ট, ১২ই, ১৩ই, ১৪ই নভেম্বর এবং ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে নভেম্বর প্রভৃতি কয়েকটি তারিখে অত্যধিক উল্কাপাত হইতে দেখা যায়। কারণ গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় ইহারাও নির্দিষ্ট পথে চলে এবং কোন কোনটি ঝাঁক বাঁধিয়া বিচরণ করে। পৃথিবী যেদিন এমন একটি ঝাঁককে আপনার বুকে টানিয়া লয় সেইদিন অধিক পরিমাণে উল্কাপাত হয় এবং ঐ সকল দিনে উল্কাগুলি পৃথিবী কর্তৃক অধিক জোরে আকৃষ্ট হয়।

সূর্যেও লৌহ এবং নিকেল পাওয়া যায়। অতএব ইহাও অনুমান করা যায় ইহারা এক সময়ে সূর্যের অংশ ছিল।

সংক্ষেপঃ—ধূমকেতু ঝাঁটার মত, ভ্রমণ পথ উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্তাকার, গ্রহগণ অপেক্ষা আকারে বহু বড় হইলেও ওজনে বহু কম। মনে হয় ইহার অধিকাংশই বাষ্পময়। সূর্যের নিকট আসিলে ইহাদিগকে দেখা যায়। তখন গতি বৃদ্ধি হয় ও লেজ বাড়ে। লেজটি সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে।

উল্কাপিণ্ড লৌহ বা নিকেল প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীতে আসিবার সময় বায়ুর সহিত ঘর্ষণে উত্তপ্ত ও ক্রমে জ্বলিয়া উঠিলে হাউইএর মত দেখায়। কখন কখন পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে অধিক উল্কাপাত হয়। ছোট বড় অনেক উল্কাই পৃথিবীতে পড়িয়াছে।

অষ্টম প্রশ্নমালা

১। ধূমকেতু ও উল্কার বিবরণ লিখ। Write notes on .—Comets and meteors.

[কঃ বিঃ ১৯৪১]

২। উল্কাপাত বলিতে কি বুঝায়? (What do you understand by coming down of a meteor.)

৩। বৎসরের কোন্ কোন্ সময়ে বেশীমাত্রায় উল্কা দেখা যায় এবং কেন লিখ। (In which parts of the year meteors are found in large numbers and state reasons.)

ভূ-বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর জন্ম

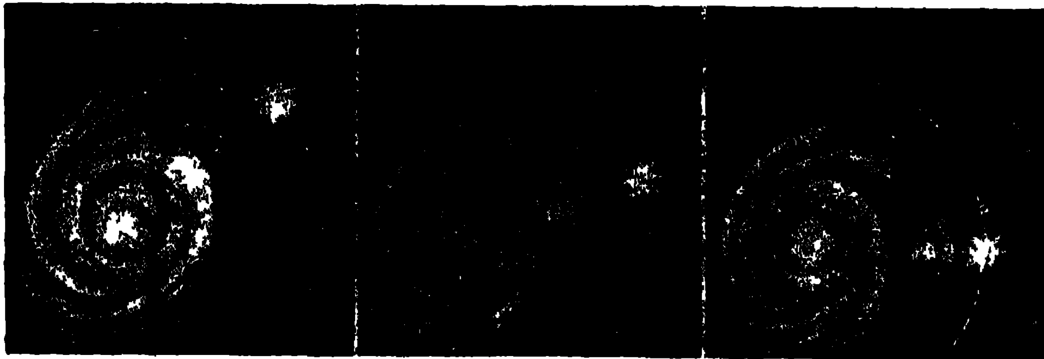
প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মহেন-জো-দড়োব ভূগর্ভে বিবাট সহবেব অবশেষ আবিষ্কাব কবিযাছেন। ভূতাত্ত্বিকগণ হিমালয শৃঙ্গে প্রস্তবে কত মাছ এবং অন্যান্য জলীয জীবেব জীবাশ্ম আবিষ্কাব কবিযাছেন। আমবা দেখিতে পাই সাগবে, নদীবক্ষে কত দ্বীপ মাথা তুলিযা উঠিতেছে। আবাব এই যে সেদিন বিহাবে ভূমিকম্প হইযা গেল তাহাতে কত উচ্চ স্থান জলাভূমিতে পবিণত হইযা গিযাছে। এই সকল বিষয চিন্তা কবিলে মনে হয পৃথিবীব উপব দিন দিন কত পবিবর্তনই না সাধিত হইতেছে। পূবে যে পৃথিবী এমন সুন্দব মানুষেব বাসোপযোগী ছিল না তাহাও বলা যাইতে পাবে। এ বিষযে গবেষণা কবিযা বহু বৈজ্ঞানিক পৃথিবীব জন্ম সম্বন্ধে বহু মত প্রচাব কবিযা থাকেন। কে বলিতে পাবে তাহাদেব মধ্যে কোন্ মত ঠিক আব কোন্‌টি বেঠিক!

জার্মাণ বৈজ্ঞানিক ক্যাণ্ট ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপলাস প্রচাব কবিযাছিলেন সমস্ত সৌবজগৎ প্রথমে নীহাবিকাবস্থায পিণ্ডাকাবে বহুদূব বিস্তৃত ছিল। এই নীহাবিকা অত্যন্ত গবম এমন কি জ্বলন্ত অবস্থায ছিল বলিযা বলেন। পিণ্ডাকাব এই নীহাবিকা প্রচণ্ড বেগে আপন মেরুদণ্ডেব চাবিদিকে ঘুবিত। কালক্রমে ঘুবিতে ঘুবিতে ইহা তাপ বিকিবণ কবিতে থাকে। ফলে এই পিণ্ডেব মধ্যভাগ শীতল হইযা চুপসিযা যাওযায ইহাব মধ্যভাগ হইতে একটি বলয খসিযা পৃথক হইযা যায। কালক্রমে এই বলয়ও চুপসাইয়া গোলাকাব ধাবণ কবে। পুনরায় প্রথম পিণ্ড হইতে এইরূপে আর একটি বলয় বাহিব হয় এবং কালে

তাহাও গোলাকার ধারণ করে। মূল গোলকটি এইরূপে যত ছোট হইতে থাকে ততই ইহার ঘূর্ণন গতি প্রবলতর হইতে থাকে। এইরূপে কয়েকটি অংশ ইহা হইতে পৃথক হইয়া যাইবার পর যে অংশটি রহিল তাহাই আমাদের বর্তমান সূর্য, এবং যে অংশগুলি ইহা হইতে বাহির হইয়া এক একটি পৃথক গোলক হইয়া রহিল তাহারা মঙ্গল, বুধ, পৃথিবী ইত্যাদি সূর্যের কয়টি গ্রহ। যাহারা পৃথক হইয়া আসিল তাহারাও মূল গোলকটির ন্যায় একই দিকে স্বীয় মেরুদণ্ডের চারি-দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাকর্ষের ফলে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। ক্যাণ্ট ও লাপলাসের এই মতটি নীহারিকাবাদ (Nebular hypothesis) নামে খ্যাত। কয়েকটি কারণে শেষ পর্যন্ত এই মতবাদ টিকিল না।

বর্তমানে পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে **জিন্‌স্** ও **জেফ্রিসের** মতবাদই প্রচলিত। তাঁহাদের মতবাদ **জোয়ারী মতবাদ** (Tidal theory) বা **গ্রহকণিকাবাদ** (Planetesimal hypothesis) নামে খ্যাত। তাঁহাদের মত এই :—

সৃষ্টির আদিম যুগে সূর্য এবং সূর্য অপেক্ষা বৃহত্তর নক্ষত্রগণ বর্তমান ছিল। বহু দূর হইতে সূর্যের পাশ দিয়া সূর্যাপেক্ষা বহুগুণ বড় একটি নক্ষত্র চলিয়া যায়। চন্দ্র ও সূর্যের টানে পৃথিবীপৃষ্ঠে জলরাশি যেমন একত্রিত হইবার চেষ্টা করিয়া জোয়ার-রূপে ফুলিয়া উঠে তেমনই নক্ষত্রটির আকর্ষণে সূর্যের কিয়দংশ ফুলিয়া



১নং চিত্র—নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন হইতেছে

নক্ষত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন নক্ষত্রটি সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটে আসিল তখন

সূর্যের যে অংশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রটি আবার আপন পথে অগ্রসর হইয়া সূর্য হইতে দূরে চলিয়া গেল। সূর্য ও নক্ষত্রের আকর্ষণে সূর্যের ঐ বিচ্ছিন্ন অংশ, দুই দিকে ক্রমশ সরু হইয়া পটোল বা চুরুটের মত আকার ধারণ করিল। এই বিরাট বাষ্পীয় চুরুট বা পটোলাকার পদার্থটি কালক্রমে নৈসর্গিক কারণে খণ্ড খণ্ড হইয়া বর্তমানে গ্রহ ও উপগ্রহগণের আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। গ্রহগণের আয়তন ও দূরত্ব বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় পটোলাকৃতি বাষ্পীয় পিণ্ডটির যে অংশ ভাঙ্গিয়া যে গ্রহের জন্ম হইয়াছে সেই অংশের আয়তন অনুসারে গ্রহগণের আয়তন। তাই গ্রহমণ্ডলীর প্রায় মধ্যস্থিত বৃহস্পতি গ্রহ আয়তনে সর্বাপেক্ষা বড় এবং দুই প্রান্তের দিকে গ্রহগণ ক্রমশ ছোট হইয়া গিয়াছে।



২ নং চিত্র—পটোলাকার বাষ্পীয়পিণ্ড হইতে গ্রহগণের জন্ম

নক্ষত্রটি যখন সূর্য হইতে দূরে চলিয়া গেল তখন ইহাদের উপর সূর্যের আকর্ষণই প্রবল হইল। নক্ষত্রটি বাষ্পীয় পটোলাকার পিণ্ডটিতে যে গতি সঞ্চার করিয়াছিল, সেই গতি ও সূর্যের মহাকর্ষের ফলে উহা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিল। আজিও সে ঘূর্ণনের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

এইরূপে যখন পৃথিবী জন্মগ্রহণ করে তখন ইহা একটি বাষ্পপিণ্ড মাত্র ছিল এবং সেই বাষ্পপিণ্ড অত্যন্ত উষ্ণ ছিল। কালক্রমে তাপ বিকিরণ করিয়া ইহার পৃষ্ঠ শীতল হইতে লাগিল এবং ক্রমে সেই বাষ্প জমিয়া তরল হইল এবং আরও শীতল হইয়া কঠিন হইল। আজও পৃথিবীর চারিদিকে যে বায়ুমণ্ডলের আবরণ, তাহা আদিম যুগের বাষ্পের অংশ ভিন্ন আর কিছু নহে। সমুদ্র, নদ, নদী

প্রভৃতির জল তরলিত বাষ্প এবং মাটি, পাথর প্রভৃতি আদিম কালের বাষ্পের ঘনীভূত আকার মাত্র। একই উষ্ণতায় সকল দ্রব্য একই অবস্থায় থাকিতে পারে না একথা পূর্বেই জানিয়াছ, যেমন ০° সেন্টিগ্রেডে জল কঠিন অবস্থায় থাকে আবার ১০০° সেন্টিগ্রেডে উহা বাষ্প হইয়া যায়, অথচ লৌহকে তরল করিতে হইলে ১৫৩০° সেঃ উষ্ণ করিতে হয় এবং বাষ্প করিতে হইলে ২৫০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে তুলিতে হয়। কাজেই বাষ্পপিণ্ডের যে যে উপাদান, বর্তমান পৃথিবী পৃষ্ঠের উষ্ণতায় যে আকারে থাকিতে পারে, তাহারা সেইরূপ আকারেই আছে—কেহ বাষ্প, কেহ তরল, কেহ বা কঠিন হইয়া আছে। কিন্তু ইহার গর্ভ এখনও অত্যন্ত উষ্ণ—সেখানকার উত্তাপ বিকিরিত হইতে পায় না। কাজেই ইহাও কল্পনা করা যাইতে পারা যায়, যতই ভূগর্ভের নিচে যাওয়া যাইবে ততই উষ্ণতা বৃদ্ধি হইবে। পৃথিবীর উপরিস্থ কঠিন আবরণ নিচের দিকে ক্রমশ তরল হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রের নিকট বোধ হয় এখনও বাষ্পই বিদ্যমান রহিয়াছে।

পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হইতে লাগিল তখন প্রথমে লৌহ, নিকেল প্রভৃতির বাষ্প জমিয়া তরল হইল পরে জলীয় বাষ্প জমিল। এইরূপে বিভিন্ন তরল পদার্থ যখন একত্র হইল তখন ভারীগুলি পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট সঞ্চিত হইল এবং ক্রমে লঘুতর তরল পদার্থগুলি ইহার উপর সঞ্চিত হইল। এই লঘুতর তরল পদার্থগুলি আবার শীতল হইয়া জমিয়া কঠিন হইয়া গেল।

পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ এবং ইহাদের উপগ্রহগণ এক সময়ে সূর্যের অংশ ছিল। তাহা হইলে পৃথিবীর উপাদানগুলিও যে সূর্যে বিদ্যমান আছে ইহাও বলা যাইতে পারে।

সংক্ষেপ ঃ—ক্যাণ্ট ও লাপলাসের নীহারিকাবাদ মতে ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত বাষ্পীয় পিণ্ড হইতে বলয় পৃথক হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পর পর কয়েকটি গ্রহের সৃষ্টি করিল। সর্বশেষ যে অংশটুকু রহিল তাহাই সূর্য। এ মতবাদ এখন প্রচলিত নাই। এখন জিন্‌স্ ও জেফ্রিসএর জোয়ারীবাদ বা গ্রহকণিকাবাদ প্রচলিত। তাঁহাদের মতে সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বড় একটি নক্ষত্র সূর্যের নিকট দিয়া চলিয়া যাওয়ায় সূর্যের অংশ বিশেষ স্ফীত হইয়া ক্রমে নক্ষত্রটি নিকটতম হইলে সূর্যের

ঐ স্ফীত অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সূর্য ও নক্ষত্রের আকর্ষণে ঐ বিচ্ছিন্ন অংশের দুই দিক সরু হইয়া যায়। এই পটোলাকৃতি বাষ্পপিণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া আবার গ্রহ উপগ্রহাকারে আজিও বিদ্যমান। বিকিরণ হেতু বাষ্পপিণ্ড জমিয়া তরল ও কঠিন হইয়া যাওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠে মাটি ও জল জমিয়া উঠে। যে অংশ এখনও গ্যাসের মত রহিয়াছে, তাহাই বায়ুমণ্ডল। ভূগর্ভ এখন ভূপৃষ্ঠ হইতে বহু উষ্ণ। সেখানে যে তরল পদার্থ আছে তাহা ভূ-পৃষ্ঠের তরল পদার্থ অপেক্ষা গুরুতর।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইল বল। (State how the earth was created)

[কঃ বিঃ ১৯৪০]

২। লাপলাস ও ক্যাণ্টের মতবাদ কি ? অথবা নীহারিকাবাদ বলিতে কি বুঝায় সবিস্তার লিখ। (What is Laplas's and Cant's theory ? Or write in detail what is meant by Nebular hypothesis)

৩। জিন্‌স্ ও জেফ্রিসএর মতবাদ কি ? অথবা জোয়ারীবাদ বা গ্রহকণিকাবাদ বলিতে কি বুঝ লিখ। (What is Jean's and Zefrey's theory ? Or state what do you understand by Tidal theory Or Planetesimal theory)

৪। পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে কোন্ মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত—নীহারিকাবাদ না গ্রহকণিকা-বাদ ? দুইটি মতের আবিষ্কর্তাদের নাম কর। (What theory is current—Nebular theory or Planetesimal theory ? Who are the inventors of the theories ?)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূ-ত্বক, শিলা ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা

ভূ-ত্বক—জন্মের পর বাষ্পীয় হইতে ক্রমে পৃথিবী তরল গোলকরূপে যখন সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছিল তখন ইহার তাপ চারিদিকে বিকিরিত হইতেছিল। কাজেই শীতল হইয়া কতকগুলি উপাদান জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইল। এইরূপ জমাট বাঁধিয়া কঠিন হওয়ার ফলে সঙ্কোচন আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোথাও চাপে ফুলিয়া উঠিল, কোথাও নামিয়া গেল। যে স্থান নামিয়া গেল সে স্থানে তরল পদার্থ আসিয়া জমিল, কাজেই পৃথিবী পৃষ্ঠে কঠিন স্থল ও তরল পদার্থ জলের, একটা মোটামুটি বিভাগ হইয়া গেল। বাষ্পপিণ্ডে যে জলীয় কণা বিদ্যমান ছিল তাহারাই জমিয়া জলরূপে সঞ্চিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লবণ জাতীয় পদার্থের বাষ্প ঐ জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকিয়া গেল। এখন পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল এবং এই অসীম জলরাশি কেন লবণাক্ত বুঝিতে পারি। কিন্তু এই অসীম জলরাশির নিচেও স্থল। সমুদ্রের জলতল সীমা ধরিলে পৃথিবী পৃষ্ঠে পাহাড় পর্বতগুলির সর্বাধিক উচ্চতা প্রায় ২৯০০০ হাজার ফিট এবং সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা ৩৫০০০ হাজার ফিট। যাহা হউক পৃথিবী পৃষ্ঠের জলরাশি ভিন্ন যে স্থলভাগ আবরণরূপে বিদ্যমান তাহার উপাদানও বহু প্রকারের। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই স্থলভাগের অংশ মাত্রকেই শিলা বলিয়া থাকেন। তাহাদের মতে পাথর, নুড়ি, কাঁকর যেমন শিলা তেমনই বালুকণা কাদা মাটি প্রভৃতিও শিলা। বস্তুত খনিজ কঠিন পদার্থ মাত্রই শিলা। তবে সমস্ত শিলাগুলিকে তাঁহারা তিনটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:—**আগ্নেয়, পলল** ও **পরিবর্তিত** শিলা।

আগ্নেয় শিলা (Igneous rock):—নৈসর্গিক কারণে উত্তপ্ত অবস্থা হইতে

শীতল হইয়া কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে শিলা গঠিত হয় তাহারাই আগ্নেয় শিলা। অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয় গিরির গর্ভ হইতে যে নিস্রাব বহির্গত হয় তাহারা শীতল হইয়া আগ্নেয় শিলারূপে বিদ্য-মান থাকে। অনেক সময় আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত আগ্নেয় শিলার ভিতর বায়ু বা বাষ্পীয় পদার্থের জন্য জালি জালি ফাঁপা হইয়া যায়। আবার ধূলা, বালি, ছোট ছোট পাথর প্রভৃতি নির্গত হইয়া একত্রে জমাট বাঁধিয়া যায়—তাহারাও আগ্নেয় শিলা, তবে ইহারা **টাফ** (Tuff) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আগ্নেয় শিলা দুই রকম, **প্লুটনিক** (Plutanic) ও **ভলকানিক** (Volcanic)। ভূগর্ভের গলিত পদার্থ ভূগর্ভে আবদ্ধ থাকিয়া শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যাওয়ায় প্লুটনিক শিলা সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ভলকানিক শিলা ভূগর্ভের বাহিরে আসিয়া জমিয়া থাকে।

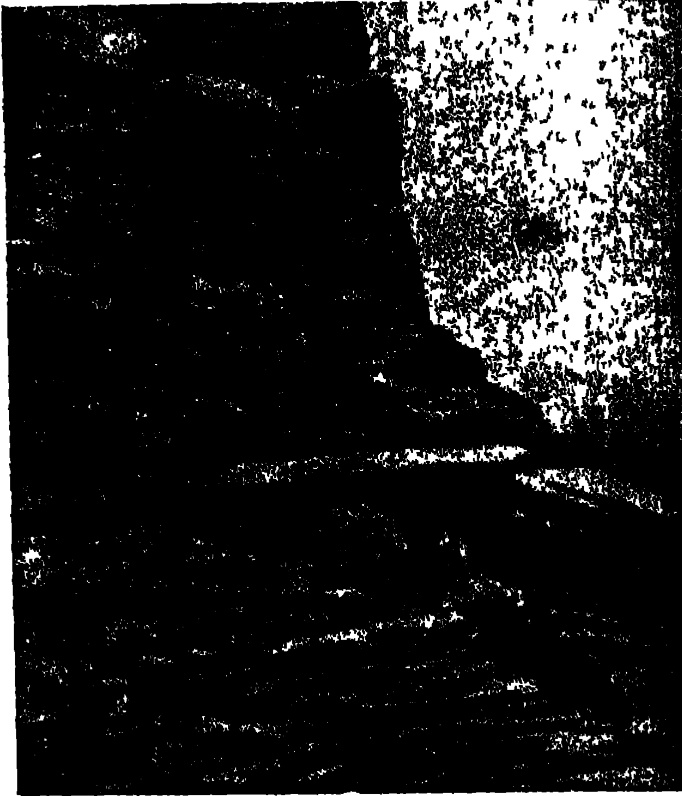


৩নং চিত্র—আগ্নেয় শিলা

গ্র্যানাইট (Granite) প্লুটনিক শিলার উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহারা সাধারণত তিন প্রকার বিভিন্ন উপাদানের সহিত পরস্পর ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। মাংসের রঙের মত অল্প লালাভাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসিত অংশটির নাম **ফেলস্পার** (Felspar)। ইস্পাতের ছুরিকাঘাতে ইহাতে দাগ পড়ে। স্বচ্ছ কাচের মত আর একটি উপাদান ইহাতে থাকে তাহার উপর ছুরির আঁচড় বসে

না, সে উপাদানটিব নাম **কোয়ারট্‌জ** (Quartz)। বাকি তৃতীয় উপাদানটি **অভ্র** (Mica), ইহা নবম, ছুবিব আঁচড়ে ইহাব উপব দাগ পড়ে—দেখিতে কখনও সাদা, কখনও কাল, পর্দায় পর্দায় সজ্জিত। অনেক সময় এরূপ আগ্নেয় শিলাগুলি ভূসমান্তবাল ভাবে থাকে কখনও বা ফাটলেব মধ্যে খাড়া ভাবে জমাট বাঁধিয়া থাকে, পূর্বোক্তগুলি **শিল** (Sill) শেষোক্তগুলি **ডাইক** (Dyke)।

পলল শিলা (Sedimentary Rock):—বায়ু, বৃষ্টি, সূর্যোত্তাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কাবণে বাসাযনিক বা যান্ত্রিক উপাযে পৃথিবীব পৃষ্ঠে ক্রমাগত ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে। ফলে পৃথিবীব এক স্থানেব শিলা বা মৃত্তিকা অন্য স্থানে চালিত হইতেছে। একটি স্তবেব উপব একটি স্তব ক্রমে আব একটি স্তব সজ্জিত হইযা যে শিলা গঠন করে তাহাই **পলল** শিলা। আমবা নিত্য বাটনা বাটিবাব জন্য যে শিলা ব্যবহাব কবি তাহা পলল শিলা। যখন শিল কাটাই হয তখন একটু লক্ষ্য কবিলে দেখিবে, যে শিল কাটে সে কাটিবাব সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে আঘাত কবিলে প্রস্তবী-ভূত বালুকণাগুলি সারি-বদ্ধ ভাবে ছাড়িযা যায। চেষ্টা কবিলে ইহাকে স্তবে স্তবে ছাড়াইযা ফেলা যায—বালুকণাগুলি এমন সুসংবদ্ধ ভাবে সাজান থাকে। কলিকাতাব ফুটপাথে যে পাথব গাঁথা থাকে তাহা পলল



৪নং চিত্র—পলল শিলা

শিলার অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ—ইহাদিগকে **বেলে পাথর** (Sandstone) কহে।

এইরূপ স্তর বিন্যস্ত হয় বলিয়া এমনও দেখা যায় পলল শিলার মধ্যে কত জীব জন্তুর কঙ্কাল বা জীবাশ্ম প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। আগ্নেয় শিলা উত্তপ্ত উপাদান হইতে গঠিত বলিয়া কখনও ইহার মধ্যে জীব থাকিতে পারে না। তাই আগ্নেয় শিলার মধ্যে কখনই জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব নয়। জীবাশ্ম থাকা বা না থাকাই পলল শিলা বা আগ্নেয় শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। উত্তাপ হেতু কয়লার জন্ম, তথাপি কয়লা এক প্রকার পলল শিলা।

হিমালয় পর্বতে এমন অনেক পলল শিলা পাওয়া যায় যাহাতে সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর জীবাশ্ম রহিয়াছে। ইহাতে বলা যায় এক সময়ে ঐ সকল শিলাগুলি সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপে জলজ বা স্থলজ, সামুদ্রিক বা হ্রদের গাছপালা বা জীবজন্তুর জীবাশ্ম দেখিয়া কোন্ শিলা কোথায় জন্মিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

পরিবর্তিত শিলা (Metamorphic rock)—তাপ ও চাপ ইত্যাদির বৈষম্য হেতু আগ্নেয় বা পলল শিলা হইতে পরিবর্তিত শিলা উৎপন্ন হয়। ইহাদিগকে দেখিলে সহজে কোন্ শ্রেণীভুক্ত ধরা যায় না। চুনা পাথর হইতে মার্বেল পাথরের জন্ম। দেখিলে কিন্তু মনে হয় না যে কোন দিন মার্বেল পাথর চুনা পাথর ছিল। মনে হয় চুনা পাথর পলল শিলা এবং মার্বেল পাথর আগ্নেয় শিলা। এইরূপ কর্দম হইতে শ্লেট পাথরের জন্ম।

অনেক সময় দেখা যায় জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাদির অবশিষ্ট একত্র হইয়া প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগকে **জৈব** শিলা (Organically derived rock) বলা হয়। চা-খড়ি এবং স্পঞ্জ জৈব শিলার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে নানা জাতীয় শিলার আস্তরণটিতে আগ্নেয় শিলা এবং পলল শিলা সমপরিমাণে বর্তমান। খনি বা নলকূপ খনন করিবার কালে

পৃথিবীব অভ্যন্তবস্থ শিলা পবীক্ষা কবিযা দেখা গিযাছে, পৃথিবীব অভ্যন্তবে ভূপৃষ্ঠ হইতে অল্প নিচে আব পলল শিলা নাই, কেবলমাত্র আগ্নেয শিলা এবং তাহা প্রধানত গ্র্যানাইট জাতীয। সমুদ্রতলে বা সমুদ্র মধ্যে যে দ্বীপ গুলি আছে তাহারা **ব্যাসল্ট** (Basanlt) জাতীয শিলাদ্বাবা গঠিত। আগ্নেয গিবি হইতে যে লাভা উদ্গীর্ণ হয তাহাও ব্যাসল্ট জাতীয। ব্যাসল্ট আগ্নেয শিলা। গ্র্যানাইট যেমন ভূগর্ভে জমিযা থাকে—ইহাবা সেরূপ নহে। ভূগর্ভ হইতে বাহিব হইযা ভূপৃষ্ঠে জমিযা থাকে।

এইরূপে বুঝা যায স্থলভাগ প্রধানত গ্র্যানাইট জাতীয শিলায প্রস্তুত। ইহাব নিচে সাগবেব তলদেশ দিযা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আব একটি স্তব আছে তাহা প্রধানত ব্যাসল্ট দ্বাবা গঠিত। ব্যাসল্ট স্তব হইতে পৃথিবী পৃষ্ঠ পর্যন্ত স্তরগুলিকে আমবা সাধাবণত ভূত্বক বলিযা থাকি। কযেকটি প্রাকৃতিক কাবণে পৃথিবী কেমন কবিযা পবিবর্তিত হইতেছে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পাহাড হইতে প্রস্তব ও উপলখণ্ড নদী স্রোতে বাহিত হইযা নিম্ন দিকে গডাইযা আসিতেছে। আসিবাব সময পবস্পব পবস্পবেব সহিত ঘর্ষণে ক্রমে ক্ষুদ্রাকাব হইযা যায। অবশেষে বড বড প্রস্তব খণ্ড বালুকণায পবিণত হইযা যায। নদী যখন সমতল দেশে আসে তখন উহাব বেগ মন্দীভূত হয, কাজেই অপেক্ষাকৃত বড় এবং ভাবী প্রস্তব খণ্ড থিতাইযা পডে। যত সমুদ্র নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই ইহাব বেগ কমিযা আসে। আসিবাব সময পথিমধ্য হইতে যে কর্দম বাহিয়া আনিযা ছিল তাহা বালুকণাব সহিত জমিযা স্থানে স্থানে সঞ্চিত হয ও চবেব সৃষ্টি কবে। নদীমধ্যবর্তী চব ক্রমশ বিস্তীর্ণ হইয়া নদীকে বিভিন্ন ধাবায বিভক্ত কবে। এই চবভূমিব উর্ববতা অতিশয প্রবল। নদী যখন সাগবে আসিযা পডে তখন উহাব মোহানাব নিকট যে ত্রিকোণাকাব চবগুলি সৃষ্টি কবে তাহাদিগকে ব-দ্বীপ বলে। এই ব-দ্বীপে ক্রমে চাষ আবাদ হইতে মানুষেব বসতি আবম্ভ হয। তখন ইহা জনপূর্ণ

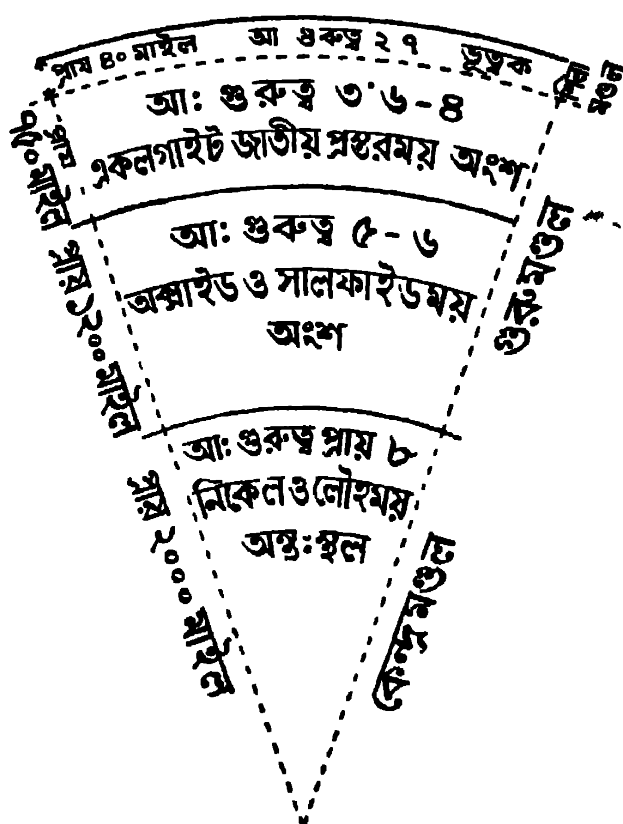
লোকালয়ে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর উপর বায়ু ও তাপের ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে ইহার পৃষ্ঠ পরিবর্তিত হইতেছে তাহা পদার্থ বিষ্ঠার চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে কিছু কিছু পড়িয়াছ। ভূচাঞ্চল্যে উহার পৃষ্ঠে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে পাঠ করিবে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা

পূর্বে জানা গিয়াছে পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫ এবং ইহার ব্যাসার্ধ ৪০০ চারি হাজার মাইল। খনি খুঁড়িয়া মানুষ মাত্র দুই মাইল পর্যন্ত ইহার গর্ভে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সমুদ্রের গড় গভীরতাও ন্যূনাধিক দুই মাইল। বাকি অংশ কি উপাদানে গঠিত তাহা প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিতে মানুষের সাধ্য হয় নাই। কল্পনা দ্বারা বৈজ্ঞানিকগণ যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাতেও যথেষ্ট মত ভেদ পরিলক্ষিত হয়। তথাপি মানুষের মনে অজ্ঞাত জিনিষের বিষয়ে জানিবার আকাঙ্খা চির প্রজ্জলিত থাকায় তাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা জানিবার জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছে।

ভূ-ত্বক মাত্র ৪০ মাইল পুরু। ইহার প্রধান উপাদান গ্র্যানাইট ও ব্যাসল্ট জাতীয় শিলা, প্রথম ২৫ মাইল গ্র্যানাইট, পরবর্তী ১৫ মাইল ব্যাসল্ট। কিন্তু এতদুভয়ের গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬ বা কিঞ্চিদধিক। তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে পদার্থ আছে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮ এর কম নহে। এ দিকে আবার লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পৃথিবীর কেন্দ্রের যত নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রতি ১০০ ফুট গভীরতায় ১° ফারেনহিট উষ্ণতা বাড়ে। অবশ্য যত কেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই এই উষ্ণতা বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়। তখন আর প্রতি একশত ফুটে ১° ডিগ্রী ফারেনহিট উষ্ণতা বাড়ে না। যাহা হউক কম হারে বাড়িলেও বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন কেন্দ্রের নিকট উষ্ণতা এক লক্ষ ডিগ্রী

ফারেনহিটের কম হইবে না। এত অধিক উষ্ণতায় পার্থিব কোন পদার্থই কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না, গ্যাসীয় আকার ধারণ করে। আবার এদিকে ভূ-ত্বক কঠিন হওয়ায় অভ্যন্তরস্থ পদার্থ গ্যাসীয় হইয়া প্রসারিত হইতে না পারিয়া অত্যধিক চাপের মধ্যে থাকে। এই চাপের পরিমাণ হিসাব করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ু মণ্ডলের চাপের ত্রিশ-লক্ষগুণ অধিক। অতএব এত চাপে পূর্বোক্ত উষ্ণতায় থাকিয়াও পার্থিব পদার্থ গুলি কঠিন পদার্থের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। যদি কোনক্রমে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের ঐরূপ কোন এক স্তর পর্যন্ত ছিদ্র করা যায় তবে প্রচণ্ড বেগে গলিত উপাদান বাহিরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইবে।



৫নং চিত্র—ভূ-গর্ভের স্তর

ভূ-ত্বকের পরে প্রায় ৭৫০ মাইল পুরু স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫ বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। ইহাও এক প্রকার প্রস্তর জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

পরবর্তী ১২০০ মাইল পুরু স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫ হইতে ৬, ইহা প্রধানত অক্সাইড ও সালফাইডময় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্র হইতে ২০০০ মাইল ব্যাসার্ধ লইয়া যে স্তর, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮, নিকেল এবং লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্বও তাই। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন পৃথিবীর কেন্দ্রে লৌহ ও নিকেল আছে। উল্কায় এই দুইটি ধাতু থাকে।

কাজেই পৃথিবীর কেন্দ্রে যে নিকেল ও লৌহ আছে সে ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া যায়।

আগ্নেয় গিরি হইতে লাভা উদ্গীরণ, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উষ্ণ প্রস্রবন, খনির ভিতর উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি পৃথিবীর অভ্যন্তর যে উষ্ণ তাহা প্রমাণ করিতে বিশেষরূপে সাহায্য করে।

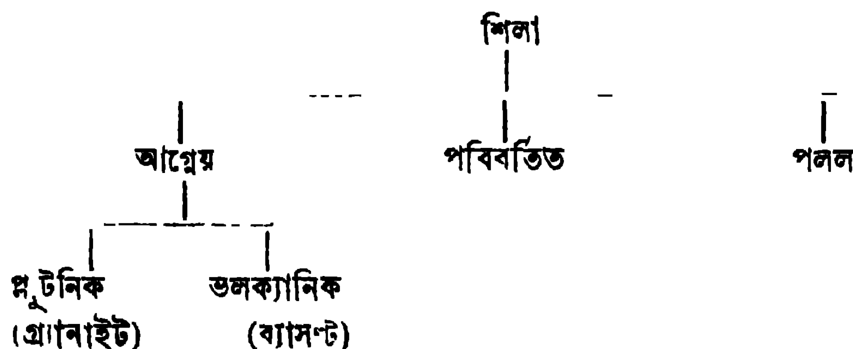
পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন এক স্থানে কোন বিশেষ কারণে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে সময় সময় ভূপৃষ্ঠে তাহা ভূমিকম্পরূপে প্রকাশ পায়। বিস্তীর্ণ ভূমি লইয়া ভূমিকম্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও ইহা একটি কেন্দ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই কম্পন তরঙ্গ দুই প্রকার। কতকগুলি তরঙ্গ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, কতকগুলি কেবল মাত্র কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া চালিত হয়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়াই তরঙ্গগুলি দ্রুততর বেগে ছড়াইয়া পড়ে এবং পদার্থ যত স্থিতিশীল হয় ইহার মধ্যে কম্পনতরঙ্গের গতিও তত দ্রুত হয়।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে ভূ-ত্বক দিয়া ভূমিকম্পের তরঙ্গ যে সময়ে কোন এক নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে, নিম্নতর স্তর দিয়া তদধিক দূরত্ব অতিক্রম করিতে তাহা অপেক্ষাও অল্প সময় লাগে। অতএব ভূগর্ভের অভ্যন্তর ভাগ ক্রমেই গুরু হইতে গুরুতর বা অধিক স্থিতিশীল।

ভূ-ত্বককে **শিলামণ্ডল** (Lithosphere), নিকেল বা লৌহময় স্থানকে **কেন্দ্রমণ্ডল** (Centrosphere) এবং বাকি অংশকে **গুরুমণ্ডল** (Barysphere) বলা হয়।

সংক্ষেপ ঃ—তাপবিকিরণ হেতু পৃথিবীপৃষ্ঠ গ্যাসীয় হইতে ক্রমে তরল ও কঠিন হইয়াছে। অভ্যন্তর এখনও খুব উত্তপ্ত আছে। ভূপৃষ্ঠ কঠিন হওয়ায় চাপে কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হইয়াছে, নিচু স্থানে জল জমিয়া সমুদ্ররূপে বর্তমান। সর্বাধিক উচ্চস্থান গুলি পাহাড় পর্বতরূপে বিদ্যমান। লবণ জাতীয় বাষ্প ঐ জলে গুলিয়া যাওয়ায় সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর উপাদানগুলি, কাঁকর, বালি, মাটি, কাদা পাথর, যাহাই

হউক না কেন বৈজ্ঞানিকগণের মতে সকলগুলিই শিলা। আগ্নেয়, পলল পরিবর্তিত, তিন রকম শিলা; আগ্নেয় শিলায় জীবাশ্ম নাই এবং স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নয়—পলল শিলায় জীবাশ্ম দেখা যাইতে পারে এবং ইহার মধ্যে স্তর আছে। আগ্নেয় শিলার যাহারা ভূগর্ভে জমাট বাঁধে তাহারা গ্র্যানাইট জাতীয়, যাহারা বাহিরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া জমাট বাঁধে তাহারা ব্যাসল্ট জাতীয়। যেগুলি ভূসমান্তরাল স্তরে জমে তাহারা ডাইক, যাহারা খাড়া ভাবে সঙ্কীর্ণ পথে জমাট বাঁধে তাহারা শিল। শিলা, কাদা নদীবাহিত হইয়া চর ও ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে।



ভূ-ত্বক বা শিলামণ্ডল ৪০ মাইল পুরু—সকলের উপরের অংশ গ্র্যানাইটময়। পরবর্তী ১৫ মাইল ব্যাসল্ট গঠিত। ভূ-ত্বকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬। পরবর্তী ৭৫০ মাইল প্রস্তরময়, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫, তৎপরবর্তী ১২০০ মাইল অক্সাইড ও সালফাইডময়—আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫ হইতে ৬। সর্বসমেত ১৯৫০ মাইল গুরুমণ্ডল। কেন্দ্রের চতুর্দিকে ২০০০ মাইল নিকেল ও লৌহ গঠিত, কেন্দ্রমণ্ডল সর্বাপেক্ষা ভারী, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। ভূ-ত্বক কিরূপে সৃষ্ট হইল (কঃ বিঃ ১৯৪০)? ইহার উপাদান কি কি? ইহার বেধ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব কত? কেন ইহার নাম শিলামণ্ডল হইল বল। (How the earth's crust was formed? What are its constituents? What are its thickness and specific gravity? Why is it called lithosphere?)

২। আগ্নেয়, পলল ও পরিবর্তিত শিলা কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। (Explain with example what are called igneons, sedimentary and metamorphic rocks)

৩। জৈব শিলা, গ্র্যানাইট, ব্যাসল্ট, ডাইক, শিল, বলিতে কি বুঝ লিখ। (What do you understand by organic rock, granite, basault, dyke and sill ?)

৪। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান বিস্তারিত ভাবে লিখ। (Write in detail what you know about the interior of the earth)

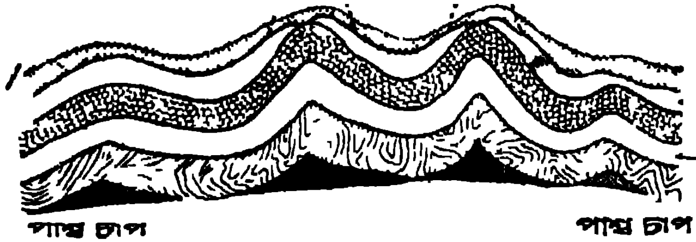
৫। নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল। (Write what you know of the following – Barysphere and centro-sphere)

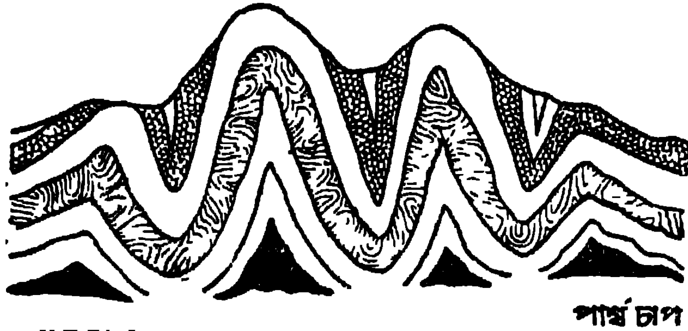
———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভূ-চাঞ্চল্য

পূর্বে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। এইবার ভূ-চাঞ্চল্যের জন্য আলোড়ন বা তজ্জনিত পৃথিবীর বহির্গঠন কিরূপে পরিবর্তিত হয় দেখা যাউক। যখন পৃথিবী শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইতে লাগিল তখন ভূ-ত্বকে চাপ লাগিল। ফলে কোন স্থান উঁচু হইয়া উঠিল কোন স্থান নিচু হইয়া গেল। এই উঁচু নিচু হইবার একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাইতে পারে। এক গোছা পাতলা কাগজ উপর উপর সাজাইয়া রাখিয়া তাহার উপর কোন ভারী জিনিষ রাখিয়া দুই দিক হইতে চাপ দিলে দেখা যায় দুই পাশের চাপের মধ্যবর্তী স্থানটুকুর কোথাও উঁচু কোথাও নিচু হইয়া গিয়াছে।

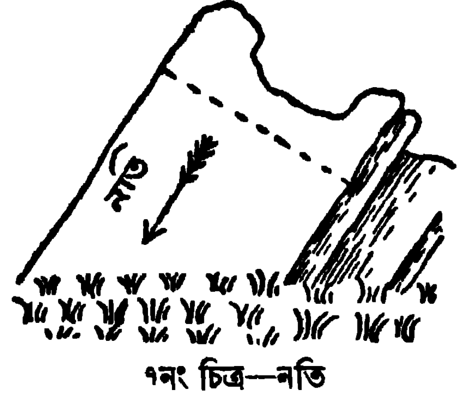




৬নং চিত্র—ভূ-ত্বকে ভাঁজ

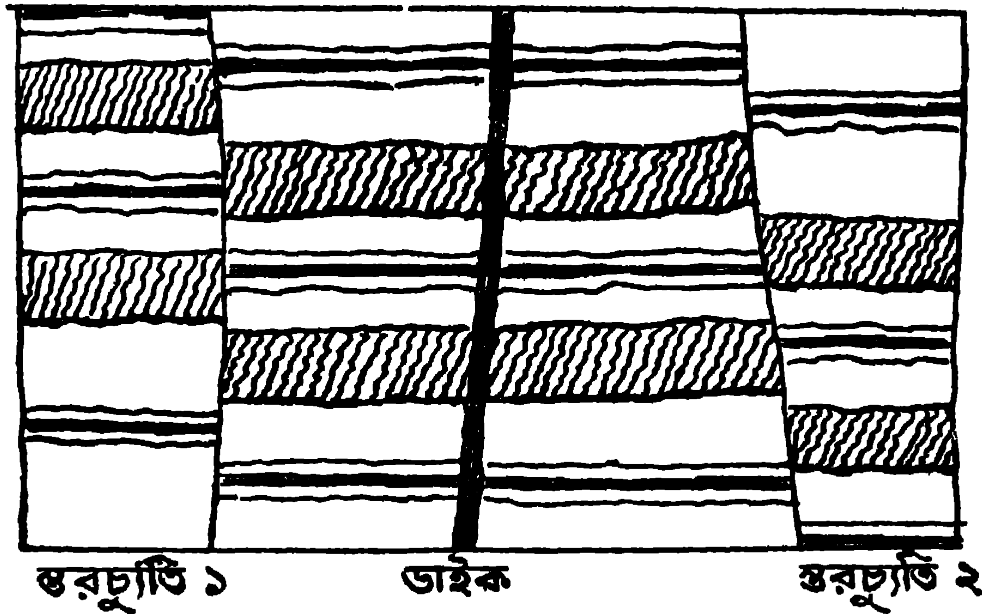
চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে স্থান উঁচু হইল সেটি পাহাড় বা পর্বত হইল, যেস্থান নামিয়া গেল সেখানে হ্রদ, সমুদ্র আবার কোথাও বা উপত্যকা, আধিত্যকা ইত্যাদি সৃষ্টি করিল। সঙ্কোচন হেতু পৃথিবীর ঐরূপ কয়েকটি উন্নত বা অবনত স্থানের সমষ্টিকে **ভাঁজ** (Fold) বলা হয়। ভাঁজের মধ্যে কোথাও কোথাও ফাঁপা থাকিয়া যাওয়াও স্বাভাবিক। কখনও কখনও এই চাপ হেতু ভূ-ত্বকের

শিলাগুলি বাঁকিয়া **নত** (Tilted) হইযা যায। চিত্রে একটি শিলার নতি দেখান হইল। পূর্বে তোমবা কাহাকে ডাইক বা শিল বলে জানিযাছ। এই ডাইক বা শিল উৎপন্ন হইলে উহাদেব দুই পার্শ্ববর্তী ভূ-স্তবেব মধ্যে আঁট থাকে না, সুযোগ পাইলে অতি সহজেই এক পার্শ্বেব নয় অপব পার্শ্বেব স্তব উঠিযা বা নামিযা যায, ইহাকে **স্তরচ্যুতি**



৭নং চিত্র—নতি

(Fault) বলা হয। সকল সময়ই যে শিল বা ডাইকের জন্যই স্তবচ্যুতি হয়



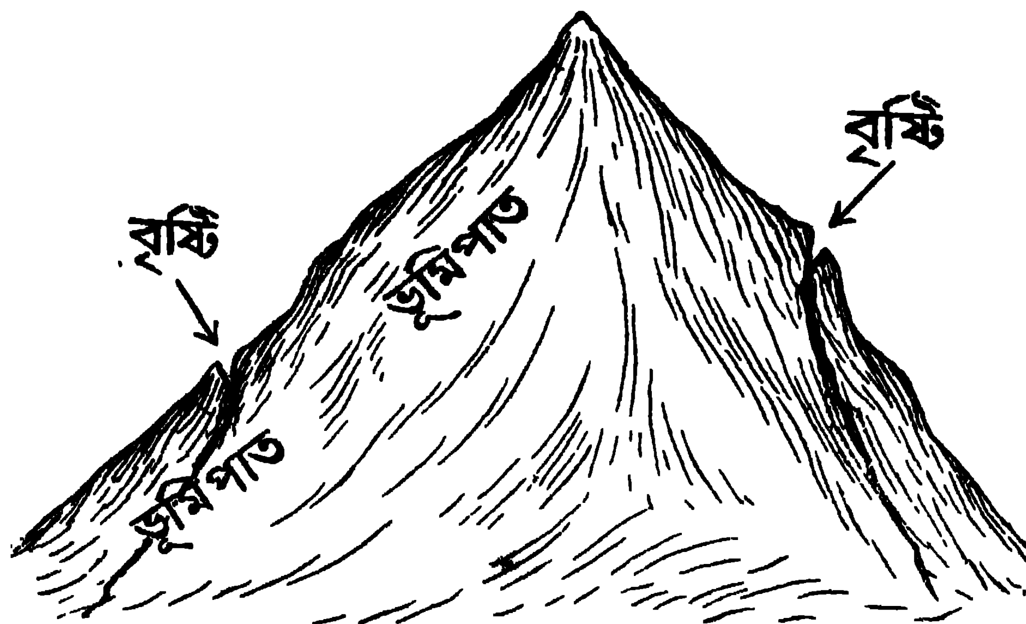
৮নং চিত্র—স্তবচ্যুতি

এমন নহে। শিল বা ডাইক না থাকিলেও স্তবচ্যুতি হইতে পাবে। চিত্রে একটি স্তবেব চ্যুতি দেখান হইল।

ভূস্তবেব এক অংশেব তিনটি ডাইকেব জন্য উহাব পবিণতি দেখান হইল। বামদিকেব স্তবটি মধ্যেব স্বাভাবিক স্তব হইতে উঠিযা গিযাছে এবং ডানদিকেব স্তবগুলি নামিযা গিয়াছে, কিন্তু মধ্যস্থলে একটি ডাইক থাকা স্বত্বেও স্তবচ্যুতি হয় নাই, দুই পার্শ্বের স্তবগুলি সমান সমান বিন্যস্ত বহিযাছে।

যখন স্বাভাবিক স্তর হইতে একটি স্তর চ্যুত হইয়া নিচে নামিয়া যায় তখন স্বাভাবিক চ্যুতি (চিত্রে ২) এবং যখন উঠিয়া যায় তখন বিপরীত চ্যুতি (চিত্রে ১) ঘটে।

পর্বত গাত্রে যদি শিথিল শিলাস্তর কিংবা পর্বতের ঢালের দিকে ঢালু হইয়া শিলাস্তর থাকে তবে তাহা পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য খসিয়া



৯নং চিত্র—ভূমিপাত

পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষত যখন বৃষ্টিপাত হইয়া উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পায় তখন খসিয়া পড়া আরও সহজ হইয়া যায়। এইরূপ শিলা খসিয়া যাওয়াকে **ভূমিপাত বা ধস** (Landslide) বলা হয়। হিমালয়ে প্রায়ই এরূপ ভূমিপাত হইয়া থাকে। একই রকমে বরফ বা তুষার খসিয়া পড়াকে **বরফনামা** (Avalanche) বলে।

ভূমিকম্পঃ—কোন কারণে ভূ-ত্বকে কম্পন হইলেই ভূমিকম্প হয়। আমরা অনেক সময় বোঝাই লরী অথবা রেল গাড়ী চলিয়া যাইবার সময় মৃদু ভূকম্পন অনুভব করি। কিন্তু নৈসর্গিক কারণে যে ভূমিকম্প হয় তাহার প্রভাব যেমন বহুদূর প্রসারী হয় তেমনই তাহার ধ্বংস শক্তিও

অসীম—মানবেব ধাবণাব অতীত। এই যে সে দিন উত্তব বিহাব ও কোযেটায পব পব দুইটি ভীষণ ভূমিকম্প হইযা গেল, ইহাব ফলে যে মানবেব ক্ষতি হইযাছে তাহা মানুষেব দ্বাবা এত অল্প সমযে কখনও সংঘটিত হইতে পাবে না। মানুষ প্রকৃতিব এ তাণ্ডব-লীলা দেখিযা আপনাব ক্ষুদ্র শক্তি যে কত অকিঞ্চিৎকব তাহা বুঝিযাছে।



•নং চিত্র—ভূমিকম্পের ফলে ফাটল

পূর্বে মানুষেব ধাবণা ছিল কেবলমাত্র আগ্নেয়গিবিব লাভা উদ্গীবণেব ফলেই ভূমিকম্প হইযা থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহুবিধ নৈসর্গিক কাবণেই ভূ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয এবং ভূ-চাঞ্চল্যেব ফলে ভূমিকম্প হইতে পাবে। বড বড ভূমিকম্প গুলিব প্রধান কাবণ স্তবচ্যুতি বলিযা ভূতত্ত্ববিদ্-গণেব অভিমত।

ভূ-কম্পন লেখন যন্ত্র (Seismograph) সাহায্যে একস্থানে ভূমিকম্প হইলে পৃথিবীব বিপবীত দিকে আট হাজাব মাইল পর্যন্ত ভূমিকম্পেব তবঙ্গেব গতি পথ, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ণয কবা যায। আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। কিন্তু এই যন্ত্র সাহায্যে পবীক্ষা কবিযা জানা গিযাছে পৃথিবীব উপব ভূমিকম্প হইবাব একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে—তাহা পৃথিবীব চাবিদিক ঘেবিযা একটি কটিবন্ধেব মত

রহিয়াছে। তাহাকে **প্রকম্পন কটিবন্ধ** (Seismic belt) বলা হয়। অতএব এই প্রকম্পন কটিবন্ধের মধ্যে যে সকল দেশ পড়ে তথায় ভূমিকম্প অধিক হয়। জাপান এবং বিহার ও কোয়েটা এরূপ কটিবন্ধের উপর অবস্থিত।

জলে ঢিল ছুঁড়িলে যেমন জলের উপর একটি ক্ষুদ্র স্থান হইতে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া জলতলের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—ভূমিকম্পও সেইরূপ একটি ক্ষুদ্র স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যে স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে **নাভী** (Focus) বলা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনও তরল আছে—তবে জলের মত তরল নাও হইতে পারে। এই তরল পদার্থের অংশ-বিশেষ অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিলে ভূচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে। ফলে ভূ-ত্বক ফাটিয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিতে পারে।

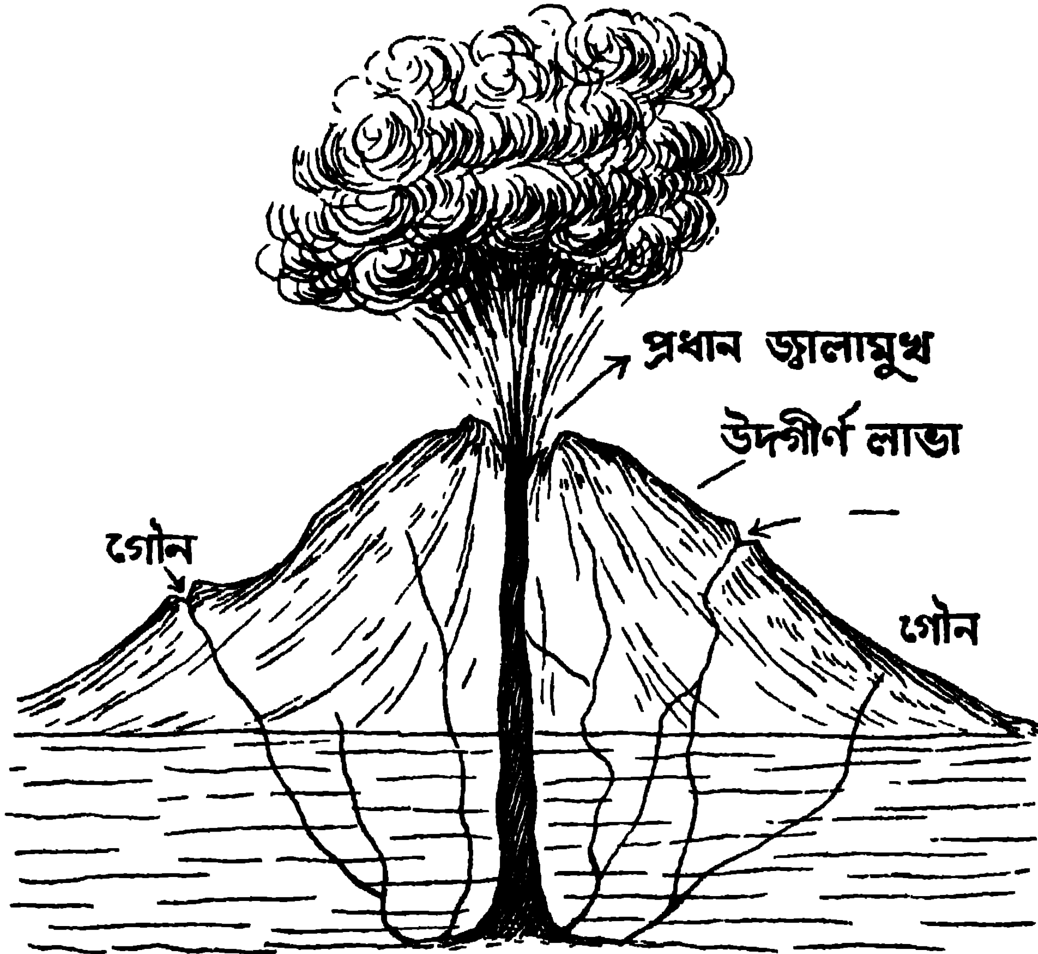
ভূমিকম্পের ফলে অনেক স্থান উঁচু নিচু হয়—মাটি ফাটিয়া যায় এবং সেই ফাটল হইতে শীতল ও উষ্ণ জল অথবা বালি উত্থিত হয়। কোথাও বা গন্ধক ও গলিত ধাতু নিঃসৃত হয়। বিহারের ভূমিকম্পের ফলে এইরূপ বহু দীর্ঘ ফাটল উৎপন্ন হইয়াছিল, বালি নিঃসৃত হওয়ায় কত জমি যে বালি চাপা পড়িয়া উর্বরতা হারাইয়া চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়া আছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

পৃথিবীর কেন্দ্র ও ভূমিকম্পের নাভীকে সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া ঐ রেখাকে বর্ধিত করিলে ভূপৃষ্ঠে যেখানে আসিয়া পৌছায় তাহাকে **উপকেন্দ্র** (Epicentre) বলে। তাই বলিয়া নাভী বা উপকেন্দ্রকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু বলিয়া মনে করিও না। অনেক সময় একটি দীর্ঘ রেখাও ভূমিকম্পের নাভী হইতে পারে। বিহারের ভূমিকম্পের নাভী ছিল কাটামুণ্ড হইতে জামালপুর পর্যন্ত দীর্ঘ।

আগ্নেয়গিরি—নাম শুনিয়া কেহ মনে করিও না আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি উদ্গীর্ণ হয়। ইহার দ্বারা ভূগর্ভস্থ দাহ্য বাষ্প, জল, জলীয় বাষ্প, গলিত ধাতু, শিলা বা লাভা, ধূম, ধূলিকণা, বালি, পাথর কণা প্রভৃতি নির্গত হয়। অনেক সময় দাহ্য

বাষ্পগুলি বাহিরে আসিয়া জ্বলিয়া উঠে। সকল সময়ে যে আগ্নেয়গিরিগুলি পাহাড় বা পর্বতের আকার ধারণ করিবে তাহা মনে করিও না। সমতল ভূপৃষ্ঠেও লাভা উদ্গীর্ণ হয়, তবে ঐ সকল লাভা বাহিরে আসিয়া চতুর্দিকে জমিয়া পাহাড়ের আকার ধারণ করে। যে স্থান দিয়া লাভা প্রভৃতি নির্গত হয় তাহাকে আগ্নেয় গিরির **জ্বালামুখ** (Crater) বলে। অনেক আগ্নেয়গিরির একাধিক মুখ দেখা যায়, একটি প্রধান ও বড়, অপরগুলি ক্ষুদ্রতর।

কতকগুলি আগ্নেয়গিরি হইতে কেবল মাত্র লাভা উদ্গীর্ণ হয়, তাহারা



১১নং চিত্র—আগ্নেয়গিরি

শান্ত প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি, ইহা হইতে মানুষের ক্ষতি হয় না। কিন্তু কতকগুলি হইতে কেবল বাষ্প বাহির হয় এবং সেগুলি বিস্ফোরক ও মানুষের

অনিষ্টকর। এই প্রকার আগ্নেয়গিরি হইতে শিলাচূর্ণ, ধূলা, বালি নির্গত হইয়া উপরে ছড়াইয়া পড়ে। সুণ্ডায় ক্রাকাটোয়া এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি।

কোন কোন আগ্নেয়গিরি কিছুকাল **সুপ্ত** (Dormant) থাকিয়া পুনরায় **সক্রিয়** (Active) হইয়া উঠে—তাহাদিগকে সবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে। শিশিলি দ্বীপের 'এট্না' এই জাতীয়, যে গুলি হইতে নিয়ত উদ্গীরণ হয় তাহাদিগকে অবিরাম বলা হয়। ষ্ট্রম্বলা একটি অবিরাম আগ্নেয়গিরি। কতকগুলি আবার এতদিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে যে তাহাদিগকে **নির্বাপিত** (Extinct) আগ্নেয়গিরি বলা চলে। পৃথিবীতে এরূপ মৃত আগ্নেয়গিরি অনেক আছে। কিন্তু একথা কেহই বলিতে পারেন না, আগ্নেয়গিরি যত দিনের জন্যই নির্বাপিত থাকুক না কেন একদিন তাহা আবার সক্রিয় হইবে না। বহুযুগ নির্বাপিত থাকিয়াও কোন কোন আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে।

ভূ-ত্বকের ঠিক নিচে নরম ব্যাসল্ট শিলা জাতীয় উপাদান আছে। ভূ ত্বকে এমন বড় বড় ফাটল দেখা যায় যে ভূপৃষ্ঠ হইতে তাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঐ শিলা পর্যন্ত পৌছিয়াছে। পার্শ্ববর্তী শিলার চাপে হউক বা স্থান বিশেষে লাভা উত্তপ্ত হইবার জন্যই হউক ইহারা জোরে ভূগর্ভ হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসে। ইহাই আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ। ১১নং চিত্রে দেখিতে পাইবে প্রধান জ্বালামুখ হইতে লাভা উদ্গীর্ণ হইতেছে বটে কিন্তু আরও কয়েকটি অপ্রধান জ্বালামুখ রহিয়াছে। জ্বালামুখগুলি বাটির মত। যে প্রধান ফাটল হইতে লাভা নির্গত হয় তাহার পাদদেশে একটি বিশাল গহ্বরে লাভা সঞ্চিত থাকে, তাহাকে **ভূ-বীর্য প্রকোষ্ঠ** (Magma chamber) বলা হয়। এই প্রকোষ্ঠ হইতে আরও ছোট বড় ফাটল আঁকিয়া বাঁকিয়া গেলে জ্বালামুখ দিয়া বাহির হয়, কতকগুলি আবার ইহার গহ্বরেই শেষ হইয়া যায়।

এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে এক একটি আগ্নেয়গিরি আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পর্বতমালার ন্যায় ইহারাও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আছে। আফ্রিকার

পূর্ব ভাগ দিয়া মাদাগাস্কার ও কিউলিযান প্রভৃতি দ্বীপ পর্যন্ত একটি আগ্নেয়গিরি শ্রেণী আছে। পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ (West Indies) হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগর, এশিয়া মাইনর প্রভৃতির মধ্য দিয়া সুমাত্রা, জাভা দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের হাউই দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত আর একটি আগ্নেয় গিরি শ্রেণী অবস্থিত। এরূপ আরও ছোট খাট আগ্নেয় গিরি শ্রেণী পৃথিবীতে অনেক আছে।

ভূমিকম্পের তুলনায় আগ্নেয়গিরির, মানুষের ক্ষতি করিবার অধিক ক্ষমতা নাই। আগ্নেয়গিরির প্রভাব অল্প স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাহার এক নির্দিষ্ট সীমা আছে। কিন্তু ভূমিকম্পের তাণ্ডব নর্তন কোথায় কি ভাবে কখন ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিবে কেহই বলিতে পারে না এবং এই ধ্বংসক্রিয়া হয়ত অনন্ত প্রসারিতও হইতে পারে।

সংক্ষেপ—পৃথিবীপৃষ্ঠের সঙ্কোচনের ফলে ভূত্বকে ভাঁজ, নতি ও ফাটল হইয়া থাকে—ভাঁজের মধ্যে ফাঁপা স্থান থাকাও সম্ভব। ডাইক বা শিলের দুই পার্শ্বের শিলা পরস্পর দৃঢ় সংবদ্ধ না হওয়ায় সুযোগ পাইলে সরিয়া যাইতে পারে, তাহাকে স্তরচ্যুতি বলা হয়। কেবলমাত্র শিল বা ডাইকের জন্যই যে স্তরচ্যুতি হয় এমন নহে। পর্বতের ঢালু দিয়া ইহার অংশবিশেষ স্খলিত হওয়ার নাম ভূমিপাত, এইরূপ বরফ পড়িলে বরফ নামা বলে। স্তরচ্যুতি, আগ্নেয় গিরির উদ্গীরণ প্রভৃতি বহুবিধ নৈসর্গিক কারণে ভূমিকম্প হয়। একটি নির্দিষ্ট স্থান (নাভী) হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবীর কেন্দ্র ও ভূমিকম্পের নাভী যে রেখায় আছে তাহা পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে আসিয়াছে তাহা ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। ভূকম্পলেখন যন্ত্র সাহায্যে দেখা গিয়াছে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রকম্পন কটিবন্ধে যে সকল দেশ পড়ে সেখানেই ভূমিকম্প বেশী হইবার সম্ভাবনা।

ভূগহ্বরস্থ নরম ব্যাসল্ট শিলা জাতীয় উপাদানের স্তর হইতে একটি ফাটল দিয়া বাষ্প, গলিত শিলা, ধূলা প্রভৃতির উদ্গীরণকে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের যে স্থান দিয়া লাভা নির্গত হয় তাহাকে জ্বালামুখ বলে, ইহা বাটির মত হইয়া থাকে। প্রধান ও গৌণ জ্বালামুখ ভূবীর্য প্রকোষ্ঠের সহিত সংযুক্ত থাকে, যেগুলি দিয়া কেবলমাত্র লাভা নির্গত হয় তাহারা শান্ত এবং যেগুলি দিয়া বাষ্প বাহির হয় তাহারা বিস্ফোরক। কতকগুলি সুপ্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে সক্রিয় হয়, তাহাদিগকে সবিরাম, যেগুলি হইতে নিয়ত উদ্গীরণ হয় সেগুলিকে অবিরাম এবং যেগুলি হইতে উদ্গীরণ হইতে দেখা যায় না তাহাদিগকে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি বলা হয়।

কিন্তু নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি হইতেও যে সময়ে উদ্গীরণ হয় না এমন নহে। আগ্নেয়গিরি গুলিও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আছে।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। ভাঁজ, নতি, স্তরচ্যুতি, ভূমিপাত, বরফপড়া প্রভৃতি কাহাকে বলে ও কেন হয় বুঝাইয়া দাও। (Explain with reason why the following occur—fold, tilt, landslide and avalanche)

২। ভূমিকম্পের কারণ কি? প্রধানত কি কি কারণে ভূমিকম্প হয়? (What are the causes of Earthquake ? What are the principal causes ?) (কঃ বিঃ ১৯৪০)

৩। ভূমিকম্পের নাভী ও উপকেন্দ্র কাহাকে বলে? প্রকম্পন কটিবন্ধ ভূবীয় প্রকোষ্ঠ ও জ্বালামুখ কাহাকে বলে? (What are the following —Centre and Epicentre of earthquakes, Seismic belt, magma chamber and crater ?)

৪। কেন এবং কিরূপে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হয় লিখ? (Why and how do volcanic irruption takes place ?)

৫। সুপ্ত, সক্রিয় ও নির্বাপিত আগ্নেয় গিরি বলিতে কি বুঝায়? (What are called the dormant, active and extinct volcanoes ?)

৬। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয় গিরি মানুষের কিরূপ ক্ষতি করিতে পারে বিস্তারিত ভাবে লিখ। (Write in detail how earth-quake brings mischief to the human beings)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাটি

পৃথিবী পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণের যে অগভীর আবরণ তাহাই মাটি। প্রধানত এই মাটিতেই গাছ পালা জন্মিয়া থাকে। কিছু মাটি লইয়া পরীক্ষা করিলে ইহার বিভিন্ন উপাদানগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কিছু মাটি গুঁড়া করিয়া লইলে প্রথমেই দেখা যায় ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় কতকগুলি শক্ত দানা আছে, তাহাদিগকে হাতে করিয়া বাছিয়া পৃথক করা যায়। ইহারা ভীষণ শক্ত, সহজে ইহাদিগকে ভাঙ্গা যায় না। কতকগুলি ইহাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর দানা আছে, চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া তাহাদিগকে পৃথক করা যায়। ইহাদিগকে **কাঁকর** (Gravel) বলে। ইহাদের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থগুলিকে জলে গুলিয়া স্থির হইতে দিলে দেখা যায় জলের রং ঘোলাটে থাকিলেও তলদেশে বালুকা কণা জমিয়া চিক্‌মিক করিতে থাকে। জৈব পদার্থ ও কাদা দ্রব হইয়া জলের রং ঘোলাটে করিয়া দেয়। ফিল্টার কাগজে ঐ জল ছাঁকিয়া লইলে ফিল্টার কাগজে কাদা ও জৈব পদার্থ পড়িয়া থাকে। এই ছাঁকা জল ফুটাইয়া বাষ্পীভূত করিলে পাত্রের তলায় চুন ও লবণজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পটাসিয়াম ঘটিত লবণের ভাগই অত্যধিক। তাহা হইলে মাটি মোটামুটি (১) কাঁকর, (২) বালি, (৩) কাদা, (৪) জৈব পদার্থ ও (৫) চুন ও পটাসিয়ামের লবণজাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে প্রস্তুত বলিয়া বুঝিতে পারি। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহ বিশ্লিষ্ট হইয়া মাটিকে জৈব পদার্থগুলি সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহা তোমরা পূর্বে কিছু বুঝিয়াছ এবং পরে বিশেষরূপে জানিতে পারিবে। উদ্ভিদের দেহ রূপান্তরিত হইয়া ভূগর্ভে কয়লার স্তর গঠন করে তাহা তোমরা পরে জানিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন মাটিতে অসংখ্য জীবাণুও থাকে। তাহারা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা মাটির উর্বরতা সম্পাদন করে, শিলাগুলি রোদ বৃষ্টি

প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বায়ু, জলপ্রবাহ, ভূমিপাত, হিমবাহ, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার নৈসর্গিক কাণ্ড দ্বারা ইহা স্থানান্তরিত হইয়া নানা স্থানে মৃত্তিকার স্তর করিয়া অবস্থিত থাকে।

পরীক্ষা করিলে লক্ষ্য করা যায় ক্রমে বড় শিলাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া বালি, ধুলা ও মাটিরূপে ভূস্তর গঠন করিয়াছে।



১২ নং চিত্র—পাথর হইতে মাটি

পাহাড়ে দেশে কূপ খনন করিলে মাটির অল্প নিচেই পচা পাথর এবং তাহার নিচে কঠিন বৃহত্তর পাথর পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা দেশের দক্ষিণাংশের অধিকাংশ মাটিই নদীর স্রোতে পলি পড়িয়া চরভূমি সৃষ্টি করিবার ন্যায় বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। তাই এদেশে বহুদূর খনন করিলেও পাথর পাওয়া যায় না। মাটিতে সব সময়েই কিছু না কিছু পরিমাণ জল থাকেই। মাটি হিসাবে কাহাতেও অত্যধিক জল থাকে কাহাতেও বা কম জল থাকে। ক্রমাগত শুকাইলে কিংবা চুল্লীতে পোড়াইলে দেখা যায় মাটি ক্রমশ হাল্কা হইতেছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—এরূপে উত্তপ্ত করিলে ইহার জলীয় ভাগ বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়।

ক্রমশ ক্ষয় হেতু কোন এক স্থানের শিলার উপর তাহারই বিচ্ছিন্ন অংশ মাটিরূপে সঞ্চিত থাকিলে মাটি ও পাথরের উপাদান একই প্রকারের পদার্থ হয়, এরূপ মাটিকে **আবাসিক মাটি** (Residual soil) বলা হয়। কিন্তু নৈসর্গিক কারণে অপর স্থানের মাটি অন্য স্থানে সঞ্চিত হইলে তন্নিম্নবর্তী শিলার উপাদান-গুলির সহিত উক্ত মাটির উপাদানের পার্থক্য দেখা যায়। এরূপ মাটিকে **চালিত মাটি** (Transported soil) বলা হয়।

নৌকাযোগে ভ্রমণে বাহির হইলে দেখা যায় যেস্থানে নদীর পাড় সন্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে কত বিভিন্ন রকমের মাটির স্তর যেন একটির উপর একটি সাজান রহিয়াছে। কোনটির রং শাদা, কোনটি কাল, কোনটি লাল, কোনটি বা হল্‌দে কিংবা আরও কত রকমের, এ সকল বিভিন্ন স্তর হইতে মাটি সংগ্রহ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহারা উপরিতলের অর্থাৎ নদীর চরের মাটি হইতে ভিন্ন প্রকারের। ইহাদের মধ্যে কোনটি অধিক বালুকাময়, কোনটি অল্প বালুকাময় এবং এমন স্তরও দেখা যায় যাহা কেবল বালুকা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য যে বালির দরকার হয় তাহা একপ মৃত্তিকার স্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

বেলেমাটি (Sandy soil)—যে মাটিতে অধিক বালি থাকে তাহাকে বেলে মাটি বলে। ইহাতে সাধারণত পাঁচ হইতে ১০ ভাগ মাত্র কাদা বাকি সমস্ত বালি। বেলে মাটিতে জল ঢালিলে অল্পক্ষণের মধ্যে সে জল শুষিয়া লয় এবং ইহাতে জল দিলে মাটি তত আটার মত চিট্‌চিটে হয় না। তবু ইহার উপর পলি পড়িলে সরিষা, তিল, তরমুজ, ফুটি, পটল, খরমুজা প্রভৃতি রবি ফসল বেশ জন্মাইয়া থাকে।

এঁটেল বা কাদা মাটি (Clay soil)—ইহার শতকরা ৫০ হইতে ৮০ভাগ কাদা, ১ হইতে ১০ ভাগ চুন ও জৈব পদার্থ, বাকি অংশ বালি। ভিজা অবস্থায় ইহা চট্‌চটে আটার মত—শুকাইলে শক্ত হইয়া ফাটিয়া যায়। এঁটেল মাটি দিয়া জল এবং বায়ু সহজে চলাচল করিতে পারে না বলিয়া ইহা গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কিন্তু যে সকল গাছের জল বেশী দরকার সেই সকল গাছের পক্ষে এই মাটি ভাল। জলমগ্ন থাকিলে ইহাতে প্রচুর ধান ও যব জন্মে। ইহাতে চুন ছিটাইয়া ইহাকে অন্য চাষের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

দো-আঁশ মাটি (Loamy soil)—উপযুক্ত দুই প্রকার মাটির মাঝামাঝি, দোঁ-আঁশ মাটিতে শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ কাদা ১০ ভাগ চুন জাতীয় ও জৈব পদার্থ এবং অবশিষ্টাংশ বালিকণা।

ধান এবং যব ছাড়া প্রায় সকল গাছের পক্ষে দো-আঁশ মাটিই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে জল ঢালিলে ছিদ্র পথ দিয়া ছড়াইয়া পড়ে, শিকড় দিয়া গাছ তাহাই শুষিয়া লয়। ইহার কণার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে তাহাও উদ্ভিদ সহজে গ্রহণ করিতে পায়।

চুনে মাটি (Calcarious soil)—ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান থাকায় ইহা খুব উর্বর। চুন সকল রকম মাটিতেই অল্প বিস্তর থাকে। এই মাটির চুনের সাহায্যে পাচিত উদ্ভিদ দেহ পরিবর্তিত হইয়া সোরা ও সোরার ন্যায় সার উৎপন্ন করে। ইহাতেও প্রায় সকল রকম ফসল হইতে পারে। সিম, মটর ও মটর জাতীয় গাছের পক্ষে ইহা সবিশেষ উপযোগী।

পিট মাটি (Peat soil)—ইহাতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। ইহাতে চা ভিন্ন অন্য কিছুর চাষ ভাল হয় না।

বাংলা দেশে প্রথমোক্ত তিন প্রকার মাটিই অধিক।

গলিত উদ্ভিদ দেহ মাটির বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ—ইহা যে মাটিতে নাই তাহা সম্পূর্ণ অনুর্বর। ইহা সহজে জল শোষণ করিয়া দেহমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারে। তাই যে সব মাটিতে গলিত উদ্ভিদ থাকে তাহার উপর অধিক দিন বৃষ্টি না হইলেও গাছ পালা সতেজ থাকিতে পারে।

মাটির সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক—উদ্ভিদ খাদ্যের কতকাংশ মাটি হইতে এবং কতকাংশ বায়ু মণ্ডল হইতে সংগ্রহ করে। মাটি হইতে মূল দ্বারা উদ্ভিদগণ রস ও লবণ জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া কলেবর পুষ্ট করে। অতএব মাটির উপাদান ভেদে সেখানকার গাছ পালার প্রকৃতিও ভিন্ন হইতে পারে। মাটির ভিতর উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পাইলে গাছ যেমন সতেজ হয়, খাদ্যের অভাব হইলে তাহারা তেমনই ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। তাই অল্প পরিমাণ মাটিতে বড় গাছ বাঁচিতে পারে না বা ছোট গাছও অধিক দিন বাঁচে না। অতএব গাছের পক্ষে উপযুক্ত প্রকার মাটি উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। মাটি উদ্ভিদের খাদ্যভাণ্ডারের বৃহত্তর অংশ।

মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পতঙ্গাদি অতি ক্ষুদ্র ইতর প্রাণিগণও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃক্ষলতার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে। বৃক্ষলতা জীবগণের আহার, বাসস্থান, রোগে ঔষধ ও পথ্য দিয়া আসিতেছে। এই বৃক্ষলতা মাটিতেই জন্মায়। বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন প্রকার গাছ জন্মায়। যে রকম মাটিতে গম ভাল হয়, সে রকম মাটিতে আলু, পটল ভাল না হইতে পারে। এইজন্য দেখা যায় এক এক দেশে এক এক প্রকার ফসল অধিক পরিমাণে জন্মে। আবার অনেক ফসল আদৌ জন্মে না। সাধারণত লোণা জায়গায় নারিকেল গাছ জন্মায়, এজন্য সমুদ্র তীরবর্তী কিংবা লোণা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে, কিন্তু পাহাড়িয়া দেশে নারিকেল আদৌ জন্মে না। সেখানে নারিকেল গাছ লাগাইলে বাঁচিবে না, বাঁচিলে ভাল ফল দিবে না। তেমনই পাহাড়িয়া দেশে যত সহজে একটি শাল গাছ জন্মিয়া সতেজ হইয়া উঠে, আমাদের দেশে তত সহজে জন্মায় না।

মাটির পার্থক্যে চাষের প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া থাকে। লাঙ্গল দিয়া মাটিকে চষিয়া ওলট পালট করিয়া লওয়া হয়, কোদাল দিয়া গভীরতর করিয়া এই কায সম্পাদন করা হয়। মই দিয়া মাটি গুঁড়া ও সমতল করা হয়। কোন কোন মাটিতে আগুন রাখিলে আল্গা হইয়া উদ্ভিদ বিশেষের উপযোগী হয়, এইজন্য তোমরা অনেকে ফাল্গুন মাসে বাঁশ বনে আগুন লাগাইতে দেখিয়াছ। মাটিতে রোলার (Roller) দিয়া কখন কখনও ঘন করিতে হয়। কিন্তু সকল ব্যবস্থাগুলি সময় মত অবস্থা বুঝিয়া উদ্ভিদ বিশেষের জন্য করিতে হয়। নতুবা ইহা হইতে উপকার না হইয়া অপকারও হইতে পারে। ভিজা এঁটেল মাটিতে লাঙ্গল করিলে মাটি আল্গা না হইয়া বসিয়াই যাইবে।

মাটির প্রধান গুণ ইহা আগুনে পুড়ে না এবং ইহার প্রধান উপাদান ঐ অদাহ্য সূক্ষ্মকণা, জল ও বায়ু। প্রত্যেক সূক্ষ্মকণার চারিদিকে একটি করিয়া জল ও বায়ুর আবরণ থাকে। শিকড় দিয়া গাছ, মাটি হইতে এই জল ও বায়ু গ্রহণ করে। মাটি শক্ত হইয়া গেলে তাহার মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা নষ্ট

হইয়া যায় বলিয়া জমি কর্ষণ করিতে হয়, গাছের গোড়ার মাটি কোপাইয়া আল্‌গা করিয়া দিতে হয়। মাটিতে অল্প পরিমাণে সহজদাহ্য জৈব পদার্থ বর্তমান থাকে। মাটির অদাহ্য সূক্ষ্মকণাগুলি আবার প্রধানত কাদা, বালি ও চুন জাতীয় পদার্থ প্রভৃতিতে বিভক্ত। ইহাদের আনুপাতিক পরিমাণের উপর মাটির পার্থক্য নির্ভর করে। মাটিতে জৈব পদার্থ মিশ্রিত হইলে মাটির উৎপাদনী শক্তি বাড়িয়া যায়। এইজন্য শিং গুঁড়া, খইল, গোবর প্রভৃতি পদার্থ সার হিসাবে জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া মৃত জীবজন্তুর দেহ, উদ্ভিদের দেহ গলিত হইয়া প্রতিনিয়তই মাটিতে মিশ্রিত হইতেছে।

সংক্ষেপ ঃ—ভূ-পৃষ্ঠে সূক্ষ্ম শিলাচূর্ণের আবরণ মাটি। ইহার উপাদান কাঁকর, বালি, কাদা, জৈব পদার্থ, চুন ও পটাসিয়ামঘটিত লবণ জাতীয় পদার্থ। বড় বড় শিলা ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে সজ্জিত হইয়া মাটির স্তরে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যে মৃত্তিকা সঞ্চিত হয় তাহা আবাসিক মাটি এবং চালিত হইয়া আসিলে তাহাকে চালিত মাটি বলা হয়। উপাদান হিসাবে মাটি বিভিন্ন নামে কথিত হয়; যথা বেলেমাটি, এঁটেল মাটি দোআঁশ মাটি, চুন মাটি ও পিট মাটি। এক এক প্রকার মাটি এক এক প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী। যে মাটিতে ধান, যব ইত্যাদি হয় সে মাটিতে আলু, পটল, কুমড়া ইত্যাদি ভাল না হইতে পারে। মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ বিভিন্ন সার দিয়া মাটির গুণ পরিবর্তিত করিয়া উদ্ভিদ বিশেষের উপযোগী করিয়া লইতে পারা যায়। মাটি উদ্ভিদের খাদ্য ভাণ্ডারের বৃহত্তর অংশ। চাষের জন্য মাটির বিভিন্ন প্রকার পাট করিয়া লইতে হয়, তবেই ইহা উপযুক্ত পরিমাণ ফসল দেয়।

১। মাটি কিরূপ উৎপন্ন হইয়াছে লিখ—ইহার প্রধান উপাদান কয়টির নাম কর এবং কিরূপে তাহাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় লিখ। (Write how the soil has been formed What are its chief constituents and how their presence can be proved ?)

*২। কয় প্রকারের মাটি আমাদের দেশে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের সুবিধা ও অসুবিধা কি বল। (How many kinds of soil are found in our country and what are their advantages and disadvantages ?)

৩। আবাসিক ও চালিত মাটি কাহাকে বলে? বেলে মাটি ও কাদামাটির পার্থক্য কি লিখ। (What are the differences between residual soil and transported soil ? Write the differences of sandy and clay soil)

৪। কোন্ মাটি বৃক্ষ লতার পক্ষে ভাল এবং কেন? (Which kind of soil is suitable for plants and why ?)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কয়লা ও খনিজ তৈল

মানব সভ্যতার মূলে যে সকল দ্রব্য অতীব প্রয়োজনীয় তন্মধ্যে কয়লা প্রধানতম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যক্ষভাবে কয়লা পুড়িয়া এঞ্জিন চালায়, কোল গ্যাস উৎপন্ন করিয়া সহরের পথে আলো জ্বালায়, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে বার্ণার (Burner) এবং গৃহে উনান জ্বালাইয়া থাকে। পরোক্ষ ভাবে ইহা হইতে পিচ, আলকাতরা এমন কি রং, ঔষধ, সুগন্ধি দ্রব্যও কয়লা হইতে প্রস্তুত হয়। কয়লা পুড়াইয়া পাথর হইতে ধাতু নিষ্কাষিত করা হয়।

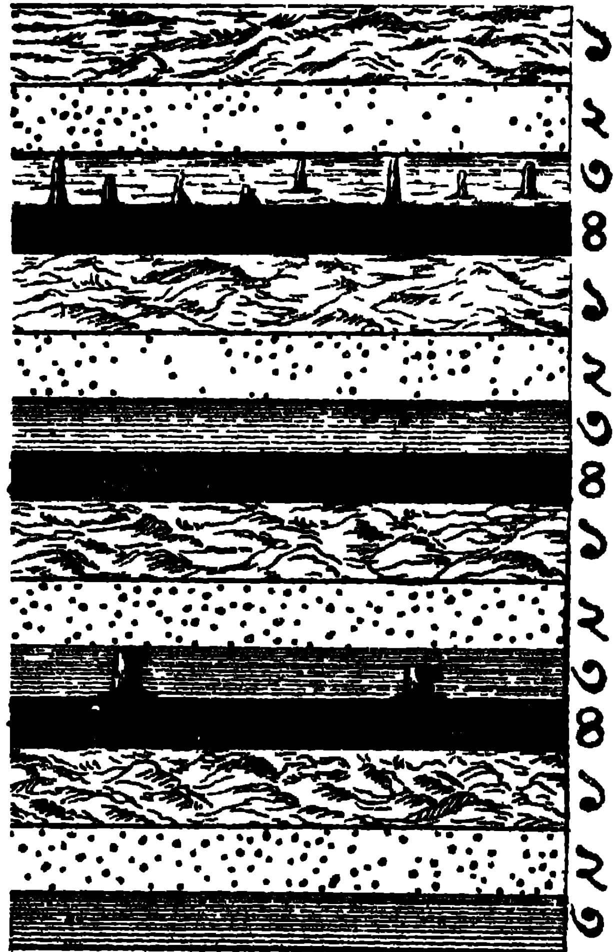
ঘরে কাঠ পুড়াইয়া কাঠ কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু পাথুরে কয়লার সহিত কাঠ কয়লার কতকগুলি সামঞ্জস্য থাকিলেও পার্থক্যও কিছু দেখা যায়। আবার পাথুরে কয়লাও কয়েক প্রকারের আছে। তন্মধ্যে রেলের, ষ্টীমারের বা অন্যান্য কল কারখানার এঞ্জিনে যে কয়লা পোড়ান হয় তাহাকে **ষ্টীম কয়লা** (Steam coal), উনানে পোড়াইবার জন্য যে কয়লা ব্যবহার করা হয় তাহাকে **কোক** কয়লা (Coke) বলে, **অ্যান্থ্রাসাইট** (Anthracite) নামক কয়লা সর্বোৎকৃষ্ট। জলিবার সময় ইহা হইতে ধোঁয়া হয় না বলিলেই চলে।

সকল প্রকার কয়লার প্রধানতম উপাদান অঙ্গার এতদ্ভিন্ন হাইড্রোজেন অক্সিজেনও ইহাতে বর্তমান থাকে—কখনও মৌলিক ভাবে আবার কখনও একটি অপরের সহিত যৌগিক পদার্থ করিয়া। এই তিনটি মূল পদার্থের পরিমাণের পার্থক্য অনুসারে কয়লার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

কাঠ কয়লা পাথুরে কয়লা অপেক্ষা বড় লঘু, দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে পাথুরে কয়লাকে পাথরের ন্যায় মনে হয়। ইহাতে বিভিন্ন স্তর সজ্জিত থাকায় ইহাকে পলল শিলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, কাঠ কয়লা যেমন কাঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পাথুরে কয়লাও তেমনই কাঠ

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কাঠ কয়লা অল্প সময়ে পুড়িয়াছে এবং ইহার অধিকতর উপাদানগুলি অন্য পদার্থের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু পাথুরে কয়লা বহুকাল ধরিয়া দগ্ধ হইয়াছে এবং এখনও ইহার উপাদানের অনেকাংশ অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইতে বাকি আছে বলিয়া ইহা এখনও কাঠ কয়লা অপেক্ষা ভারী।

তোমাদের মধ্যে যাহারা কয়লার খনি দেখিয়াছ তাহারা নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ ভূগর্ভের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন কয়লার স্তর নাই। এক একটি কয়লার স্তর হাজার হাজার ফুট পুরু হইলেও কয়লা স্তরের মাঝে মাটি, বালুকা, প্রস্তর ও শিলা মাটিও স্তরে স্তরে সাজান আছে। চিত্রে দুইটি কয়লার স্তরের উপরে ও নিচে অন্যান্য যে স্তর আছে সেই স্তরগুলি ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা দেখান হইল। পর্যায় ক্রমে ইহারা কেমন সজ্জিত থাকে তাহাও দেখ।



১৩নং চিত্র—মাটি, বালুকাস্তর, শিলা ও কয়লা

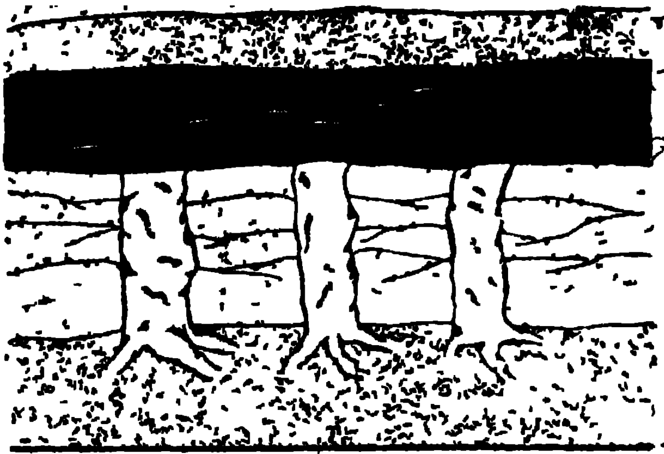
এক একটি খনি ছয় সাত হাজার ফুট গভীরও হইয়া থাকে। কয়লা উত্তোলনকালে ইহার উপর উদ্ভিদের জীবাশ্ম এবং কয়লার কিয়দংশ অবিকৃত কাষ্ঠ-খণ্ড প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ কয়লার জন্ম সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি হইবার পূর্বে ইহাতে কেবল

মাত্র উদ্ভিদ জন্মাইত। সূর্যোত্তাপে তাহারা বর্ধিত হইত কিন্তু কোন কাজে ব্যয়িত হইত না। ক্রমে পৃথিবীর বহু স্থান জুড়িয়া এই উদ্ভিদ জন্মাইতে থাকে। কালক্রমে ভূ-চাঞ্চল্য হেতু উদ্ভিদগুলি স্তরে স্তরে অন্যান্য পলল শিলার ন্যায় সঞ্চিত হয়। পুনরায় হয়ত ইহার উপর জল মাটি ইত্যাদির স্তর পড়িয়া যায়। আবার সেই স্তরে উদ্ভিদ জন্মায়। এইরূপে ইহারা ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চাপে প্রস্তরীভূত হইয়া যায়। ভূ-গর্ভের তাপে উহারা ক্রমে দগ্ধ হইয়া কাল হইতে আরম্ভ করে। ভূগর্ভে অক্সিজেনের আধিক্য না থাকায় এই দহন কার্য অতি মৃদু ভাবে চলিতে থাকে।



১৪নং চিত্র—পত্রাঙ্কিত জীবাশ্ম

অবশেষে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টির বহু পরে, তাঁহারা এই অশেষ কল্যাণকর অফুরন্ত শক্তির উৎস কয়লার সন্ধান করিয়া কত অমানুষিক কার্যই না ইহার দ্বারা করিয়া লইতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, যে যুগে মানুষের এই প্রয়োজনীয় পদার্থ ভূগর্ভে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন পৃথিবীতে কেবল মাত্র উদ্ভিদের রাজত্ব ছিল।



১৫নং চিত্র—গাছের গুঁড়ির জীবাশ্ম

তখন পৃথিবীর সর্বত্র জলাভূমি ছিল এবং বায়ুতে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অধিক পরিমাণে ছিল—ইহাতে সহজে গাছ পালা বর্ধিত হইত। উদ্ভিদ গুলি প্রধানত ফার্ণ জাতীয় ছিল।~ মানুষ সে যুগের নাম দিয়াছে

অঙ্গার যুগ (Carboniferous age) , কিন্তু সে যে কতকাল পূর্বে তাহা ধারণার অতীত। রাণীগঞ্জ ও আসানসোল বাংলা দেশের কয়লার কেন্দ্র। বিহারে ঝরিয়া অঞ্চল কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। পাঞ্জাব, আসাম এবং মধ্য-প্রদেশেও কয়লার খনি আছে।

খনিজ-তৈল

অনেক স্থলে খনিজ তৈলের দ্বারা কয়লার কাজ চালান হয়। ছোট ছোট ষ্টীমার, মোটর গাড়ী, এরোপেন প্রভৃতির ইঞ্জিনে কয়লার পরিবর্তে খনিজ-তৈল ব্যবহার করা হয়।

তৈল সাধারণত তিন প্রকারের (১) জৈব, যথা :—কড মাছের তৈল (২) উদ্ভিজ্জ, যথা :—সরিষা, নারিকেল, রেড়ি প্রভৃতির তৈল এবং (৩) খনিজ, যথা :—পেট্রোল, কেরোসিন, ইঞ্জিনের তৈল ইত্যাদি। অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে খনিজ তৈলও প্রধানত উদ্ভিজ্জ এবং জৈব তৈল , তবে ইহাদিগকে মাটির ভিতর হইতে পাওয়া যায় বলিয়া খনিজ তৈল বলা হয়। মাটির ভিতরে কিরূপে তৈল সঞ্চিত হয় দেখা যাউক।

বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে খনিজ তৈলের সহিত যে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয় তাহা খনিজ তৈলের ন্যায়ই অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থ। পূর্বে তোমরা জানিয়াছ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের সময় ঐরূপ সহজ দাহ্য বাষ্প ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়াই আপনা আপনি জলিয়া উঠে। যেখানে এইরূপ সহজ দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়, কল্পনা করা যাইতে পারে—তাহার নিকটে কোথাও হয়ত খনিজ তৈল সঞ্চিত আছে।

খনিজ তৈলের উপাদান এবং কয়লার উপাদান গুলি প্রায় একরূপ হওয়ায় অনেকে মনে করেন—কয়লা যেমন উদ্ভিদ দেহের আংশিক দহনের পরিণাম, খনিজ তৈলও সেইরূপ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় আংশিক দগ্ধ উদ্ভিদ দেহের পরিণাম। ভূগর্ভস্থ তাপ এবং চাপের পরিমাণের বিভিন্নতাই ইহার কারণ , অবস্থা বিশেষে কোথাও কয়লা কোথাও বা খনিজ তৈলরূপে সঞ্চিত হইয়া আছে।

সমুদ্রতীর প্লাবিত হইবার পরে যখন জল নামিয়া যায় তখন স্থানে স্থানে গর্তের মধ্যে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীব আটকাইয়া পড়ে। এই সামুদ্রিকজীব-পূর্ণ গর্তগুলি যখন ভূ-চাঞ্চল্য হেতু বসিয়া যায় তখন উহার উপরে শিলাস্তর জন্মিতে থাকে। প্রাণিগুলির দেহে তৈলাক্ত পদার্থ বর্তমান এবং তাহা হইতে একপ্রকার জীবাণু (Bacteria) জন্মে। ভূগর্ভস্থ তাপ এবং চাপের দ্বারা এই ব্যাকটিরিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উক্ত জীবদেহ হইতে তৈলাক্ত পদার্থগুলি খনিজ তৈলে পরিণত হয়। এইজন্য ইহাকে সমুদ্রোপকূলে উৎপন্ন পলল শিলার অন্তর্নিহিত হইয়া থাকিতে দেখা যায়।



১৬নং চিত্র—তৈলের খনি

খনি হইতে তৈল দুই প্রকারে উত্তোলন করা যায়। ভূগর্ভের যে স্তরে এই খনিজ তৈল সঞ্চিত হয় সেই স্তর বালুকাপ্রস্তরময় এবং উহার উপরে ও নিচে অপ্রবেশ্য (Impervious) শিলা থাকিলেই সেখান হইতে তৈল উত্তোলন করা সম্ভব হয়।

যখন তৈল শিলারাশি হইতে পৃথক হইয়া পুকুরের জলের ন্যায় একস্থানে

সঞ্চিত থাকে তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে সেই স্থান পর্যন্ত একটি ছিদ্র করিয়া দিলে চাপে তৈল আপনা আপনি খনি হইতে একেবারে ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণের ন্যায় বাহিব হইযা আসে। ক্রমে চাপ কমিয়া গেলে পাম্প কবিয়া তৈল টানিযা লইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যেখানে তৈল সঞ্চিত থাকে সেখানে তিনটি স্তর প্রায়ই দেখা যায। তিনটি স্তবে যথাক্রমে জল, তৈল এবং দাহ্য বাষ্প পব পব সজ্জিত থাকে। সর্বনিম্নে জল, তাহাব পর তৈল এবং সর্বোপবি দাহ্য বাষ্প থাকে। ভূগর্ভ হইতে বিভিন্ন স্তব পর্যন্ত নল প্রোথিত কবিযা পাম্প দ্বাবা তিনটি পদার্থই বাহিব করা যায।

অনেক সময তৈল এইরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে না। পৃথিবীব অভ্যন্তবস্থ শ্লেট জাতীয শিলাব মধ্যে নিসিক্ত থাকে। তখন ঐ শিলা ভাঙ্গিযা কোন একটি দৃঢ পাত্রে প্রখব উত্তাপ প্রয়োগ কবিলে ঐ তৈল নির্গত হয। খনি হইতে যে বাষ্প বাহিব কবিযা লওয়া হয তাহা, জ্বালাইবাব জন্য ব্যবহৃত হয়। খনিজ তৈল পাতিত কবিয়া উহাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত কবা হয এবং তাহারা বিভিন্ন কার্যে লাগিযা থাকে। অল্প উত্তাপেই যে তৈল পাতিত হইয়া আসে তাহা পেট্রোল। ইহাব স্ফুটনাঙ্ক ৭০° হইতে ১২০° ডিগ্রীব মধ্যে। পেট্রোল প্রধানত মোটব ইঞ্জিন চালাইবাব জন্য, গবম কাপড কাচিবাব জন্য (Dry Washing) এবং ববাব প্রস্তুত কবিবাব জন্য ব্যবহৃত হয। পেট্রোলেব পবেই কেবোসিন—ইহাব স্ফুটনাঙ্ক ১৫০° হইতে ৩০০° ডিগ্রী। কেবোসিনেব আলো পাডা গাঁযে প্রত্যেক গৃহেই ব্যবহৃত হয। ইহাতে কলকাবখানাব এঞ্জিনও চালিত হয়, পুকুবে ছডাইয়া ইহাব দ্বাবা মশাব ডিম নষ্ট কবা হয। ৬০০ ডিগ্রীব বেশী স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট অংশেব নাম এঞ্জিন তৈল (Engine oil)।

এঞ্জিন তৈল হইতে আবাব ভ্যাসেলিন (Vaseline) পাওয়া যায়। খনিজ তৈল হইতে মোম পাওয়া যায়। মোমেব বাতি জ্বালাইযা আমবা আলো পাই।

ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাব তৈল খনিব জন্য বিখ্যাত, আমেবিকাব যুক্ত প্রদেশে অত্যধিক পরিমাণে খনিজ তৈল পাওযা যায়।

সংক্ষেপঃ—কয়লা মানুষের নানাবিধ কাযে সহায়তা করে। বলিতে গেলে ইহা সর্বপ্রকার শক্তির উৎস। পৃথিবীর জন্মের বহুযুগ পরে ইহার বহু স্থানে অনেক উদ্ভিদ জন্মাইয়াছিল। কালক্রমে ভূ-চাঞ্চল্য বশত ঐ সকল উদ্ভিদ মাটি চাপা পড়িয়া পৃথিবীর তাপে ও চাপে আংশিক ভাবে দগ্ধ হইয়া কয়লার রূপ ধারণ করিয়াছে। কয়লার মধ্যে অবিকৃত কাঠ এবং উদ্ভিদের জীবাশ্ম উপর্যুক্ত ধারণার সহায়ক। কয়লার উপাদান ও প্রকৃতিগত পার্থক্য হিসাবে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। পাথুরে কয়লা পলল শিলা জাতীয়, ভূগর্ভে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। এক একটি স্তর হাজার হাজার ফুট পুরু. ইহাদের মধ্যে বালুকা, প্রস্তর, মাটি ও শিলামাটির স্তরও পর্যায়ক্রমে সজ্জিত থাকে। কয়লা পোড়াইয়া কোলগ্যাস, পিচ, আলকাতরা, রং এবং নানাপ্রকার ঔষধ ও সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। আসানসোল, রাণীগঞ্জ ঝরিয়া, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে।

কয়লার ন্যায় খনিজ তৈলও বহুবিধ জ্বালানি কাজে ও এঞ্জিন চালাইবার কাজে লাগে। উদ্ভিদ এবং জৈব পদার্থ হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। ভূ চাঞ্চল্য হেতু সামুদ্রিক প্রাণী এবং উদ্ভিদ মাটি চাপা পড়িয়া কালক্রমে ভূগর্ভের চাপ ও তাপে তৈলময় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ তৈল বালুকাপ্রস্তরের সহিত নিসিক্ত থাকে। ইহার উপরে ও নিচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে। চুয়াইয়া তেল যখন একটি স্তরে সঞ্চিত হয় নল দিয়া তখন উহাকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। কখনও কখনও তেলময় শিলাগুলিকে অত্যধিক উত্তপ্ত করিয়াও তৈল বাহির করা হয়। স্ফুটনাঙ্ক প্রভেদে ঐ তৈল পেট্রোল, কেরোসিন এবং এঞ্জিন তেল নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন কাজে লাগে। এঞ্জিন তেল হইতে ভ্যাসেলিন এবং খনিজ তেল হইতে মোম পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ, আসাম এবং পাঞ্জাব তেলের খনি আছে।

পঞ্চম প্রশ্নমালা

১। কয়লা কিরূপে ভূ-গর্ভে সঞ্চিত হইয়াছে এবং উহা কি কি কাজে লাগে বিস্তৃত ভাবে লিখ। অথবা প্রমাণ কর কয়লা উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন পলল শিলা জাতীয় পদার্থ। (Write how the coal was formed and state its uses Or Prove, coal is a kind of sedimentary rock.)

২। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের কাজে লাগা পর্যন্ত কয়লার জীবনেতিহাস লিখ।
(Write down the history of formation of coal upto its uses)

৩। খনিজ তৈলের উৎপত্তি কিরূপে হইল ? কিরূপে ইহাদিগকে খনি হইতে তোলা হয় এবং ইহারা কি কাজে লাগে বিস্তৃত ভাবে লিখ। (Write in detail how mineral oils are formed, how they are drawn out and their uses)

উদ্ভিদ-বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

দেহের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে জীবগণ কত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। মানুষের দেহের আকৃতি ও প্রকৃতি, সিংহ ব্যাঘ্রের আকৃতি ও প্রকৃতি হইতে কত ভিন্ন, অথচ মানুষও প্রাণী, সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুগণও প্রাণী। আবার মশা, মাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গও প্রাণী। ইহাদের সহিত মানুষের তুলনা করিতে গেলে কত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তথাপি প্রাণী হিসাবে মানুষের সঙ্গে ইহাদের অনেক সাদৃশ্যও আছে।

এইরূপ সাদৃশ্য এবং পার্থক্য উদ্ভিদ জগতেও বিদ্যমান। একটি বিশালকায় বট বৃক্ষের সহিত দুর্বা ঘাসের তুলনা করিতে গেলে মনে হয় না যে ইহারা এক জাতীয় জীব,—উদ্ভিদ। একটি নির্দিষ্ট জাতীয় উদ্ভিদের সকল গুলির আকার সমান নয়, তাহাদের পাতা সমান আকার বা আয়তনের নয়, সকল গুলির ফল এক রকম আকারের নয়। ধান, আম, দুর্বা, শেওলা, ফনি মনসা, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কেবল মাত্র আমাদিগকে সৃষ্টি রহস্যের বৈচিত্র্য বুঝিবার সুযোগ দিয়া থাকে।

এই সকল বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সহিত পরিচিত হইতে হইলে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ প্রয়োজন। জগতের সকল প্রকার উদ্ভিদের সহিত পরিচিত হওয়া মানুষের একটি জীবনে ঘটিয়া উঠা সম্ভব নয়, অথচ মানুষ নানা কারণে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভর করে উদ্ভিদের উপর। উদ্ভিদ তাহাদের আহার্য যোগায়, রোগে ঔষধ ও পথ্য যোগায় এবং আহার ও ঐ সকল ঔষধপথ্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিজে দগ্ধ হইয়া উত্তাপরূপ শক্তি যোগায়। এইরূপে

মানুষের জীবনে কখন্ কোন্ উদ্ভিদের প্রযোজন হইবে কে বলিতে পারে? তাই অজানা উদ্ভিদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুসারে তাহাদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা উচিত।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইবে পুকুরের ঘাটে যে শেওলা জন্মে, পচা খড়ের উপর যে ব্যাঙের ছাতা জন্মে, এমন কি গাছের গায়ে যে ছাতা পড়ে অথবা কয়েকদিনের ভিজা জুতায় কিংবা অন্য দ্রব্যে যে ভ্যাবনা পড়ে তাহারাও উদ্ভিদ। এখন আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহাদিগকে উদ্ভিদ বলিযা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয না, অথচ প্রকৃতই ইহারা উদ্ভিদ। কিন্তু আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছ যেমন বীজ হইতে জন্মায ইহারা সেরূপ বীজ হইতে জন্মায় না। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজ হইতে জন্মায তাহাদিগকে **বীজজ** (Phanerogams) এবং যাহারা বীজ হইতে জন্মায় না তাহাদিগকে **অবীজজ** (Cryptogams) বলে। বীজজ উদ্ভিদের ফুল হয় কিন্তু অবীজজের ফুল হয না। বীজজের মধ্যে আবার কতকগুলি উদ্ভিদের বীজ ফলের মধ্যে লুকান থাকে, ইহাদিগকে **আবৃত বীজ** (Angiosperm) বলা হয। আবার পাইন প্রভৃতি এমন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাহাদের ফল হয না, কেবলমাত্র নগ্ন বীজ হয, তাহাদিগকে **নগ্নবীজ** (Gymnosperm) উদ্ভিদ বলিয়া থাকি। ফলবান উদ্ভিদের, বীজের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।


১নং চিত্র—পাইন গাছ

ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজের একটি করিযা দানা বা বীজপত্র থাকে। আবার ছোলা, মটর, তেঁতুল, আম, জাম প্রভৃতির বীজে দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে। যাহাদের বীজে মাত্র একটি করিয়া বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **একবীজপত্রী** (Monocotyledonous) এবং যাহাদের বীজে দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে তাহাদিগকে **দ্বিবীজপত্রী** (Dicotyledonous) বলা হয়।

অবীজজ উদ্ভিদেব সকলগুলিব দেহের পবিপূর্ণতা লাভ হয় নাই—এইজন্য ইহারা নীচ জাতীয় উদ্ভিদ্। শেওলা, ছাতা প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদেব দেহেব বিভিন্ন অংশ নির্ধারিত কবিতে পাবা যায় না—ইহাদের মূল, কাণ্ড বা পত্র কিছুই বিশেষরূপ সুনির্দিষ্ট নহে, এই-জন্য ইহাদিগকে **সমাঙ্গ দেহীবর্গ** (Thallophyta) বলা হয। এমন কতকগুলি অবীজজ উদ্ভিদ আছে যাহাদেব কাণ্ড ও পত্র থাকে—অথচ মূল থাকে না, তাহাদিগকে **মসবর্গ** (Bryophyta) বলা হয়। অনেক সময় মসবর্গেব কাহাবও কাহারও আবাব ঐ দুইটি অঙ্গ বিশেষ পরিপুষ্টতা লাভ কবে না। অবীজজ উদ্ভিদেব মধ্যে যাহাদেব কাণ্ড, পত্র ও মূল বিশেষরূপে পবিস্ফুট তাহাদিগকে **ফার্ণ বর্গের** (Pteridophyta) মধ্যে ফেলা হয।



২নং চিত্র—ব্যাঙের ছাতা

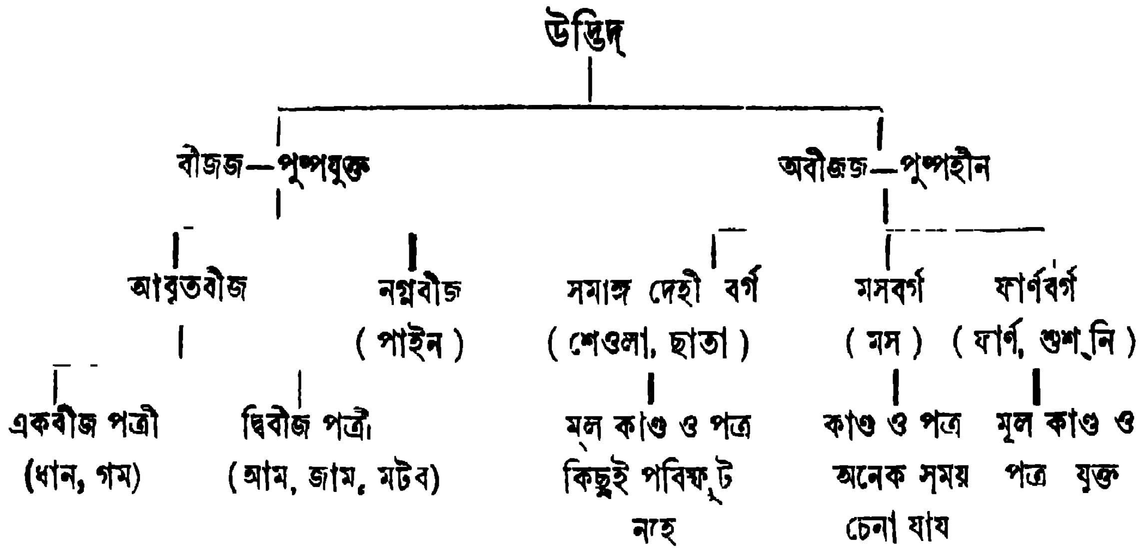


৩নং চিত্র—মস ও ফার্ণ

দেহেব গঠন, আয়ু, ফল প্রসবেব নিযম, মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলেব ধর্ম এবং সাধাবণ জীবন যাত্রাব পদ্ধতি অনুসাবে উদ্ভিদদিগকে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পাবে। তন্মধ্যে বৃক্ষ, লতা, বীরুৎ, গুল্ম, পবজীবী পবাশ্রয়ী, মাংসাশী, মৃতজীবী ও জলজ প্রধান। ইহাদের কয়েকটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইহাদের দেহাংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী পরিচ্ছেদ কযেকটিতে বলা হইবে।

সংক্ষেপ ঃ—বহু প্রকারের উদ্ভিদ্ আছে। জুতায় যে ছাতা পড়ে তাহাও যেমন এক প্রকার উদ্ভিদ্, ব্যাঙের ছাতা, শেওলা, দুর্বা, আম এবং জাম প্রভৃতির গাছ তেমন উদ্ভিদ্। এই উদ্ভিদেব মধ্যে বহু পার্থক্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহাদিগের সকলকে চিনিয়া বাখা

অসম্ভব। তাই শ্রেণী বিভাগ করিয়া ইহাদের মোটামুটি একটা পরিচয় মনে রাখা যায়। সেই হিসাবে উদ্ভিদ্ এক বীজ পত্রী, দ্বিবীজ পত্রী, সমাঙ্গ দেহীবর্গ, মসবর্গ ও ফার্ণবর্গভুক্ত। এতদ্ভিন্ন বৃক্ষ, লতা বীরুৎ, গুল্ম,পরজীবী, পরাশ্রয়ী, মাংসাশী, মৃতজীবী ও জলজ এই কয় শ্রেণীর আবৃতবীজ উদ্ভিদ্ আছে।



প্রথম প্রশ্নমালা

১। নিম্নলিখিত শ্রেণীর কয়েকটি গাছের নাম বল এবং কেন তাহাদিগকে এরূপ নাম দেওয়া হইয়াছে বল :—একবীজ পত্রী, দ্বিবীজ পত্রী, অবীজজ ও সমাঙ্গদেহী বর্গ।

(Name some plants which belong to the following group stating reasons Monocotyledonous dicotyledonous, cryptogams and (Thallophyta)

২। ফল, পুষ্প ও বীজ অনুসারে গাছের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত কর। (Tabulate to classify the plants which has been grouped according to their fruits, flowers and seeds)

৩। নিম্নলিখিত উদ্ভিদগুলি কোন শ্রেণীর বল :—

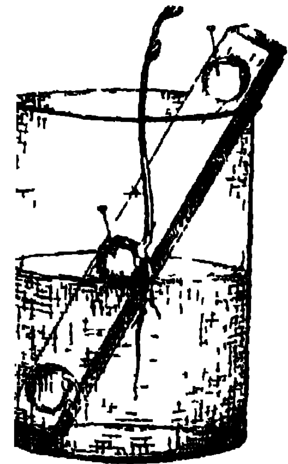
মটর, শেওলা, বেঙের ছাতা ও ধান। (To which group do the following belong—Pea, moss, fungi and paddy ?)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্কুরোদ্গম

পরিমিত রস, উত্তাপ এবং বাতাস না পাইলে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, একথা হয়ত তোমরা সকলে জান। বস্তা বস্তা ধান, বস্তা বস্তা ছোলা বা অন্য কলাই, দোকানে কতদিন পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। আবার যদি বীজ গরম জলে ফুটাইয়া লওয়া হয় অথবা বরফ ঢাকা দেওয়া হয় তবে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু ঐ সকল বীজের কয়েকটি লইয়া যদি উপযুক্ত মাটিতে বপন করা হয় তবে তাহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং পরে কেমন সুন্দর সুপুষ্ট চারা জন্মে। এই চারা হইতে বড় বড় গাছ, ফুল ও ফল হইয়া থাকে। গাছের জীবনে পরিমিত আলোর প্রয়োজন। আলোক না পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় বটে, কিন্তু পরে আলো না পাইলে গাছ সতেজ থাকে না, এমন কি অধিক দিন আলো না পাইলে গাছ মরিয়া যায়।

একটি কাষ্ঠ ফলকের ঠিক মাঝে একটি ও দুই পাশে দুইটি ছোলা আলপিন দিয়া আটকাইয়া কাষ্ঠ ফলকটিকে একটি পাত্রস্থ জলে এমন ভাবে ডুবাইয়া রাখ যেন একটি ছোলা সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবিয়া থাকে, মধ্যেরটি যেন অর্ধেক জলে এবং অর্ধেক উপরে এবং অপরটি সম্পূর্ণরূপে জলের উপরে থাকে। কয়েকদিন পরে দেখা যাইবে, যে ছোলাটি সম্পূর্ণরূপে জলে ডুবিয়া ছিল এবং যে ছোলাটি সম্পূর্ণরূপে জলের বাহিরে ছিল, তাহাদের অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই, অথচ মধ্যের ছোলা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া ছোলার চারা কেমন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। ইহার

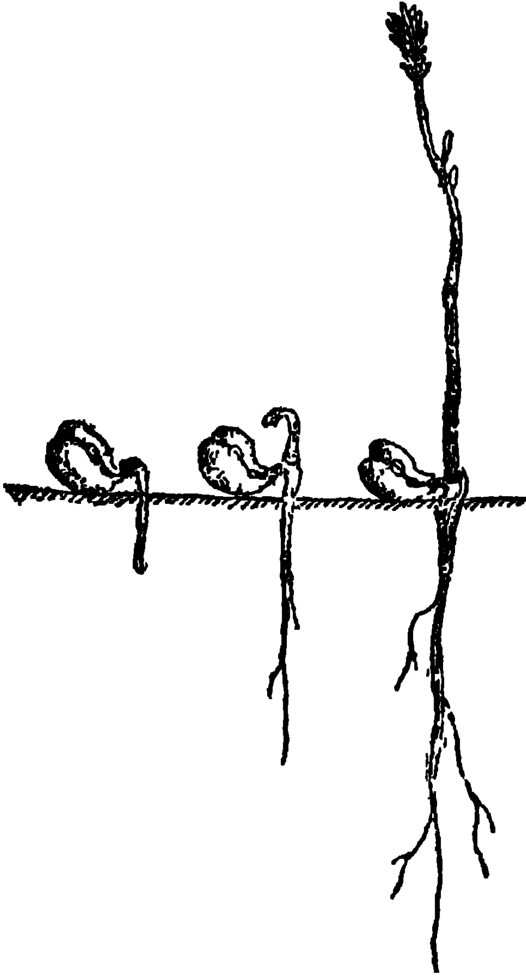


৪নং চিত্র—অঙ্কুরোদ্গম

কারণ আর কিছুই নহে—জলের ছোলাটি রস পাইলেও বায়ু ও উত্তাপ

পায় নাই, এবং উপরেব ছোলাটি বায়ু ও উত্তাপ পাইলেও বস পায় নাই বলিয়া অঙ্কুরিত হয় নাই। কিন্তু মাঝেব ছোলাটি পবিমিত বস এবং বায়ু পাওয়ায় অঙ্কুরিত হইয়াছে। মনে বাখিও সাধাবণ জলে বায়ু মিশ্রিত থাকে। গবম করিয়া ফুটাইয়া লইলে উহা হইতে বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপ ফুটান জল লইযাই উপবোক্ত পবীক্ষাটি করা উচিত।

ছোলার বীজ হইতে গাছ জন্মাইতে হইলে ছোলা গুলিকে একদিন জলে ভিজাইয়া বাখা হয়। যখন ছোলা গুলি ফুলিয়া মোটা হইতে থাকে তখন হইতে ইহাব ভিতবে শিশু গাছেব জন্ম হয়। পবে আল্‌গা মাটিতে ছডাইয়া দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে মাটি নাডিয়া চাডিয়া দেওয়া হয যাহাতে বীজগুলি অল্প মাটি চাপা পডে। মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইযা মাটি সবস বাখা হয। কযেকদিন পবে মাটি ভেদ কবিয়া ছোলা গাছ উপবদিকে বাডিতে থাকে। ভিজা ছোলা হইতে আবম্ভ কবিয়া ছোলাব গাছ হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিলে ইহাব বিভিন্ন অবস্থাব পবিচয় পাওয়া যাইবে। ভিজা ছোলা লইয়া একটু টিপিলেই দেখা যায ইহার মাঝামাঝি বীজাববণ ফাটিযা যায় ও দুইটি দানা বাহিব হইয়া পডে। মাটিতে পুঁতিবাব পব যখন ভ্রূণ ক্রমে বাডিতে থাকে তখন এইরূপে বীজাববণ ফাটাইযাই অঙ্কুব বহির্গত হয়। একটি ভিজা ছোলা বেশ করিয়া জল মুছিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ছোলার

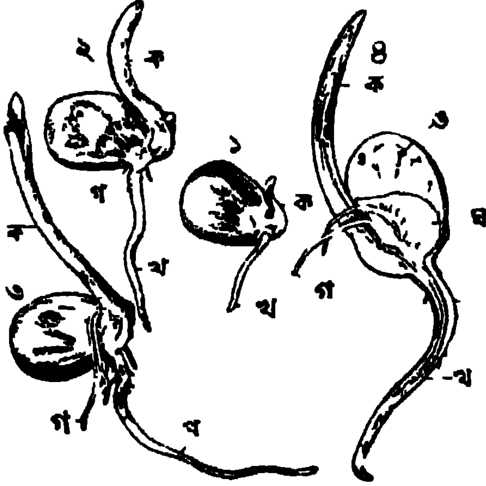


নং চিত্র—ছোলাব অঙ্কুরোদ্গম

সরু মুখের দিকের ঠিক মাঝে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে। টিপিলে এইখান দিয়া রস নির্গত হয়। এই ছিদ্রটিকে **ডিম্বকনাভী** (Hilum) বলে। এইখানেই বীজপত্র দুইটি ভ্রূণের সহিত সংযুক্ত থাকে। ঠিক ইহার উপরে একটি কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **বীজরন্ধ্র** (Micropyle) বলে। সময়ক্রমে ভ্রূণ বাড়িয়া বীজাবরণ ফাটাইয়া দেয় এবং ভ্রূণমূল বহির্গত হইয়া মাটির ভিতরে প্রসারিত হইতে থাকে। ইহাই ছোলার প্রধান মূল। কিন্তু বীজাবরণযুক্ত বীজপত্র মাটির ভিতর আটকাইয়া পড়ে বলিয়া বক্রাকারে এই মূল বাড়িতে থাকে। দুই তিন দিন পরে বীজাবরণযুক্ত বীজপত্র মাটি হইতে উপরে উঠিয়া পড়ে। ক্রমে বীজাবরণ খুলিয়া বীজপত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই বীজপত্র জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়ে এবং নূতন কচি সবুজ পাতা বাহির হয়। এই বীজপত্রই ছোলা গাছের প্রথম খাদ্য ভাণ্ডার। বীজপত্রের সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইয়া গেলে শুকাইয়া ঝরিয়া যায় এবং কাণ্ডের গাঁট হইতে নূতন পাতা এবং মূল দ্বারা আহার্য সংগ্রহ করিয়া গাছটি বাড়িতে থাকে। বীজপত্র প্রথমে কত মোটা এবং ফ্যাকাসে হল্‌দে রংএর থাকে, কিন্তু যত শীর্ণ হয় তত সবুজ হইতে থাকে। অন্য পত্রগুলি কিন্তু বীজপত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির এবং ভিন্ন রংএর।

ভুট্টার দানা কিন্তু ছোলার দানা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার ভিতর একটি মাত্র দানা থাকে এবং সে দানাটিও উপরের আবরণের সহিত দৃঢ় ভাবে সংবদ্ধ থাকে। এই এক একটি দানা বীজ নহে, এক একটি ফল। ছোলার মত ভুট্টার দানা জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর ফুলিয়া উঠিলে আল্‌গা মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ভুট্টা দানার মুখের শাদা অংশ হইতে ভ্রূণমূল বহির্গত হইয়া বাড়িতে থাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব হইতেই এই ভ্রূণমূলের গোড়া হইতে এবং বীজ পত্রের পার্শ্ব হইতে কতকগুলি সরু সরু শিকড় বাহির হয়। পরে এত অধিক পরিমাণে এই শিকড় জন্মায় যে একটি গোছার মত দেখায়। এইজন্য

ভুট্টার মূল **গুচ্ছমূল** (Fibrous Root)। ধান, পিঁয়াজ প্রভৃতি একবীজ পত্রী উদ্ভিদেরও এইরূপ গুচ্ছ মূল হয়। ভুট্টার বীজে একটি মাত্র বীজ থাকে, তাহা কখনও আবরণের বাহিরে আসে না এবং ভুট্টার দানাও কখনও ভ্রূণ কাণ্ডের (Shoot) বৃদ্ধির সঙ্গে মাটির বাহিরে উঠে না। ভ্রূণমূল নিচে যাইবার পর ভ্রূণকাণ্ড একটি আবরণে আবৃত হইয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং পরে ঐ আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে ও সবুজ পত্রযুক্ত কাণ্ডে পরিণত হয়।



৬নং চিত্র—ভুট্টার অঙ্কুর

ছোলার ন্যায় প্রথমে ভুট্টাও ইহার বীজপত্রস্থ খাদ্য গ্রহণ করে। পরে বীজ পত্রের খাদ্য ফুরাইয়া গেলে সবুজ পত্র, মূল ও আস্থানিক মূল দিয়া ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে। ভুট্টা গাছের গাঁটে গাঁটে মাটির উপরেও যে সকল শিকড় দেখা যায় তাহাদিগকে **আস্থানিক** (Adventitious) **মূল** বলা হয়। প্রথম অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া ভুট্টার গাছের চারিটি শিশু অবস্থা চিত্রে দেখান হইল। **ক খ গ** ও **ঘ** যথাক্রমে ইহার কাণ্ড, মূল, গুচ্ছ মূল ও বীজপত্র। ইহাদের ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য কর। কতকগুলি বীজ মাটিতে অঙ্কুরিত হইয়া মাটি ভেদ করিয়া উঠে। ক্রমে কাণ্ডের বৃদ্ধির সহিত বীজপত্র কিছুদিন মাটির উপর হইতে ক্রমাগত উপরে উঠিতে থাকে। ইহাদিগকে **মৃদ্ভেদী** (Epigeal) বীজ বলে। অপর পক্ষে কতকগুলি বীজ মাটির নিচেই থাকিতে চায়। ইহারা **মৃদন্তর্গত** (Hypogeal) বীজ। তেঁতুল, সিম, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির বীজ মৃদ্ভেদী বীজ, কিন্তু মটর, ছোলা প্রভৃতির বীজ মৃদন্তর্গত বীজ। আবার ছোলা, মটর, সিম প্রভৃতি গাছের ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের মধ্যে থাকে, কিন্তু রেড়ি, ধান, তাল নারিকেল, খেজুর, সুপারি, যব, ভুট্টা প্রভৃতির ভ্রূণের খাদ্য বীজপত্রের বাহিরে থাকে। পূর্বোক্ত বীজ গুলিকে **অন্তঃসার** (Ex-albuminous) এবং দ্বিতীয় প্রকার বীজগুলিকে **বহিঃসার** (Albuminous) বীজ বলে।

দৈহিক গঠন, ফুল ও ফল দান করিবার রীতি ও পদ্ধতি, মূল, কাণ্ড ও পত্রের বিভিন্নতা এবং সাধারণ ধর্মের পার্থক্য অনুসারে, সমস্ত উদ্ভিদকে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় পূর্বে জানিয়াছ। তন্মধ্যে বৃক্ষই সর্বাপেক্ষা আকারে বিশাল এবং সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ।

সমূল আকন্দ, হুড়হুড়ে বা এইরূপ জাতীয় একটি ছোট গাছ উপড়াইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, একটি গাছের প্রধানত দুইটি অংশ—**মূল** (Root) ও **কাণ্ড** (Shoot)। প্রথম অংশটি সাধারণত মাটির নিচে এবং অপরটি মাটির উপরে থাকে। মূলের ধর্ম মাটির নিচে প্রসার লাভ করা, কিন্তু কাণ্ডের ধর্ম ঠিক বিপরীত—ইহা উপর দিকে বাড়িতে চায়।

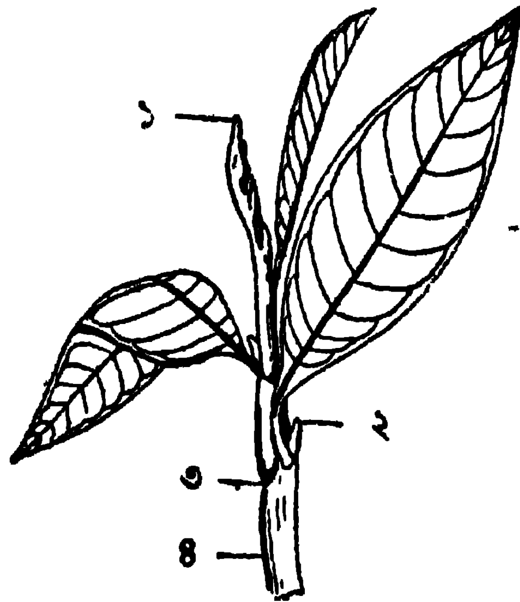
এইবার একটি বড় গাছের কথা ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহারও ঐরূপ দুইটি প্রধান অংশ আছে. ইহার মূল মাটির নিচে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাটি আঁকড়াইয়া ধরে তাতে গাছটি খাড়া হইয়া থাকে, পড়িয়া না যায়। এই মূল দিয়া গাছ মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া আপনার খাদ্য আহরণ করে। প্রধান মূল হইতে শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া মাটির ভিতর চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, গাছের কাণ্ড হইতেও সেইরূপ শাখা প্রশাখা বাহির হইয়া উপরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই শাখা প্রশাখায় গাছের পাতা, ফুল ও ফল ধরে এবং পরে আমরা ফল হইতে বীজ পাই। ফুল ও ফল, সকল গাছে সকল সময় পাওয়া যায় না—ইহারা গাছের অপ্রধান অংশ। গাছের প্রধান অংশ হইল তিনটি—মূল, কাণ্ড এবং পাতা। পাতার সাহায্যেও গাছ খাদ্য আহরণ করে, কিন্তু পাতার প্রধান কার্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা। গাছকে বাঁচিতে হইলে মূল, কাণ্ড ও পাতার বিশেষ প্রয়োজন, এইজন্য ইহাদের যে কোন একটিকে যদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তবে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে, নয়ত একেবারে মরিয়া যায়। কিন্তু ফুল ফল তুলিয়া লইলে গাছের তত ক্ষতি হয় না।

মূল ও পাতা দিয়া গাছ আপনার খাদ্য আহরণ করে এবং অনেক সময়

সেই খাদ্য সঞ্চিত করিয়াও রাখে; মূলা, গাজর প্রভৃতিব মূলেব কথা মনে কবিলে এবং ঘৃতকুমাবী ও হিম সাগরের পাতার কথা মনে কবিলে আমবা বেশ বুঝিতে পারি পূর্বোক্তগুলিব মূলে ও শেষোক্তগুলির পাতায় খাদ্য সঞ্চিত থাকে।

বীজ হইতে প্রথম মূল বাহিব হয। মূলের সর্বপ্রথম অবস্থা **ভ্রূণমূল**' (Radicle) এবং কাণ্ডেব অনুরূপ অবস্থাব নাম **ভ্রূণ মুকুল** (Plumule)। বীজ অঙ্কুবিত হইবার সর্বপ্রথম অবস্থায় আমবা ভ্রূণমূলকেই দেখিতে পাই, পবে ভ্রূণমুকুল বাহিব হয।

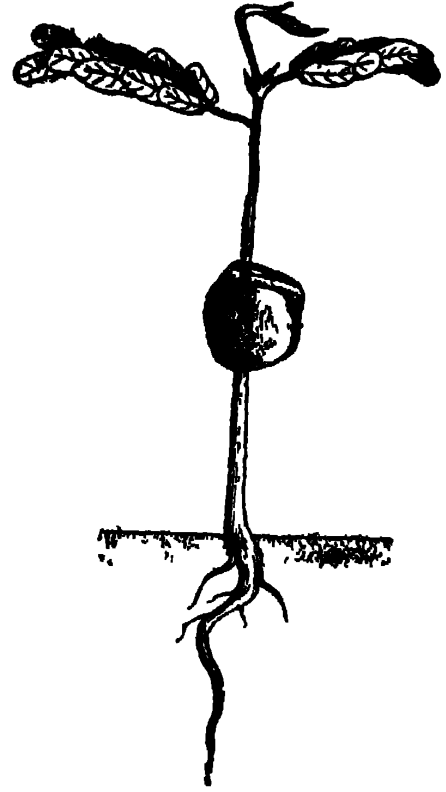
গাছের একটি শাখা লইযা পবীক্ষা কবিলে দেখা যাইবে, ঠিক যে অংশ হইতে পাতা বাহিব হয, শাখা বা উপশাখাব ঠিক সেই অংশ অপব অংশ অপেক্ষা কিছু মাটা এবং বাঁকা, ইহাই গাছেব গাঁট বা **সন্ধি** (Node)। এই রূপ দুইটি সন্ধিব মধ্যবর্তী স্থানকে **পর্ব** (Anti-node) বলা হয়। প্রত্যেক সন্ধিতে যেখানে পাতা বাহির হয সেই স্থানে পাতাব ও শাখাব মধ্যে একটি কচিপাতাব মুকুল দেখা যায়, ইহাই বড হইয়া কখনও আব একটি প্রশাখায় পবিণত হয়, ইহাকে **পার্শ্বস্থ মুকুল** (Axillary bud) বলে। প্রত্যেক শাখা প্রশাখাব শীর্ষদেশেও এইরূপ মুকুল জন্মায়। তখন তাহাদিগকে **অন্তস্থ মুকুল** (Terminal bud) বলে। সাধাবণত এই অন্তস্থ মুকুল হইতে ফুল ধরে। ৭নং চিত্রে দেখ (১) গাছটির অন্তস্থ মুকুল, (২) পার্শ্বস্থ মুকুল (৩) সন্ধি (৪) পর্ব।



৭নং চিত্র—সন্ধি, পর্ব ও মুকুল

একটি খুব ছোট তেঁতুল চারা লইয়া পরীক্ষা কবিয়া দেখ—ইহাব বীজপত্র)Cotyledons) দুইটি কেমন মাটিব উপর গাছের সহিত যুক্ত হইয়া

বহিয়াছে। কিছুদিন পরে এই বীজপত্র দুইটি ক্রমে শীর্ণ হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন গাছকে আর ইহাতে সঞ্চিত খাদ্যেব উপব নির্ভর কবিতে হয় না। গাছ যত বাড়িতে থাকে ততই তাহার ডালপালা, পাতা গজায, এদিকে নিচে শিকডও ঐরূপ শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবিতে থাকে। ঝডে উপডান একটি বৃহৎ তেঁতুল গাছ যদি কেহ কখনও দেখিয়া থাক তবে বুঝিতে পাবিবে ইহাব মাটিব উপবেব অংশ যেমন বিস্তাব লাভ কবে মাটিব নিচেব অংশও প্রায সেইরূপ বিস্তার লাভ কবে। কিন্তু ইহা মাটিব নিচে থাকে বলিয়া আমবা মোটে টেব পাইনা। লক্ষ্য কবিলে বেশ দেখা



৮নং চিত্র—তেঁতুল চাবা

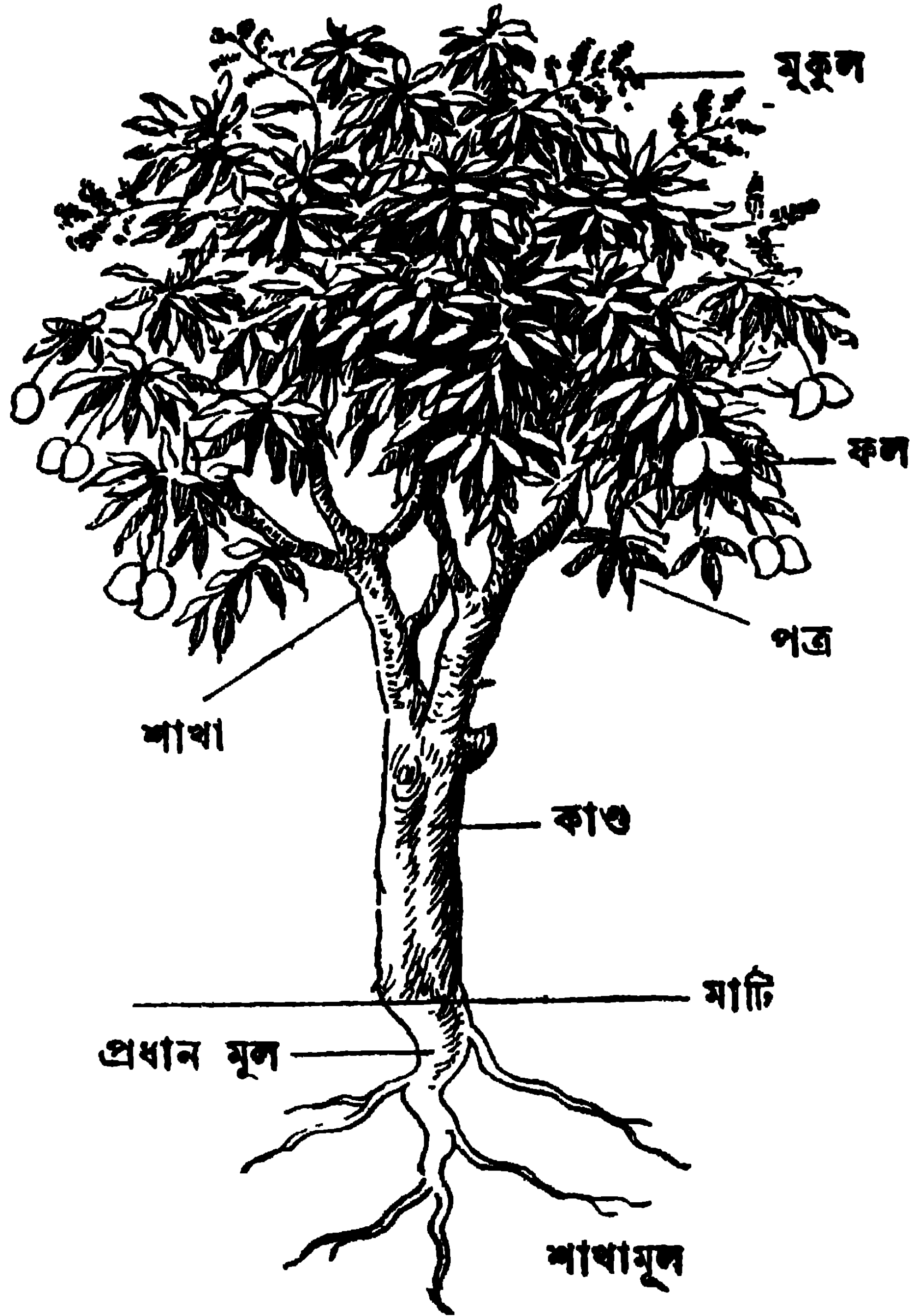
নিচে প্রধান শিকডটি ক্রমাগত সোজা নিচেব দিকে নামে, ইহাকে **প্রধান** (Tap) **মূল** বলে। ইহাব পাশে যে সমস্ত শিকড বাহিব হয ক্রমে সেই সকল শিকডেব পাশ দিযাও আবাব শিকড বাহিব হয়; ইহাদিগকে **শাখা মূল** বলে। মূলগুলি মাটিব নিচে অন্ধকাবে থাকে বলিয়া ইহাদেব বং শাদা।



৯নং চিত্র—তেঁতুল ফুল

যে সকল সন্ধি হইতে পাতা বাহির হইয়াছে সেখানে পার্শ্ব-মুকুল দেখিতে পাওযা যায। অন্তস্থ মুকুল হইতে ফুল হয়। এই ফুল হইতে ক্রমে পাপডি খসিয়া যায এবং সরু সরু তেঁতুল ফল দেখা দেয়। বাবমাস সকল গাছেব পাতা দেখা যায় না। অশ্বত্থ, নিম প্রভৃতি গাছেব পাতা বসন্তকালে একবাবে খসিয়া যায় ও নূতন পাতা গজায়। তেঁতুল গাছে বারমাসই পাতা দেখা যায। মধ্যে মধ্যে উহার কিছু পাতা পাকিয়া ঝবিয়া পড়িয়া যায এবং নূতন পাতা

গজায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ইহার নূতন পাতা অধিক পরিমাণে হয় এবং নূতন পাতা হইবার পরেই তেঁতুল ফুল ধরে। এই ফুল হইতে ফল হইয়া বাড়িতে



১০নং চিত্র—পূর্ণাঙ্গ গাছ

থাকে এবং সেই ফল পাকিতে প্রায় চৈত্র, বৈশাখ মাস পর্যন্ত সময় লাগিয়া

থাকে। অধিকাংশ গাছের নূতন পাতা গজাইবার, ফুল ও ফল ধরিবার যেমন সময় নির্দিষ্ট থাকে তেঁতুল গাছেরও ঠিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ও ফল হয়। তেঁতুল ডালের প্রত্যেক সন্ধি হইতে একটি করিয়া প্রধান পাতা বাহির হয়। একটি সন্ধির যেদিকে এই প্রধান পাতা বাহির হয় পরবর্তী সন্ধিতে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে পাতা বাহির হয়। প্রধান পত্রের গায়ে আবার জোড়া জোড়া ছোট ছোট পাতা বাহির হয়। এই পাতাগুলি এক এক স্থানে দুইটি দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নিমপাতার মত পাতার শীর্ষে একক পাতা থাকে না। ১০ নং চিত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ ও তাহার মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প ও ফল দেখান হইল। উদ্ভিদের প্রতি অংশের উপকারিতা, কার্য ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য দেহাংশ বিশেষের রূপান্তর প্রভৃতি পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

সংক্ষেপ ঃ—পরিমিত রস, বাতাস ও উত্তাপ না পাইলে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। বীজের ত্বক নাভি ও বীজরন্ধ্র আছে। উদ্ভিদের প্রধান দুইটি অংশ—মূল এবং কাণ্ড, আবার ইহাদের প্রত্যেকের নানা রূপ আছে। কাণ্ড এবং মূলের যেমন পার্থক্য তেমনই সাদৃশ্যও দেখা যায়। কাণ্ডে থাকে শাখা, প্রশাখা, পত্র, সন্ধি, মুকুল, ফল, ফুল ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। একটি পরীক্ষা বর্ণনা কর যাহাতে প্রমাণ করা যায় উপযুক্ত রস, বায়ু এবং উত্তাপ না পাইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। (Describe an experiment which will prove that a seed will not germinate unless it gets adequate amount of water, air and heat.)

২। ছোলা ও ভুট্টার অঙ্কুরোদ্গম কিরূপে হয় লিখ। (Write how gram and maize germinate)

৩। ভুট্টার ও ছোলার অঙ্কুরোদ্গম কালে কি কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? (What differences are noticed in the germination of a gram and a maize)

৪। গাছের প্রধান অংশ দুইটির বিবরণ দাও। (Give an account of the two main parts of a plant.)

৫। কাণ্ড এবং মূলের মধ্যে প্রধান প্রধান সাদৃশ্য এবং পার্থক্যগুলি বুঝাইয়া দাও। (Explain the chief similarities and differences of a root and a shoot)

৬। ফল ও ফুল গাছের অপ্রধান অংশ কেন? (Why fruits and flowers are minor parts of a plant?)

৭। পর্ব, সন্ধি, অন্তস্থমুকুল, ও পার্শ্বমুকুল কাহাকে বলে চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও। (Explain with a diagram —antinode node terminal bud and axillary bud)

৮। আম ও তেঁতুল গাছের জীবন বৃত্তান্ত লিখ। (Write life histories of a mango tree and of a tamarind tree)

৯। তেঁতুল গাছে কোন সময়ে ফুল ধরে? (When is the time of inflorescence of a tamarind tree?)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

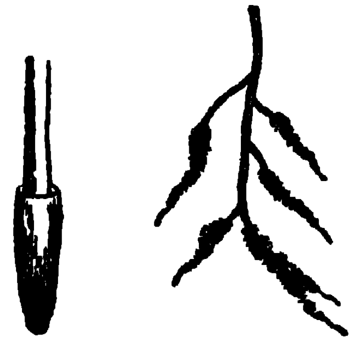
মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ

মূল

পূর্বেই বলা হইয়াছে ভ্রূণ হইতে বাহির হইয়া যে অংশ মাটির ভিতর দিকে যায় তাহাই শিকড় এবং যাহা উপর দিকে উঠে তাহা কাণ্ড। এই শিকড় যখন **প্রধান মূল** (Tap root) রূপে ক্রমাগত নিচে নামিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার পাশ হইতে শাখা এবং ক্রমে প্রশাখা বহির্গত হয়। আবার কখনও বা প্রধান মূল বর্ধিত না হইয়া মরিয়া যায় এবং ঐ স্থান হইতে **গুচ্ছ মূল** (Fibrous root) বাহির হইয়া মাটির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অধিকাংশ এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের গুচ্ছমূল হয়। মূলের রং এক রকম শাদা, কিন্তু কাণ্ডের রং বিভিন্ন। শিকড় হইতে পাতা, ফুল, ফল বা বীজ হয় না। কিন্তু প্রত্যেক শিকড়ের মাথায় একটি করিয়া **মূলত্রা** Root cap) থাকে—ইহা সুকুমার মূলাগ্রভাগকে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষাকরে। এই মূলত্রার উপরে শিকড়ের চারিদিকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুলের মত কতকগুলি **মূলরোম** (Root hair) বাহির হয়। কাণ্ডের ন্যায় মূলের সন্ধি বা পর্ব নাই।



১১ নং চিত্র
ধানগাছের গুচ্ছমূল



১২ নং চিত্র--মূলত্রা ও মূলরোম

কাণ্ডের বিভিন্ন অংশে অবস্থান অনুসারে মূলকে সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়, তন্মধ্যে কাণ্ডের নিচে প্রধান মূলকে **প্রকৃত** (True) মূল

এবং কাণ্ডের অন্যান্য অংশে অবস্থিত মূলকে **আস্থানিক** (Adventitious) মূল বলা হয়। কাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান অনুসারে ইহাদের কার্যের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আম, জাম, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের মূল প্রকৃত মূল, কিন্তু বটের ঝুরি, কেয়া বা ভুট্টা গাছের উপরকার শিকড়, পান, কুমড়া, বাঁশ প্রভৃতি গাছের শিকড় আস্থানিক মূল। আস্থানিক মূল আবার কার্য অনুসারে বা অবস্থান অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত, যথা :—

(ক) **স্তম্ভ** (Prop) মূল—বট বা রবার গাছের বড় বড় শাখা প্রশাখা হইতে



১৩ নং চিত্র—বটের ঝুরি

ঝুরি নামিয়া মাটির ভিতরে প্রধান মূলের মত প্রবেশ করে। কালক্রমে ইহারা

পুষ্ট হইয়া এক একটি স্তম্ভের মত হইয়া দাঁড়ায়। তখন বড় গাছটির শাখাটির গোড়া কাটিয়া দিয়া প্রধান গাছ হইতে পৃথক করিলে শাখা প্রশাখা গুলি এক একটি পুরাদস্তুর গাছ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ মূলকেই **স্তম্ভমূল** (Prop root) বলা হয়।

(খ) **ঠেশ** (Stilt) মূল :—কেয়াগাছ যাহাতে সহজেই মাটিতে পড়িয়া না যায় সেইজন্য উহার গুঁড়ির মাটির উপরের অংশ হইতেও বড় বড় শিকড় বাহির হইয়া গাছটিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে। ইহাদিগকে **ঠেশ** মূল বলে। ভুট্টা, আখ, ধান প্রভৃতি গাছের গোড়ার দিকে অনেকগুলি গাঁট হইতে এইরূপ ঠেশমূল বাহির হইতে দেখা যায়, তবে তাহারা কেয়াগাছের ঠেশমূলের মত বড় ও মজবুদ নহে।



১৪নং চিত্র—কেয়াগাছের ঠেশমূল

(গ) **আরোহী** (Climbing) মূল—পান, গজপিপুল প্রভৃতি কতকগুলি লতা গাছ আপন কাণ্ডের দুর্বলতার জন্য ঝড় ঝাপটার হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য একটি শক্ত গাছে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষা করে, কিন্তু ইহারা আশ্রয়দাতার নিকট হইতে আপনাদের আহারের প্রত্যাশা রাখে না। মূলের সাহায্যে ইহারা বলবান একটি আশ্রয়ে আরোহণ করে বলিয়া ইহাদিগকে **আরোহী** (Climbing) মূল বলা হয়। অনেক লতাগাছের আকর্ষ (Tendril) এবং কাণ্ডেরদ্বারাও এই কার্য সাধিত হয়। তাই বলিয়া উল্লিখিত মূল গুলিকে আকর্ষ মনেকরিও না অথবা আকর্ষগুলিকে আরোহী মূল বলিয়া ভুল করিও না।

(ঘ) **শ্বাসমূল** (Breathing roots বা Pneumatophores)—নোনা জলাভূমিতে কতকগুলি গাছ জন্মে, তাহাদের মূল জলমগ্ন থাকে বলিয়া মাটি হইতে পরিমিত বাতাস পায় না, তাই উহাদের শাখামূল বা প্রশাখা মূল হইতে কতকগুলি শঙ্কুর মত মূলের বর্ধিত অঙ্গ মাটির উপরে খাড়া ভাবে উঠিয়া স্ব স্ব গাত্রস্থ ছিদ্র দিয়া বায়ুমণ্ডল হইতে বায়ু গ্রহণ করে এবং শ্বাস কার্য চালায়। ইহাদিগকে **শ্বাস** (Breathing) মূল বলে।

সুন্দর বন অঞ্চলে সুঁদরী, বেওড়া, গবান, গেঁও প্রভৃতির এইরূপ শ্বাসমূল দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঙ) **বায়বীয়** (Aerial) মূল—রাস্না, গুলঞ্চলতা বা গুড়ুচি প্রভৃতি বৃক্ষরুহা গাছের (Epiphytes) কাণ্ড হইতে আস্থানিক মূল বাহির হইয়া, কতকগুলি আশ্রয়দাতাকে জড়াইয়া ধরে এবং কতকগুলি বাতাসে ঝুলিতে থাকে। যে গুলি বাতাসে ঝুলিতে থাকে তাহাদিগকে বায়বীয় মূল বলা হয়। বায়বীয় মূলের গায়ে ব্লটিং কাগজের ন্যায় এক রকম পাতলা আবরণ (Velamen) থাকে। তাহা দ্বারা ইহারা বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করে। পরে দেখিবে পত্রের একটি কাজ বায়ু হইতে আহার্য সংগ্রহ করা। এখানে দেখিতেছ গাছের মূল ও পত্র উভয়েই বায়ু হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

(চ) **পত্রমূল** (Leaf root) পাথরকুঁচির পাতা কয়েকদিন ভিজা মাটিতে পড়িয়া থাকিলে ইহার কিনারা হইতে মূল বাহির হইতে দেখা যায়। ক্রমে পাতাটির ঐ স্থানে একটি পাথরকুঁচির চারার জন্ম হয়। পাথর কুঁচির পত্রের এইরূপ মূলকে **পত্র-মূল** (Leaf-root) বলা হয়। এখানে পাথরকুঁচির পাতা বীজের ন্যায় কার্য করিতেছে

(ছ) **ভাসমান** (Floating) মূল—কোবদাম বা কোঁচড়া গাছের কাণ্ডের গাঁট হইতে ভিজা তুলার ন্যায় গোছা গোছা একপ্রকার মূল বাহির হয়। ইহারা গাছটিকে ভাসাইয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে বলিয়া ইহাদিগকে **ভাসমান** মূল বলা হয়।

(জ) **শোষকমূল** (Haustoria) স্বর্ণলতা বা আলোকলতার সবুজ পাতা নাই। ইহারা অন্য একটি গাছে জন্মিয়া তাহার দেহের মধ্যে চুলের মত সরু মূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া খাদ্য শোষণ করে বলিয়া ইহাদের ঐপ্রকার মূলকে **শোষকমূল** বলে।

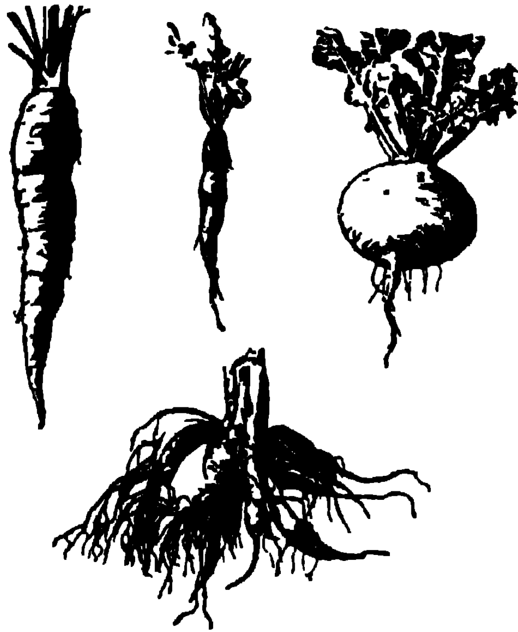
কতকগুলি উদ্ভিদ অপর একটি গাছের উপর বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রয় বৃক্ষের রক্ষ শোষণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, যেমন স্বর্ণলতা অন্য গাছ হইতে আপনার শিকড় দিয়া আহার্য সংগ্রহ করে। ইহাদিগকে **পরভোজী** (Parasite) বলা হয়।

পরভোজী উদ্ভিদ দুই রকম—**আংশিক পরভোজী** (Partial parasite) এবং **সম্যক পরভোজী** (Total parasite)। বড় বড় আম গাছের শাখায় একপ্রকার লতা জন্মাইতে দেখিয়াছ কি? ইহার ছোট ছোট লাল ফুল হয়। ইহাদের নাম লোরেন্থাস (Lorenthus)। ইহারা আশ্রয় বৃক্ষে মূল প্রবিষ্ট করাইয়া উহাকে আঁকড়াইয়া থাকে, কিন্তু পাতার দ্বারাই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। ইহারা আংশিক পরভোজী। পরে জানিতে পারিবে বৃক্ষের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ কিছু না কিছু করিতে পারে বা করিয়া থাকে। **আলোক লতার** পাতা নাই। গোছা গোছা সূতার মত দল বাধিয়া বাবলা প্রভৃতি গাছের উপর ইহারা বর্ধিত হয়। ইহারা আশ্রয় বৃক্ষ হইতেই আপনাদের খাদ্য শোষণ করিয়া লয়। ইহারাই সম্যক পরভোজী। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ একটি গাছ অপর একটি গাছে উঠিলে উহার তেজ কমাইয়া দিতে পারে—কেবলমাত্র তাহার আহার্যে ভাগ বসাইয়া নহে—তাহাকে আঁকড়াইয়া তাহার স্বচ্ছন্দতার প্রতিবন্ধক হইয়াও বটে। কোন গাছের উপর এরূপ আগাছা হইলে আগাছাটি নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে মূলের কার্যের বিভিন্নতা লক্ষিত হইলেও মূলের প্রধান কার্য দুইটি—(১) গাছকে মাটির সহিত শক্ত করিয়া আটকাইয়া খাড়া রাখা এবং (২) মাটি হইতে খাদ্যের জন্য রস ও কাঁচা মাল

সংগ্রহ করা। মূল রোমই মাটি হইতে কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া মূলা, গাজর, শালগম, শতমূলী প্রভৃতির মূলের ন্যায় অনেক গাছের মূলে খাদ্য সংগৃহীত থাকে।

ইহাদের মধ্যে এক এক রকম মূলের এক একটি বিশিষ্ট আকৃতি আছে। মূলার মত মধ্যে মোটা ও দুই দিক সরু হইলে **মুলাকৃতি** (Fusiform), শালগমের মূলের মত গোলাকার মূলের ঠিক নিচ হইতে একটি লম্বা সরু লেজের মত বাহির হইলে তাহাকে **শালগমাকৃতি** (Napiform) এবং গাজরের মত উপর দিকে মোটা এবং নিচের দিকে ক্রমাগত সরু হইলে তাহাকে **গাজরাকৃতি** (Conical) মূল বলা হয়। কোন কোন গাছের গুচ্ছ মূলও খাদ্য সঞ্চয় করিয়া মোটা হয়; তখন তাহাদিগকে **কন্দাল** (Tuberous) মূল বলা হয়। শতমূলী শাঁকালু প্রভৃতি কন্দাল মূল।



১৫ নং চিত্র—মূলা, শালগম, গাজর ও শতমূলী

মূলের চাপ দিয়া শোষিত খাদ্য কাণ্ড ও পাতায় চালান দেওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসের কায করা, আরোহণ করা, পানার মত গাছকে জলে ভাসমান রাখাও মূলের কয়েকটি অপ্রধান কার্য। পটোল, কুঁদরি প্রভৃতির মূলে বংশ বৃদ্ধির কার্যও হয়।

পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে গাছের জীবন রক্ষার জন্য প্রধানত দশটি মূল পদার্থের প্রয়োজন, যথা:—অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র অঙ্গার পাতার সাহায্যে সংগৃহীত হয়। বাকি নয়টি পদার্থ মূল দ্বারা কাঁচা মাল রূপে সংগৃহীত হয়। এই নয়টি পদার্থ মাটিতে লবণরূপে বর্তমান

থাকে। মাটির সহিত দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া যে রস প্রস্তুত হয় তাহাই গাছেরা মূলদ্বারা শোষণ করে। কোন পদার্থ সহজে মাটির জলে দ্রব না হইলে মূল রোম হইতে একপ্রকার রস নির্গত হইয়া উহাদিগকে দ্রব করিয়া রসে পরিণত করে। তখন গাছ মূল দিয়া ঐ রস শোষণ করে।

কাণ্ড

গাছের দৃশ্যমান প্রধান অঙ্গ কাণ্ড। মূলের সহিত ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। অনেক গাছের মূল ও কাণ্ডের সংযোগস্থল নির্ণয় করা কঠিন। কাণ্ডের নিকটতম মূলের খানিকটা অংশকে কাণ্ড বলিয়া মনে হয় এবং মূলের নিকটতম কাণ্ডের খানিকটা অংশকে মূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাণ্ডে শাখা, প্রশাখা, পত্র, ফুল, ফল প্রভৃতি জন্মায়, মূলে এসব কিছুই জন্মায় না। কাণ্ড হইতেই পর্ব, সন্ধি, পার্শ্ব মুকুল এবং অন্তস্থ মুকুল প্রভৃতি বাহির হয় একথা পূর্বে জানিয়াছ।

কাণ্ডের আকৃতি (Cross section), কাঠিন্য এবং কার্যকারিতা হিসাবে ইহারা বহুবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। তাল, নারিকেল, খেজুর ও বাঁশ প্রভৃতি গাছের কাণ্ড গোল হইলেও মসৃণতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে কত পার্থক্য দেখা যায়, ইহাদের পরিধি কম বেশী তো আছেই। তেশিরা মনসা, হোগলা এবং মুথা গাছের কাণ্ড ত্রিকোণাকার, আবার হাড়ভাঙ্গা ও তুলসী গাছের কাণ্ড চতুষ্কোণ কিন্তু কুমড়া গাছের কাণ্ড কেমন ঢেউ খেলান গোছের। কাণ্ডের পরিধির আয়তন ও আকার অনুসারে এইরূপ কত প্রভেদ দেখা যায়। ধান গাছের কাণ্ড ফাঁপা, গোল এবং গাঁট গাঁট হইলেও বাঁশের মত শক্ত নয়।

কতকগুলি গাছের কাণ্ড বেশ শক্ত, তাহারা খাড়া থাকে। কিন্তু কতকগুলির কাণ্ড দুর্বল তাহারা খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না—হয় মাটিতে লতাইয়া যায় নতুবা কোন একটি শক্ত জিনিষ আশ্রয় করিয়া তাহাতে চড়িয়া থাকে। এই প্রকার গাছকে সাধারণত **লতা** (Creeper) বলা হয়। সিম, তরুলতা, অপরাজিতা প্রভৃতি লতা আপনার কাণ্ড দ্বারাই অপর আশ্রয়কে জড়াইয়া

ধরে। কিন্তু লাউ, কুমড়া, আঙ্গুর প্রভৃতি লতা আকর্ষ সাহায্যে আশ্রয়কে জড়াইয়া ধরে। বস্তুত এই সকল লতার আকর্ষ কাণ্ডেরই রূপান্তর।

সপুষ্পক উদ্ভিদ দিগকে কাণ্ডের আকৃতি অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—(১) **ওষধি** (Herb), (২) **গুল্ম** (Shrub) ও (৩) **বৃক্ষ** (Tree)।

ওষধির কাণ্ড নরম, রসাল এবং ছোট। ধান, দোপাটী, মূলা, গাজর, কলা, আদা প্রভৃতি ওষধি। দোপাটি, ধান প্রভৃতি এক বৎসর জীবিত থাকে, মূলা, গাজর প্রভৃতি ভূনিম্নস্থ কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া দুই বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু কলা, আদা প্রভৃতির কাণ্ড মাটির নিচে থাকিয়া প্রতি বৎসরই তাহা হইতে নূতন গাছের সৃষ্টি করে।

জবা, করবী প্রভৃতি **গুল্ম**। ইহাদের কাণ্ড খুব শক্ত কিংবা খুব নরম নহে। ইহাদের একটি প্রধান কাণ্ড নাই। মনে হয় গোড়া হইতেই যেন কতকগুলি ডাল পালা বাহির হইয়াছে। ইহারা দুই বৎসরের অধিক কাল বাঁচিতে পারে।

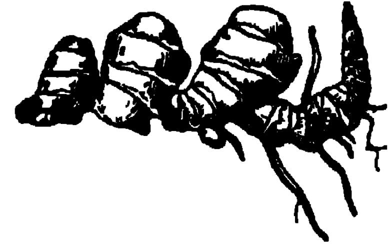
বৃক্ষের কাণ্ড যেমন বড় তেমন শক্ত হয়। বৃক্ষ বহুদিন বাঁচে, কিন্তু প্রতি বৎসর ইহাদের কাণ্ড খোলস ত্যাগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডে একটি পর্দা পড়িয়া যায়। সুতরাং একটি গাছের গুঁড়িকে চাকা করিয়া কাটিলে ইহাতে প্রায় চক্রাকার যে রেখা দেখা যায় তদ্দ্বারা গাছের কাণ্ডে কতগুলি পর্দা পড়িয়াছে বুঝিতে পারা যায় এবং সে হিসাবে গাছের আনুমানিক বয়সও নির্ধারণ করিতে পারা যায়। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতির গুঁড়িতে এরূপ পর্দা বুঝিতে পারা যায় না। ইহাদের গুঁড়িতে শাখা প্রশাখাও জন্মায় না।

কাণ্ড সাধারণত মাটির উপর থাকে, কিন্তু হলুদ, আদা, ওল, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতির কাণ্ড মাটির নিচে থাকে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে মূল মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহারা রূপান্তরিত কাণ্ড। এই সকল কাণ্ডে গাছগুলি খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং ইহা হইতে সময় মত নানা অঙ্গে রস ও খাদ্য সঞ্চালিত করিয়া দেয়।

আলু, ওল, হলুদ প্রভৃতির মত **ভূনিম্নস্থ** কাণ্ডদিগকে মূল না বুঝিবার কয়েকটি লক্ষণ এই—(১) ইহাদের গায়ে পাতলা আঁশের মত ছাল ও কুঁড়ি থাকে (২) ইহাদের মূলত্রা থাকেনা (৩) ইহাদের গা হইতে মূল ও কাণ্ড বাহির হয়।

ভূনিম্নস্থ কাণ্ড সাধারণত চারি প্রকার ; যথা :—

(১) **রাইজোম** (Rhizome)—ইহারা মাটিতে শায়িত অবস্থায় থাকে, মোটা ও শাঁসাল হয়, উপরদিকে পাতা বাহির হয় এবং মাটির উপর ঐ পাতা গুলি বর্ধিত হয়, নিচের দিকে মূল চলিয়া যায়। প্রতিবৎসর সময় ক্রমে পাতাগুলি শুকাইয়া যায় তখন ইহাদের বৃদ্ধি থাকে না। পরবর্তী বৎসরে আবার সময় মত পাতা গজায়। বাংলায় বিজ্ঞান লেখক স্বনামধন্য জগদানন্দ রায় মহাশয় কিছুকাল গাছের এরূপ নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যাপারকে গাছের ঘুম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার সে প্রবন্ধ পড়িলে আরও কত গাছের এরূপ ঘুমের কথা জানিতে পারিবে। ইহাদের গায়ে গাঁট ও পর্বগুলি আঁশের মত পাতলা পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। আদা, হলুদ, কলাগাছ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।



১৬ নং চিত্র—আদা

(২) **স্ফীতকন্দ** (Tuber)—ভূনিম্নস্থ কাণ্ডের যে স্ফীত অংশ প্রায় গোলাকার বা প্রায় ডিম্বাকার হয় ইহাতে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সঞ্চিত থাকে। ইহার গায়ে যে চোখ থাকে সেই চোখগুলি কাটিয়া মাটিতে পুঁতিলে তাহা হইতে নূতন গাছ হয়। গোল-আলু ইহাদের দৃষ্টান্ত।



১৭ নং চিত্র—গোল আলুর গাছ

(৩) **কন্দ** (Bulb)—ইহারা দেখিতে ছোট একটি শঙ্কু (Cone) বা থালার (Disc) ন্যায়। ইহাদের উপর হইতে কতকগুলি মোটা মোটা শল্কপত্র একটি একটি

করিয়া কাণ্ডকে ঘেরিয়া গুচ্ছাকারে মাটির বাহিরে আসে। এই স্থানে প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং এই সকল মোটা শল্ক-পত্রের ডগা মাটির উপর যাইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করে, তাহারাই আমাদের চোখে পড়ে।



১৮ নং চিত্র - ওল ও পেঁয়াজ

কন্দ সাধারণত তিন প্রকারের—(ক) **আবৃতকন্দ** (Tunicated bulb)। ইহার শল্ক পত্রগুলি একটি আর একটিকে এমন ভাবে জড়াইয়া আড়াল করিয়া রাখে যে ভিতরেরটিকে দেখা যায় না। বাহিরের শল্ক-পত্রগুলি ভিতরের গুলি অপেক্ষা পাতলা। পিঁয়াজ, রসুন ইহাদের দৃষ্টান্ত।

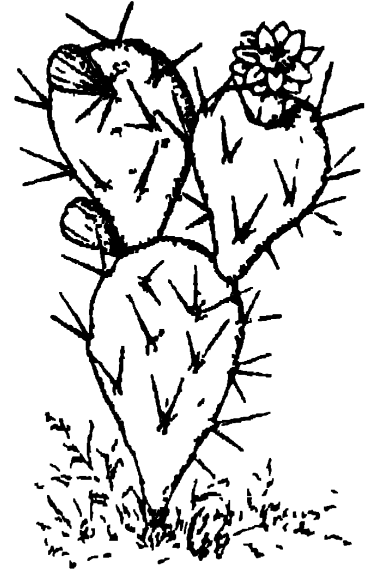
(খ) **নগ্নকন্দ** (Scaly বা Imbricate bulb) ইহাদের কাণ্ডের গায়ে পাতার বোঁটাগুলি একটির পর একটি লাগিয়া থাকে মাত্র এবং কেহ কাহাকেও ঢাকিয়া রাখেনা। পদ্ম, শালুক ইহাদের দৃষ্টান্ত।

(গ) **উপকন্দ** (Pseudo bulb) যে সব কন্দের পাবগুলি স্ফীত হয় তাহাদিগকে উপকন্দ বলে। উদাহরণ—রাস্না, মানকচু ইত্যাদি।

কাণ্ডের প্রধান কার্য ইহার সর্বাঙ্গে রস ও খাদ্য সরবরাহ করা, সবুজ পত্র ধারণ করা—যাহাতে সকল পত্রগুলিই অতি সহজে সূর্যালোক পাইতে পারে, এবং পত্রে প্রস্তুত খাদ্য বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা। কিন্তু অনেক সময় রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া ইহারা অন্যবিধ কার্যও করিয়া থাকে। কুমড়া ও ঝুমকা লতার আকর্ষ এইরূপ কাণ্ডের রূপান্তর। এই আকর্ষ সাহায্যে ইহারা অন্য একটি শক্ত আশ্রয়কে জড়াইয়া থাকে। বেলের কাঁটাও রূপান্তরিত কাণ্ড; ইহা দ্বারা বেলগাছ শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করে। ফণীমনসার কাণ্ড চেপ্টা হইয়া যাওয়ায় পাতার কার্য করিয়া থাকে।

মাটির নিচে আদা, হলুদ, ওল, পেঁয়াজ, আলু প্রভৃতি খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, গোলাপ, বেলফুলের গাছ, হাস্‌না হেনা প্রভৃতির কাণ্ড বংশ বৃদ্ধিও করে।

গাছ পাতা দিয়া আহার্য প্রস্তুত করিয়া দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত করে। তাহা হইলে নিশ্চয় ইহাদের দেহে খাদ্য সঞ্চালনের দুই রকম পথ আছে। একরকম পথ দিয়া পত্র হইতে খাদ্য আসিয়া সর্ব দেহে সঞ্চালিত হয়। এই পথ গুলিকে **ফ্লোয়েম** (Phloem) বলে। অন্য রকম পথ দিয়া মূল হইতে খাদ্য উদ্ভিদের সর্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদিগকে **জাইলেম** (Xylem) বলে। যে কোন একটি নরম গাছের—ধর কচুগাছের শিকড়ের দিক কাটিয়া রঙিন্ জলে ডুবাইলে পাতাগুলির শিরা পর্যন্ত রঙিন হইয়া উঠে। পাত্রের রঙিন্ জল ঐ জাইলেম দিয়া শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে জাইলেমের অস্তিত্ব বুঝা যায়।



১৯ নং চিত্র—ফণীমনসা

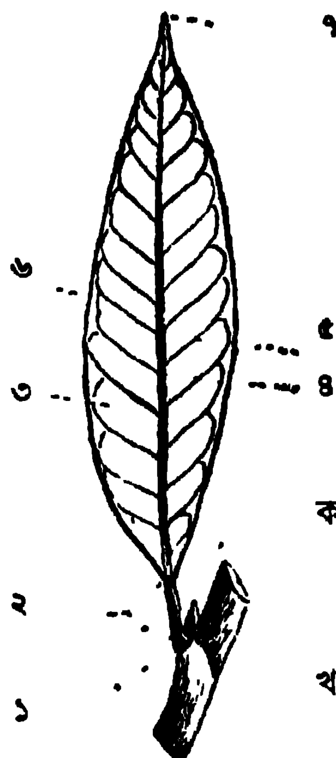
বীজ পত্রের পার্থক্যে উদ্ভিদের কাণ্ডের যে পার্থক্য সচরাচর পরিলক্ষিত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল।

একবীজপত্রী	দ্বিবীজপত্রী
১। কাণ্ডে শাখা প্রায় হয় না।	কাণ্ডে শাখা প্রায়ই থাকে।
২। আগাগোড়া প্রায় সমান মোটা হয়।	আগা সরু ও গোড়া মোটা হয়।
৩। অপেক্ষাকৃত বড় পাতা হয়।	পাতা সাধারণত খুব ছোট এবং সংখ্যায় অধিকতর হয়।

পত্র

গাছের পাতা কাণ্ড, শাখা বা প্রশাখার পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বের দিকে ইহাদের অধিকতর অংশ প্রসারিত করিয়া থাকে। সাধারণত অধিকাংশ পাতা সবুজ বর্ণের পাত্‌লা এবং চওড়া পাতের ন্যায়। একটি পরিপূর্ণ পাতার সাধারণত তিনটি অংশ যথা:—**ফলক** (Blade), **বৃন্ত** (Stalk বা Petiole)

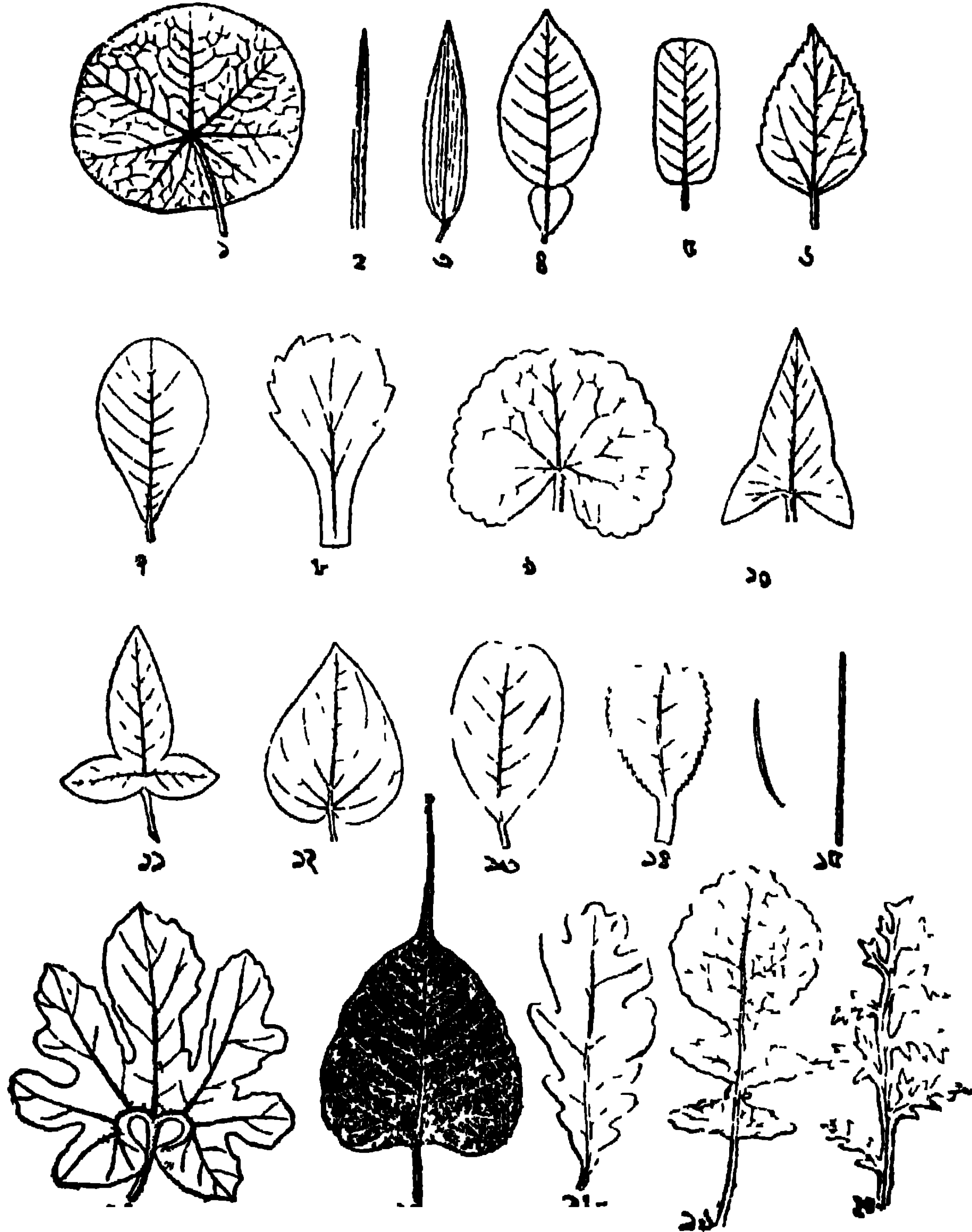
এবং **বৃন্তমূল** (Base)। যে অংশ ঠিক কাণ্ডের সহিত লাগিয়া থাকে তাহা বৃন্তের অপরাংশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও কিছু স্থুল। এই অংশকে (১) **বৃন্তমুল** (Base) বলা হয়। ফলকের ও বৃন্তমূলের মধ্যবর্তী অংশ (২) **বৃন্ত** (Petiole)। সকল সময়ে সকল পত্রে বৃন্ত নির্ধারণ করা যায় না—মটরের গাঁটে যে পাতা হয় তাহার ঠিক বৃন্ত বুঝা যায় না। কলাগাছ প্রভৃতির বৃন্তমূলও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। পত্রের সর্বাধিক অংশ সাধারণত পাতলা ও চওড়া হয়, ইহাই (৩) **পত্র ফলক**। এতদ্ভিন্ন চিত্রে একটি পত্রের (৪) **মধ্য-শিরা** (৫), **সাধারণ-শিরা** (৬) **কিনারা** ও (৭) **পত্র-শীর্ষ** দেখান হইল। **ক** একটি পার্শ্বমুকুল এবং **খ** একটি সন্ধি।



২০ নং চিত্র—পত্রের বিভিন্ন অংশ

পত্র ফলকের আকার, শীর্ষ এবং কিনারাগুলি আবার বহুবিধ হইয়া থাকে। ঝাউ, বন ঝাউ, পাইন প্রভৃতি গাছের পাতার সঙ্গে পদ্ম পাতা বা কলা পাতার তুলনা করিলে একটিকে পত্র বলিলে অপরটিকে আর পত্র বলিয়া মনে হয়না। অথচ প্রকৃত পক্ষে তাহারা সকলেই পাতা। থালকুড় ও পদ্ম পাতার **শীর্ষগুলি** কেমন গোল। কিন্তু পান, কলমি বা কচু পাতার অগ্রভাগ কেমন সুচাল। অশ্বত্থ পাতার অগ্রভাগ আবার ইহাদের অপেক্ষা কেমন সুচাল হইয়া খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। কাঞ্চন পাতা আবার ঠিক বিপরীত। দেবদারু পাতার কিনারাগুলি কেমন ঢেউ-খেলান, আমগাছের পাতা কেমন নিটোল, আনারসের পাতা কাঁটাযুক্ত, অথচ জবা পাতার কিনারা কেমন কাটা কাটা। ২১ নং চিত্রে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আকারের পাতা দেখান হইল। ধান গাছের মত লম্বা ফলক পাতাকে **লম্ব** (Linear) পত্র, বট পাতার মত আকৃতি বিশিষ্ট পাতাকে

ডিম্বাকৃতি (Egg-shaped বা Ovate), পানকে **হরতনাকৃতি** (Hart shaped), থালকুড়ের বা কাঞ্চন পাতাকে **বৃক্কাকৃতি** (Kidney shaped বা Reniform), লাউকুমড়ার পাতাকে **হংসপদাকৃতি** (Crisped), কচু পাতার



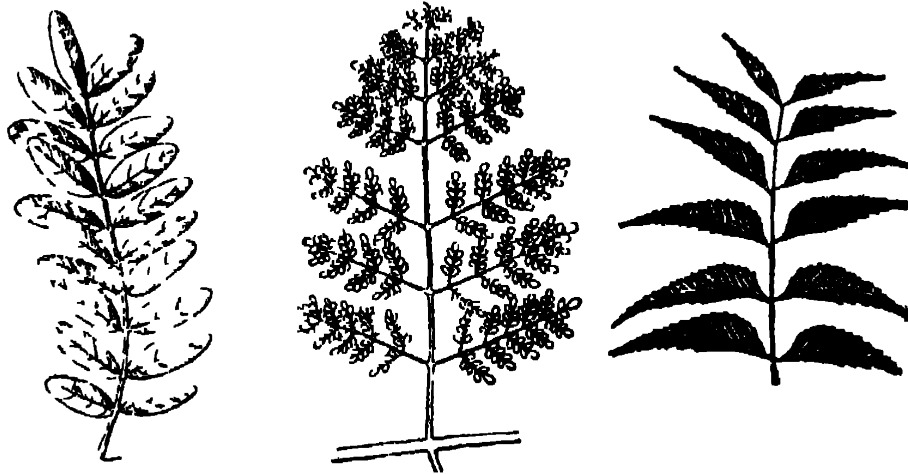
২১ নং চিত্র—বিভিন্ন রকমের পাতা

ন্যায় পাতাকে **বাণাকৃতি** (Sagitate), আম জামের পাতাকে **বল্লমাকৃতি** (Lanceolate), পাইন গাছের পাতাকে **সূচাগ্র** (Occular), পদ্মপাতাকে

চক্রপত্র (Round leaf) বলা হয়। হাতের চেটোর মত পাতা, যথা :—সিমুল ভেরেণ্ডা প্রভৃতির পাতাকে **হস্তাকৃতি** (Palmate) পাতা বলে।

পাতার ডগা (Apex) হিসাবেও ইহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ফেলা হয়। খেজুর ও পাইন পাতার ডগা সূচের মত তাই ইহারা **সূচাগ্র** (Mucronate) অশ্বত্থপাতা **দীর্ঘশীর্ষ** (Accuminate), আম, জাম পাতা **তীক্ষ্ণাগ্র** (Accute) ইত্যাদি।

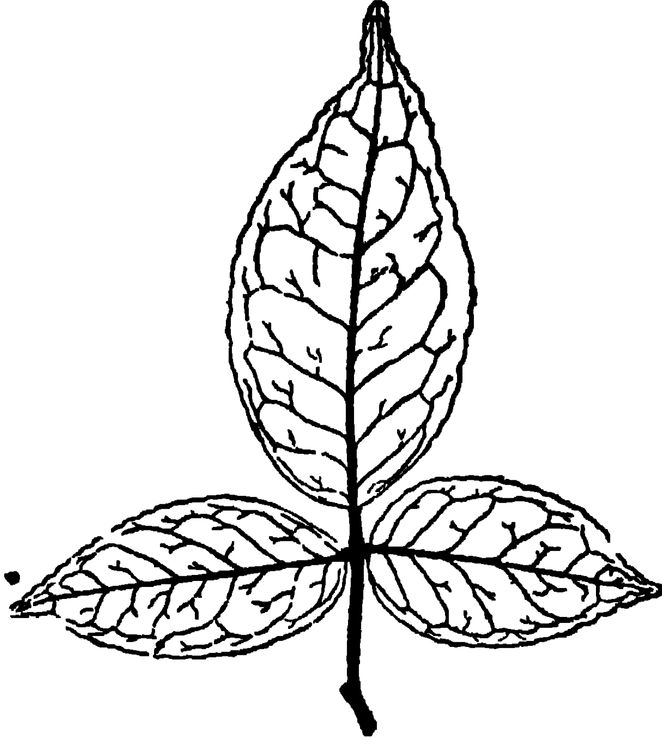
বৃন্ত বা কাণ্ডে কিংবা শাখা প্রশাখায় পত্রবিন্যাস কত বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। কলাগাছের পাতা, কাণ্ডে যেমন ভাবে লাগিয়া থাকে আমগাছের পাতা ঠিক সেরূপ ভাবে থাকে না। জবা গাছের প্রতি গাঁটে বিপরীত দিকে পত্র বাহির হয়, বঙ্গন গাছে একটি গাঁটে দুটি পাতা বিপরীত দিকে নির্গত হয় এবং করবী গাছের প্রত্যেক গাঁটে কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাতা বাহির হয়। একটু লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে যে গাছের একটি গাঁটে যত বেশী পাতা বাহির হয়, পাতা আকারে তত ছোট হয়।



২২ নং চিত্র—তেঁতুল, সজনা ও নিম পাতা

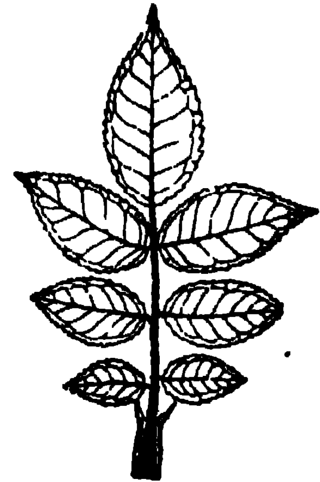
আমের একটি বৃন্তে মাত্র একটি পাতা থাকে কিন্তু বেল, গোলাপ, নিম তেঁতুল প্রভৃতি গাছের একটি বৃন্তে একাধিক পত্র থাকে—কখনও জোড় সংখ্যক কখনও বিজোড় সংখ্যক। নিম, গোলাপ, বেলের একাধিক বিজোড় সংখ্যক

পত্র একটি বৃন্তে থাকে। কিন্তু তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির বৃন্তে জোড় সংখ্যক পত্র থাকে। যে সকল গাছের একটি বৃন্তে একটি পাতা হয় তাহাদের পাতাগুলি **সরলপত্র** (Simple leaf) এবং একটি বৃন্তে একাধিক পত্র থাকিলে তাহাকে **যুক্তপত্র** (Compound leaf) বলা হয়। আম, কাঁটাল প্রভৃতির পাতা সরলপত্র, কিন্তু নিম, শিমূল, গোলাপ, তেঁতুল, শজনা প্রভৃতির যুক্ত পত্র। এইরূপ এক একটি যুক্তপত্রের ফলককে **অনুফলক** (Leaflet) বলে। এক একটি অনুফলককে পৃথক করিলে এক একটি পত্রের মত দেখায়।



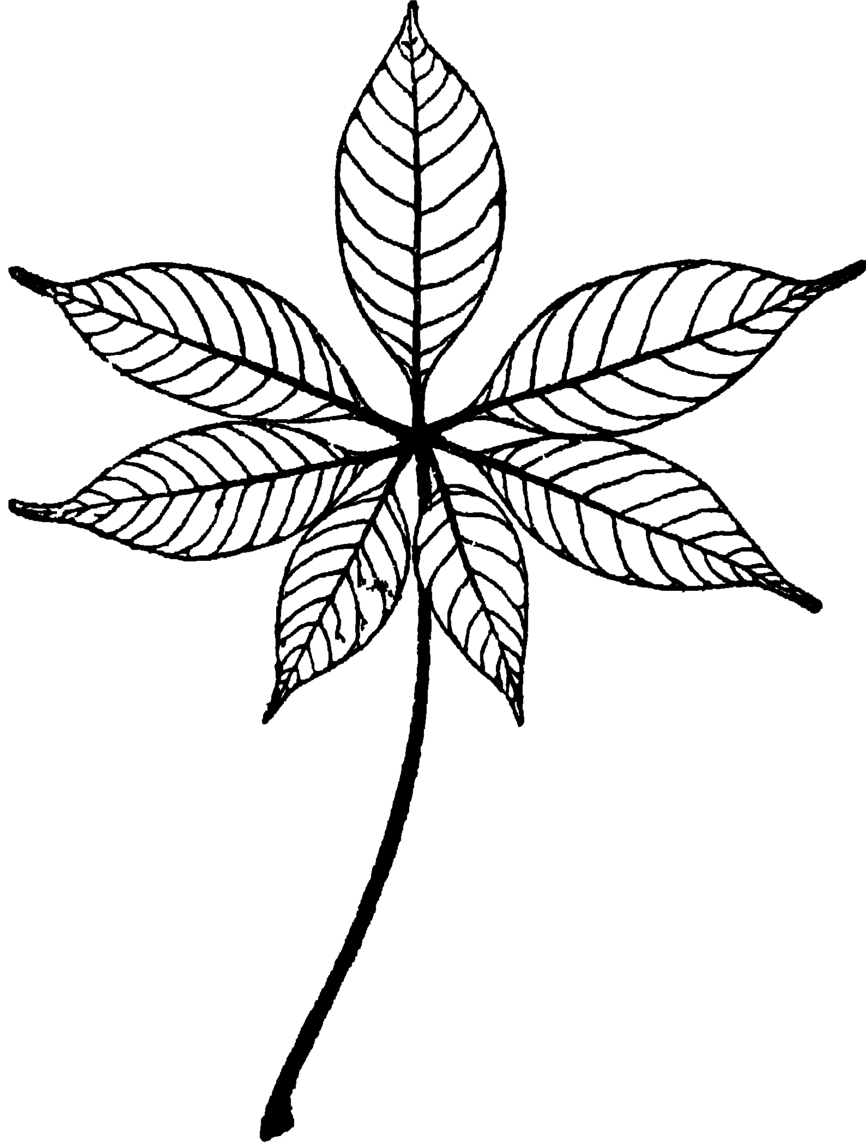
২৩ নং চিত্র—বেলপাতা

আকৃতি অনুসারে পত্রে শিরাবিন্যাস কত বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কখনও একটি পাতায় একটি প্রধান শিরা, কখনও বা একাধিক প্রধান শিরা থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক পাতায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাও থাকে। আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতির একটি **মধ্যশিরা** (Mid-rib) হইতে আবার সূক্ষ্মতর শিরা এবং সে গুলি হইতে আরও কত সূক্ষ্মতর শিরা চারিদিকে জালের মত ছড়াইয়া আছে। ইহারা জাল শিরা। বাঁশ, আনারস, আখ, ধান প্রভৃতির পাতার শিরাগুলি এরূপ নহে। ইহাদের মধ্যশিরা বলিয়া কিছু নাই—সব শিরাগুলি



২৪ নং চিত্র—গোলাপ পাতা

সমান অথচ প্রায় **সমান্তরাল** (Parallel)। সমান্তরাল শিরা দুই বকম,- কলাপাতার শিরা **সমান্তরাল পালক শিরা** (Parallel pinnate), আর বাঁশ ইত্যাদির পাতার শিরা, **সমান্তরাল করতল** (Parallel palmate) শিরা। লাউ কুমড়ার শিরা **জাল করতল** শিরা (Reticulate palmate)।



২৫ নং চিত্র—শিমুল পাতা

এই শিরার জন্য পাতা শক্ত হয়। অশ্বত্থ পাতা পচিয়া গেলেও ইহার শিরা-গুলি কেমন জালের মত দেখিতে হয় তাহা তোমাদের অনেকেই দেখিয়া থাকিবে; তাহা হইলে শিরাগুলি পাতার অন্য অংশ হইতে শক্ত বলিয়া ইহা পাতাকেও শক্ত

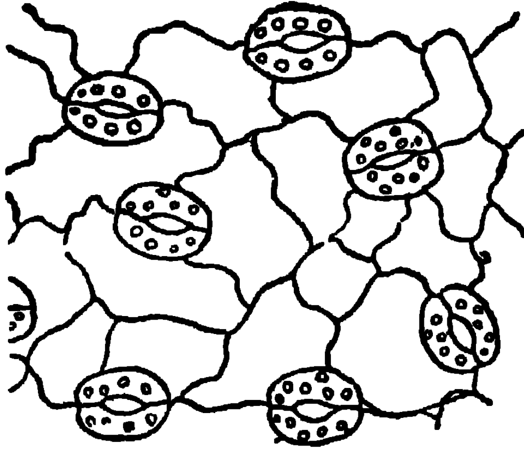
করে। এই শিরার জন্যই কোন পাতাকে ইচ্ছামত যে কোন দিক হইতে সহজে ছিঁড়িয়া ফেলা যায় না। ইহা ছাড়া এই সকল শিরা দিয়া উদ্ভিদ পাতায় প্রস্তুত খাদ্য দেহের অন্যত্র পাঠাইয়া দেয় এবং মূল দ্বারা আহৃত খাদ্যও এই শিরা সকল দিয়া পাতা পর্যন্ত ছড়াইয়া দেয়।



২৬ নং চিত্র—ভেরেণ্ডা পাতা

প্রায় সকল পাতারই উপর দিক অর্থাৎ যে দিক সূর্যের দিকে থাকে তাহা মসৃণ এবং নিচের দিক অপেক্ষাকৃত খসখসে। পাতার নিচের দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে তাহাদের নাম ষ্টোমা (Stoma)। এই ষ্টোমাই ইহাদের নাসিকার কার্য চালায়—অবশ্য গাছের প্রত্যেক কোষ দিয়া শ্বাস কার্য চলিতে

পারে। ষ্টোমাগুলি বন্ধ হইয়া গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়—অবশেষে গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাই পাতায় ধূলা কাদা লাগিলে পাতাগুলি ধুইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের দেহের লোমকূপের মতই ষ্টোমাগুলি অতিক্ষুদ্র—খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।



২৭ নং চিত্র—ষ্টোমা

ষ্টোমার দুই পাশে দুইটি কোষ থাকে তাহারা সূর্যালোকে প্রসারিত অথবা তাহার অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া ষ্টোমার আয়তন যথাক্রমে বাড়াইতে ও কমাইতে পারে বলিয়া ইহাদিগকে **রক্ষীকোষ** (Guard cell) বলা হয়। রক্ষী কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস্ ও এক প্রকার সবুজ কণা থাকে। সবুজ কণাগুলিকে **পত্র-হরিৎ** (Chlorophyl) বলা হয়।

পাতার প্রধান কাজ তিনটি—(১) অঙ্গার আত্মকরণ (Carbon assimilation) বা আলোক সংশ্লেষ (Photo Synthesis), (২) শ্বাসকার্য (Respiration) ও (৩) প্রস্বেদন (Transpiration)।

অঙ্গার আত্মকরণ প্রক্রিয়াটিকে রন্ধনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে মূল দিয়া গাছ আহার্যের কাঁচা মাল রস সংগ্রহ করিয়া কাণ্ড মধ্যস্থ নালী এবং পত্রের শিরা দিয়া পত্রে ছড়াইয়া দেয়। এইখানে ষ্টোমা দিয়া পাতাগুলি বায়ু হইতে কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ করে এবং রক্ষী কোষের দ্বারা সূর্যালোক টানিয়া লয়। সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিলের বর্তমানে রস ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডে যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তাহার ফলে ফরম্যালডিহাইড (Formaldehide) নামক পদার্থ ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন রন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া যায়। ফরম্যালডিহাইড্ শর্করায় পরিণত হয় ও জীবিত কোষ পুষ্ট করিবার জন্য দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হয়। বাকি ফরম্যালডিহাইড

প্রোটোপ্লাজম সাহায্যে শ্বেতসারে পরিবর্তিত হয়। রাত্রে ঐ শ্বেতসার কিন্তু পুনর্বায় শর্করায় পরিবর্তিত হয় এবং বিপরীত প্রক্রিয়া চলে।

তাহা হইলে এখানে যদি পাতাকে উদ্ভিদের রন্ধন শালা ধরা হয় তবে ষ্টোমা গুলি উহার জানালা, সূর্যালোক আগুন, ক্লোরোফিল রাঁধুনী এবং রস ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড খাদ্যের উপকরণ।

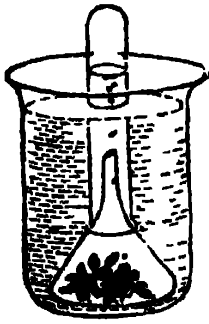
শশা, ডুমুর, কুমড়া প্রভৃতির পাতায় দেখিয়াছ কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুঁয়া থাকে। অথচ আম, জাম, কাঁটাল, অশ্বত্থ, বটের পাতা কত মসৃণ। এই শুঁয়া থাকায় ইহারা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করে। বিছুটির শুঁয়া কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক তোমরা অনেকেই জান। আনারস, ঘৃতকুমারী প্রভৃতির পাতার কাঁটাও আত্মরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় পাতার রসও গাছকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। লেবু, কালমেঘ প্রভৃতির পাতা এ জন্য উল্লেখযোগ্য। গাঁদাল পাতার তীব্র গন্ধেও ইহার নিকটে শত্রু আসিতে পারে না। ওল, কচু প্রভৃতির পাতা এত কুট্‌কুটে যে মানুষের গায়ের চামড়ায় ইহাদের রস লাগিলে গা পর্যন্ত কুট্‌কুট করে।

পাতা রূপান্তরিত হইয়া অন্য অনেক কাজ করিয়া থাকে। ফণীমনসা গাছের কাঁটাগুলি ইহার রূপান্তরিত পাতা ছাড়া আর কিছুই নয়—ইহার দ্বারা ইহারা আত্মরক্ষা করে। মটর গাছের আকর্ষ পাতার রূপান্তর, ইহাদ্বারা ইহারা আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ধরে। ঝাঁঝির পাতায় পোকা মাকড় ধরিবার ফাঁদের বন্দোবস্ত আছে। পাথর কুঁচির পাতায় চারা জন্মায়।


২৮ নং চিত্র—মটরের আকর্ষ

পত্রহরিৎ সূর্য্যকিরণের সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ হইতে কার্বনটুকু গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত রসের সাহায্যে গাছের দেহ পুষ্ট করে এবং অক্সিজেন-বাষ্প্ বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। উদ্ভিদ্ যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে, তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে বুঝা যায়।

একটি বড় কাচের পাত্রে কিছু সবুজ শেওলা রাখিয়া উহার উপর একটি কাচের ফানেল উপুড় করিয়া দাও। কাচের পাত্রটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাষ্প মিশ্রিত জল (বাজারেব সোডা ওআটার) দিয়া প্রায় পূর্ণ করিয়া দাও, যেন ফানেলটি সম্পূর্ণ ভাবে ঐ জলে ডুবিয়া থাকে। পরে একটি জলপূর্ণ পরথ-নলী ফানেলের নলেব উপর এরূপভাবে বসাইয়া দাও, যেন ইহাতে কোনরূপে বাতাস না প্রবেশ করে। পাত্রটিকে এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিয়া দাও। পরে দেখিতে পাইবে যে, শেওলা হইতে বুদ্বুদ বাহির হইয়া পরথ্ নলীব ভিতর জমিতেছে এবং উক্ত নলীর জল নিচে নামিযা যাইতেছে (২৯ নং চিত্র)। পবথ-নলীটি এরূপে বায়ুপূর্ণ হইলে নলীব মুখ আঙ্গুল দিয়া বন্ধ কবিয়া উহাকে বাহিবে আন। উহাব মধ্যে একটি নির্বাপিত-প্রায় দেশালাই কাঠি ফেলিয়া দিলেই তাহা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিবে। অতএব পবথ-নলীব মধ্যস্থিত বায়ু অম্লজান ভিন্ন আব কিছু নহে। তাহা হইলে পত্রগুলি বুদ্বুদ্রূপে অক্সিজেন ত্যাগ কবিতেছিল।



২৯ নং চিত্র—উদ্ভিদ ও বায়ু

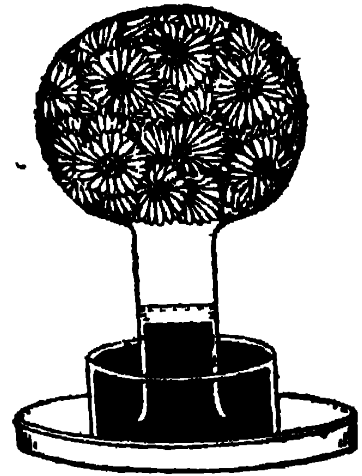
অন্ধকার স্থানে এই পরীক্ষা কবিলে এরূপ কোনও বুদ্বুদ্ উঠে না। অর্থাৎ যে ক্রিয়ায উদ্ভিদ্ বায়ুস্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাষ্পেব কার্বন গ্রহণ কবত অক্সিজেন ছাডিয়া দিয়া কার্বনাংশের দ্বারা স্বীয় দেহ পুষ্ট কবে, তাহা সূর্যের আলো ও তাপ ব্যতীত হইতেই পাবে না। এইজন্য সূর্যকিবণ উদ্ভিদ্ জীবনেব পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দেখ, রৌদ্র ও উত্তাপ পাইলে গাছ যেমন সজীব থাকে, অন্ধকারে সেরূপ থাকে না। ঘাসের উপব একটি পাত্র উপুড কবিয়া রাখিলে কয়েক দিন পরে আলো না পাইয়া ঘাসগুলি সাদা হইয়া যাইবে।

প্রাণিগণের ন্যায় উদ্ভিদ্গণের শরীবেও ভাঙ্গাগডা কার্য নিয়তই চলিতেছে। তাহার ফলে উদ্ভিদ্গণও কিয়ৎপরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ত্যাগ কবে। দিবা-ভাগে উদ্ভিদেরা যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ত্যাগ করে, নিজেদের অঙ্গপুষ্টির জন্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বায়ু হইতে গ্রহণ করত

উহার অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু রাত্রিকালে সূর্যকিরণের অভাবে এরূপভাবে অক্সিজেন ছাড়িতে পারে না, কেবলমাত্র কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ ত্যাগ করে। এই জন্য রাত্রে বৃক্ষতলে শয়ন করিলে শরীর অসুস্থ হইতে পারে।

এখন তোমরা দেখিলে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ দ্বারা বায়ুস্থ অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ-সামঞ্জস্য কিরূপে রক্ষিত হইতেছে। প্রাণিগণ অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ বাতাসে ছাড়িয়া দিয়া বায়ুকে সর্বদা দূষিত করিতেছে, আর উদ্ভিদ্‌গণ সূর্যকিরণের সাহায্যে সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্রহণ করত অক্সিজেন ছাড়িয়া দিয়া বায়ুকে পরিষ্কৃত রাখিতেছে এবং গৃহীত কার্বনাংশ দ্বারা স্বীয় শরীরের পুষ্টিসাধন করিতেছে। এই বিনিময়ের ফলেই প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন রক্ষিত হইতেছে।

গাছের **শ্বাসকার্য** (Respiration) পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ফ্লাস্কে কতকগুলি বোঁটাকাটা টাট্‌কা ফুল ঢুকাইয়া দাও। ফ্লাস্ক উপুড় করিলে ফুলগুলি যেন পড়িয়া না যায়। একটি বড় থালার মত পাত্রের উপর একটি গভীর পাত্রে কিছু পারদ লও। ঐ পারদের উপর ফ্লাস্কটি উপুড় করিয়া দাও। এইবার একটি রবারের নলের সাহায্যে খানিকটা কষ্টিক পটাশের ঘন দ্রবণ ফ্লাস্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা কর। পরে দেখিবে ফ্লাস্কের মধ্যে পারা উঠিয়া যাইবে। ফ্লাস্কের মধ্যে পূর্বে যে বায়ু ছিল তাহা হইতে ফুল অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড্ ত্যাগ করে, কিন্তু কষ্টিক পটাশ দ্রবণ ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ শোষণ করায় পারা ভিতরে উঠিয়া যায়। মনে রাখিও উদ্ভিদ দিনের বেলায় অক্সিজেন ত্যাগ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ টানিয়া লয় কিন্তু রাত্রে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া চলে। ষ্টোমা দ্বারা উদ্ভিদগণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ পাতার ভিতরে টানিয়া লয়।

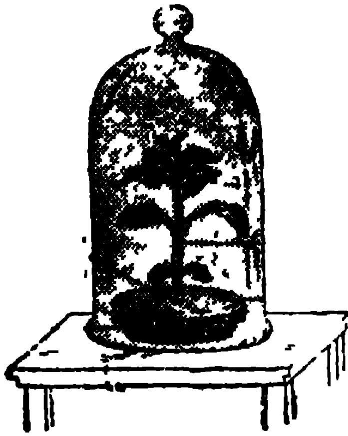


৩০ নং চিত্র—পাতার শ্বাসকার্য

প্রস্বেদন (Transpiration)—গাছের পাতা আরও একটি কাজ করিয়া

থাকে। শিকড় দিয়া খাদ্য গ্রহণ কালে ইহারা মাটি হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল টানিয়া লয়। পরে পাতার সাহায্যে উহাকে বাষ্পীভূত অবস্থায় বায়ু মণ্ডলে ছাড়িয়া দেয়।

একটি ছোট গাছের চারার গোড়ার দিক একটি রবারের চাদরের ভিতর ঢুকাইয়া গোড়াটি একটি ছোট গামলায় রক্ষিত মাটিতে পুঁতিয়া দাও। কয়েক দিন পরে গাছটি লাগিয়া গেলে রবারের চাদরটি গামলায় দড়ি বা সূতা দিয়া বাঁধ। যদি রবারের ছিদ্র বড় হওয়ায় গাছের পাশে রবারের চাদরের মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যায় তবে তুলা দিয়া বন্ধ কর। পরে একটি বড় কাচের প্লেটের উপর গামলাটি রাখিয়া গাছ ও গামলাকে একটি বড় বেলজারে চাপা দিয়া রাখিয়া দাও। পরদিন দেখিবে বেলজারের গায়ে জল বিন্দু জমিয়া যাওয়ায় বেলজারের কাচ ঈষদচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ জলবিন্দু নিশ্চয়ই ঐ গাছটির পাতা হইতে নির্গত হইয়াছে। ইহাকে গাছের **প্রস্বেদন** প্রক্রিয়া বলে। যদি মাটি হইতে কোন জলীয় বাষ্প উঠিয়া থাকে তবে তাহা রবারের ভিতর আটকাইয়া যাইবে।



৩১ নং চিত্র—প্রস্বেদন

কলস উদ্ভিদ (Pitcher plant) নামে এক প্রকার গাছের পাতার মধ্যশিরা সূতার মত লম্বা হইয়া শীর্ষে একটি কলসীর মত পাত্রের আকার ধারণ করে। পাত্রটির মধ্যে মিষ্ট রস থাকে এবং উহার মুখ রঙিণ আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে। কীট পতঙ্গ লোভে পড়িয়া ঐ রস পান করিতে আসিলে উহারা পাত্রের মধ্যে পিছলাইয়া পড়ে এবং প্রাণ হারায়। তখন ঐ কলসের এক প্রকার রস নির্গত হয়, উহা কীট পতঙ্গদিগকে জীর্ণ করিয়া ফেলে এবং উদ্ভিদ ঐ পতঙ্গের দেহ হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। এইরূপ উদ্ভিদদিগকে **পতঙ্গভুক** (Insectivorous) বলে। আমাদের দেশের পুকুরের এক প্রকার ঝাঁঝি অনুরূপ উপায়ে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

ফুল

আমাদের দেশে সাধারণত শরৎ এবং বসন্ত কালে অনেক রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে। গাছ যখন বেশ সবল ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে তখন নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট গাছে ফুলের কুঁড়ি দেখা দেয়। কিন্তু এমন অনেক গাছ আছে যাহাতে বার মাস ফুল ফুটে। ফুলের সুগন্ধ এবং সৌন্দর্য আমাদিগকে আকৃষ্ট করে। ফুল বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। ইহার ন্যায় মনোমুগ্ধকর সুন্দর জিনিষ জগতে আর নাই। ফুলের সৌন্দর্য পাপড়িতে। বিচিত্র বর্ণ সম্পদে সজ্জিত হইয়া কুঁড়ি হইতে যখন পাপড়িগুলি আত্মপ্রকাশ করে তখন কেবল মানুষ নহে কত ইতর প্রাণীও আকৃষ্ট হইযা মুগ্ধভাবে ইহার পাশে ঘুরিযা বেড়ায়।

একটি বোঁটা হইতে কোন প্রকার গাছে একটি ফুল হয় আবার কোন প্রকার গাছে একটি বোঁটা হইতে বহু ফুল ধরে। শেষোক্ত প্রকারের ফুলের সমগ্র বোঁটাকে **মঞ্জরী** (Inflorescence) বলে।

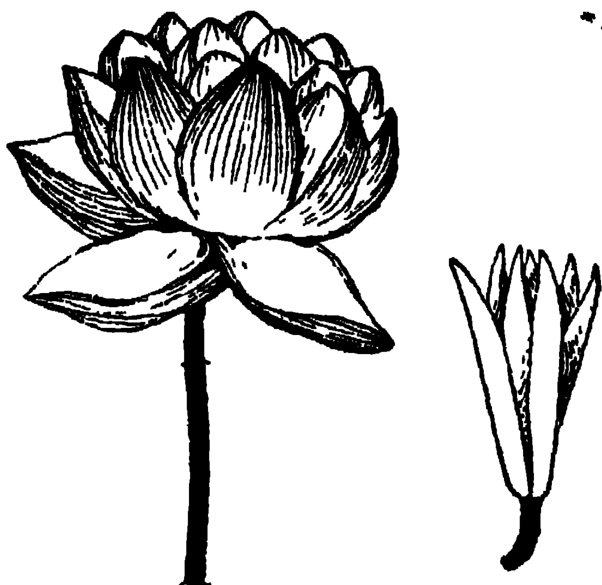
একটি ফুল লইয়া পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে কেবল মাত্র পাপড়িই ফুলের সমস্ত অংশ নহে। একটি ফুলের সাধারণত চারিটি অংশ, যথা :—(১) **কুণ্ড** বা **বৃত্যংশ** (Sepal), এবং **কুণ্ডসমষ্টি** বা **বৃতি** (Calyx), (২) **পাপড়ি** (Petal) এবং পাপড়ির সমষ্টি **অন্তরাবরণ** বা **পুষ্প মুকুট** (Corolla), (৩) **পরাগ কেশর** বা **পুং কেশর** (Stamen) ও (৪) **গর্ভকেশর** বা **স্ত্রী কেশর** (Carpel)।

একটি ফুলের বোঁটা ধরিয়া উপর দিকে ধরিলে ফুলের সবচেয়ে নিচের অংশটি অর্থাৎ ঠিক বোঁটার উপরকার অংশটিই বৃতি। ইহার বর্ণ সাধারণত সবুজ। যখন ইহারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত থাকে তখন এক একটি খণ্ডকে **বৃত্যংশ** (Sepal) বলে। যখন ফুল কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন এই বৃতিরূপ কৌটার মধ্যে সমগ্র ফুলটি আপনাকে গুটাইয়া আত্ম গোপন করিয়া থাকে। তখন ফুলের মনোহারিত্ব বা নূতন বর্ণ থাকে না। যত দিন যায় তত বৃতির মুখ ফাটিয়া যায় এবং ফুলের পাপড়ি বাহির হয় এবং বর্ণ সম্পদে ও সৌরভে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বহু ফুলের বোঁটা ও বৃতির সংযোগ স্থলে ছোট ছোট পাতার মত এক প্রকার অংশ দেখিতে

পাওয়া যায়—ইহাদের বর্ণ সাধারণত বৃতির বর্ণের ন্যায়। ইহাদিগকে **বৃন্তপত্র** (Bract) বলে।

লক্ষ্য করিলে দেখিবে একটি জবা ফুলের ঠিক বোঁটার উপরেই খুব ছোট কতগুলি পাতার মত জিনিষ ছড়াইয়া আছে; ইহা বৃন্তপত্র। ইহাদের উপর হইতে ফুলেব আরম্ভ। ইহার উপর সবুজ বর্ণেব একটি বাটির মত জিনিষ থাকে যাহার ভিতর কুঁড়ি অবস্থায় ফুল ঢাকা থাকে। কাল ক্রমে এই বাটি ফাটিযা গেলে বঙিণ পাপড়ি বাহির হয়; ইহাই জবা ফুলেব বৃতি।

বৃতিব পরেই ফুলেব (২) **পাপড়ি** (Petal), বা পাপড়িব সমষ্টি **অন্তরাবরণ** বা **পুষ্প মুকুট** (Corolla)। পাপড়িগুলি কখনও কাটা কাটা হয, কখন কখন একসঙ্গে যুক্ত হইযা বৃতির মত একটি হইযা থাকে। কাটা কাটা এক একটি অংশকে **পাপড়ি** (Petal) এবং উহাদেব সমষ্টিকে **দল** বা **পুষ্প মুকুট** (Corolla) বলে। ফুলেব এই অংশই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। বর্ণ সম্পদই বল আব সৌবভই বল, সকলই পাপড়িতে। দিনেব বেলায যে সকল ফুল ফুটে, তাহাদেব বর্ণ সাধারণত শাদা হইলেও উহাদেব গন্ধ তীব্র। কখন কখন পাপড়িগুলি এক স্তবে কখনও বা বহুস্তবে সজ্জিত থাকে। কৃষ্ণচূড়াব ফুলেব পাপড়ি এক থাক কাটা কাটা, কিন্তু ধুতুবা, কল্‌কে প্রভৃতি ফুলের এক থাক পাপড়ি একসঙ্গে সংযুক্ত হইযা তামাক খাইবার কলিকার মত দেখায়। জবা এবং মালতী ফুলে পাঁচটি, সরিষা ফুলে চারিটি, আতা ও কাঁটাল ফুলে তিনটি করিয়া পাপড়ি থাকে। আবার গোলাপ ফুলে এক থাকে পাঁচটি করিয়া দুই তিন থাক এবং চাঁপা ফুলে তিনটি করিয়া দুই থাক পাপড়ি সাজান



৩২ নং চিত্র—পদ্ম ও চাঁপা

থাকে। পদ্মে ঐরূপ অনেকগুলি পাপড়ি থাক থাক সাজান আছে, তাই পদ্মের আর এক নাম শতদল।

ফুলের তৃতীয় স্তবক (৩) **পুং কেশরচক্র** (Andrœcium)। পাপড়ির পর ফুলের ভিতরে লম্বা তারের মত কতকগুলি জিনিষ দেখা যায়, তাহাদের নাম **পুং কেশর** (Stamen)। ইহাদের মাথায় একটি করিয়া চ্যাপ্টা থলি থাকে, তাহাতে হলুদ রঙএর ফুলের **রেণু** বা **পরাগ** (Pollen) থাকে। থলিটিকে **পরাগকোষ** (Anther) বলা হয়। তাহা হইলে প্রত্যেক পুং কেশরের দুইটি অংশ। নিচের সূত্রাকার অংশের নাম **সূত্র** (Filament) এবং উপরের অংশ পরাগকোষ।

সর্বশেষে ফুলের অন্তরতম প্রদেশে থাকে (৪) **গর্ভকেশর চক্র** (Gynacoeum), ফুলের ভিতরে ইহার এক একটি অংশকে বলে **গর্ভকেশর** (Carpel)। গর্ভকেশরের সর্ব নিম্নে স্ফীত অংশকে গর্ভকোষ বলে। এই গর্ভকোষের সঙ্গে উপর দিকে একটি সরু নল সংযুক্ত থাকে, তাহাকে **গর্ভ দণ্ড** (Style) এবং এই গর্ভদণ্ডের শীর্ষদেশকে **গর্ভমুণ্ড** (Stigma) বলা হয়। গর্ভকোষের ভিতর থাকে **ডিম্বকোষ** (Ovule) এবং তাহার ভিতর থাকে **ডিম্বক** (Ovum)। গর্ভকোষ ধীরে ধীরে বাড়িয়া ফলের আকার ধারণ করিতে থাকিলে এদিকে ফুলের অন্য অংশ শুকাইয়া যাইতে থাকে, শেষে পাপড়ি ও কেশরগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। গর্ভকোষ, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড লইয়াই ফুলের গর্ভকেশর। ৩১ নং চিত্রে একটি মাঝামাঝি কাটা জবাফুলের বিভিন্ন অংশ দেখ—(১) পরাগকেশর, (২) পরাগকোষ, (৩) পাপড়ি, (৪ গর্ভদণ্ড, (৫) বৃতি (৬) গর্ভকোষ ও (৭) বৃন্তপত্র।



৩১ নং চিত্র—মাঝামাঝি কাটা জবাফুল

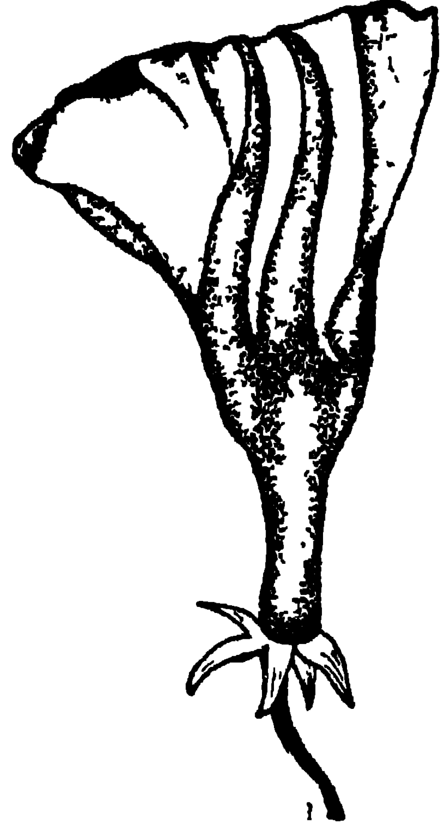
সকল পুষ্পে পূর্বোক্ত চারিটি অংশ সুপরিস্ফুট নহে। যাহাদের এই চারিটি অংশআছে তাহাদিগকে **পূর্ণাঙ্গ** (Regular) এবং যাহাদেব এই চারিটি অংশের সকলগুলিই সুপরিস্ফুট নয় তাহাদিগকে **অপূর্ণাঙ্গ** (Irregular) ফুল বলে।

ধুতুবা, গোলাপ, বেল প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ পুষ্প, কিন্তু লাউ কুমডা, ঝিঙ্গে, শশা তরমুজ, ফুটি, তাল, পেঁপে প্রভৃতি ফুলে তিনটি অংশ দেখা যায়। কোন কোনটির পুং কেশব থাকে, কিন্তু গর্ভকেশব থাকে না, আর যেটিব গর্ভ-কেশব থাকে তাহাব পুংকেশব থাকে না. ইহাদিগকে **এক-লিঙ্গ** (Unisexual) ফুল বলে। ফুলেব মধ্যে সে হিসাবে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে। **স্ত্রী-পুষ্প** (Female flower) হইতে ফল জন্মায়, কিন্তু **পুরুষ-পুষ্প** (Male flower) হইতে ফল জন্মায না। আবাব এমন ফুলও আছে যাহাব মধ্যে পুং-কেশব এবং গর্ভ-কেশব দুইই থাকে, তাহাদিগকে **উভলিঙ্গ** (Hermaphrodite বা bisexual) ফুল বলে। তাল, খেজুর, পেঁপে প্রভৃতি এমন গাছ আছে সাধারণত যাহাদেব যে গাছে স্ত্রীপুষ্প হয সে গাছে পুরুষ পুষ্প জন্মায় না এবং যে গাছে পুরুষ পুষ্প জন্মায় সে গাছে স্ত্রী পুষ্প জন্মায় না। এই সকল গাছকে **এক-লিঙ্গ-পুষ্পক** (Dioecious) গাছ বলে; কিন্তু লাউ কুমড়ার একই গাছে দুই রকম ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহাদিগকে **উভলিঙ্গ-পুষ্পক** (Monoecious) গাছ বলে। লাউ, কুমডা, তরমুজ প্রভৃতির স্ত্রী পুষ্পেব একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম হইতেই ইহাদের স্ত্রী পুষ্পেব বোঁটার উপরেই ফল দেখা যায়। বোঁটাব যেস্থানে বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভকেশর বসান থাকে তাহাকে



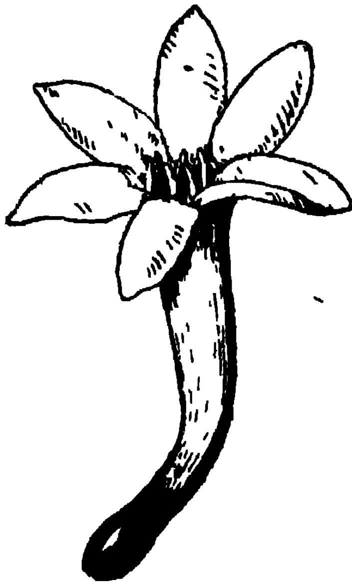
৩৪ নং চিত্র—কুমড়ার স্ত্রী-পুংপুষ্প

পুষ্পাধার (Thalamus) বলে। কলিকা, ভেবেণ্ডা প্রভৃতি কতকগুলি ফুলের এই স্থানে **মধু-গ্রন্থি** (Necter) থাকে।



৩৫ নং চিত্র—কলিকা ফুল

ফুলের আকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় বিভিন্ন ফুলের আকৃতি বিভিন্ন হইলেও পাতার ন্যায় ইহাদিগকে কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। কাটা কাটা পাপড়ি দিয়া গঠিত ফুলের আকার সাধারণত দুই প্রকার—(১) **ক্রুশাকৃতি** (Cruciform) ও (২) **প্রজাপতি আকৃতি** (Papilionaceous)। সরিষা, মূলা প্রভৃতির ফুল দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহাদের পাপড়ি চারিটি আড়া আড়ি ভাবে অবস্থিত, অনেকটা ক্রুশের মত—তাই ইহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। আবার মটর, বক, শজনা প্রভৃতি ফুলে **পাঁচটি** পাপড়ি একটি চলন্ত পাল তোলা নৌকা অথবা উড়ন্ত প্রজাপতির আকারে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের সবচেয়ে বড় পাপড়িকে **ধ্বজা** (Standard), দুই পাশের পাখীর ডানার মত পাপড়ি দুটিকে **পক্ষ** (Wing) এবং ভিতরের একজোড়া পাপড়িকে **নৌকা** (Keel) বলা হয়।



৩৬ নং চিত্র—রজনী গন্ধা

সংযুক্ত পাপড়ি দিয়া গঠিত ফুলের আকার সাধারণত নিম্নোক্ত প্রকারের হয়।

(১) **ফানেলাকৃতি** (Funnel shaped) —ধুতুরা, কলমী, রাঙ্গালু, ছোট গোয়ালা প্রভৃতি

(২) **ঘণ্টাকৃতি** (Campamulate)—কুমড়া, কল্‌কে প্রভৃতি

(৩) **চক্রাকৃতি** (Rotate)—বেগুন, লঙ্কা, আকন্দ প্রভৃতি

(৪) **ওষ্ঠাকৃতি** (Bilabiate)—তুলসী, বাসক, দণ্ডকলস ইত্যাদি

(৫) **নলাকৃতি** (Tubular)—রজনী গন্ধা, সূর্যমুখীর ভিতরের ফুল ইত্যাদি

(৬) **ফিতাকৃতি** (Ligulate) সূর্যমুখীর বাহিরেব ফুল

ফুলের কার্যঃ—বংশ বক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি কবাই ফুলের প্রধান কাজ, কাবণ ফুল হইতে ফল এবং ফল হইতে বীজ এবং বীজ হইতে গাছেব জন্ম। একটি গাছে বহু ফুল হয় আবাব এক একটি ফুল হইতে বহু বীজেব জন্ম হয়। পূর্বে দেখিয়াছ স্ত্রী পুষ্প হইতে ফল জন্মায়। কিন্তু স্ত্রী পুষ্পের পবাগেব সহিত পুং পুষ্পেব পবাগ সংযোগ (Pollination) না হইলে কেবলমাত্র স্ত্রী পুষ্প হইতেই ফলের জন্ম হয় না।

একটি ফুলের পবাগ যখন কোন প্রকারে অন্য একটি গর্ভমুণ্ডে লাগিযা যায তখন পবাগগুলি গর্ভমুণ্ড হইতে রস পায় এবং আপন দেহ হইতে ছোট ছোট পরাগ নল (Pollen tube) উৎপন্ন কবিযা গর্ভদণ্ডের ভিতব দিযা গর্ভকোষে এবং তথা হইতে ক্রমে ডিম্বক বন্ধ্র দিযা ডিম্বকোষেব মধ্যে প্রবেশ করে। এখানে দুইটি বিভিন্ন বকম কোষের মিলনেব ফলে কালক্রমে গর্ভকোষটি ফলে এব° ডিম্বকোষটি বীজে পবিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকেই **নিষিক্তকরণ** বা **গর্ভাধান** (Fertilisatiou) বলে।

এই সমস্ত ব্যাপাবটি বুঝাইবার জন্য সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ফুলেব বিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধে যাহাবা ফুলের পরাগ সংযোগ কবাইয়া দেয় তাহাদিগকে ঘটক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমবা ঐরূপ চারি প্রকাব ঘটকেব সন্ধান জানি। যথা :—

(১) কীট পতঙ্গ। ইহারা ফুলেব বর্ণ ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মধু আহবণ করিতে গিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া পরাগ সংযোগ কার্য করিয়া থাকে। গোলাপ, মটব, সরিষা, বেগুন প্রভৃতি ফুলের এইরূপে পরাগ সংযোগ হয়।

সাধারণত এই রকম ফুলের আকার বৃহৎ, রঙ উজ্জ্বল হয় ও ইহারা সুগন্ধযুক্ত হয়। ইহাদের গর্ভদণ্ড চট্‌চটে আঠাযুক্ত, পরাগ ভারী কাঁটাযুক্ত ও আঠাল হয়। ইহাদের পরাগ কোষ গর্ভমুণ্ডের আগে পুষ্ট হয়।

(২) বায়ু। বায়ুভরে ফুলসহ গাছের শাখা প্রশাখা আন্দোলিত হইবার কালে ফুলের পরাগগুলি খসিয়া অপর ফুলে ছড়াইয়া পড়ে তাহাতেই পরাগ সংযোগ কার্য হইয়া থাকে। নারিকেল, পাইন, পিটুলি পান প্রভৃতির বায়ু সাহায্যে পরাগ সংযোগ হয়। সাধারণত এই ফুলের আকার ছোট হয় বা ইহাতে গন্ধ থাকে না, কিন্তু পরাগ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

(৩) জল। ঝাঁঝি বা পাটা শেওলা গাছের পরাগ সংযোগ জলের দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

(৪) প্রাণী। শিমূল, কদম, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ফুলের পরাগ সংযোগ কাক, শালিক, বাদুড় প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা ঘটিয়া থাকে।

ফল

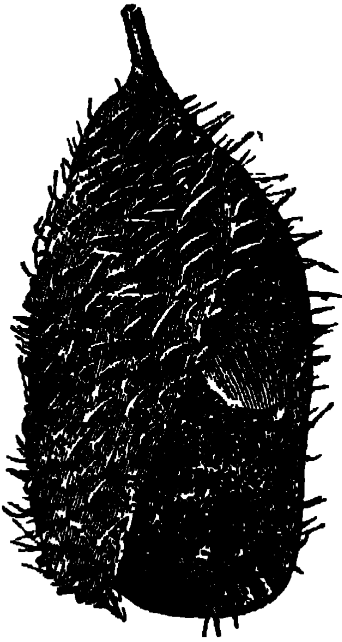
একটি ধান ও একটি তরমুজ, লাউ বা পেঁপে পাশাপাশি রাখিলে সহসা মনে হয় না যে তরমুজ যেমন একটি সমগ্র ফল ধানও তেমনই একটি সমগ্র ফল। মনে হয় ধান, তরমুজের বীজের ন্যায় একটি বীজ। আবার যখন পাকা কার্পাস ফল ফাটিয়া তুলা বাহির হইতে থাকে তখন মনে হয় না যে কার্পাস ফলও তরমুজের মত এক প্রকার ফল। আবার আতা, নোনা, আনারস, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের গঠন বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ইহারা অনেকগুলি ফলের সমষ্টি মাত্র। এইরূপে ফলের মধ্যে পার্থক্য বিচার করিয়া ফলকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) মৌলিক ফল, (২) গুচ্ছ ফল ও (৩) যৌগিক ফল।

(১) **মৌলিক** (Simple) ফল :—একটি ফুল হইতে একটি ফল উৎপন্ন হইলে, ফলটিকে **মৌলিক** ফল বলে। মৌলিক ফল দুই প্রকার—রসাল ও অরসাল।

দেখা যায় কতকগুলি ফলে রস অধিক থাকে এবং কতকগুলিতে অল্প থাকে। ধান, মটর, কার্পাস, নাটা প্রভৃতি যে সকল ফলে রসাল শাঁস অধিক থাকে না তাহাদিগকে **অরসাল** (Dry) এবং আম, জাম, পেয়ারা, পেঁপে তরমুজ প্রভৃতি যে সকল ফলে রসাল শাঁস অধিক থাকে তাহাদিগকে **রসাল** (Fleshy বা Succulent) **ফল** বলা হয়।

লিচু কিন্তু রসাল ফল নয়; ইহার যে শাঁস আমরা খাই উহা ফলের অংশ নয়; উহা বীজের একপ্রকার বিশিষ্ট আবরণ (Aril)।

অরসাল ফল দুই প্রকার—(ক) মটর, সিম, নাটা, সরিষা, দোপাটি প্রভৃতি যে সকল ফল শুকাইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহা হইতে বীজ ছড়াইয়া পড়ে তাহাদিগকে **স্ফোটক** (Dehiscent) ফল এবং (খ) ধান, যব, ভুট্টা প্রভৃতি যে সকল অরসাল ফলের আবরণ কখনও ফাটে না তাহাদিগকে **অস্ফোটক** (In-dehiscent) ফল বলে।



৩৭ নং চিত্র—নাটাফল

স্ফোটক জাতীয় ফলের ফাটিবার ভঙ্গি অনুসারে তাহাদিগকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—(ক) **শিম জাতীয়** (Legume)—উহাদের ফল মাঝামাঝি দুই ভাগে ফাটিয়া যায়, উদাহরণ—শিম, মটর, বরবটি ইত্যাদি। (খ) **সরিষা জাতীয়** (Siliqua)—উহাদের ফল লম্বালম্বি ভাবে কয়েকটি বিভিন্ন অংশে ফাটিয়া থাকে। উদাহরণ—সরিষা, মুলা, কাপাস, ঢেঁড়স, ইত্যাদি।

খোসা, শাঁস ও বীজের পার্থক্য অনুসারে রসাল ফল পাঁচ প্রকার, যথা—(ক) **সাষ্টিক** (Drupe), (খ) **বেগুন জাতীয়** (Berry), (গ) **শশা জাতীয়** (Pepo), (ঘ) **লেবু জাতীয়** (Hesperidium) ও (ঙ) **আপেল** জাতীয় (Pome)।

(ক) **সাষ্টিক** ফল (Drupe)—লক্ষ্য করিলে আম, আমড়া, প্রভৃতি

রসাল ফলের তিনটি স্তর দেখা যায়। সর্বোপরি যে আবরণ তাহাকে (১) **খোসা** (Epicarp) বলি, ইহা (২) **মধ্যস্তর** (Mesocarp)—শাঁসের চেয়ে শক্ত। (৩) তৃতীয় স্তর (Endocarp) হইল আঁটি। খেজুর, নারিকেল এই জাতীয় ফল।

(খ) **বেগুন জাতীয় ফল** (Berry)—বেগুন, টেঁপারি, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের খোসা তত পুরু নয়, ইহাদের সমস্ত অংশই প্রায় শাঁস এবং এই শাঁসের মধ্যে অনেক খানি স্থান লইয়া অনেকগুলি ছোট ছোট বীজ ছড়ান থাকে। ইহাদিগকে বেগুন জাতীয় ফল বলে। ইহাদের প্রায় সকল অংশই আমরা খাইয়া থাকি।



৩৮ নং চিত্র—বেগুন জাতীয় ফল

(গ) **শশা জাতীয়** (Pepo)—শশা, ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলের বাহিরের স্তর অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং ইহাদের শাঁসের পরিমাণ যথেষ্ট—বীজের সংখ্যাও যথেষ্ট। ইহাদের মধ্যস্তরই আমরা সাধারণত খাই। কিন্তু লাউ বা শশার শাঁস এবং বীজও আমরা খাইয়া থাকি।



৩৯ নং চিত্র—পেঁপে

(ঘ) **লেবু জাতীয়** (Hesperidium)—কমলা, পাতি, কাগজি, জামিরা প্রভৃতি ফলের বাহিরের স্তর বেশ একটু পুরু এবং মধ্যস্তর পাতলা থলির মধ্যে আবদ্ধ। এই থলির মধ্যে আবদ্ধ কোষা কোষা মধ্যস্তরের ভিতরেই কয়েকটি করিয়া বীজ এবং অসংখ্য রসাল শাঁশের দানা থাকে। এই রকম একটি শাঁশের দানা আবার এক একটি অপেক্ষাকৃত পাতলা পর্দার মধ্যে আবদ্ধ। ইহাদের এক একটিকে পৃথক করা যায়। ইহাদের শাঁস অপেক্ষা রসই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(ঙ) **আপেল জাতীয়** (Pome) ফল—আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের খোসা অনেকটা শশা জাতীয় ফলের খোসার ন্যায় ; মধ্যস্তরও উহাদের মধ্যস্তরের মত কিছু শক্ত। ইহাদের ছোট ছোট বীজ, সংখ্যায় তিন চারিটির অধিক নয়। বীজগুলি ফলটির মধ্যস্থলে একত্রে থাকে।

(২) **গুচ্ছ ফল** (Aggregate fruit)—একটি ফুল হইতে অনেকগুলি ফল হইয়া একত্রিত হইলে তাহাকে **গুচ্ছফল** বলা হয়। চাঁপা ও কাঁটালি চাঁপার ফল গুচ্ছ ফল। আতা, নোনা প্রভৃতিও এক প্রকার গুচ্ছ ফল। ইহাদের এক একটি গর্ভকেশর হইতে এক একটি ফল জন্মায়, কিন্তু উহারা একসঙ্গে দল বাঁধিয়া থাকে বলিয়া বাহির হইতে বুঝা যায় না। তথাপি কাঁচা অবস্থায় ইহাদিগকে কাটিলে বুঝিতে পারা যায় খোসার একটি ঢাকার ভিতর এক একটি কোষ। ও কোষার বাহিরের আবরণ লইয়া এক একটি ফল, পাকিলে ঐ কোষার নরম আবরণ একত্রিত হইয়া সমস্ত কোষাগুলির একটি আবরণের মত দেখায়।

চালতাও এক প্রকার গুচ্ছ ফল। চালতা ফুলের বৃত্যংশগুলি স্ফীত ও রসাল হইয়া চালতার এক একটি বাখড়া হয়। এই বাখড়াগুলি একত্রিত হইয়া একটি ফলের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু প্রকৃত ফলই বাখড়ার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। চালতার গোঁড়াই চালতার প্রকৃত ফল। চালতা এই সব কারণে **অপ্রকৃত** ফল।

(৩) **যৌগিক** (Multiple) ফল—বহু ফুল হইতে একটি ফল জন্মাইলে ফলটিকে **যৌগিক** ফল বলা হয়। কাঁটাল, আনারস, ডুমুর, তুঁত ইহার দৃষ্টান্ত, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আনারস—আনারসের গায়ে যে ছয় কোণা চোখ দেখা যায় উহারা এক একটি পৃথক ফুল হইতে উৎপন্ন। ইহাদের শাঁশ, গর্ভকেশরগুলির নিম্ন অংশ হইতে উৎপন্ন। শাঁশের মধ্যস্থলের দণ্ডাকার অপেক্ষাকৃত শক্ত অংশ ফুলের মঞ্জরী দণ্ড।

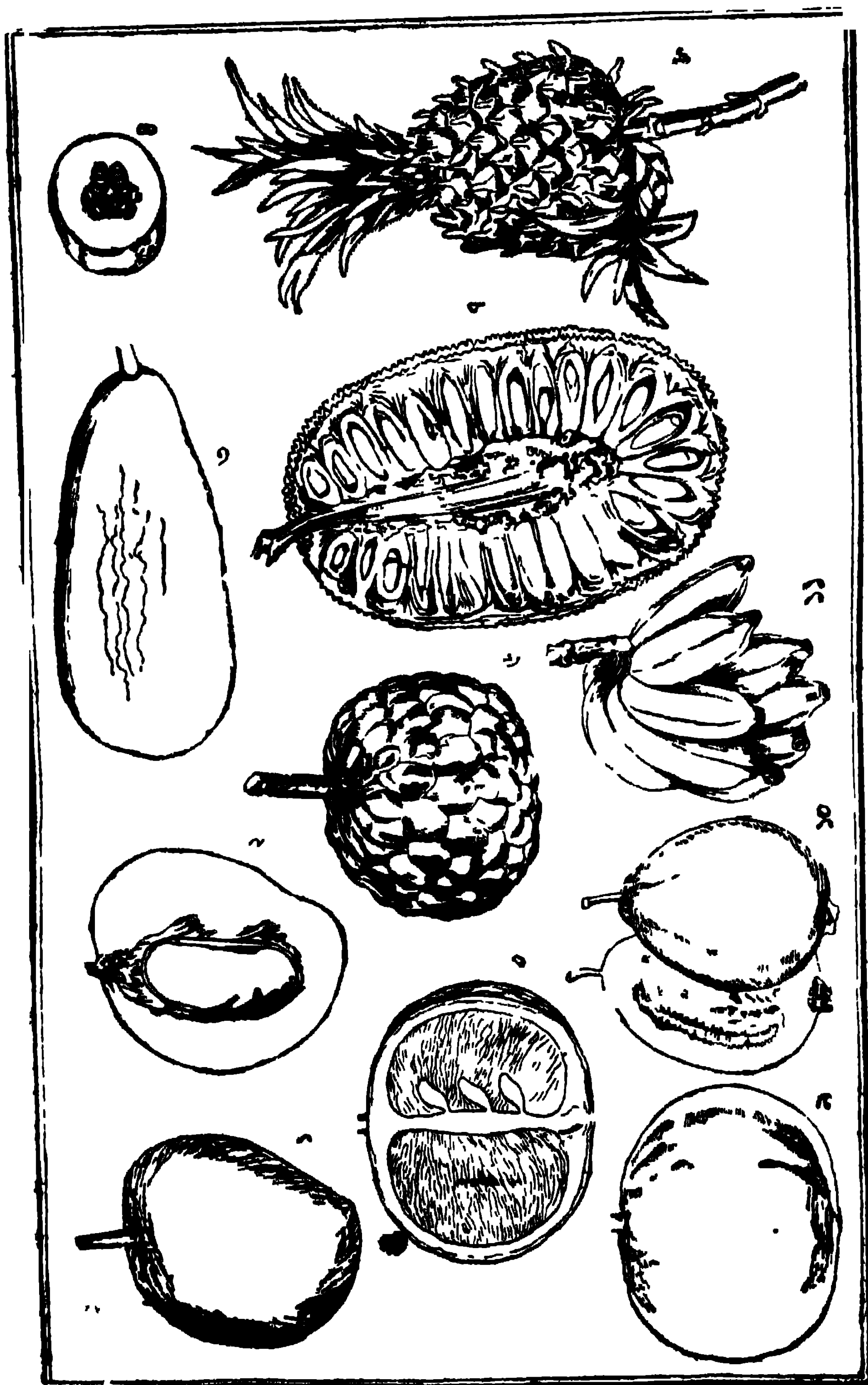
কাঁটাল—কাঁটালের এক একটি কাঁটা এক একটি ফুলের গর্ভদণ্ড হইতে উৎপন্ন। ইহাদের এক একটি কোষ ফুলের গর্ভকেশর হইতে উৎপন্ন, পাতুড়ি-গুলি অনিষিক্ত ফুলের আবরণ—মধ্যস্থলের ভুতুড়ি অর্থাৎ মোটা দণ্ডটি মঞ্জরী শীর্ষ।

ডুমুর—ডুমুর ফুলের মঞ্জরী দণ্ড ফাঁপা হইয়া গোলাকার একটি ফলের আকার ধারণ করে, ইহাই ডুমুর ফল। ইহার ভিতরে অনেকগুলি ছোট ছোট ফুল থাকে সেইগুলিই বীজরূপে ফলের ভিতর থাকে।

এই পরিচ্ছেদের শেষে ফলের শ্রেণীবিভাগ করিয়া একটি তালিকা দেওয়া গেল।

একটি ফলে সাধারণত তিনটি অংশ দেখা যায়—খোসা, শাঁস ও বীজ। কিন্তু সকল ফলে এ তিনটি সমান অংশে থাকে না। পেঁপে, আম, শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফলে খোসা কত অল্প কিন্তু শাঁস কত অধিক। নাটা ফলে শাঁস নাই বলিলে চলে, কেবল খোসা ও বীজ। আম, জাম, খেজুর প্রভৃতি ফলে একটি করিয়া বীজ দেখা যায়, তাহা সমস্ত ফলটির মাঝখানে থাকে। কিন্তু লাউ তরমুজ শশা প্রভৃতি ফলের বীজ অনেক এবং সমস্ত ফলটির মধ্যে শাঁসের সহিত সারি সারি থাকে। কুমড়া, পেঁপে, ফুটি প্রভৃতি ফলের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা স্থান থাকে। সেই ফাঁকা স্থানের মধ্যেই শাঁসের উপরে বীজগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। যে ফলে বীজ যত কম, ফলের আকারের অনুপাতে সে ফলের বীজ তত অধিক বড় হইয়া থাকে। যে সকল ফলে বীজ মাত্র একটি, যেমন, আম, জাম, নারিকেল প্রভৃতি তাহাদের বীজ খুব বড় হইয়া থাকে।

ফুটি, পেঁপে, আম, জাম, প্রভৃতি ফল পাকিলে কত নরম হয়, কিন্তু লাউ পাকিলে তাহার খোসা এত শক্ত হয় যে তাহাকে শাঁস বাহির করিয়া দিবার পর ঘটি বাটির মত ব্যবহার করা চলে। কুমড়া, তরমুজ, বেগুন, শশা প্রভৃতি ফল কাঁচা অবস্থায় যেরূপ থাকে পাকিলেও প্রায় সেরূপ থাকে। ঝিঙ্গা, পুরুল প্রভৃতি কতকগুলি ফল আছে, পাকিলে তাহাদের শাঁস কমিতে আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে জালি প্রস্তুত হইতে থাকে। ঝিঙ্গা বা পুরুলের জালি আমরা গাত্র মার্জ্জনী হিসাবে সাবান মাখিবার সময় ব্যবহার করি। লেবুর শাঁস সাধারণ ফলের শাঁসের মত থাকে না। খোসার ভিতরে ইহার শাঁস ক্রমান্বয়ে কেমন একটির পর একটি আবরণের মধ্যে ঢাকা থাকে। বেলের খোসা কত শক্ত কিন্তু ভিতরে শাঁস পাকিলে কাদার মত নরম হইয়া থাকে।



৪০ নং চিত্র—কতকগুলি রসাল ফল

আতা বা নোনা ফলের স্বাদ কাঁচা অবস্থায় কিরূপ বিশ্রী; কিন্তু পাকিলে ইহাই কিরূপ সুস্বাদু হয়। কুমড়া পাকিলে ইহার স্বাদের বিশেষ তার-তম্য হয় না। আম কাঁচা অবস্থায় টক থাকে, পাকিলে মধুর হয়। কলা কাঁচা অবস্থায় কষায় এবং কতই না বিস্বাদ থাকে, কিন্তু পাকিলে ইহাই আবার কেমন সুস্বাদু হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব পৃষ্ঠায় একটি রসাল ফলের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর।

আম, জাম, বেমুজ, সেঁকুল, মাকাল, তেলাকুঁচা প্রভৃতি ফল পাকিলে ইহাদের রং বদলাইয়া যায়। আম, কাঁটাল, আনারস প্রভৃতি পাকিলে ইহাদের গন্ধে মানুষ এবং ইতর প্রাণী আকৃষ্ট হয়। নাটা, মটর, দোপাটি প্রভৃতি ফল পাকিলে আপনা আপনি ফাটিয়া যায়, সেইজন্য ইহাদের বীজগুলি আপনা আপনি ছড়াইয়া পড়ে। কাপাস, শিমূলের ফলও ফাটিয়া থাকে, কিন্তু বীজে তূলা লাগিয়া থাকায় ইহারা হাওয়ায় অনেক দূর পর্যন্ত উড়িয়া যাইতে সমর্থ হয়।

বীজ

চাল, সরিষা, মটর, ছোলা, আমের আঁটি, তালের আঁটি, নারিকেলের খোল এসকল গুলি এক একটি বীজ। বীজের সাধারণত তিনটি অংশ—**আবরণ, বীজ-পত্র** (Cotyledon) যাহা দানার মত বীজের ভিতর দেখা যায়, ও **অঙ্কুর** বা **ভ্রূণ** (Embryo), ইহাদের মধ্যে কতকগুলির আবরণ খুব শক্ত কতকগুলির আবরণ অপেক্ষাকৃত কম শক্ত। কতকগুলির মধ্যে মাত্র একটি দানা থাকে, কতকগুলির মধ্যে দুইটি। প্রথমোক্ত বীজগুলিকে **একবীজ পত্রী** (Monocotyledonous) ও শেষোক্ত গুলিকে **দ্বিবীজ পত্রী** (Dicotyledonous) বীজ বলে। আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে চমরী ঝাউ প্রভৃতির বীজে অনেকগুলি দানা দেখা যায়। মুগ, মসুর, অড়হর, ধান, যব, ভুট্টা প্রভৃতি বীজ মানুষের খাদ্যের জন্য যত অধিক পরিমাণে লাগিয়া থাকে এত অধিক পরিমাণে মানুষের খাদ্যে অন্য কিছু লাগে না, বলিতে গেলে মানুষ এই সকল বীজের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করে।

অন্তঃসার (Exalbuminous বা Non-endospermic), **বহিঃসার** (Albuminous বা Endospermic), **মৃদ্ভেদী** (Epigeal) ও **মৃদন্তর্গত**

(Hypogeal) বীজ কাহাকে বলে তাহা পূর্বে জানিয়াছ। পাইন **নগ্নবীজ** (Gymnosperms) হইতে জন্মায় ইহাও জানিয়াছ।

বীজের বিস্তৃতি কিরূপে হয় দেখ। মাটিতে এক স্থানে বহু বীজ পড়িলে যে সকল চারা উৎপন্ন হয় তাহারা ঘেঁসা ঘেঁসি থাকিয়া বড় হইতে পারে না। গাছে বীজ পাকিলে যদি তাহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া না যাওয়া হয় তবে গাছের গোড়ায় বীজ হইতে এক জায়গায় বহু চারার জন্ম হইতে পাবে। সেজন্য বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ নানা প্রকারে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। তন্মধ্যে প্রধান কয়টি উপায় নিচে বলা হইল :—

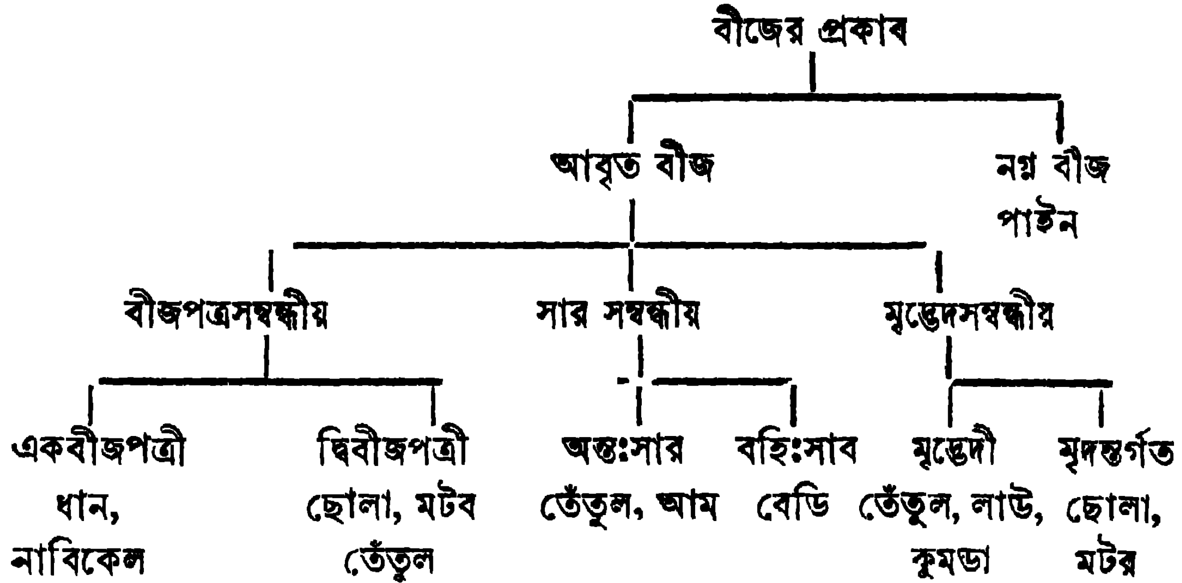
(১) **বাতাস দ্বারা**—তূলা, সিঙ্কোনা প্রভৃতির বীজ হালকা এবং ইহাদের কাহারও কাহারও গায়ে তূলার আঁশের মত সূক্ষ্ম আঁশ আটকাইয়া থাকে বলিয়া বাতাসে ভাসিয়া স্থানান্তরে নীত হইতে পাবে এবং তাহা হইতে গাছ জন্মাইতে পাবে।

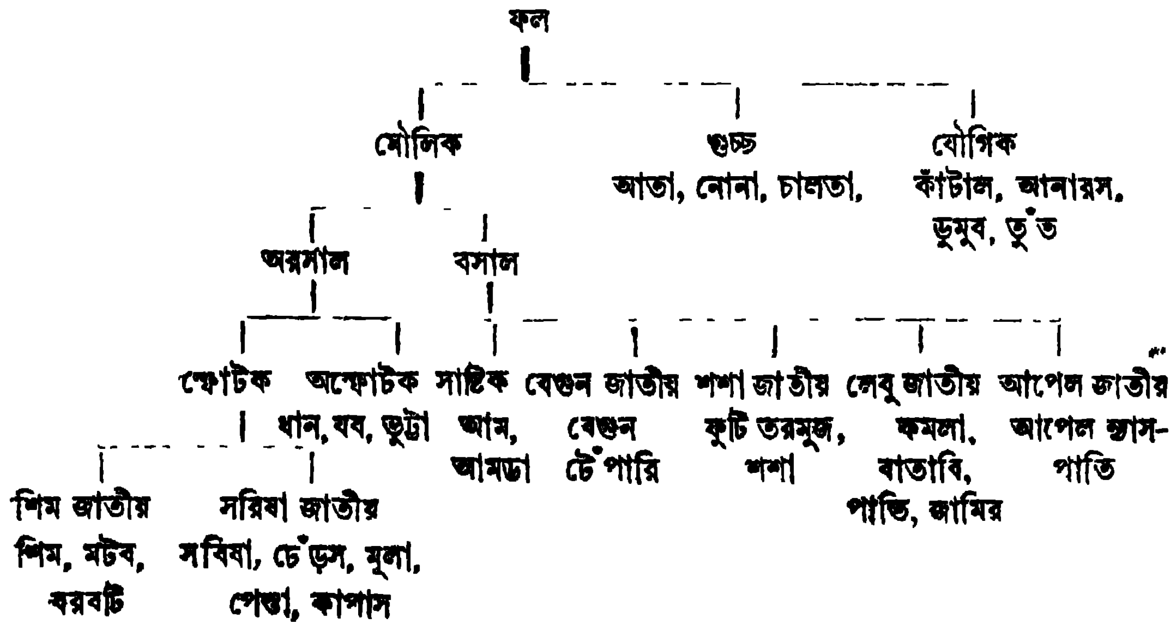
(২) **জীবগণ** দ্বারা :—চোরকাঁটা, বাঘানখা প্রভৃতি গাছের ফল মানুষের কাপড়ে বা জীব জন্তুর গায়ে লাগিয়া আটকাইয়া যায় এবং তাহাদের দ্বারা স্থানান্তরে নীত হয়। মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহা হইতে গাছ হয়। বাদুড় পেয়ারা, বাদাম, ডুমুর প্রভৃতি ফল খাইয়া ইহাদের বীজ স্থানান্তরে ফেলিয়া যায়। শৃগালরা খেজুর, কুল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া ইহাদের বীজ হজম করিতে পারে না। মলত্যাগ কালে ঐ বীজগুলি স্থানান্তরে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহা হইতে গাছ হয়। বট, অশ্বত্থের বীজ পাখীরা খায় এবং বিষ্ঠা ত্যাগ কালে ইহাদের বীজগুলি পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইতে গাছ জন্মে। কয়েদ বেলের বীজও মানুষের বিষ্ঠার সহিত এইরূপে পরিত্যক্ত হয় এবং তাহা হইতে গাছ জন্মাইতে দেখা যায়। কুঁচ খাইয়াও পাখীরা ইহাকে বিষ্ঠার সহিত ত্যাগ করিলে তাহা হইতে গাছ জন্মে।

(৩) **জল** দ্বারা—তাল নারিকেল প্রভৃতি হাল্কা ফল জলে ভাসিয়া স্থানান্তরে নীত হয় এবং কোথাও মাটিতে আটকাইয়া গেলে ইহাদের গাছ হয়।

(৪) **স্ফোটন** দ্বারা—নাটা, দোপাটি, করমচা, অপরাজিতা, মটর প্রভৃতির ফল ফাটিয়া ছিটকাইয়া পড়ে। তবে এই উপায়ে ইহারা বহুদূরে বিস্তৃত হইতে পায় না।

(৫) **মানুষের দ্বারা**—বহুবিধ উপায়ে এক স্থান হইতে বীজ অন্য স্থানে নীত হয় কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে। ঔষধ পথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বা সৌখিনতার উপাদান স্বরূপে ইহাদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য কত যত্ন করিয়া মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্তের বৃক্ষ অন্য প্রান্তে লইয়া তাহাদের চাষ করে।





সংক্ষেপ :—গাছের প্রধান অংশ দুইটি, মূল ও কাণ্ড। মূল মাটির নিচে থাকে কাণ্ড মাটির উপরে থাকে। অবশ্য অনেক কাণ্ড আছে যাহারা মাটির নিচে থাকে—যেমন হলুদ

আদা, কচু ইত্যাদি। মূলের কাজ—আহার্যের জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ করা এবং মাটির উপর উহাকে খাড়া রাখা। বিভিন্ন আকারের মূল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহারা অন্য কাজও করে। সেই হিসাবে ইহাদের নামও ভিন্ন হইয়া থাকে। কাণ্ডের কার্য খাদ্য সর্বদেহে চালান দেওয়া এবং শাখা প্রশাখা হইতে পাতা ফুল ফল ধারণ করা। ইহাতে পর্ব, সন্ধি, পত্র, মুকুল প্রভৃতি থাকিতে পারে। ইহারা বহুবিধ আকারের হয়। পাতার আকার যেমন বহু প্রকারের ইহাদের শিরা বিন্যাসও তেমনই বহু প্রকারের। একটি বৃন্তে যদি কেবলমাত্র একটি ফলক থাকে তবে তাহাকে মৌলিক পত্র বলে, কিন্তু যদি একাধিক পত্র থাকে তবে তাহাকে যৌগিক পত্র বলে। পাতায় ষ্টোমা আছে। পাতার দ্বারা বায়ু হইতে গাছ আহার গ্রহণ করিতে পারে এবং দেহের অতিরিক্ত রস নির্গত করিয়া দিতে পারে। ফুল সৌন্দর্যের আকর—ইহার সৌন্দর্যে মানুষ ও জীবজন্তু আকৃষ্ট হয়। ইহা গাছের অপ্রধান অংশ। ফুলের চারিটি অংশ—বৃতি, পাপড়ি, পরাগকেশর ও গর্ভকেশর। সকল ফুলে সকল অংশগুলি থাকে না। ফল এবং বীজ গাছের অপ্রধান অংশ। নানারকম ফলের আকার ভিন্ন, স্বাদ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন। বীজের সংখ্যা বেশী হইলে উহারা আকারে ছোট হয়।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজ কত বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে লিখ। (Write down the different forms of —Roots, stems, leaves, flowers, seeds and fruits)

২। ওল, আদা, আলু এবং মূলা :—ইহারা কাণ্ড কি মূল বল। (Say whether the following are stem or root ,—corm, ginger, potatoes and radish).

৩। নিম্নলিখিতগুলি প্রকৃত পক্ষে গাছের কি এবং ইহারা কিসের কার্য করে ? বেলের কাঁটা, মটরের আকর্ষ, পিঁয়াজ ও ধান। (Say what part of a plant the following are and what their functions are ·—The thorn of a 'Bel', tendrils of a pea, onion and paddy.)

৪। কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর—(ক) মূল ও (খ) ফলের। (Discuss the functions of (a) the root and (b) the fruit) (ক: বি: ১৯৪০)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধান ও মটর গাছের জীবনেতিহাস

ভাত বাঙ্গালীদের প্রধান খাদ্য। অবাঙ্গালীগণ তাই 'ভেতো' বলিয়া বাঙ্গালীদের কলঙ্ক রটাইয়া থাকেন। কিন্তু খাদ্য শস্য হিসাবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের হিসাবে জানা গিয়াছে এত অধিক পরিমাণে আর কোন শস্য মানুষের খাদ্য হিসাবে উৎপন্ন হয় না। কাজেই বাঙ্গালী ছাড়া বহু অবাঙ্গালীও ইহা খাইয়া জীবন ধারণ করেন। ধান হইতে চাউল এবং চাউল সিদ্ধ করিয়া ভাত হয়। ধানকে অল্প সিদ্ধ করিয়া সিদ্ধ ধানকে রৌদ্রে শুকাইয়া, ঐ শুষ্ক ধানকে ভানিয়া লইলে যে চাউল হয় তাহা সিদ্ধ চাউল এবং ধানকে কেবলমাত্র শুকাইয়া ভানিয়া লইলে যে চাউল হয় তাহা আতপ চাউল। বাঙ্গালীরা খাইবার জন্য বেশীর ভাগ সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং পূজা পার্বণে আতপ চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আতপ চাউলই সমধিক প্রচলিত।

যে দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সেই দেশের জলাভূমিতে ধান্য জন্মায়। সেজন্য পাহাড়ে দেশে ধান্য জন্মে না। জমি ও আবাদের সময় ভেদে ধান মোটামুটি তিন রকম। ভাদ্র আশ্বিন মাসে যে ধান পাকে তাহাকে **আউশ** বা **আশু** ধান বলা হয়। অধিকাংশ ধান অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে পাকিয়া থাকে—ইহারা **আমন** বা **হৈমন্তিক** ধান। যে সকল ধান বর্ষাকালে বা শীতের শেষে পাকে তাহারা **বোরো** ধান। সাধারণত আউশ ধান উঁচু জমিতে জন্মায়, আমন ধান তদপেক্ষা নিচু জমিতে জন্মায় এবং বোরো ধান তদপেক্ষা নিচু জমিতে জন্মায়। লম্বা শুঁয়াযুক্ত এক প্রকার ধান আবাদী ধানের মধ্যে আপনি জন্মায়। তাহারা সুপক্ক হইবার আগেই ঝরিয়া পড়ে

বলিয়া মানুষের কোন কাজে আসে না। অথচ ইহার গাছ অতি সহজে আবাদী ধানের মধ্যে আগাছার মত জন্মাইয়া আবাদী ধান নষ্ট করিয়া ফেলে। সেইজন্য চিনিতে পারিলেই এবং সুবিধামত চাষীরা ঐ গাছগুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দেয় অথবা কাটিয়া ফেলে। ইহাদিগকে ঝাড়া বা উড়ি ধান বলে।

উঁচু জমিতে যে ধান হয় তাহার দানা সরু হয় এবং নিচু জমিতে যে ধান হয় তাহাদেব দানা মোটা হয়। সেই হিসাবে আউশ ধানর দানা সরু হওয়া উচিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আউশ ধানেব দানা প্রায় বোরো ধানের দানার ন্যায়ই মোটা হইয়া থাকে। হৈমন্তিক ধানের মধ্যে সীতাশাল, বাঁকতুলসী, দাদখানি প্রভৃতি ধানের দানা সর্বাপেক্ষা সরু। সরু ধানের চাল যেমন দেখিতে সুন্দর এবং খাইতে সুস্বাদু তেমনই সহজপাচ্য। এইজন্য রোগীদিগকে সরু চালের ভাত খাইতে দেওয়া হয়। ধান যত পুবাতন হয় ইহাব চালও তত উপকারী হয়, কোন কোন চাউলে সুগন্ধ পাওয়া যায়—পায়স প্রভৃতি প্রস্তুত কবিবাব পক্ষে তাহাবা অত্যন্ত উপযোগী। ধান হইতে চিঁড়া, খই এবং মুড়কী এবং চাউল হইতে ভাত, মুড়ি প্রস্তুত হয়। দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইতে হইলে চিঁড়া, মুড়ি ও মুড়কীর ন্যায় নিবাপদ আহার্য আব নাই। চাল গুঁড়া হইতে পিঠা, রুটি প্রভৃতি হয়। জিলাপী প্রস্তুত করণের ইহা অন্যতম প্রধান উপাদান।

ধানের খোসা ছাড়াইলে যে চাল পাওয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় ইহা একদলবীজ। কাজেই ধানের অঙ্কুর হইতে প্রথমে মাত্র একটি পাতা বহির্গত হয়। অতি সাবধানে ধানের খোসা ছাড়াইলে দেখা যায় চাউলের সমস্ত দেহ একটি পাতলা আবরণে আবৃত; চাউলের একমুখে একটি ক্ষুদ্র গর্তের মধ্যে অঙ্কুরটি ঘুমাইয়া থাকে বস পাইলে এই অঙ্কুর বর্ধিত হয় এবং ইহার এক অংশ মাটির নিচে যায়, অপর অংশ কাণ্ডরূপে মাটির উপরে উঠিতে থাকে। তখন সমস্ত বীজ বা চাউলটি ঐ ভ্রূণ মূল বা ভ্রূণ কাণ্ডের আহার যোগাইয়া থাকে। এই আহারের অধিকাংশই শ্বেতসার জাতীয়।

জমিতে পর পর তিন চারিবার লাঙ্গল করিবার পর মই দিয়া মাটি ভাঙ্গিয়া



৪১ নং চিত্র—ধানগাছ ও তাহার বিভিন্ন অংশ

গুঁড়া করিয়া দিলে ঐ জমি চাষের উপযুক্ত হয়। তখন ইহাতে ধান ছড়াইয়া যাহাতে ঐ ধান আবার মাটি ঢাকা পড়ে তজ্জন্য পুনরায় উহার উপর দিয়া মই টানা হয়; ইহাকে ধান্য বপন করা বলে। কয়েকদিন পরে মাটির রস পাইয়া ধান অঙ্কুরিত হয়। ভ্রূণ কাণ্ড মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠে এবং ভ্রূণমূল মাটির ভিতব চলিয়া যায়। ভ্রূণমূলের পাশ দিয়া ধানের গুচ্ছমূল বাহির হয় এবং অল্পদিন মধ্যে ভ্রূণমূলটি মরিয়া যায়। গাছ যত বড হইতে থাকে তত ইহার কাণ্ড বর্ধিত হয় ও কাণ্ডের প্রতি গাঁট হইতে পাতা বাহির হয়, প্রতি পাতার গোড়া কাণ্ডটিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। একটি পত্রেব ফলক যে দিকে প্রসারিত থাকে তাহার পবের পাতাব ফলকটি ঠিক তাহাব বিপরীত দিকে প্রসারিত থাকে। এইরূপে যত দিন যায় কাণ্ড তত বড হয় এবং পাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমন ও বোরো ধানেব গাছকে ২০।২৫ দিন পরে শিকড় সমেত তুলিয়া অন্য একটি পূর্বোক্ত প্রকারে লাঙ্গল করা এবং মই দেওয়া জমিতে গোছা গোছা করিয়া পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে **ধান্য রোপণ** করা বলে। অনেক সময় বৃষ্টির সুবিধা এবং অসুবিধা বুঝিয়া চাষীরা কেবলমাত্র ধান্য বপন করিয়াই দেয়, নাড়িয়া রোপণ কবে না।

ধানগাছেব পাতার ফলক তলোয়ারের ফলকেব মত লম্বা। ইহার গা মসৃণ নহে, শক্ত লোমযুক্ত করক'রে। নরম চামডার উপরে ঐ পাতা টানিলে চামডা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। পাতা যত পাকিয়া উঠে ততই ইহা অধিক করক'রে হয়। খড সর্বাপেক্ষা অধিক করক'রে। কাঁচা বেলায় ধান গাছ সবুজ; কোন কোন ধান গাছের পাতা কাল বা বেগুণেও হয় পাকিলে ইহাদের সোণার মত রং হয়। ধানগাছের কাণ্ড ফাঁপা নলের ন্যায়, মাঝে মাঝে গাঁইট বা সন্ধি (Node)। প্রতি সন্ধি ঘেরিয়া এক একটি পাতা বাহির হয়। ধান গাছের গোড়ার দুই চারিটি সন্ধি হইতে আস্থানিক মূল বাহির হইয়া থাকে।

গাছ বড় হইলে ধানের ফুল হয়। বোঁটার উপরে (৪১ নং চিত্রে গ) পাতার ন্যায় যে দুটি সরু সরু পদার্থ থাকে ইহারা এবং তদুপরি শক্ত আবরণ দুই ভাগে

বিভক্ত খোসা দুইটি **মঞ্জরী পত্র** (Bract) নামে অভিহিত। ধানের পাতার ন্যায় খোসাগুলি কর্কশ'রে কাঁটাযুক্ত। কালক্রমে খোসা যত শক্ত হয় ইহার গায়ের কাঁটাগুলিও তত শক্ত হয়। কোন কোন ধানের খোসার ডগায় লম্বা এবং শক্ত শুঁয়া থাকে। জটাকল্মা ধানে ঐরূপ শুঁয়া থাকে। মঞ্জরী পত্রের মধ্যে থাকে গর্ভকোষ। গর্ভকোষের চারিদিক ঘেরিয়া দুইটি **লডিকিউলের** (Lodicule) উপর দুইটি **আবর্ত** (Whirl) থাকে। ঐ আবর্ত হইতে ছয়টি **পুরুষ কেশর** (Stamen) বাহির হয়। পুরুষ কেশরের **পরাগদণ্ডগুলি** (Filaments) খুব সরু ও লম্বা হয় এবং ইহাদের মাথায় অপেক্ষাকৃত স্থূল ও ভারী **পরাগস্থলী** (Anthers) থাকায় ঝুলিয়া পড়ে এবং বাতাসে নড়িতে থাকে। ৪১ নং চিত্রে **ঘ** দেখা যাইবে পুরুষ কেশরগুলি কিরূপ ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং পরাগস্থলী হইতে পরাগ ঝরিয়া পড়িতেছে। গর্ভকোষ পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হওয়ায় এক্ষণে বিশেষ-রূপে দৃষ্টিগোচরে আসে। গর্ভকোষের ডগায় দুইটি লোমযুক্ত চামরের মত দণ্ড থাকে এবং গর্ভকোষে একটি মাত্র ডিম্বক থাকে। পরাগ পতনের ফলে ডিম্বক হইতে বীজ জন্মায়। তখন লডিকিউল সমেত পুরুষ কেশর শুকাইয়া পড়িয়া যায় এবং চাউল পূর্বোক্ত চারিটি মঞ্জরীপত্রে আবৃত থাকে। চাউল প্রথমাবস্থায় দুধের মত শাদা তরল পদার্থরূপে দেখা দেয়। ধানগাছের মাথায় একটি শীষে এমন অনেকগুলি ফুল ধরে এবং ঐ ফুলগুলি সময়ে ধানে পরিণত হয়।

আউশ ধান সাধারণত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা হয়। এবং ভাদ্র আশ্বিন মাসে গাছ সমেত ধান পাকিয়া সোণার বর্ণ ধারণ করিলে চাষীরা ধানগাছ কাটিয়া আঁটি আঁটি বাঁধিয়া শুকাইতে দেয়, শুকাইলে ঝাড়িয়া ধান ও গাছ পৃথক্ করা হয়। ধানের শুষ্ক গাছকে খড় বলা হয়। খড় গৃহপালিত গবাদি জন্তুর প্রধান খাদ্য। অনেক সময় একই জমিতে আউশ ধান কাটিয়া লইবার পর আমন ধান রোপণ করা হয়। আমন ধান সাধারণত অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে পাকিয়া থাকে। কোন কোন আমন ধান আশ্বিনের শেষ হইতেও পাকিতে আরম্ভ করে। মাঠে অত্যধিক জল থাকিলে খড় ভাল হয় না বলিয়া

বোয়ো ধানের খড় অনেক সময় অকর্মণ্য হয়, তাই চাষীরা কেবলমাত্র ধানের শীষ কাটিয়া আনিয়া তাহাই ঝাড়িয়া ধান বাহির করে। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে, উত্তরবঙ্গের বীমভূমে এবং পূর্ব্ববঙ্গের বরিশালে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মাইয়া থাকে। উড়িষ্যায়ও যথেষ্ট ধান চাষ হয়।

মটর

ভাতেব মত ডালও আমাদের নিত্য ভোজ্য। ভাত যেমন কেবল মাত্র বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য, ডাল কিন্তু সমগ্র ভাবতবাসীর নিত্য ভোজ্য পদার্থ। বাঙ্গালীর 'ভাত ডাল' যেমন নিত্য ভোজ্য ভাবতের প্রায় অন্য সকল জাতির কাছে 'ডাল রুটি' তেমনই নিত্য ভোজ্য। বহুপ্রকার ডালের মধ্যে ছোলা ও মটর জাতীয় ডালই ভারতেব অন্যান্য জাতীব মধ্যে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়।

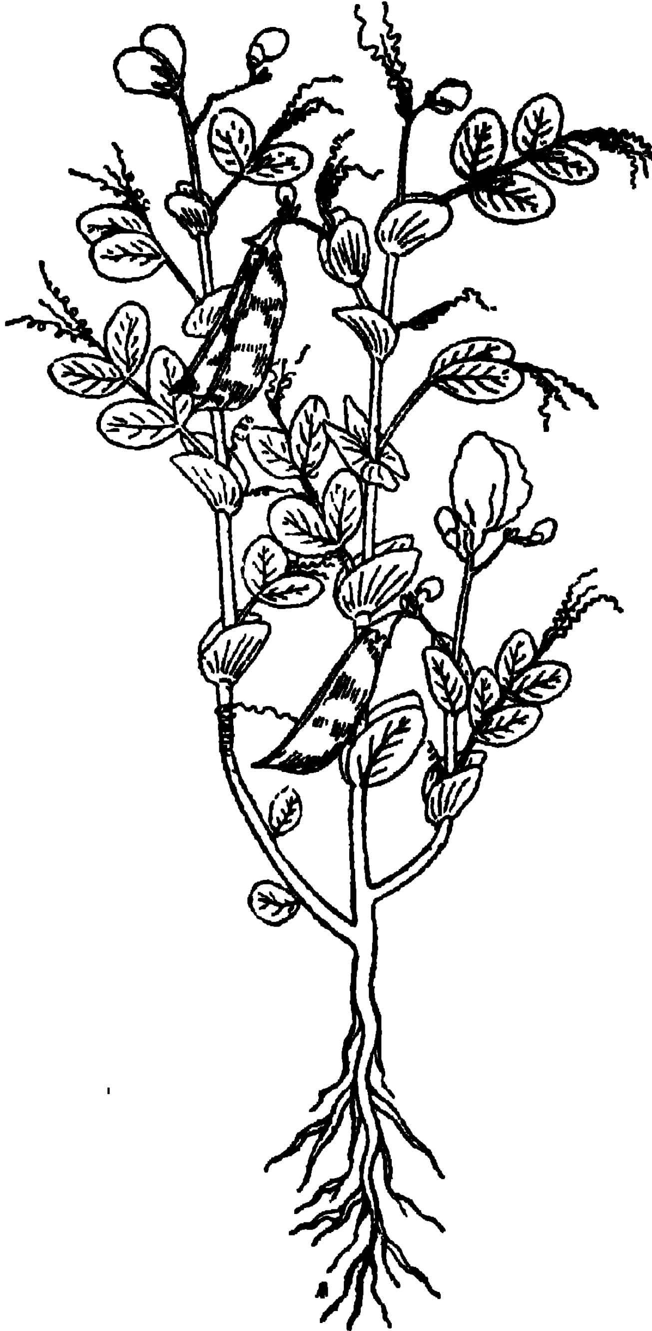
শীতকালে শুষ্ক মাটিতে মটব চাষ হয়। উপযুক্ত রূপে চাষ কবিলে অসময়েও মটব গাছ জন্মায। নদীর চরে ইহাবা প্রচুব পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। অসময়ের মটব শুঁটিতে মটর দানা বেশ পুষ্ট হয় না, গাছে শুঁটিও অধিক জন্মায় না।

শুষ্ক মটরকে দুই একদিন ভিজাইযা বাখিলে ইহার কলা বাহির হয়। এই সময়ে মাটিতে ছড়াইয়া মাটি চাপা দিলে শিকড মাটির ভিতর চলিযা যায় এবং কাণ্ড উপর দিকে বাড়িতে থাকে। মটর দ্বিবীজপত্রী বীজ এবং অমৃত্তেদী, কাজেই বীজটি মাটির উপর থাকিতে চায় না। ইহার প্রধান মূল ক্রমাগত নিচে নামিতে থাকে এবং কালক্রমে তাহা হইতে শাখা প্রশাখা নির্গত হয়। এদিকে মাটির উপরেও প্রধানকাণ্ড হইতে ক্রমে শাখা প্রশাখা বাহির হয়।



৪২নং চিত্র—মটর ও মটরের কল

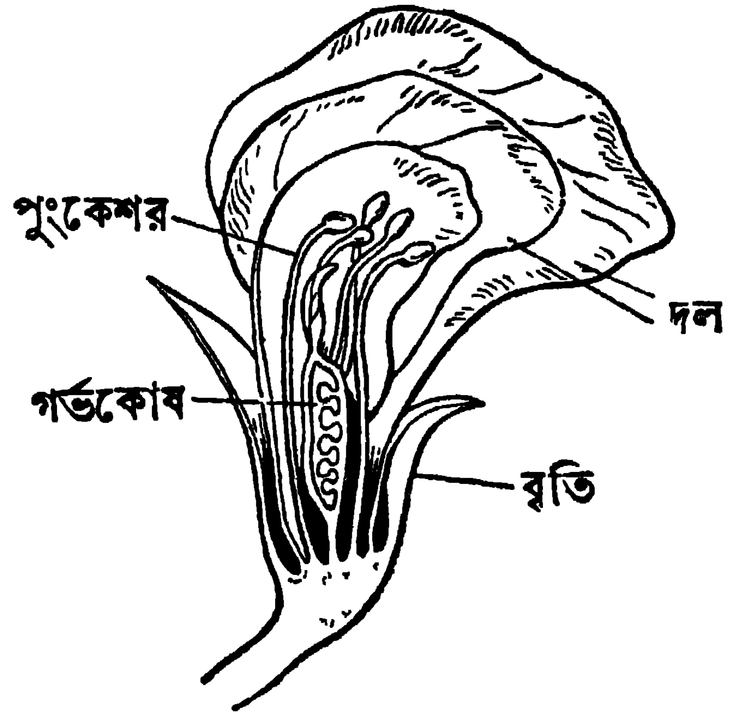
মটর গাছ লতা বলিয়া ইহারা খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না। অনেক সময় লতাইয়া ইহারা বেড়ার গায়ে কিংবা অন্ত গাছে পালায় উঠিয়া বাড়িয়া থাকে; কিন্তু যেখানে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয় সেখানে ইহারা মাটিতেই লতাইয়া বাড়িতে থাকে। আশ্রয়কে জড়াইয়া ধবিবার জন্ম ইহাদেব পাতাব অগ্রে **আকর্ষ** (Tendril) আছে। চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে প্রতি সন্ধি হইতে পত্র নির্গত হয। কিন্তু ঐ সন্ধিতে কাণ্ডকে ঘেরিয়া এক জোড়া **উপপত্র** (Stipules) বাহির হয। ঐ সন্ধি হইতে মটবের ফুল এবং শাখা প্রশাখা বাহির হয়। এক বোঁটায় কখন একটি কখন বা এক গোছা ফুল হয় তাহা হইতে এক গোছা শুঁটি বা ফল হয়।



৪৩ নং চিত্র—মটর গাছ

মটর ফুল সাধারণত বেগুনী এবং সাদা রংএ মিশ্রিত; কখনও বা লাল আভাযুক্ত হয়। গাছে ফুল ফুটিলে দেখিতে মনোরম

হয়। মটর ফুলের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহার পাঁচটি বৃতি একত্র জুড়িয়া একটি পদ্মকাটা বাটির মত দেখায়। কুঁড়ি অবস্থায় ফুল এই বৃতির মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যত বড হয় ততই এই বৃতি ফাটিয়া কুঁড়ির বাহিব হইবার পথ প্রশস্ত কবিয়া দেয়। তখন পাপড়িগুলি বৃতির চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পাঁচটি পাপড়ি এরূপ ভাবে গঠিত যে সমস্ত ফুলটিকে একটি পাল তোলা নৌকার মত দেখায়। দুটি পাপড়ি জুড়িয়া নৌকার **খোল** (Keel) প্রস্তুত করে, তদুপবি পাখীর ডানাব মত যে দুইটি পাপড়ি থাকে তাহাদিগকে **পক্ষ** (Wing) এবং ফুলের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা বড পাপড়িটিকে **ধ্বজা** (Standard) বলা হয়। ইহার পব দশটি **পুরুষ** কেশব। পুরুষ কেশরেব দণ্ডগুলিব



৪৪ নং চিত্র—মটর ফুল

মাথায থাকে পবাগধানী এবং পবাগধানীর মধ্যে থাকে দুইটি পবাগ পূর্ণ থলি। গোড়ার দিকে নয়টি পুরুষ কেশর মিলিত হইযা একটি নলের মত আকার ধাবণ কবে এবং একটি পৃথক থাকে। পুরুষ কেশবেব পর থাকে গর্ভকেশর। গর্ভকেশবেব গোডার দিক অপেক্ষাকৃত মোটা ও ফাঁপা—তাহার পববর্তী অংশ একটি দণ্ডেব মত এবং মাথাটি গোল বলেব ন্যায়। পুরুষ কেশর হইতে পরাগ আসিয়া এই অংশে লাগিলে তাহা গর্ভ কেশরের গোডায় পৌছাইয়া বীজের সৃষ্টি করে। গর্ভকেশরের গোডাব অংশ এইবাব বড় হয়া শুঁটিতে পরিণত হয় এবং হইার মধ্যস্থ বীজগুলিই মটর

দানা। ইহাবা শুঁটির ভিতর সারিবদ্ধভাবে শুঁটিব একপাশে এক একটি বোঁটার সাহায্যে ঝুলিতে থাকে। একটি ফুলেব পুরুষ কেশরের পরাগ ঐ ফুলের গর্ভকেশবে আসিয়া পড়িলে কিন্তু ফল হইবে না। ফুলেব বর্ণে, গন্ধে ও বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হইয়া কীট পতঙ্গাদি যখন একটি ফুলেব পুরুষ কেশরেব পবাগ দেহে লাগাইয়া আনিয়া অন্য ফুলেব গর্ভকেশবে পৌছাইয়া দেয় তখনই ফল ধবে।

মটব শুঁটি বা দানা কাঁচা বেলায় দেখিতে সবুজ, পাকিয়া শুকাইয়া গেলে হল্‌দে হইযা যায়। মটব শুঁটি বেশ শুকাইয়া গেলে আপনা আপনি ফাটিযা যায় ও ইহার ভিতব হইতে মটর দানা ছিটকাইয়া যায। তাই চাষীবা পাকা শুঁটি সমেত গাছ উপডাইযা আনিযা জমা করে এবং বৌদ্রে শুকাইয়া গরুদ্বাবা মাড়িয়া ইহা হইতে মটব কডাইএব দানাগুলি পৃথক কবে।

মটবেব কচি নবম গাছ শাক হিসাবে আমবা খাই। মটব ডাল আমাদেব ভোজ্য। ইহাব খোসা গরুব খাদ্য। শুকনা ডাল গুঁড়া কবিযা ব্যাসন প্রস্তুত হয। ভিজা ডাল বাটিযা নানারূপ মুখবোচক খাদ্য প্রস্তুত কবা যায।

ধান ও মটরের তুলনা

ধান	মটব
১। একবীজ পত্রী	১। দ্বিবীজপত্রী
২। প্রধান মূল কিছুদিন পবে শুকাইয়া যায়। গুচ্ছমূল ইহাকে সজীব রাখে।	২। প্রধান মূল ববাবর নিচে নামিতে থাকে এবং তাহা হইতে শাখা প্রশাখা বাহিব হয়
৩। কাণ্ড ফাঁপা এবং তাহাতে পর্ব ও সন্ধি পর পর থাকে।	৩। কাণ্ড ফাঁপা নয়—পর্বসন্ধি আছে।
৪। পাতা মৌলিক, লম্বা এবং সূচাল, শিরা সমান্তরাল	৪। যৌগিক পাতা—পাতার ডগার আকর্ষ, শিরা জালের মত
৫। কাণ্ডের ডগায় একটি শীষে ফুল ও ফল ধরে। বৃতি ও পাপড়ি পরিস্ফুট নয়।	৫। বৃতি পদ্মকাটা বাটির মত। পাঁচটি পাপড়ি জুড়িয়া নৌকার আকার ধারণ করে।
৬। গাছ ঘাস জাতীয়।	৬। গাছ লতা জাতীয়

সংক্ষেপ ঃ—ধান বিভিন্ন প্রকারের—সরু ও মোটা ইত্যাদি। চাষের সময় হিসাবে তিন রকম ধান—আশু, আমন ও বোরো। জমি যত নিচু হয় সেখানে তত মোটা ধান জন্মায়। ধানের গাছ ফাপা। খাদ্য হিসাবে কোন শস্য পৃথিবীতে এত অধিক পরিমাণে জন্মায় না। মটরও ধানের ন্যায় ভারতবাসীর নিত্য ভোজ্য। ইহারা শুষ্ক ভূমিতে শীতকালে জন্মায়। মটরের গাছ লতানে, পাতা গোল—গাছে আকর্ষ আছে; ইহার ফুল দেখিতে মনোরম। শুঁটির ভিতর অনেকগুলি দানা সারিবদ্ধভাবে পৃথক্ পৃথক্ বোঁটায় ঝুলিতে থাকে।

চতুর্থ প্রশ্নমালা

১। ধান বা মটর চাষ বৎসরের কোন সময় হয়? অঙ্কুরোদ্গম হইতে পাকা ধান বা শুষ্ক মটর পর্যন্ত উহাদের গাছের যে পরিবর্তন হয় তাহা লিখ। (What are the times for the cultivation of Paddy and Pea? Describe different stages of a Paddy plant or a Pea plant from the germination up to their harvesting time.)

২। 'ধান গাছের জীবন' বা 'মটর গাছের জীবন' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ। (Write an essay on life history of 'Paddy' or 'Pea'.)

৩। ধান বা মটর ফুল বিকাশ লাভ করিয়া কিরূপে ফলে পরিণত হয় লিখ। (Write what you know of inflorescence of Paddy and Pea.)

৪। ধান ও মটর কি কাজে লাগে লিখ। (State the uses of Paddy aud Pea.)

৫। ধান বা মটরের আবাদ কিরূপে হয় লিখ। (Write the process of cultivation of Pea and Paddy.)

৬। ধান ও মটরের পার্থক্য পাশাপাশি লিখিয়া দেখাও। (Tabulate the distinction between Paddy and Pea.)

প্রাণী-বিদ্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীব ও জীবন লক্ষণ

কলের সাহায্যে রেল গাড়ী, মোটর গাড়ী, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ প্রভৃতি কেমন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলে। মানুষ, পশুপক্ষীও এরূপ ছুটিয়া চলিতে পারে। মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জীবন আছে কিন্তু রেল গাড়ীর, মোটর গাড়ীর, ষ্টীমারের কিংবা উড়োজাহাজের জীবন নাই। যাহাদের জীবন আছে তাহাদিগকে আমরা **জীব** (The Living) এবং যাহাদের জীবন নাই তাহাদিগকে **জড়** (The Non-living) বলি। আবার দেখ, গাছপালা মানুষের মত পশুপক্ষীর মত বাড়ে কিন্তু তাহাদের মত চলাফেরা করিতে পারে না। মানুষ যেমন আহার্য গ্রহণ করিয়া তাহার কলেবর পুষ্ট করে গাছ পালাও সেরূপ মৃত্তিকা হইতে তাহার আহার্য সংগ্রহ করিয়া কলেবর পুষ্ট করে। আমরা জানি মানুষের মত গাছ পালার জীবন আছে। আবার একটি মিছরীর দানাকে ঘন মিছরীর জলে ডুবাইয়া রাখিলে সে দানাটি বড় হইতে থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া মিছরীর দানার জীবন নাই, একথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এখানে রেল গাড়ী, মোটর, ষ্টিমার, উড়োজাহাজ, মিছরীর দানা প্রভৃতি **জড়**, কিন্তু মানুষ, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ প্রভৃতি **জীব**। তাহা হইলে জড় ও জীবের লক্ষণ কি ?

বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় জীব মাত্রেরই নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি আছে :—

১। **জীবকোষ** (Cell)—জীবের দেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত।

২। **পুষ্টি** (Nutrition)—আহার্য গ্রহণ করিয়া জীবের দেহ ক্রমশ পুষ্ট হয়।

৩। **বৃদ্ধি** (Growth)—সময় সহকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি হয়।

৪। **শ্বাসপ্রশ্বাস** (Respiration)—শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে।

৫। **নিঃসরণ** (Secretion)—শরীর হইতে অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে।

৬। **চলাফেরা** (Locomotion)—শরীর নাড়িতে পারে ও শরীরকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারে।

৭। **সংবেদনী শক্তি** (Response to stimuli)—আছে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় নিজেকে চালাইয়া লইতে (Adaptability to environments.) পারে।

৮। **বংশবৃদ্ধি** (Propagation)—করিতে পারে।

৯। **মৃত্যু** (Death)—জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

জীবকোষের বিষয় দেহতত্ত্বে বিশেষরূপে বলা হইবে। যে সকল জীবকোষ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা নহে তাহাদের দ্বারা গঠিত দেহ নরম হয় কিন্তু যে দেহ প্রাচীর বেষ্টিত কোষ দ্বারা গঠিত তাহা শক্ত হয়। প্রাচীর বেষ্টিত কোষ দ্বারা উদ্ভিদ-দেহ এবং প্রাচীরহীন কোষ দ্বারা জীবদেহ গঠিত তাই প্রাণী দেহ অপেক্ষা উদ্ভিদের দেহ কঠিন।

এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। তোমরা আট দশ দিন পূর্বে জন্মিয়াছে এমন খুব ছোট তেঁতুল চারার সহিত একটি বড় তেঁতুল গাছের তুলনা করিলে দেখিবে ইহারা একই বংশজাত হইলেও ইহাদের শরীরের পার্থক্য কত অধিক। তেঁতুল চারার পাতা, কাণ্ড, শিকড় এবং বড় তেঁতুল গাছের পাতা, কাণ্ড, শিকড় প্রভৃতির মধ্যে কত পার্থক্য। চারা গাছটির পাতাগুলি বড় গাছের পাতা হইতে কত ভিন্ন। ইহার কারণ বয়ো-বৃদ্ধিসহকারে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া বড় গাছের সম্যক বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু চারা গাছের এমন সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ ঘটে নাই, তাই এই পার্থক্য। শিশু সন্তান ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যেও এমন অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

এইবার আমরা সমস্ত জীব জগতকে দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য বা পার্থক্য গুলি বিচার করিয়া দেখিব। তাহাদের মধ্যে একটি প্রাণি-জগৎ অপরটি উদ্ভিদ-জগৎ।

প্রাণী এবং উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য বা পার্থক্য :—

প্রাণী	উদ্ভিদ
১। দেহ অনাবৃত জীবকোষ দ্বারা গঠিত।	১। দেহ আবৃত জীবকোষ দ্বারা গঠিত।
২। খাদ্য খাইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে।	২। জল, মাটি ও বাতাস হইতে বিচিত্র প্রণালী দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই খাদ্যদ্বারা শরীর পুষ্ট করে।
৩। আহার্য আহারোপযোগী হইলে তবে উদরস্থ করে।	৩। কাঁচা মাল দেহমধ্যে লইয়া স্বীয় শক্তি দ্বারা আহারোপযোগী করিয়া গ্রহণ করে।
৪। খাদ্যের সাহায্যে শরীর বৃদ্ধি করে ও শরীরের অপচয় নিবারণ করে।	৪। অনুরূপ কার্য করে।
৫। বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে ও অঙ্গারক বাষ্পত্যাগ করে। (পরে বলা হইবে)	৫। অনুরূপ কার্য করে।
৬। শরীর হইতে অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে।	৬। অনুরূপ কার্য করে।
৭। শরীর নাড়িতে পারে ও ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে।	৭। শরীর নাড়িতে পারে—বড় বড় উদ্ভিদ চলাফেরা করিতে পারে না বটে, ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ চলাচল করিতে পারে।
৮। সংবেদনী শক্তি আছে। চিমটি কাটিলে বেদনা পায়। চতুষ্পার্শ্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে।	৮। সংবেদনী শক্তি আছে। লজ্জাবতী লতা ছুঁইলে যেন লজ্জায় মুস্‌ড়িয়া যায়। চতুষ্পার্শ্বের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে।
৯। বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে।	৯। বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে।
১০। বুদ্ধি বলে ও শরীর মধ্যস্থ নার্ভের সাহায্যে কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।	১০। বুদ্ধি আছে বলিয়া জানা যায় না। নার্ভের সন্ধান পাওয়া যায়।
১১। মৃত্যু আছে।	১১। মৃত্যু আছে।

এতদ্ভিন্ন প্রাণিগণ যেমন ঘুমায় অনেক গাছও তেমনিই ঘুমায়। তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, শিরিশ, বাব্‌লা প্রভৃতি গাছের পাতা রাত্রিকালে একত্র হইয়া যেন ঝিমাইয়া পড়ে, ইহা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, জীব জগতেব মধ্যে মানুষই চবম বিকাশ ও সৃষ্টি রহস্যের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে—তাই সে জীবজগতের উন্নততম জীব।

জীবের লক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলেও আমবা বুঝিতে পারিব, সকল লক্ষণ গুলিই সকল জীবেব মধ্যে সম্যকরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। মানুষেব মধ্যে যতগুলি লক্ষণ পূর্ণতা লাভ কবিয়াছে ইতব প্রাণিদেব মধ্যে ততগুলি লক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। আবার ইতব প্রাণিদেব মধ্যে যতগুলি লক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, উদ্ভিদের মধ্যে হয়ত ততগুলি লক্ষণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

জড় পদার্থের মধ্যে উপরোক্ত জীবন লক্ষণেব কোনটি দৃষ্ট হয় না। উদ্ভিদ তাহাদেব বিভিন্ন দেহাংশ দ্বাবা কার্যগুলি সম্পন্ন কবে দেখিযাছ। যখন প্রাণিদেব ঐ সকল দেহাংশেব বিষয় বলা হইবে তখন তাহাদেব কার্য কবিবার প্রণালী গুলিও বর্ণিত হইবে।

সংক্ষেপ ঃ—যাহাদের জীবন আছে তাহাবা জীব, যাহাদের জীবন নাই তাহাবা জড়; উদ্ভিদ সেই হিসাবে জীব। জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত. ইহাবা খাদ্য খাইয়া দেহ পুষ্ট কবে ও অপচয় নিবারণ করে, শ্বাস লয়, অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে ও বংশবৃদ্ধি কবে, ইচ্ছামত অনেকে চলাফেরা কবিতে পারে, সংবেদনা শক্তি আছে।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। জীবনের কি কি লক্ষণ থাকা চাই? লক্ষণগুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর। (What are the signs of life? Give an account of those signs.)

২। উদ্ভিদকে জীব বলা যাইতে পারে কি? যদি পারা যায় তবে কেন? (Have the plants life? How can it be proved?)

৩। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য ও কি কি বৈষম্য দেখা যায় পাশাপাশি লিখিয়া দেখাও। (Distinguish between a plant and a living being.)

৪। কি কি বৈশিষ্ট্য দ্বারা জীব ও জড়ের পার্থক্য বুঝা যায়? (What are the characteristics which distinguish between the living from the non-living?)

(কঃ বিঃ ১৯৪০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবী জুড়িয়া যেমন অসংখ্য প্রকাবেব উদ্ভিদ আছে, তেমনই স্থল, জল ও আকাশ জুড়িয়া কত যে বিভিন্ন প্রকাবেব জীব বিচবণ করিতেছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় কবিতে কে পাবে? ইহাদেব দেহ গঠন হইতে আরম্ভ কবিযা আচার ব্যবহাব ও জীবন যাত্রাব প্রণালী এত বিভিন্ন যে চিন্তা কবিয়াও তাহাদেব ধাবণা কবা যায় না। এক ফোঁটা জল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে তাহাতে যে অসংখ্য জীবাণু দেখা যায় তাহাবা যেমন প্রাণী, পূর্ণাঙ্গ মানুষ, গরু, মহিষ, সিংহ, হাতী ইত্যাদিও তেমনি প্রাণী। ইহাদেব প্রত্যেকটিব পবিচয লওয়া মানুষেব সাধ্যাতীত। কিন্তু শ্রেণী বিভাগ করিয়া কোন্ জীব কোন্ শ্রেণীব অন্তর্গত ইহা নির্ণয় কবিতে পাবিলে তাহাদেব প্রকৃতিগত সাদৃশ্য বা বৈষম্য হইতে তাহাদেব সম্বন্ধে অনেক কিছু ধাবণা কবিতে পাবা যায়।

মানুষ, সিংহ, ব্যাঘ্র, গরু, ছাগল, কুকুব, বিড়াল, পাখী, সাপ, ব্যাঙ ও মাছ—এই সকল জীবদেহে হাড দেখিতে পাওযা যায, কিন্তু প্রজাপতি, পিপীলিকা, মৌমাছি, মাকডসা, কেঁচো, জোঁক, শামুক এবং ঝিনুক প্রভৃতি জীবেব দেহে হাড নাই। শবীবেব সমস্ত হাড়ের মধ্যে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং প্রধান। এই মেরুদণ্ড আছে বলিয়াই মানুষ খাড়া হইয়া চলিতে পাবে; গরু, ঘোড়ার দেহগঠন এই মেরুদণ্ডেব জন্যই সুদৃঢ় থাকে। কিন্তু এই মেরুদণ্ড একখানি হাড নহে, একসঙ্গে দৃঢভাবে আবদ্ধ বহু সংখ্যক হাড দিয়া ইহা গঠিত। এইজন্য মেরুদণ্ডবিশিষ্ট প্রাণিগণ স্ব স্ব দেহ অল্পাধিক পবিমাণে বাঁকাইতে সমর্থ হয়।

• সাপ, গিরগিটি, কুমীর প্রভৃতি সবীসৃপ, কুকুব, ঘোড়া, গরু সিংহ, ব্যাঘ্র

প্রভৃতি পশু, কাক, চিল, শকুন, সালিক প্রভৃতি পক্ষী, রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছ, এবং মানুষ প্রভৃতি জীবের দেহগঠন তুলনা করিলে দেখা যায় ইহাদের সকলের দেহ একটি লম্বা হাড়ের কাঠামোর উপর নির্মিত। এই লম্বা কাঠামোর প্রধান হাড়টি মেরুদণ্ড। যে সকল জীবের মেরুদণ্ড আছে তাহাদিগকে **মেরুদণ্ডী** (Vertebrata) বলা হয়। আবার এই মেরুদণ্ডের শাখার ন্যায় কতকগুলি হাড় বাহির হইয়া জীবগণের হস্ত পদাদির কাঠাম ঠিক করে। মানুষের হাত পা যতটা প্রত্যক্ষ, ইতর প্রাণীদের হাত পা তত প্রত্যক্ষ নহে। চতুষ্পদ জন্তু এবং গিরগিটি ও টিকটিকি প্রভৃতি চতুষ্পদ সরীসৃপের দুইটি হাত বা দুইটি পা, চারিটি পায়ের মতই দেখায়, এবং সেইরূপ কাজও করিয়া থাকে। কিন্তু যদি এই সকল প্রাণী খাড়া হইয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে ইহাদের সম্মুখের পা দুইটি উহাদের হাত বলিয়া মনে হইত। কুকুর, বিড়াল, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি জানোয়ারদিগকে দেখা যায় একটি পায়ে কোন বস্তু চাপিয়া ধরিয়া অন্য পায়ে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে। এস্থলে পা দিয়া তাহারা হাতের কাজই করিয়া থাকে। হনুমান, বনমানুষ প্রভৃতি প্রাণীদিগকে সামনের দুইটি পা দিয়া হাতের কাজ করিতে বিশেষরূপে দেখা যায়। কিন্তু সাপের এরূপ হাত পা দেখা যায় না।

পক্ষীদের মধ্যে চতুষ্পদ জানোয়ারদের মত সামনে দুইটি পা দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, দুইটি ডানা তৎপরিবর্তে তাহাদের হাতের ন্যায় অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া থাকে। মাছের এরূপ হাত পা কিছুই নাই। কিন্তু পরিবর্তে আছে দুই জোড়া পাখ্‌না—যাহার দ্বারা ইহারা জলে সাঁতার দিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা হাত পায়েরই কাজ করে। গাছপালার কথায় আমরা দেখিয়াছি কোন কোন গাছের কোন এক বিশেষ অঙ্গ কোন এক বিশেষ কাজ করিবার জন্য যেরূপ রূপান্তরিত হয়, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তেমনই নানারূপে প্রকাশ পায়। কাজ করিবার পক্ষে মানুষের হাত পা'ই যথেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীকে লেজ দিয়াও অনেক কাজ করিতে হয়। তাহা হইলে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—মুণ্ড ও

ধড়। কোন কোন প্রাণীর ধড়ের পাশ হইতে হাত, পা, ডানা, লেজ ইত্যাদি শাখা বাহির হয়, কাহারও হয় না। মুণ্ডে সাধারণত চোখ, মুখ, নাক, কান, ইত্যাদি এবং ধড়ে কাঁধ, পেট, পিঠ, হাত, পা, লেজ থাকে। বুকে মেরুদণ্ড হইতে কতকগুলি শাখা হাড় বাহির হইয়া একটি খাঁচা প্রস্তুত করে। এই খাঁচার ভিতর থাকে তাহাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যন্ত্র হৃদপিণ্ড, ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি। ইহারা অতিশয় সুকুমার বলিয়া ভগবান ইহাদিগকে ঐ খাঁচার ভিতর স্থান দিয়া সুরক্ষিত করিয়াছেন। হাত, পা ও লেজ সাধারণত লম্বা হাড় দিয়া প্রস্তুত। হাতে এবং পায়ে প্রশাখার মত যে আঙ্গুল বাহির হয় তাহাও কতকগুলি ছোট লম্বা হাড়ের সমষ্টি মাত্র। মাথায় যে আমাদের যন্ত্র আমাদিগের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহা অতীব সুকুমার এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। সেজন্য ইহা হাড়ে প্রস্তুত একটি কৌটায় কৌশলে সুরক্ষিত।

যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড নাই তাহাদিগকে **অমেরুদণ্ডী** (Invertebrata) প্রাণী বলা হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীও যেমন অসংখ্য প্রকারের অমেরুদণ্ডী প্রাণীও তেমনি অসংখ্য প্রকারের। তাই আবার উক্ত দুই প্রকার প্রাণীকেই আরও বিভিন্ন প্রকার পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে, মাছ, সরীসৃপ, পাখী, চতুষ্পদ ও মানুষ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তন্মধ্যে মাছের সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলা হইয়াছে এবং পরে কিছু বলা হইবে। চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুর দুধ খাইয়া আমাদের শিশুগণ পুষ্টিলাভ করে। আমাদের মাতৃবক্ষে দুধ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না যাহাতে কেবলমাত্র সেই দুধ খাইয়া আমাদের শিশুগণ বাঁচিতে পারে। তাই আমরা ইতর প্রাণীর দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া থাকি। চতুষ্পদ প্রাণিগণ তাহাদের সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইয়া বাঁচাইয়া রাখে, কিন্তু সকল ইতর প্রাণী তাহাদের শিশুদিগকে স্তন্যপান করায় না। যে সকল প্রাণী স্তন্যপান করাইয়া শিশুদিগকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাদিগকে **স্তন্যপায়ী** (Mammal) বলা হয়। মানুষ এবং পশু স্তন্যপায়ী প্রাণী।

অন্যান্য প্রাণী হইতে স্তন্যপায়ীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়। স্তন্যপায়ীদের গর্ভ হইতে একেবারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু অন্য প্রাণীর ডিম হয়। তাই যে সকল প্রাণীর ডিম হয় তাহাদিগকে অনেক সময় দ্বিজ বলা হয়। পাখীরা দ্বিজ। সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের দাঁত আছে বলিয়া ইহারা খাদ্য চিবাইয়া খায়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে আবার দুই রকম প্রাণী দেখা যায়—**মাংসাশী** (Carnivorous) ও **নিরামিষাশী** (Vegetarian)। মাংসাশী প্রাণী সাধারণত হিংস্র। ইহাদের দেহগঠন শিকারের উপযুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত হাল্কা; ইহাদের পেট ছোট, পাগুলি দৌড়াইবার পক্ষে অতিশয় সুবিধাজনকভাবে গঠিত; দাঁত ও নখ অতিশয় ধারাল এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্রের কাজ করে। নিরামিষাশী প্রাণীদের দেহ অপেক্ষাকৃত স্থূল এবং ভারী। দাঁত তত তীক্ষ্ণ নয়, ইহাদের উদর বৃহৎ। ইহাদের নখ নাই; তৎপরিবর্তে খুর আছে।

শিশুদিগকে স্তন্যপান করাইবার জন্য স্তন্যপায়ী জীব অধিক দিন আপন সন্তানের সংস্রবে থাকে বলিয়া ইহাদের সন্তান বাৎসল্য অতীব প্রবল। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি এবং শ্রবণশক্তি অন্যান্য প্রাণীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। স্তন্যপায়ী জীবগণের স্বভাব এবং দেহ গঠন প্রণালী অনেকটা মানুষের স্বভাব এবং দেহগঠন প্রণালীর মত।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকলগুলির বিষয়ে তোমাদের অল্প বিস্তর জানা আছে। কিন্তু অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিষয় শুনিলে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইবে। এক্ষণে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদিগকে পর্বানুক্রমে (Phyla) সাজাইয়া তাহাদের সম্বন্ধে নিচে বলা হইল।

প্রথম পর্ব—**প্রোটোজোয়া** (Protozoa) বা **আদ্যপ্রাণী**:—এই পর্বের প্রাণিগণ এক কোষ (Cell) বিশিষ্ট। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া ইহাদিগকে দেখা যায় না। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে থাকিয়া ইহারা রোগ জন্মায়। অ্যামিবা নামক প্রোটোজোয়া হইতে আমাশয় এবং ম্যালেরিয়ার বীজাণু হইতে ম্যালেরিয়া রোগ হইয়া থাকে। ইহারা জলময় পদার্থে

বা স্থলে ভালভাবে থাকিতে পারে। কিন্তু ইহারা জলে স্থলে শূন্যে সকল জায়গায় থাকে। একটি কোষের সাহায্যে ইহারা হাত, পা, মুখ, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কাজ করিয়া থাকে। ইহাদের একটি প্রাণীর দেহ ভাঙ্গিয়া একটি ক্রমে আর একটি প্রাণী জন্মায়। এইরূপে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়।

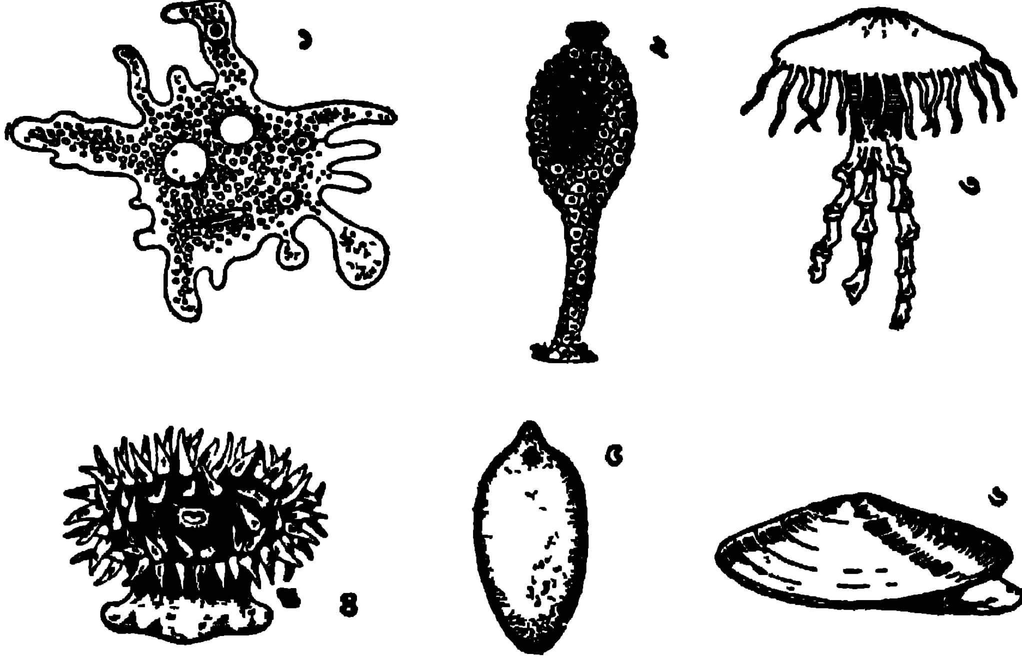
দ্বিতীয় পর্ব—**পরিফেরা** (Porifera) বা **ছিদ্রাল প্রাণী** :—ইহারা সমুদ্র গর্ভে অধিক পরিমাণে থাকে। ইহারা জলেই বাস করে। দেখিতে সবুজবর্ণের বলিয়া ইহাদিগকে উদ্ভিদ বলিয়া ভ্রম হয়। স্পঞ্জ এই সকল প্রাণীর দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহাদের দেহে বহু ছিদ্র আছে। ইহারা জলমিশ্রিত খাদ্য এই ছিদ্র দিয়া গ্রহণ করে আবার দূষিত পদার্থও ঐ সকল ছিদ্র দিয়া বাহির করিয়া দেয়। ইহাদের দেহ দুইস্তরে সজ্জিত।

তৃতীয় পর্ব—**সিলেনটারেটা** (Cœlenterata) বা **একনালী দেহী** :—ইহারাও জলচর প্রাণী এবং ইহাদের দেহও দুইস্তরে গঠিত। ইহাদের দেহে একটি মাত্র ছিদ্র আছে তাই দিয়া ইহারা আহার গ্রহণ ও দূষিত পদার্থ ত্যাগ করে। ইহাদের অনেকের শুঁড় (Tentacle) আছে। তদ্দ্বারা ইহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে। হাইড্রা (Hydra), জেলি-মাছ (Jelly-fish), সাগর কুসুম (Sea anemone) প্রভৃতি এই জাতীয় জীব, সমুদ্র গর্ভস্থ প্রবাল ইহাদের দেহাবশেষ। তোমরা প্রবাল দ্বীপের কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ।

চতুর্থ পর্ব—**প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থেস**—(Platyhelminthes) বা **চ্যাপ্টা কৃমি** :—ইহাদের দেহ চ্যাপ্টা। মানুষ এবং পশু প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর যকৃতে ইহারা জন্মিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে যকৃত কৃমি (Liver Fluke) বলা হয়। ইহারা অধিকাংশ উভয় লিঙ্গ।

পঞ্চম পর্ব—**নিমাথেল্‌-মিন্‌থেস্‌** (Nemathel-minthes) **গোল কৃমি**-মানুষ বা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহে ইহারা বাস করে। ইহারা সূতার মত লম্বা এবং ইহাদের ত্বক্‌ স্বচ্ছ। মলের সহিত যে কৃমি বাহির হয় তাহারা এই জাতীয়

জীব, ইহাদের মুখ, পৌষ্টিক নালী ও পায়ু আছে। ইহাদের দেহের আবরণ অপেক্ষাকৃত পুরু অথচ স্বচ্ছ। ইহাদের বেশীর ভাগ জীবের স্ত্রী ও পুরুষ জন্মায়।



১নং চিত্র—প্রোটোজোয়া, স্পঞ্জ ও সাগর কুসুম

ষষ্ঠ পর্ব—**আনেলিডা** (Annelida) বা **অঙ্গুরী মাল** ঃ—পর পর কতকগুলি আংটি সাজাইয়া লম্বা করিলে যেরূপ দেখায় ইহাদের দেহ দেখিতে সেইরূপ, ইহাদের দেহ স্বচ্ছত্বক (Cuticle) দ্বারা আবৃত। কেঁচো এবং জোঁক প্রভৃতি জীব এই পর্বভুক্ত। ইহাদের কাহারও কাহারও গায়ে কিটা (Chæta) আছে। ইহারা উভয় লিঙ্গ।



২ নং চিত্র—তারা মাছ ও জোঁক

সপ্তম পর্ব—**একাইনোডার্মাটা** (Echinodermata) **কণ্টকত্বক্** ঃ—

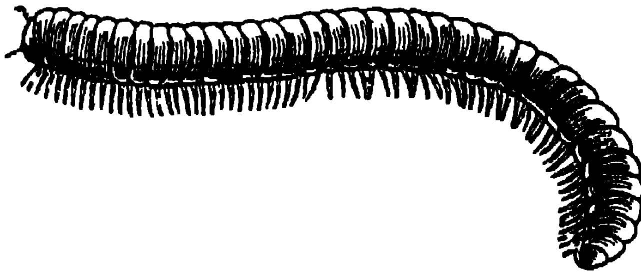
ইহাদের দেহ চুন জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত এবং সারা দেহ কণ্টকময়। ইহাদের রূপের বৈচিত্র্য ইহাদিগকে মনোরম করিয়া তুলে। সমুদ্র জলে ইহারা বাস করে। তারা মাছ (Star fish) এবং শুঁয়াযুক্ত তারা মাছ এই পর্বভুক্ত প্রাণী। ইহাদেব স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ইহাবা মন্থরগামী প্রাণী।

অষ্টম পর্ব—**অর্থ্রোপোডা** (Arthropoda) **সন্ধিপদ**:—ইহাদের



৩নং চিত্র—কয়েকটি সন্ধিপদ প্রাণী

দেহে জোড়া জোড়া পা থাকে বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। চিংড়ি, কেন্নো, পিপীলিকা, বিছা, মাছি, মশা, কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণী এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি এই পর্বভুক্ত। ইহাদেব দেহ অপেক্ষাকৃত কঠিন একটি আববণে আবৃত এবং দেহ-



৪নং চিত্র—কেন্নো

গুলি খণ্ড খণ্ড অঙ্গুরীব সমাবেশেব ন্যায়। চিংড়িব মুখের দুইধাবে ঠোঁটেব ন্যায় যে পাতলা অংশ আছে তাহাকে ইহাদেব **প্রবর্ধন** (Appendage) বলে। এই জাতীয় অনেক প্রাণীরই এইরূপ প্রবর্ধন আছে। ইহাদেব দেহ এমনভাবে গঠিত যে মাঝামাঝি কাটিলে দুইটি অনুরূপ অংশে ইহারা বিভক্ত হইতে পাবে। ইহাদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ আছে।

নবম পর্ব—**মলাস্কা** (Mollusca) **শম্বুক**:—ইহারা মন্থরগামী এবং ভীরু-স্বভাব জীব। ইহাদের দেহও একটি চুন জাতীয় কঠিন আবরণে আবৃত থাকে,

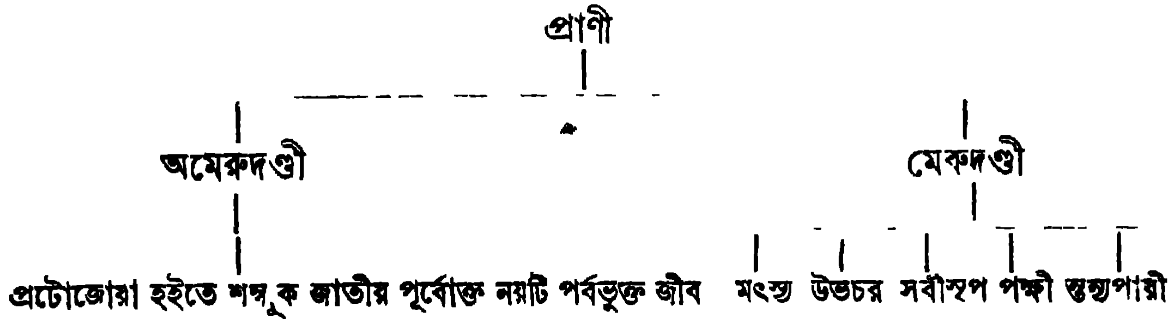
মাংসল দেহ ইচ্ছামত ঐ খোসার ভিতরে লইয়া যাইতে ও বাহিরে আনিতে পারে। ইহাদের শ্বাস গ্রহণ, রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়া মেরুদণ্ডী প্রাণীর মতই হইয়া থাকে। ইহাদের দেহের কঠিন আবরণ পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত করা যায়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জীবের স্ত্রী ও পুরুষ জন্মায় আবাব কোন কোন জাতীয় উভয় লিঙ্গ। শামুক, ঝিনুক, শাঁখ প্রভৃতি এই পর্বভুক্ত জীব।



৫নং চিত্র—শামুক

দশম পর্ব—**কর্ডাটা** (Chordata) **মেরুদণ্ডী**ঃ—ইহাই প্রাণীদের মধ্যে উচ্চতম শ্রেণীব জীব। অন্য সকল জীব হইতে ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহাদের মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক আছে। ইহাদেব কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

নিম্নে প্রাণীদেব শ্রেণী বিভাগেব একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল।



মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনা

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
১। মেরুদণ্ড নাই	১। মেরুদণ্ড আছে
২। যাহাদের নার্ভ আছে, তাহাদের পেটের দিকে নার্ভ আছে।	২। সকলের নার্ভ আছে এবং তাহা পিঠের দিকে
৩। ফ্যারিংসে ছিদ্র নাই, শ্বাসকার্যের অন্য ব্যবস্থা আছে	৩। ফ্যারিংসে ছিদ্র আছে তদ্দ্বারাই শ্বাস কার্যের ব্যবস্থা আছে
৪। অনেকের চক্ষু নাই, যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদের অধিকাংশের পুঞ্জাক্ষি	৪। সকলেরই সরল চক্ষু আছে।
৫। যাহাদের হৃদয় আছে তাহাদের হৃদয় পিঠের দিকে অবস্থিত	৫। সকলের হৃদয় আছে তাহা পেটের দিকে

সংক্ষেপ—পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকারের জীব বর্তমান, জলের জীবাণু, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু যেমন প্রাণী, কৃমি, কীট পতঙ্গ হইতে গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তু ও মানুষ তেমনই প্রাণী। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার জীবদেহের গঠন, জীবন ধারা, আকার অবয়ব প্রভৃতি বিভিন্ন, সেই হিসাবে সমস্ত প্রাণীদিগকে দশটি পর্বে বিভক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। প্রাণী-জগতের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির বর্ণনা কর। (Write down general classification of the living)

২। একনালীদেহী এবং অঙ্গুরীমাল প্রাণিদের পার্থক্য কি? (What are the peculiarities of the following phyla—Cœlenterata and Annelida)

৩। মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের তুলনা কর। (Compare vertebrata with invertebrata)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েকটি কীট পতঙ্গ

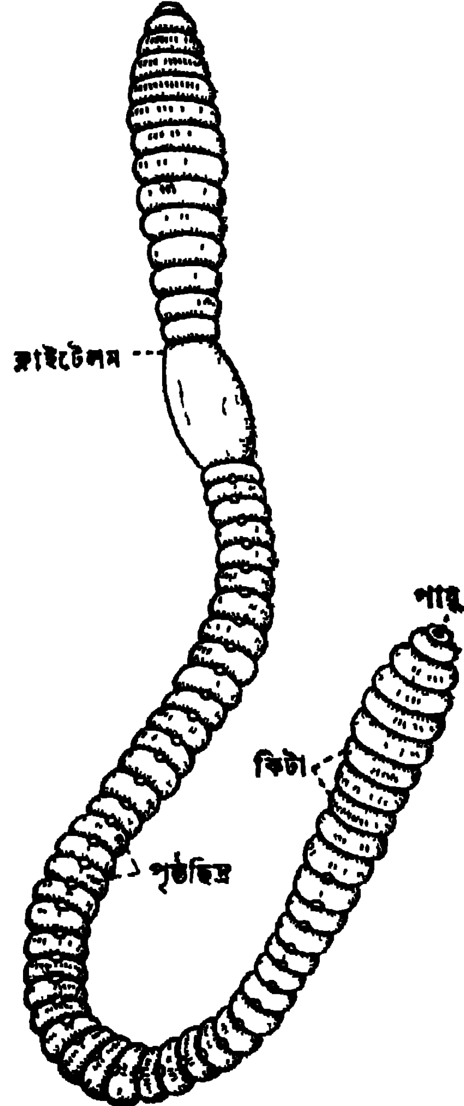
কেঁচো

কেঁচো অঙ্গুরীমাল পব ভুক্ত উভযলিঙ্গ অর্থাৎ ইহাদেব প্রত্যেকটিকে স্ত্রী বা পুরুষ দুই বলা যায়। ইহাদেব দেহেব কিছু অংশ কাটিয়া দিলে আবাব তাহা বাড়িয়া যায়। ইহাবা মাটিব নিচে বাস কবে। আহাব অন্বেষণ কালে ইহাবা মাটির উপরে আসে—কার্য সিদ্ধ হইলে আবার মাটিব নিচে চলিয়া যায়। সাধাবণত দিনের আলোতে ইহাবা বাহিবে আসে না। কেঁচো অতি ভীরু প্রাণী এবং জগতে কাহাবও অনিষ্ট কবে না বলিলেই চলে। ইহাবা মাটি ও গাছেব পাতা খাইযা বাঁচিযা থাকে। কিন্তু বিষ্ঠা রূপে যাহা ত্যাগ কবে তাহা দেখিতে মাটির সরু দড়ির মত। এইরূপ মাটিব দড়ি যেখানে দেখা যাইবে অনুমান কবিতে পারা যায় সেখানে মাটিতে কেঁচো আছে। কেঁচো মাটিব নিচে যাইবার সময মাটিতে যে গর্ত হয় তাহাতে নিকটবর্তী উদ্ভিদেব প্রভূত উপকাব হয। ঐ পথে বায়ু প্রবেশ করিয়া গাছেব উপকার সাধন কবে। কেঁচো নিবীহ প্রাণী এবং উদ্ভিদেব উপকাবী বটে কিন্তু মাছ ব্যাঙ হইতে আবম্ভ করিয়া এমন কি পিপীলিকা ও পতঙ্গ ইহাদেব শত্রু। সুবিধা পাইলে সকলেই কেঁচো খাইযা থাকে। ইহারা সাধাবণত ভিজা মাটিতে থাকিতে ভালবাসে। তাই বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকাল এবং গ্রীষ্মকালে ইহাবা মাটির বহু নিচে যেখানে অধিক ভিজা মাটি আছে সেখানে নামিয়া যায়। ইহাদেব যাইবাব সময মাটিতে যে গর্ত হয় তাহা অধিকাংশ আঁকা বাঁকা হয় না। প্রথমে মাটির উপব হইতে খানিকটা দূর পর্যন্ত নিচে নামিয়া পরে আপন সুবিধা মত বাঁকিয়া ভিজা মাটিতে বাস করে। ভিজা মাটি না পাইলে ইহারা পাঁচ ছয় ফুট নিচেও নামিয়া যায়। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি অতীব তীব্র। কোনরূপে ইহার গায়ে কিছু লাগিলেই ইহারা সিটকাইয়া

উঠে। ইহাদের চোখ নাই কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট আংটিতে আলো পড়িলে চমকিয়া উঠে। ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ও নাই। ইহারা যখন মাটির নিচে থাকে তখন তাহাদের আবাস-গর্তের মুখ ঢিল বা পাতা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে। ঐ পাতা আবার প্রয়োজনমত খাইয়া থাকে।

জীবিত অবস্থায় কেঁচোব ব্যবচ্ছেদ কবা যায় না। কাবণ ছুঁইলেই ইহাবা দেহ সঙ্কুচিত করিয়া লয় তাহা পূর্বেই শুনিয়াছ। তাই ইহাব দেহেব যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত তাহা জানিবাব জন্য ব্যবচ্ছেদ কবিবাব পুর্বেই ইহাদিগকে মাবিযা ফেলিতে হয়। যাহাতে ইহাদের দেহ প্রসারিত করিয়া ব্যবচ্ছেদেব উপযোগী করিযা মারিতে পাবা যায় তজ্জন্য এক ভাগ মেথিলেটেড স্পিবিটে দশ ভাগ জল দিয়া ইহাদিগকে সেই মিশ্র জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া বাখিতে হয়। মরিয়া গেলে একটি ব্যবচ্ছেদ থালে (Disecting tray) মোমের উপর ইহাব দুই প্রান্তে দুইটি পিন দিয়া মোমে পুঁতিয়া ইহাকে লম্বা করিয়া বাখিতে হয়। পবে আস্তে আস্তে

১ কেঁচো (পৃষ্ঠদেশ হইতে)

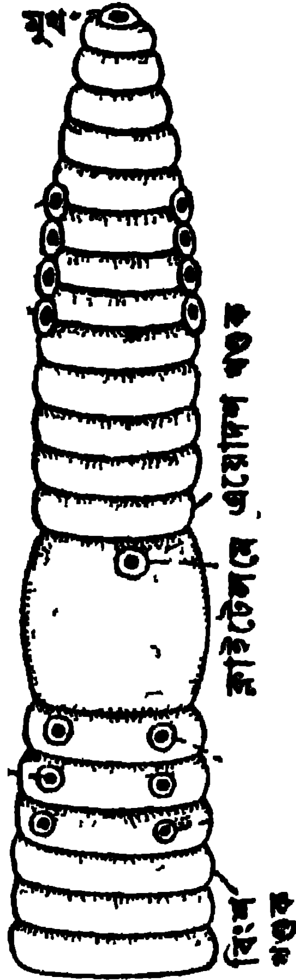


৬নং চিত্র—কেঁচোর অবয়ব

চিমটার দ্বারা উপবের আবরণটি টানিযা কাঁচি দিয়া বরাবর লম্বাভাবে কাটিয়া ঐ আবরণটির দুই দিকে পিন পুতিয়া প্রসারিত করিয়া রাখিতে হয়। ব্যবচ্ছেদেব জন্য বড় কেঁচো লওয়াই সুবিধাজনক। তাহাতে ইহাদের দেহযন্ত্রেব বিন্যাস দেখিতে সুবিধা হয়। আমাদের দেশে নানা রকম কেঁচো পাওয়া যায়। কিন্তু

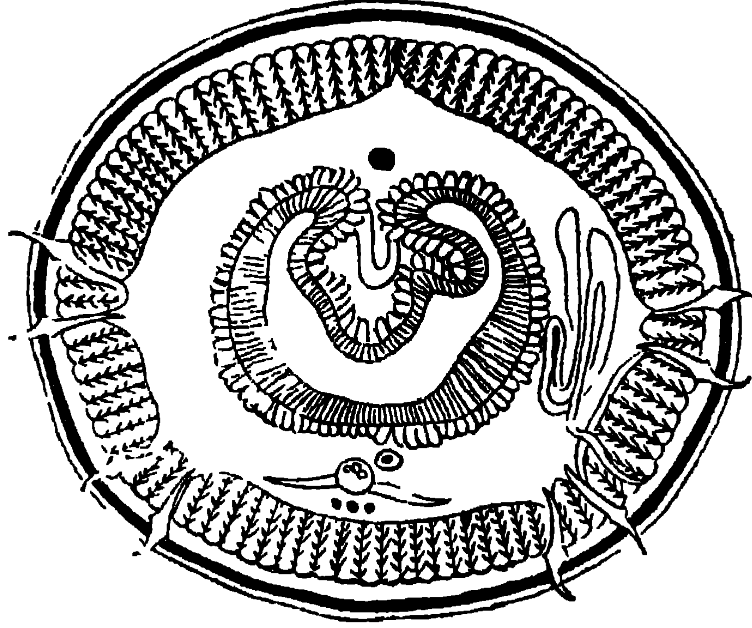
তাহারা আকারে তত বড হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন কি সাপের মত চারি পাঁচ ফুট দীর্ঘ লম্বা কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবচ্ছেদের সময় আমাদের দেশের ফেরেটিমা (Pheretima) জাতীয় কেঁচো লওয়া হয়। ইহারা দৈর্ঘ্যে আট ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে।

কেঁচোর দেহ যন্ত্র :—পূর্বোক্ত প্রকারে একটি কেঁচোর দেহ পরীক্ষা করিলে দেখিবে প্রত্যেক কেঁচোর দেহ এক শত হইতে একশত কুড়িটি অঙ্গুরীর সমাবেশে গঠিত, মুখ হইতে ক্রমে মোটা হইয়া আবার সরু হইয়া যায়। মুখ হইতে প্রায় ১৩টি অঙ্গুরী পরে একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া অঙ্গুরীর নাম **ক্লাইটেলাম** (Clitellum)। ইহা তিনটি অঙ্গুরীর সমাবেশে গঠিত বলিয়া মনে হয়। প্রথম আংটিটির উপর দিকে একটি মাংসল পিণ্ড কেঁচোর **ওষ্ঠ** (Prostomium)। ওষ্ঠের মধ্যে যে ছিদ্র আছে তাহাই কেঁচোর মুখ এবং অপর প্রান্তের অনুরূপ ছিদ্রটি ইহার পায়ু। বুকের দিক অপেক্ষা ইহাদের পিঠের দিক অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। ইহার দেহের উপর এক রকম কূর্চ (Bristle.) আছে তাহাকে **কিটা** বা **সিটা** (Chaeta বা seta) বলে। এই কিটা প্রথম ও শেষ অঙ্গুরী ছাড়া সকল অঙ্গুরীতে আছে। খস্‌খসে বলিয়া হাত বুলাইয়া এই কিটার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়; কিন্তু চোখে দেখা যায় না। এই কিটার জন্য ইহাকে **কিটাপদ** (Chaetapoda) বলা হয়।



৭ নং চিত্র—কেঁচোর সম্মুখ ভাগ

দেহাবরণ :—কেঁচোর এইরূপ একটি আংটি আড়াআড়ি লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ইহার দেহাবরণ লক্ষ্য কর, চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহাদের দেহের প্রাচীর চারি স্তরে গঠিত। উপরে **কিউটিক্‌ল** (Cuticle),

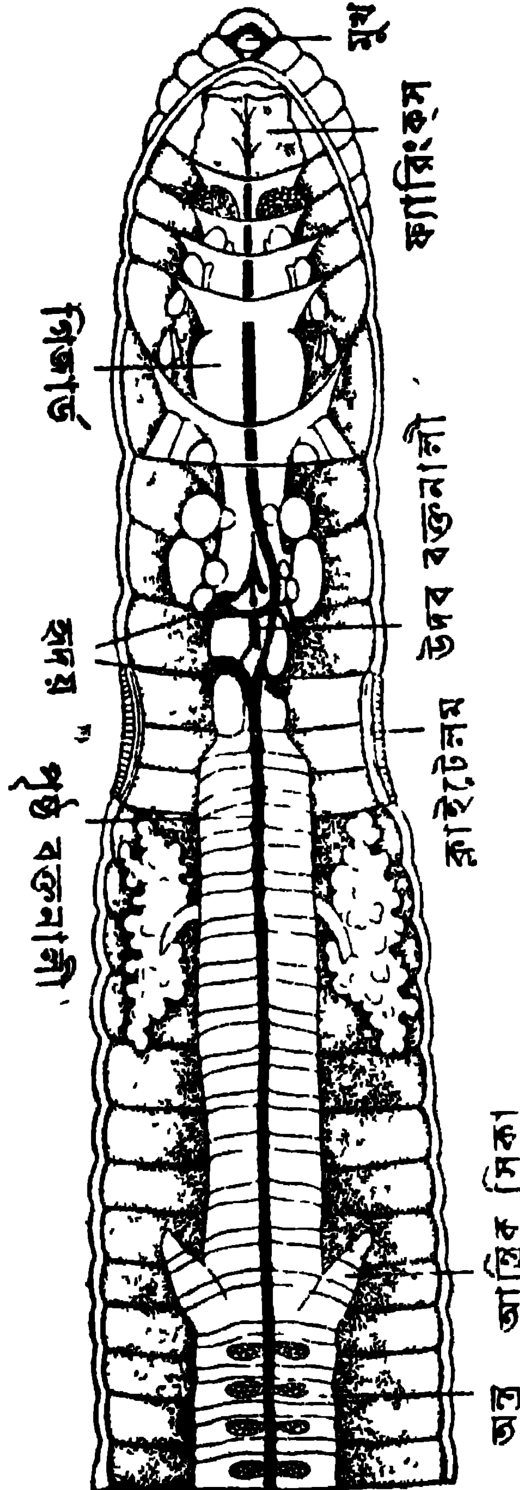


৮ নং চিত্র—কেঁচোর দেহাবরণ

পরে **ত্বক** (Skin), তাহার পরে চক্র ও লম্বপেশী স্তর এবং ভিতরে **প্রাকারাবরণ** (Cœlomic epithelium)। চলিবার সময় ইহাদের কিটা মাটিতে ঠেকিয়া থাকে এবং পেশীগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে।

পৌষ্টিকনালী (Alimentary canal) :—ইহাদের খাদ্য নালী মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নালীর চারিদিক ঘেরিয়া যে গহ্বর আছে তাহাকে **সিলোম** (Cœlom) বলে। যে প্রাচীর দ্বারা এই গহ্বর বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত তাহাদিগকে **সেপ্টা** (Septa) বলে। অঙ্গুরীমাল জীবের এইরূপ সেপ্টা আছে। মুখ হইতে খাবার পূর্বোক্ত নালী দিয়া লাটিমাকারের প্রকোষ্ঠ **ফ্যারিংস**এ (Pharynx) যায়। তাহার পর **ইসোফেগাস** (Œsophagus)। ইসোফেগাসের মধ্যে ডিমের মত গোলাকার স্থানটিকে **গিজার্ড** (Gizzard) বলে। দুইটি

প্রকোষ্ঠ মিশিয়া ইহা গঠিত। এইখানে আসিয়া উহাদের খাদ্য পিষ্ট হয়। গিজার্ডের পরের অংশ **অন্ত্র** (Intestine)। অন্ত্র, **পায়ু** (Anus) পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্ত্রের ভিতরে উপর দিকে একটি লম্বালম্বি ভাঁজের মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম রক্ত-বহা নালী আছে। ঐ ভাঁজটির নাম **টিপলোসোল** (Typhlosol)। টিপলোসোল কিন্তু সকল অন্ত্রের আংটি-গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই টিপলোসোল দ্বারা অন্ত্র ফুলাইয়া ইহারা খাদ্য শোষণ করে।



৯নং চিত্র—কেঁচোর পৌষ্টিক নালী

ইহাদের ফুস্‌ফুস্‌ নাই। ত্বকের মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী আছে তদ্বারা ইহাদের শ্বাসকার্য সম্পাদিত হয়।

কেঁচোর রক্ত শাদা, কারণ ইহাদের রক্তে শ্বেত কণিকা ভিন্ন লোহিত কণিকা নাই। ইহাদের রক্তের তরলাংশ **প্লাসমার** (Plasma) মধ্যে **হিমোগ্লোবিন** (Hœmoglobin) থাকে। ক্লাইটেলাম হইতে মুখের দিকে ৫।৬টি অঙ্গুরী পর্যন্ত স্থানের মধ্যে ইহাদের **হৃদয়** (Heart) থাকে। ইহাদের হৃদয় পূর্বোক্ত রক্তবহা নালীর অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাদের অবস্থান কিন্তু

পূর্বোক্ত রক্তবহা নালীর সহিত লম্বভাবে। ইহাদের আকার রক্তবহা নালী অপেক্ষা কিছু অধিক স্ফীত। কেঁচো এই হৃদয় দিয়া রক্ত সঞ্চালনের কার্য চালাইয়া থাকে। হৃদয় হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত সঞ্চালক নালী বহির্গত হইয়া সমস্ত দেহে ছড়াইয়া আছে। তন্মধ্যে দুইটি প্রধান, একটি পিঠের দিকে অপরটি পেটের দিকে। হৃদয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ ফলে নালীগুলি দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়।

পিপীলিকা

পিপীলিকা একপ্রকার পতঙ্গ। অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদের দেহ মধ্যে মাথা, গলা, বুক, কোমর ও পেট এই কয়টি ভাগ আছে।

ইহাদের মাথা গোলাকার, তাহার সম্মুখেই এক জোড়া **শুঁয়া** (Antenna)। ইহার দ্বারা উহারা গন্ধ পায় এবং পথ চিনিয়া লয়। তাহার পাশেই দুইটি **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye)। বুকে তিন জোড়া পা আছে, প্রত্যেক পা কয়েকটি গাঁটে বিভক্ত। পিঠের উপর দুই জোড়া **পাখা** (Wing) আছে, এক জোড়া বড় ও এক জোড়া ছোট। বড় জোড়াটির নিচে ছোট জোড়া আছে। আমরা যে পিপীলিকা সাধারণত দেখি তাহাদের পাখা নাই। ইহারা শ্রমিক। সমাজ বদ্ধ ভাবে ইহারা বাস করে। তাই ইহাদের কার্যের বিভাগ আছে, ইহাদের মধ্যে কেহ শ্রমিকের কাজ করে—আবার কেহ যোদ্ধার কাজ, কেহ বা পাহারাওয়ালার কাজ করিয়া থাকে। ইহারা শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ডিম এবং বাচ্ছা কাড়িয়া লয়—এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আপনাদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। খাবার পাইলে ইহারা প্রথমে পেট ভরিয়া খাইয়া পরে অপরের জন্য বাসায় লইয়া যায়।

সারি দিয়া পিপীলিকা যাইতে নিশ্চয়ই দেখিযাছ। কেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ইহারা কাজ করিতে পারে ইহাতেই বুঝা যায়, কেমন নিঃশব্দে একসঙ্গে শত শত পিপীলিকা কাজে ব্যাপৃত হয়, কোন প্রকার গোলমাল নাই। কিন্তু যদি কোনরূপে

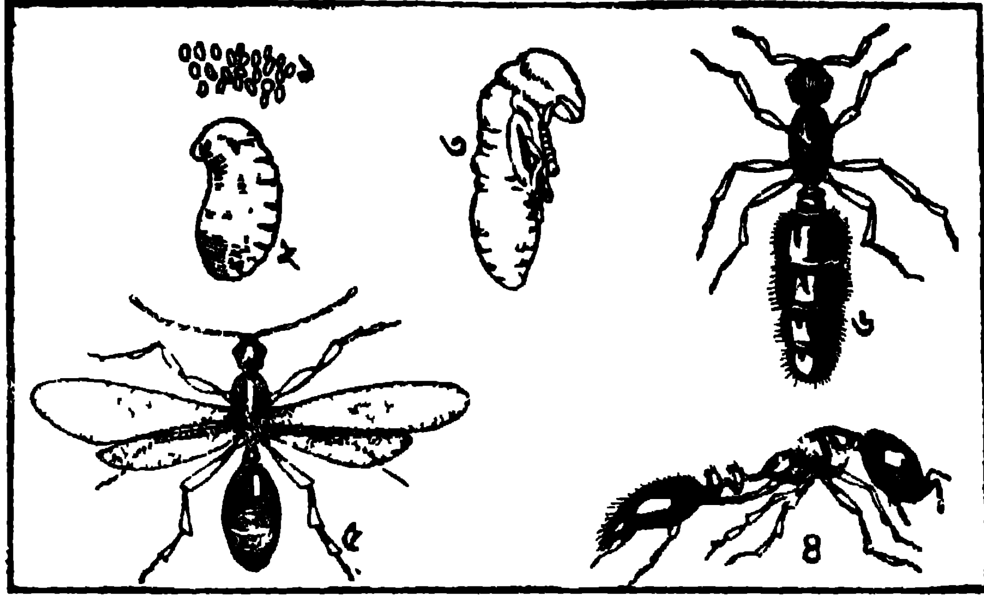
তোমরা ইহার সারি একটু ভাঙ্গিয়া দাও তবে ইহারা বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে—ভয়ে নহে, ইহারা সঙ্গীদের গন্ধ পাইয়া সারিবদ্ধভাবে যাইতে ছিল। এখন ঐ সারি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তাহারা বন্ধুদের গন্ধ না পাইয়া পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে। পিপীলিকাকে কেহ কখনও শব্দ করিতে দেখে না। কিন্তু **লোবোপেল্টা** (Lobopelta) নামে এক প্রকার পিপীলিকা শব্দ করিতে পারে।

পিপীলিকা নানা প্রকারের—ছোট, বড়, কাল, হলদে ইত্যাদি। হল্‌দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে পিপীলিকাগুলি আমরা দেখি ইহারা সাধারণত মাটির নিচে বাস করে। বড় কালগুলিও মাটির নিচে থাকে। যেখানে থাকে সেখানকার মাটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানারূপে বাহির করিয়া গর্ত্ত করে এবং সেই গর্তে বাস করে। কোথাও ঐরূপ মাটি দেখিলে বুঝিতে হইবে সেখানে পিপীলিকা বাস করে। মাছ ধরিবার জন্য এক প্রকার পিপীলিকার ডিম তোমরা গাছের পাতা হইতে সংগ্রহ কর। গাছের পাতাকে জুড়িয়া ইহারা কেমন সুন্দর বাসা করে দেখিয়াছ। তাহাতে ঐ জাতীয় পিপীলিকা বাস করে। ইহাদের বর্ণ হলদে। 'কাঠ পিঁপড়ে' জাতীয় পিপীলিকা, কাঠে, গাছের কোঠরে বাস করে।

পিপীলিকার ডিম অতিশয় ক্ষুদ্র ও তাহাদের বর্ণ সাদা। এই ডিম হইতে প্রথমে লম্বা কৃমির মত শূককীট বাহির হয়। এই শূককীটই মাছ ধরিবার 'টোপে' ব্যবহার করা হয়। ইহার পরবর্তী অবস্থা মূক কীট। মূক কীট অবস্থায় ইহারা প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া ডিমের মধ্যে থাকে। তখন একটি কঠিন আবরণ দেহকে ঢাকিয়া ফেলে। কয়েকদিনের মধ্যে ডিম ফাটিয়া যায় ও পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা বাহির হয়। স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকার ডানা থাকে—ডিম হইতে বাহির হইয়া উড়িতে পারে ; কিন্তু শ্রমিকদের ডানা নাই, ইহারা উড়িতেও পারে না।

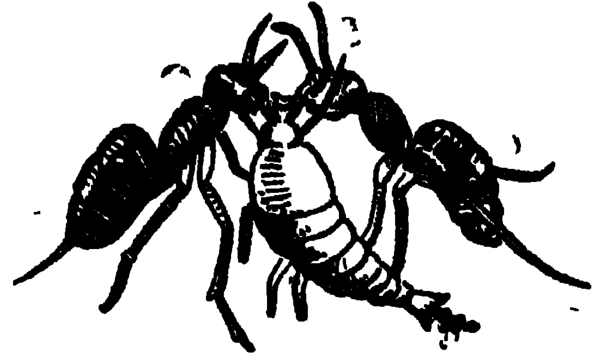
পিপীলিকা সমাজে তিন প্রকার পিপীলিকা, পুরুষ, স্ত্রী ও শ্রমিক। স্ত্রী পিপীলিকার মধ্যে একটি রাণী থাকে। তাহার কাজ ডিম প্রসব করা কিন্তু সন্তান পালন করে শ্রমিকেরা , পুরুষরা অলস কোন কাজ করে না। রাণী পিপীলিকার দেহ সকল পিপীলিকা হইতে একটু বড়। পিপীলিকা ক্ষুদ্র জীব , কিন্তু ইহারা

অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সঞ্চয়ী। বর্ষায় ইহারা বাহিরে আসিতে পারে না। সেইজন্য দারুণ শীতে পরিশ্রম করিয়া বর্ষার জন্য ইহারা খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।



১০নং চিত্র—পিপীলিকার বিবর্তন

আমেরিকায় এক প্রকার পিপীলিকা দেখা যায়, তাহারা দলের কয়েকটি শ্রমিকের হজম শক্তি নষ্ট করিয়া তাহাদের পেটে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে—প্রয়োজন হইলে এই মধু তাহারা নিজ নিজ কাজে লাগায়।



১১নং চিত্র—পিপীলিকার কলহ

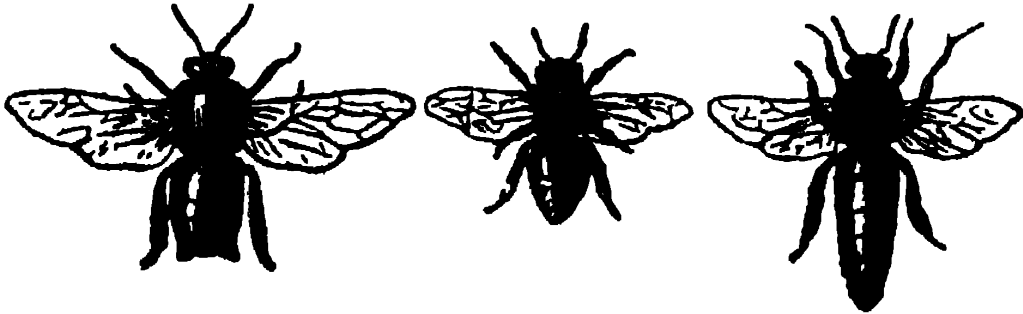
ইহারা দলবদ্ধভাবে থাকিলেও একদল অপর দলকে সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। এমন কি তখন দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অনেক সময় এই যুদ্ধে দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। চিত্রে দেখ দুইটি পিপীলিকা একটি কীট লইয়া কলহ করিতেছে। এই কীট উহাদের খাদ্য।

মৌমাছি

তোমরা মৌমাছির চাক দেখিয়াছ কি ? মৌমাছিরা ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া সেই চাকের মধ্যে রাখিয়া দেয়। ফুলের মধু বড় মিষ্ট, মৌমাছি উহা নিজের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনে। অন্য জন্তুরাও মধুর লোভে চাক নষ্ট করিতে আসে, মানুষেরাও চাক ভাঙ্গিয়া ঐ মধু চুরি করিয়া লয়। কেহ চাকের নিকট উৎপাত করিলে এক ঝাঁক মাছি চাক হইতে বাহির হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার গায়ে হুল ফুটাইয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। মৌমাছিতে যাহাকে কামড়াইয়াছে, সেই জানে এ বিষের কেমন জ্বালা।

একটা চাকে হাজার হাজার মৌমাছি থাকে। তাহাদের সকলের কাজ সমান নহে। উহাদের মধ্যে কাজের ভাগ আছে। কাজ হিসাবে উহাদের তিন শ্রেণী। শ্রেণীভেদে উহাদের আকৃতিরও একটু প্রভেদ আছে।

এক চাকে একটিমাত্র স্ত্রী মাছি কর্তৃত্ব করে। চাকের আর সকল মাছি যেন তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। সমস্ত চাঁকটা যেন তাহারই রাজ্য, এইজন্য ইহাকে 'রাণী মাছি' বা 'কর্ত্রীমাছি' (Queen) বলা হয়। ইহার প্রধান কাজ ডিম পাড়া।



১২নং চিত্র—পুরুষ, মজুর ও স্ত্রী মৌমাছি

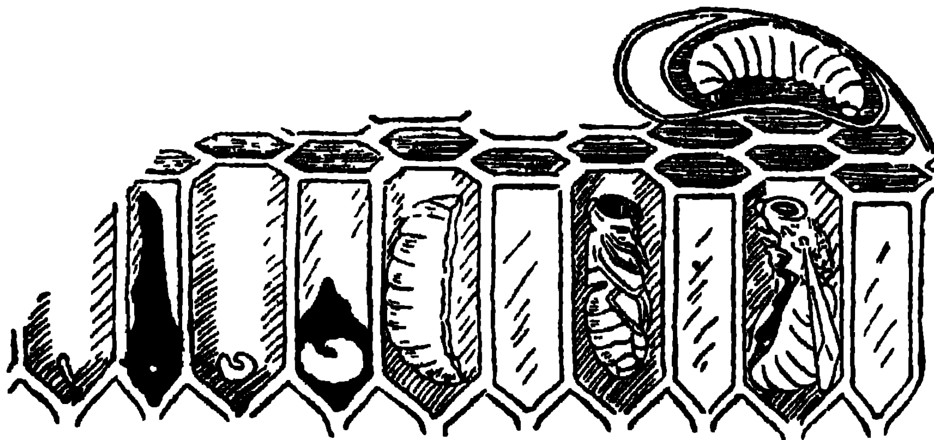
রাণীমাছি কেবল চাকের ঘরে ঘরে ডিম পাড়িয়া বেড়ায়। এই মাছির পিছনটা লম্বা, সরু ও সুচাল। আরও অনেক পুরুষ মাছি থাকে, ইহারা কোন কাজই করে না; খায় দায় ও বসিয়া থাকে। ইহাদের হুল পর্যন্ত নাই। ইহাদের পেটটা মোটা। এই অকর্মা পুরুষ মাছিগুলিকে 'বাবু মাছি' বলা যাইতে পারে।

তাহা ছাড়া হাজার হাজার মাছি থাকে। ইহারা আকারে ছোট খাট,

চালাক ও চটপটে। ইহারা মধু আনে, ইহারাই চাক বানায়। ইহারাই শিশু মাছিদিগকে খাওয়ায় ও লালন পালন করে এবং কেহ চাকের নিকটে আসিলে তাহার গায়ে হুল ফুটাইয়া চাক রক্ষার চেষ্টা করে। ইহারা সর্বদাই চাকের যাবতীয় কাজে ব্যস্ত। ইহারা চাকের 'মজুর বা কুলি মাছি' (Worker)।

মৌমাছির ডিম হইতে ছোট ছোট কৃমির মত বাচ্চা বাহির হয়। এই বাচ্চার দুইটি অবস্থা অর্থাৎ শূককীট ও মূককীট। এই দুইটি অবস্থা অতিক্রম করিবার পর পূর্ণাঙ্গ হয়। কিছুদিন পরে বাচ্চাগুলির ডানা বাহির হইলে মূর্তি বদল করে। তখন তাহারা মাছি হয়। অধিকাংশ মাছিই মজুর মাছি হয়, কতক-গুলি বাবু মাছি হয়, আর গোটাকতক বাচ্চা হইতে কন্যামাছি হয়। এই কন্যাগুলি ভাল খাইতে পায় এবং খুব যত্নে পৃথক বড় ঘরে লুকান থাকে। বুড়া রাণী চাক ছাড়িয়া অন্য কোথাও চাক বাঁধিতে গেলে একটি কন্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া চাক দখল করিয়া চাকের কর্ত্রী হয়। যেটি কর্ত্রী হয় সে আপনার ছোট ভগিনীগুলিকে মারিয়া ফেলে। এক চাকে দুইজন কর্তৃত্ব করিতে পারে না।

মধু আনিবার সময় ফুলের রেণু কুলিমাছিদের গায়ে লাগিয়া যায়। ঘরে আসিয়া রেণু ও মধু একত্র মাখাইয়া খাবার তৈয়ার করিয়া রাখে। ডিম হইতে

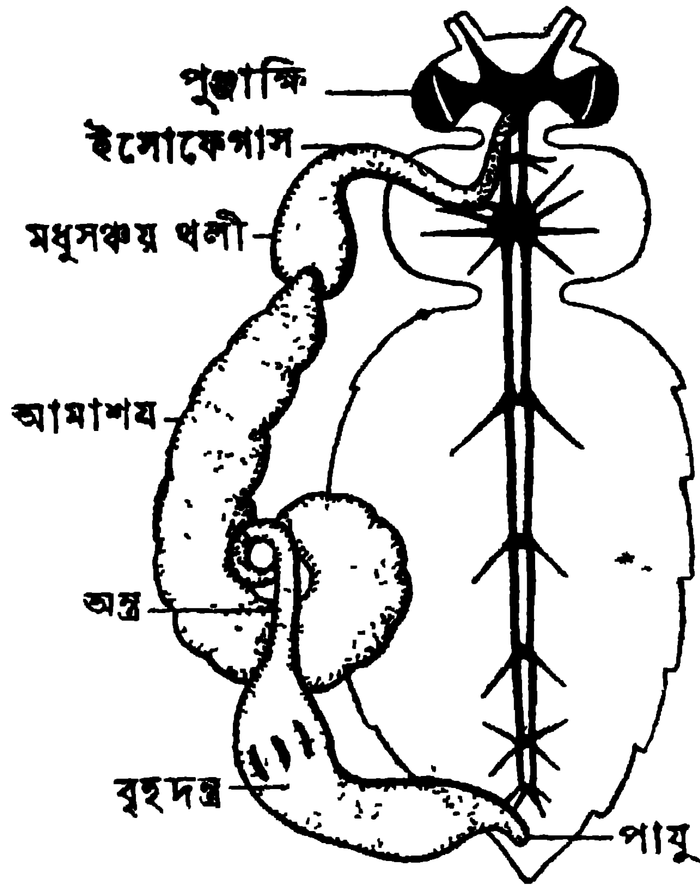


১৩ নং চিত্র—মৌমাছির চাক

বাচ্চা বাহির হইলে বাচ্চাদিগকে সেই খাবার দেয়। কুলিমাছিদের পেটের তল হইতে মোম বাহির হয়, সেই মোম দিয়া তাহারা চাক তৈয়ার করে। চাকের

কুঠারিগুলি ছয় কোণা। এই কুঠারি তৈয়ার করিতে খুব কারিগরি লাগে। এত অল্প জিনিসে এত অল্প জায়গার মধ্যে এতগুলি কুঠারি তৈয়ার করিতে আর কোন জীব পারে না।

চাকে যখন আর মাছি কুলায় না, তখন বুড়ারাণী একদিন চাক ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এক পাল কুলি মাছি ঝাঁক বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে চলে এবং অন্য কোথাও গিয়া আবার নূতন চাক তৈয়ার করে।



১৪ নং চিত্র—মৌমাছির পৌষ্টিক নালী

মৌমাছির দেহও তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষ ও উদর। মস্তকের অগ্রভাগে দুইটি লোমযুক্ত শুঁয়া থাকে তাহার নাম **লেবিয়া** (Labia)। ইহার দ্বারা ফুলের মধু খায় এবং ঐ মধু **মধুসঞ্চয় থলিতে** অল্প অল্প করিয়া জমা করে। লেবিয়ার পরে দুইটি **পুঞ্জাক্ষি** (Compound eye)। মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত লম্বিত পৌষ্টিক নালীর একটি অংশই মধুসঞ্চয় থলি। পৌষ্টিক নালীর অপরাংশে আমাশয়, অন্ত্র, বৃহদন্ত্র প্রভৃতি চিত্রে দেখ।

মশা

সাধারণত দুই শ্রেণীর মশা দেখিতে পাওয়া যায়—**অ্যানোফেলিস্** (Anopheles) ও **কিউলেক্স্** (Culex)। এই অ্যানোফেলিস্-মশা ম্যালেরিয়ার

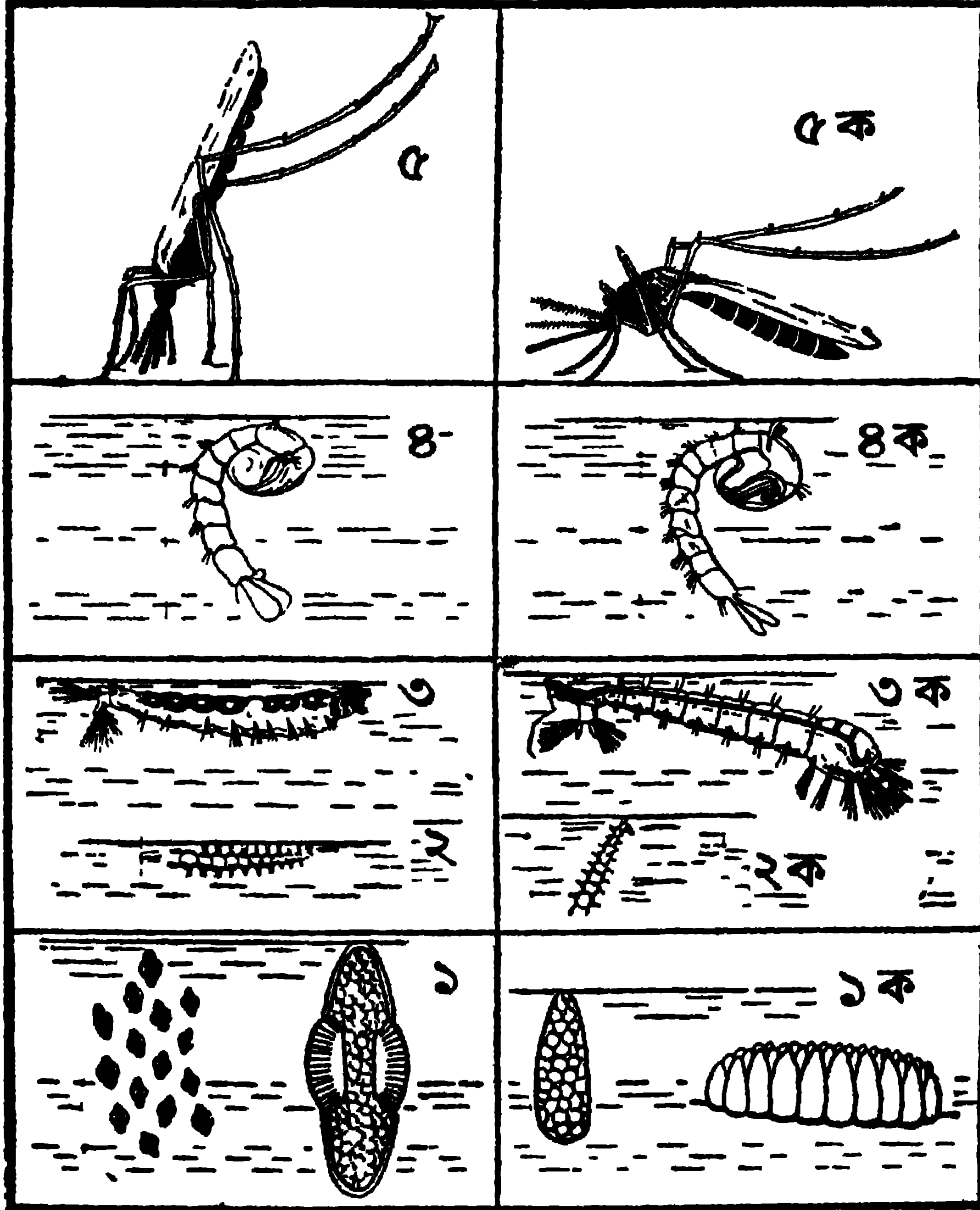
বীজাণু বহন করিয়া আমাদের দেহে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে আমাদের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ম্যালেরিয়ার কারণ এক ক্ষুদ্র বীজাণু—মনুষ্য রক্তে মিশ্রিত হইলে ইহারা বাড়িতে থাকে। এই মশা কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া তাহার রক্ত হইতে বীজাণুকে নিজদেহে গ্রহণ করে। তখনই সেই বীজাণু মশকদেহে পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

অতএব ইহারা কোথায় জন্মায় ইহাদের দেহ কিরূপে পুষ্ট হয় ইত্যাদি জানিয়া রাখিলে সময় মত ব্যবস্থা করিয়া ইহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। ইহা অন্য শ্রেণীর মশা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উপবেশন করিয়া থাকে। ইহারা ষট্পদ, ইহাদের লোমযুক্ত শুণ্ড দুইটি মুখাগ্রে অবস্থিত। বসিবার সময় চারি পায়ে ভর দিয়া দেহ এবং আসনের মধ্যে প্রায় ৪৫° কোণ নির্মাণ করিয়া মস্তক নিচু করিয়া ইহারা বসে।

পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকার মত মশার দেহও তিন ভাগে বিভক্ত—মস্তক, বক্ষ ও উদর। উদরটি নয় ভাগে বিভক্ত, এক একটি ভাগ এক একটি আঙটির মত। ইহাদের দুইটি পক্ষ, মস্তকে দুইটি পুঞ্জাক্ষি, বক্ষে তিন জোড়া পা। ইহাদের শুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে একটি সূচের মত শোষণনালী অবস্থিত আছে। স্ত্রীপুরুষ ভেদে ইহাদের প্রকৃতিতেও যথেষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়। পুরুষজাতি দিনের বেলায় বিচরণ করে। মনুষ্যদেহ দংশনে পুরুষ মশার খুব বেশী প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কিন্তু স্ত্রীজাতি অতিশয় রক্তপিপাসু। তাহারা অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে। যে গৃহ পর্যাপ্ত আলোক বাতাস প্রাপ্ত হয়, সেখানে স্ত্রী-মশক বাস করিতে চায় না। সন্ধ্যার সময় ইহারা দলে দলে মানুষের রক্তপান করিবার জন্য বহির্গত হয়। ইহারা যে কেবল রক্ত শোষণ করে তাহা নহে; ইহাদের এক অদ্ভুত প্রকৃতি এই যে নালিকাপথে রক্তশোষণ করিয়া পুনরায় সেই পথেই রক্ত উদ্গীরণ করে। এইরূপে অ্যানোফেলিসের দেহের ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে।

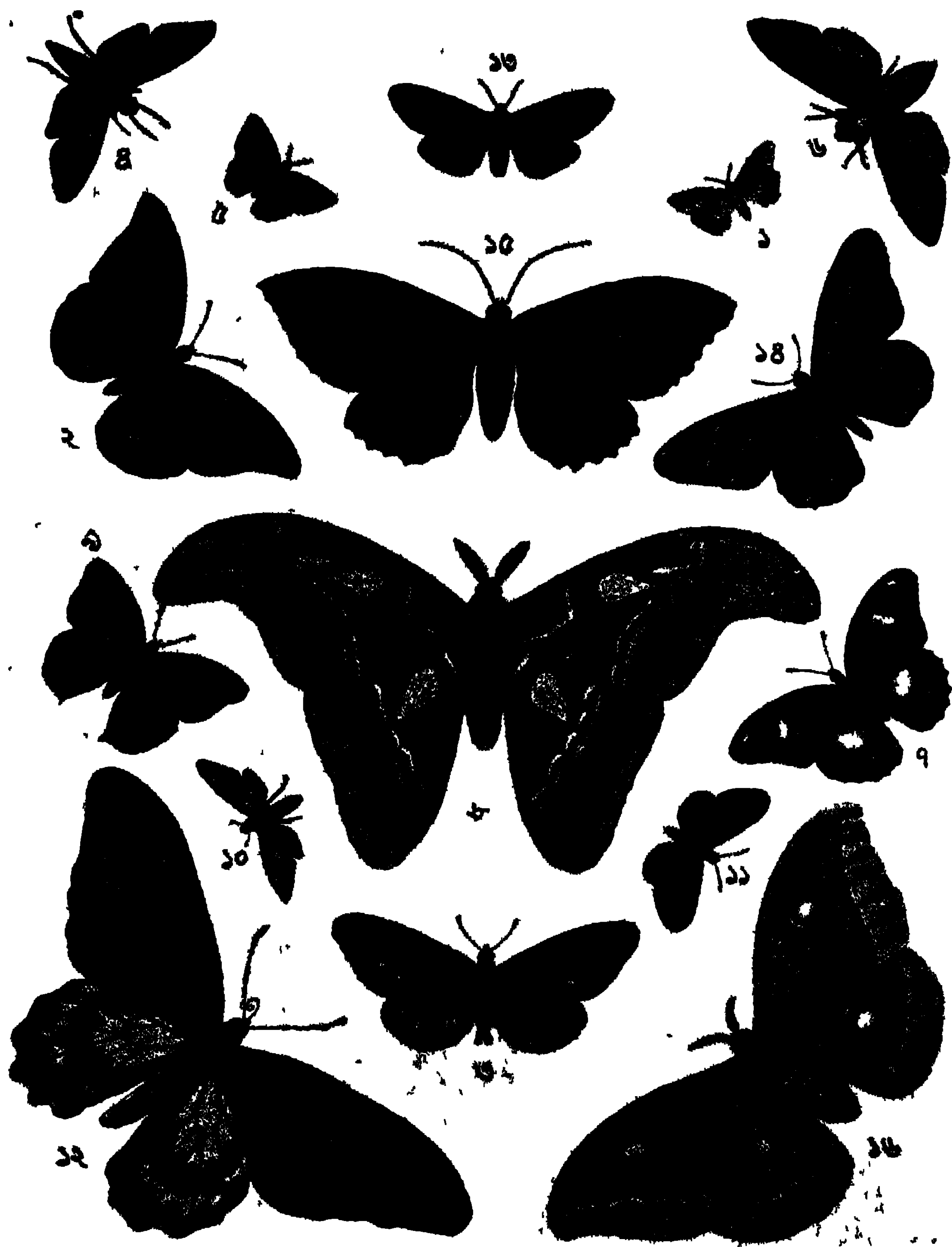
ইহা ব্যতীত কিউলেক্স মশকও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের

পক্ষ কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কিউলেক্সের উপবেশন প্রথাও অন্যরূপ



১৫নং চিত্র—মশার বিবর্তন

ইহারা দেহকে ভূ-সমান্তরাল করিয়া উপবেশন করে। ইহাদের শুণ্ড বা শুঁয়া (Antenna) দুইটি।



প্রজাপতি

অ্যানোফেলিস্ মশকের জীবন আলোচনা করিলে মানুষ ম্যালেরিয়া রোগ বীজাণু হইতে আত্মরক্ষার উপায় বাহির করিতে পারিবে। সমস্ত মশাই পচা জলের সন্নিকটে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ পত্রের নিম্নে একসঙ্গে বহু সংখ্যক ডিম প্রসব করে। সেই ডিম দুই এক দিন জলে পড়িয়া শূককীট অবস্থায় (Larva) পরিণত হয়। এই শূককীট দেখিয়াও মশকের শ্রেণী নির্ধারণ করা যায়। অ্যানোফেলিসের শূককীট জলের তলদেশে উহার সহিত সমান্তরাল করিয়া দেহ বিন্যস্ত করে, আর কিউলেক্স-শূককীট তাহার মস্তক জলের নিম্নদেশে নিচু করিয়া ঝুলাইয়া রাখে। শূককীটের পুচ্ছদেশে একটি **বায়ুকূপ** (Air-tube) বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম শুঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে। মধ্যে মধ্যে সেই পুচ্ছদেশ দিয়া বায়ুগ্রহণ করে। এই বায়ুকূপ সকল সময় আচ্ছাদিত থাকে ও শূক কীট প্রয়োজন মত পুচ্ছ উত্তোলন করিলেই আবরণ খুলিয়া যায়, তখনই ইহারা বায়ুগ্রহণ করে। সর্বাঙ্গ রোমে আবৃত এই শূককীটকে শুঁয়া পোকা বলিয়া মনে হয়। ইহারা জলে ছিটকাইতে ছিটকাইতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া বেড়ায়। যেইখানেই অগভীর জলপূর্ণ খাত থাকে সেইখানেই ইহারা জন্মায়। চৌবাচ্চা বা কলসীতে দু এক দিন জল সঞ্চিত থাকিলেই মশা সেইখানে ডিম পাড়ে। এবং ক্রমে তাহা হইতে শূককীট জন্মায়। শূককীট মাছের প্রিয় খাদ্য।

ইহার পরেই ইহাদের তৃতীয় অবস্থা মূককীট। এই অবস্থায় ইহাদের আকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়। দেহ প্রায় লোমশূন্য ও কুণ্ডলাকৃতি হইয়া মস্তক ও পুচ্ছ পরস্পর প্রায় স্পর্শ করিয়া থাকে। ক্রমে শূককীট হইতে একদিন পূর্ণাবয়ব মশক নির্গত হয়। চিত্রে ১, ২ ইত্যাদি অ্যানোফিলিস এবং ১ক ২ক ইত্যাদি কিউলেক্স।

জলে কেরোসিন ছড়াইলে ইহার উপর যে পাতলা সর পড়ে তাহাতে মশা ডিম পাড়িতে পারে না।

প্রজাপতি

প্রজাপতি এক প্রকার পতঙ্গ। সৌন্দর্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে পতঙ্গের মধ্যে এরূপ প্রাণী নাই বলিলেও চলে। তবে ইহাদের মধ্যে যে কদাকার প্রজাপতিও নাই, এমন নহে।

কোন কোন প্রজাপতি দিনেব বেলা চরিয়া বেড়ায় এবং কোন কোন গুলি রাত্রে বাহির হয়। রাত্রে যেগুলি বাহির হয় তাহাদের নাম **মথ** (Moth) এবং যাহারা দিনের বেলায় বাহিব হয় তাহাদিগকেই আমরা প্রকৃত **প্রজাপতি** (Butterfly) বলি। প্রজাপতিই দেখিতে সুন্দর, কিন্তু মথ দেখিলে ইহাদিগকে হিংস্র প্রাণী বলিয়া মনে হয়। ইহাবা দেখিতে সুন্দর নহে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ। প্রজাপতি বা মথেব দেহ এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থে আবৃত; ঐ সূক্ষ্ম পদার্থগুলি কতকটা ফুলের রেণুব মত কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রেব সাহায্যে ইহাদিগকে আঁশেব মত দেখায়।

অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায ইহাদেব দেহে তিনটি ভাগ, মস্তক, বক্ষ ও উদর। মাথায় এক জোড়া **শুঁয়া,** এই শুঁযাব অগ্রভাগ ভোঁতা। কাজেই ইহা দ্বাবা কোন প্রাণীকে ইহাবা আক্রমণ কবে না। শুঁযার পাশে দুইটি **পুঞ্জাক্ষি**. পিঠে দুই জোড়া ডানা, এক জোড়া বড ও এক জোড়া ছোট। ছোটগুলি পেটের দিকে ও বড়গুলি মাথার দিকে থাকে। বসিলে এক সঙ্গে এক এক জোড়া জুড়িয়া একত্রিত হয়। পুরুষ প্রজাপতির দেহে গন্ধ পাওয়া যায।

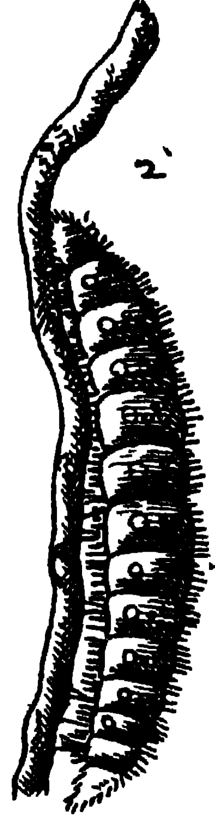
প্রজাপতির একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম হয়—ডিম হইতে ফুটিয়া ইহারা শুঁয়া পোকার মত গাছের পাতায় পাতায় ঘুরিয়া আহার্য সংগ্রহ করে। ডিম ফুটিতে দশ বার দিন লাগে। ডিম হইতে বাহির হইয়া আপনাপন ডিমের খোসা খাইয়া ফেলে। শুঁয়া পোকার অবস্থায় ইহাদের ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক। এই অবস্থাতেই দুই চারিবাব খোলস ত্যাগ করিয়া ইহারা পুনরায় দেহের চারিদিকে এক আববণ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। সে সময় কিছু খায় না, ইহাই হইল **গুটি** (Cocoon)। এই অবস্থার নাম **মুক-**





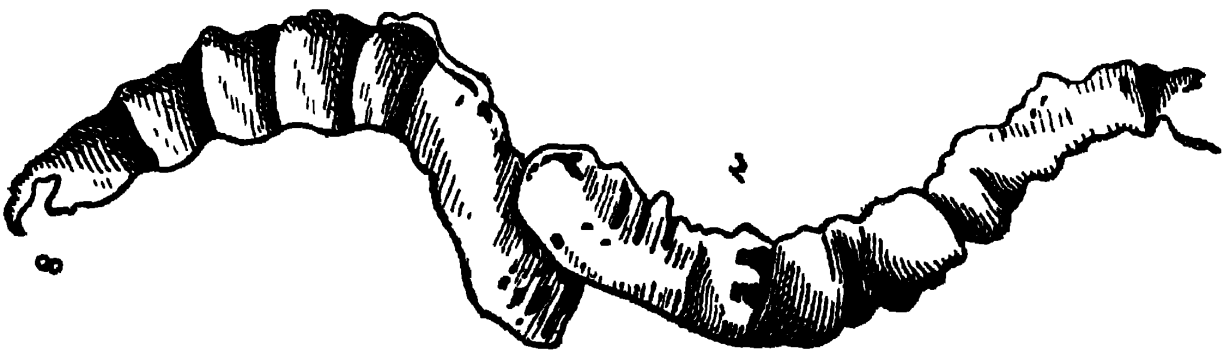
১৬নং চিত্র—প্রজাপতির ডিম

কীট (Pupa)। এই গুটি হইতে কয়েক দিন পরে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। শুঁয়া পোকা হইতে গুটি এবং গুটি হইতে প্রজাপতির জন্ম এক অদ্ভুত ব্যাপার। কোন অবস্থার সহিত কোন অবস্থার সম্বন্ধ নাই। এক অবস্থাব জীবেব সহিত অন্য অবস্থার জীবের কোন সামঞ্জস্য নাই বলিলেই চলে অথচ ইহারা একই জীব।



১৭নং চিত্র
প্রজাপতির শূককীট

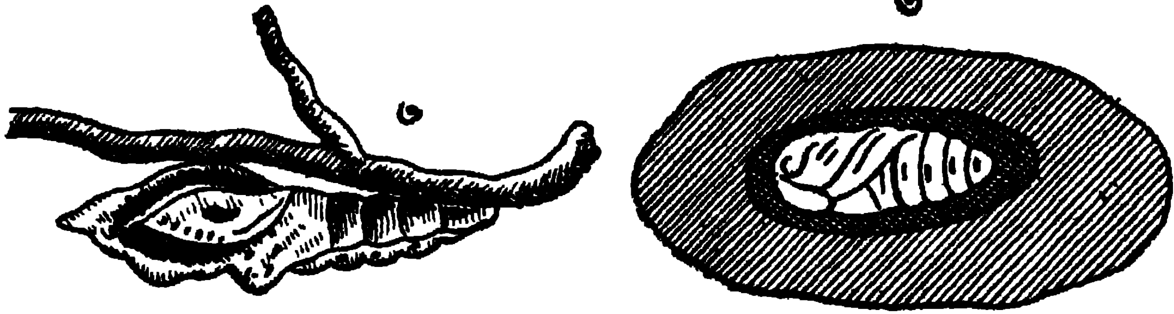
গুটি হইতে রেশম, এণ্ডি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, ইহা তোমাদেব জানা আছে; কিন্তু কেবলমাত্র মথের গুটি হইতেই ঐ সকল বেশম পাওয়া যায়। সেই জন্য আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে রেশম প্রজাপতিব চাষ হয়। যখন খাওয়া দাওয়া বন্ধ কবিয়া ইহাবা গুটিব মধ্যে অবস্থান কবে সেই সময দেহ হইতে বেশমের সূতা বাহিব কবিয়া গায়ে জড়াইতে থাকে। চাব পাঁচ দিনের মধ্যে এই গুটি আমড়ার মত বড হয এবং এক একটি গুটি হইতে প্রায চাবি পাঁচ শত গজ সূতা বাহিব হয। এই গুটি হইতে বাহিব হইবাব সময ইহাবা গুটি কাটিয়া বাহির হয়, ইহাতে অনেক খানি বেশম নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া বেশম



১৮নং চিত্র—দুইটি শূককীট

চাষীরা গুটি হইতে মথ বাহির হইবাব আগেই গুটির উপর গবম জল ঢালিয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

রেশম পতঙ্গের কতকগুলি বৎসরে একবার ডিম পাড়ে, কতকগুলি বৎসরে বহুবার ডিম পাড়ে। মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় প্রকার রেশম গুটির চাষই অধিক।



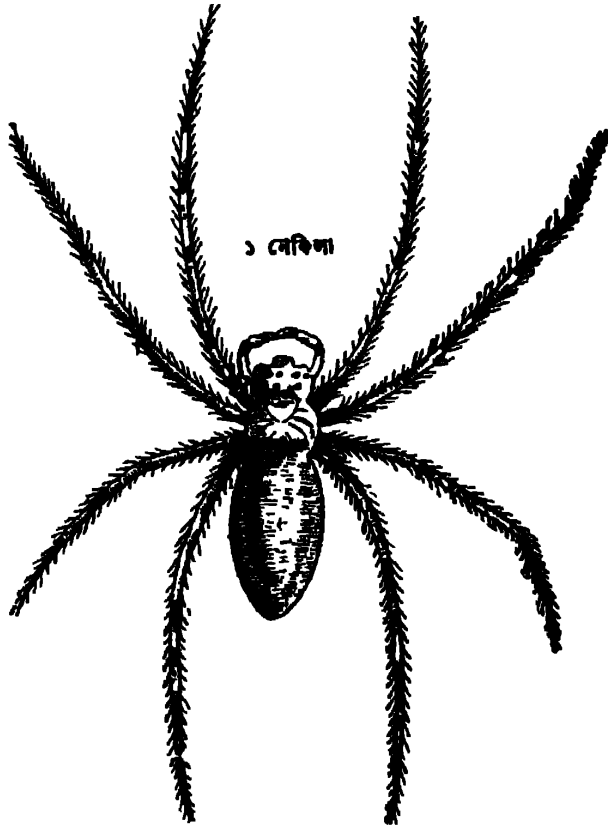
১৯নং চিত্র—গুটিপোকা ২০নং—গুটিপোকার ভিতর

চিত্রে এক এক করিয়া ডিম হইতে গুটি পর্যন্ত অবস্থার বিবর্তন দেখান হইল। রঙিন চিত্রখানি হইতে প্রজাপতির সৌন্দর্য কিরূপ মনোরম তাহা বুঝিতে পারিবে।

মাকড়সা

মাকড়সার অধ্যবসায়ের কথা তোমরা নিশ্চয় শুনিয়াছ। একদিন এই মাকড়সার অধ্যবসায় দেখিয়া রবার্ট ব্রুস পুনরুদ্যমে আপনার হৃত রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধে লাগিয়া যান। অন্যান্য অনেক পতঙ্গ ষট্পদ, কিন্তু মাকড়সা অষ্টপদ। ইহার শুণ্ড (Antenna) বা পক্ষ নাই, কিন্তু ইহার মুখাগ্র হইতে চারিটি সূত্রাকার প্রত্যঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায়। ইহাদের দুইটির দ্বারা মাকড়সা হাতের কাজ চালায় এবং অপর দুইটির সাহায্যে তাহার জালে আবদ্ধ পতঙ্গের প্রাণবধ করে। শেষোক্ত প্রত্যঙ্গ দুইটিকে আমরা মাকড়সার দন্ত বলিতে পারি। এই দন্তের সহিত উহার শরীরস্থ **বিষস্থালীর** সংযোগ আছে, এই দন্ত সাহায্যেই ইহারা পতঙ্গের দেহরস শোষণ করে। সাধারণত পতঙ্গের দুইটি পুঞ্জাক্ষি দেখা যায়, কিন্তু মাকড়সার আটটি সাধারণ চক্ষু। ইহার দেহের গঠনও পতঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইহার কণ্ঠদেশ নাই, মস্তক

ও বক্ষ যেন একত্র হইযা গিয়াছে। বক্ষদেশ হইতেই আটটি পা নির্গত হইযাছে। প্রত্যেক পায়ে সাতটি কবিযা গাঁইট। মাকডসাব একটি উদব আছে তাহা তোমবা জান। ইহাদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম দ্বাবা আবৃত।



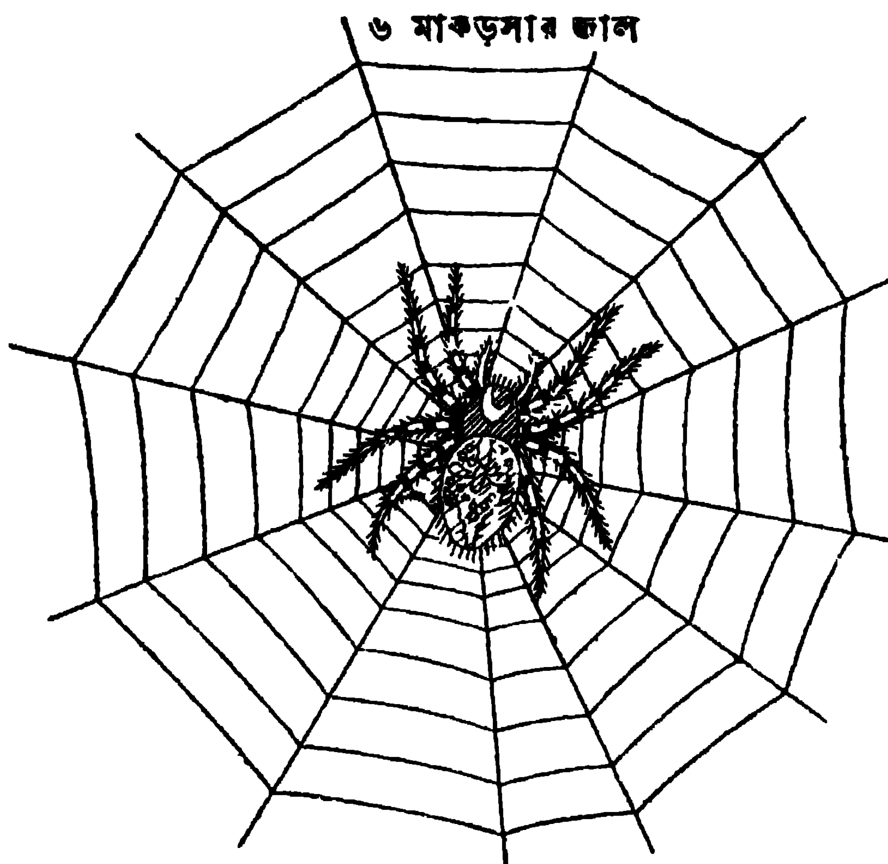
২১নং চিত্র—মাকড়সা



২২নং চিত্র—মাকডসার দাঁত

ইহাবা জালেব ন্যায় ফাঁদ প্রস্তুত কবিযা কিরূপে কীট পতঙ্গকে ফাঁদে ফেলিযা বধ কবে তাহা তোমবা অনেকে দেখিযাছ। ইহাদেব পেটেব নিচে এক প্রকাব বসস্থালী আছে। যখনই ইচ্ছা হয মাকডসা তখনই উহা হইতে বস নিঃসবণ কবিতে পাবে। এই বস নির্গত হইবাব সময জলের মত বেশ পাতলা থাকে কিন্তু বাযুস্পর্শে অল্পক্ষণেই উহা গঁদেব মত শুকাইয়া যায। মাকডসা প্রথমে এক ফোঁটা বস নির্গত করিয়া কোন স্থানে আটকাইয়া দেয পরে ঘুবিয়া ঘুবিযা মুখেব ঐ বস আবও কয়েকটি স্থানে লাগাইয়া জাল বুনে। এই জাল কিরূপ সূক্ষ্ম তাহা তোমবা জান। মাকড়সার জালনির্মাণ কার্যে নিপুণতা এবং সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই জাল প্রস্তুত করিবাব সময় সে ইতস্তত লাফাইয়া এবং একটি সূক্ষ্ম সূত্রে ভর করিয়া ঝুলিয়া জালটি শক্ত হইয়াছে

কিনা পরীক্ষা করে। ইহার নাভী হইতে এইরূপে রস নিঃসৃত হয় বলিয়াই মাকড়সার আর এক নাম ঊর্ণনাভ। জালের কেন্দ্রের নিকটে আটা তত থাকেনা। কিন্তু বাহিরের অংশ বেশ আটাল, এই অংশই যথার্থ পতঙ্গ ধরিবার ফাঁদ। মশা, মাছি বা অন্য কোনও পতঙ্গ এই জালে পড়িলে প্রথমেই তাহার পক্ষ আটায় আটকাইয়া যায়। মাকড়সা কিন্তু সেই সময় জালের উপর থাকে না,



২৩নং চিত্র—মাকড়সার জাল

পাছে তাহার শিকারগুলি তাহাকে দেখিলে দূর হইতে পলাইয়া যায়, সেজন্য মাকড়সা নিকটবর্তী কোন স্থানে ঐ জালের সূতা ধরিয়া লুকাইয়া থাকে। ঐ সূতায় টান পড়িলে জালে শিকার পড়িয়াছে স্থির করিয়া বাহিরে আসে এবং দন্ত দিয়া কাটিয়া শিকারকে খণ্ড খণ্ড করে এবং বিষস্থালীর বিষ উদ্গীরণ করিয়া শিকারটিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে। সেই মৃত শিকারকে লইয়া একটু আড়ালে

গিয়া মাকড়সা তাহার দেহরস শোষণ করে ও ক্ষুন্নিবৃত্তি না হইলে অন্য শিকারের জন্য অপেক্ষা করে। এক শিকার শেষ না হইতে যদি অন্য শিকার আসিয়া পড়ে তবে ইহা প্রথমটিকে অচৈতন্য করিয়া ফেলিয়া দিয়া দ্বিতীয়টিকে আক্রমণ করিতে যায়। আহার শেষ হইলে অনেক সময় শিকারের দেহাবশেষ তাহার জালের উপরেই ফেলিয়া দেয়। মাকড়সার জাল পর্যবেক্ষণ করিলে তাহাতে মাছি ও অন্যান্য পতঙ্গের দেহাবশেষ দেখিতে পাইবে। পূর্বে প্রজাপতি হইতে সম্ভূত যে রেশম সূতার কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মাকড়সার সূতার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইহারা ভীষণ হিংসাপরায়ণ, একা বাস করিতে ভালবাসে। স্বজাতীয় অন্য আর একটিকে দেখিলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মাকড়সার সূতা বহুদূর বিস্তৃত হয়।

মাকড়সার শ্বাসপ্রণালী পতঙ্গের শ্বাসপ্রণালী হইতে ভিন্ন। ইহার দেহে ফুস্‌ফুস্‌ না থাকিলেও তাহারই অনুরূপ বহুস্তর-যুক্ত যন্ত্র আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই যন্ত্রের নাম দিয়াছেন **বায়ু-গ্রন্থ** (Lung book)। দেহের উপরের কয়েকটি ছিদ্রের সহিত এই যন্ত্র সংযুক্ত। বায়ুনল-পথে ও ঐ যন্ত্র সাহায্যে ইহার শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ইহারা সমাজ বদ্ধ ভাবে বাস করিতে চায় না। স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সা অপেক্ষা আকৃতিতে বড় ও অধিক বলশালী। উহারা এক সঙ্গে অনেকগুলি ডিম প্রসব করে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার সূক্ষ্মসূত্রে গঠিত থালি ব্যবহার করে। এই থালি তোমরা দেখিয়া থাকিবে। উহার নিম্নদিকে একটি ঢাক্‌নিও থাকে। অনেক সময় মাকড়সাকে ঐ থালি পেটের নিচে লইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। পতঙ্গের মত ইহার দেহের বিভিন্ন ক্রম বিকাশ হয় না। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইবার পরেও মাকড়সা দুই তিন বার খোলস ত্যাগ করে।

মাকড়সা শুধু যে স্থলে ভ্রমণ করে, তাহা নহে। জলচর মাকড়সাও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার স্থলচারী অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির নানা শ্রেণীর মাকড়সাও

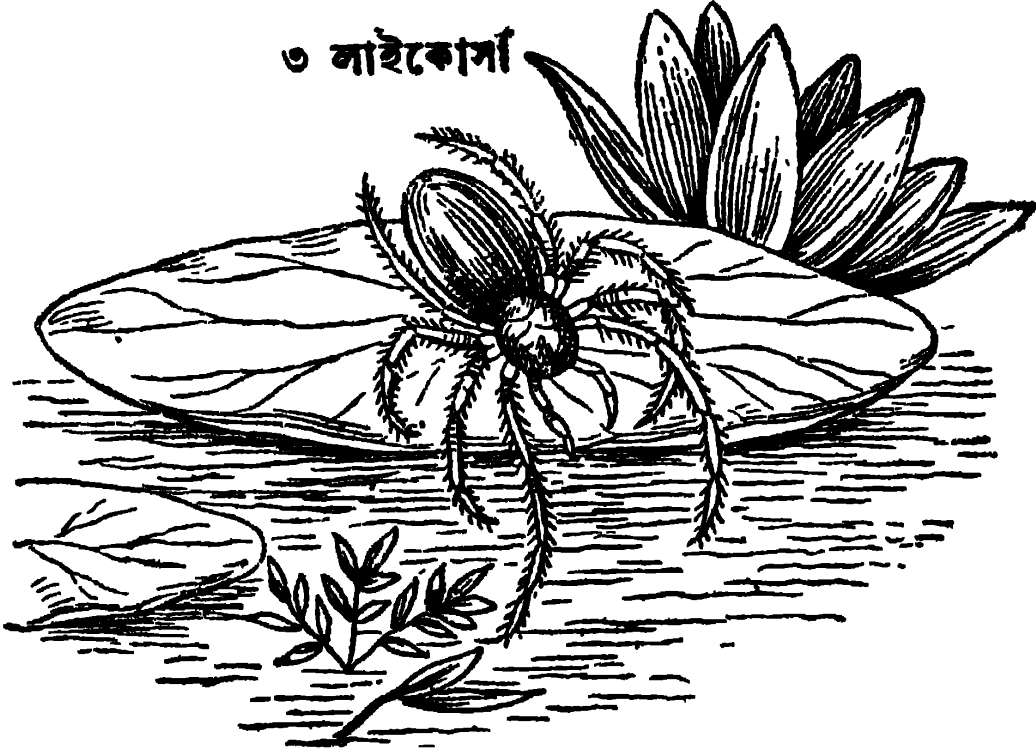
আছে। দেহের আকৃতি বর্ণ ইত্যাদি প্রভেদে ইহারা নানা জাতির হইয়া থাকে।

কতকগুলি মাকড়সা আছে, তাহাদের দেহের আকার দেখিলে ভয়ঙ্কর



২৪নং চিত্র—ডিমের থালিসহ স্ত্রী মাকড়সা

বলিয়া মনে হয়। শোনা যায় ইহারা মানুষের গায়ের ঘা চাটিলে ঘাগুলি বিষাক্ত



২৫নং চিত্র—জলচর মাকড়সা

হইয়া উঠে। স্বজাতীয়ের মধ্যে অত্যধিক হিংসাপরায়ণ হইলেও মানুষকে

দেখিলে ইহারা দূরে পলাইয়া যায়। পিপীলিকা মানুষকে কামড়াইয়া থাকে, কিন্তু মানুষকে মাকড়সা কামড়াইতে দেখা যায় না। কতকগুলি মাকড়সার দেহ বেঁটে হইলেও পা গুলি অপেক্ষাকৃত বড় এবং অধিক লোমযুক্ত।

জলচর মাকড়সাগুলি **লাইকোসা** (Licosa) নামে অভিহিত হয়। তদ্ভিন্ন **এপিরা** (Apira), **মিমুমেনা** প্রভৃতি আরও বহু জাতীয় মাকড়সা আছে।

সংক্ষেপ :—পিপীলিকার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত, ইহাদের ছয়টি পা। ইহারা সমাজবদ্ধ-ভাবে থাকে তাই স্ত্রী পুরুষ ও শ্রমিক বিভাগ আছে। ইহাদের সকলে শব্দ প্রায় করিতে পারে না। পুরুষ ও রাণীর দুই জোড়া পাতলা ডানা আছে। স্ত্রীগুলি আকারে সর্বাপেক্ষা বড়, পুরুষগুলি সকলের ছোট। মাটিতে বা গাছের কোটরে বাস করে। প্রায় ২০ বৎসর বাচে। মৌমাছির তিনটি শ্রেণী—রাণী সর্বাপেক্ষা লম্বা এবং শ্রমিক সর্বাপেক্ষা ছোট। তিন বৎসরের অধিক বাঁচে না। পৌষ্টিক নালীর একাংশে মধু সঞ্চয় থলী। আত্মরক্ষার জন্য বা শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য শ্রমিকদের হুল আছে। রাণীর হুল ছোট, পুরুষের হুল নাই। ইহাদেরও ছয়টি পা। মশা দুই জাতীয় অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স, অ্যানোফিলিসের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে স্ত্রীগুলি ভয়ঙ্কর এবং রক্ত পিপাসু। ইহারা রাত্রে বাহির হয়। অ্যানোফিলিস আসনের সহিত আপন দেহ ৪৫° ডিগ্রী কোণ করিয়া বসে। প্রজাপতির সর্বদেহে ফুলের রেণুর ন্যায় এক প্রকার পদার্থ থাকে। দেহ তিন ভাগে বিভক্ত, ছয়টি পা, দুই জোড়া পুঞ্জাক্ষি, মুখের সম্মুখে শুঁয়া। ইহারা দুই জাতীয়—প্রজাপতি ও মথ। মথের শুঁয়া সরু কিন্তু প্রজাপতির শুঁয়া মোটা কাহাকেও কামড়াইতে পারে না। মাকড়সার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত, মাথা ও পেট। ইহাদের আটটি পা, চারি জোড়া সরল চক্ষু। ইহারা বড় হিংস্র, সমাজ বদ্ধভাবে বাস করিতে চায় না। যে জালে ইহারা শিকার ধরে তাহা ইহাদের লালা দ্বারা প্রস্তুত।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। কেঁচো কোন্ পর্বভুক্ত জীব? ইহার খাদ্য এবং বাসস্থান সম্বন্ধে কি জান লিখ। (To which phylum does earthworm belong? Write what you know of its food and where it lives)

২। কেঁচোর বহির্দেহের বিবরণ দাও। (Describe the different parts of the body of an earthworm)

৩। চিত্র সাহায্যে কেঁচোর দেহের ভিতরের শারীর যন্ত্রগুলির পরিচয় দাও। (Show by a diargram the location of different organs of an earthworm in its body.)

৪। কিউটিকল, টিপলোসোল ও কিটা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (Write short notes on —Cuticle, typhlosol and chæta.)

৫। পিপীলিকার জীবন বৃত্তান্ত লিখ। (Narrate the life history of an ant.)

৬। পিপীলিকার সামাজিক জীবন কেমন লিখ। (Write how the social life of an ant is.)

৭। পিপীলিকার দেহের কি কি বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (Write short notes on the different parts of the body of an ant.)

৮। মৌমাছির বহির্গঠন ও পৌষ্টিক নালী বর্ণনা কর। (Describe the external feature and alimentary canal of a bee.)

৯। শ্রমিক এবং রাণী মৌমাছির কি কাজ? (What are the functions of a worker and a queen bee?)

১০। পিপীলিকা ও মৌমাছির তুলনা কর। (Compare an ant with a bee.)

১১। মশার জীবনী লিখ। (Describe the life history of a mosquito)

১২। দুই প্রকার মশার তুলনা কর। (Compare two kinds of mosquitos.)

১৩। প্রজাপতির বিবর্তন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (Write the different stages of a butterfly or moth.)

১৪। ব্যবসার দিক দিয়া রেশম পোকার উপকারিতা কি? কিরূপে রেশম পাওয়া যায় লিখ। (Write down the commercial utility of a silk worm and how we get silk.)

১৫। মাকড়সার জীবনী লিখ। (Write the life history of a spider.)

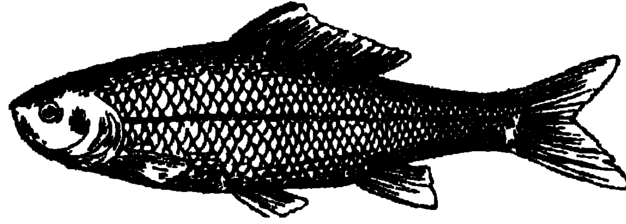
১৬। মাকড়সা কিরূপে শিকার ধরে লিখ। (Write how the spider catch their victims.)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাছ ও ব্যাঙ

মাছ

জল, বায়ু এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাব প্রভাব প্রত্যেক প্রাণীর আকৃতি ও প্রকৃতিব উপব দেখা দেয, এবং সেইরূপ পাবিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিবাব পক্ষে যাহাতে সুবিধা হয সেজন্য ভগবান প্রত্যেক প্রাণীব দেহগঠনও বিভিন্ন কবিযাছেন। ষ্টীমাব, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি জলযানগুলি গঠন কবিবাব সময়

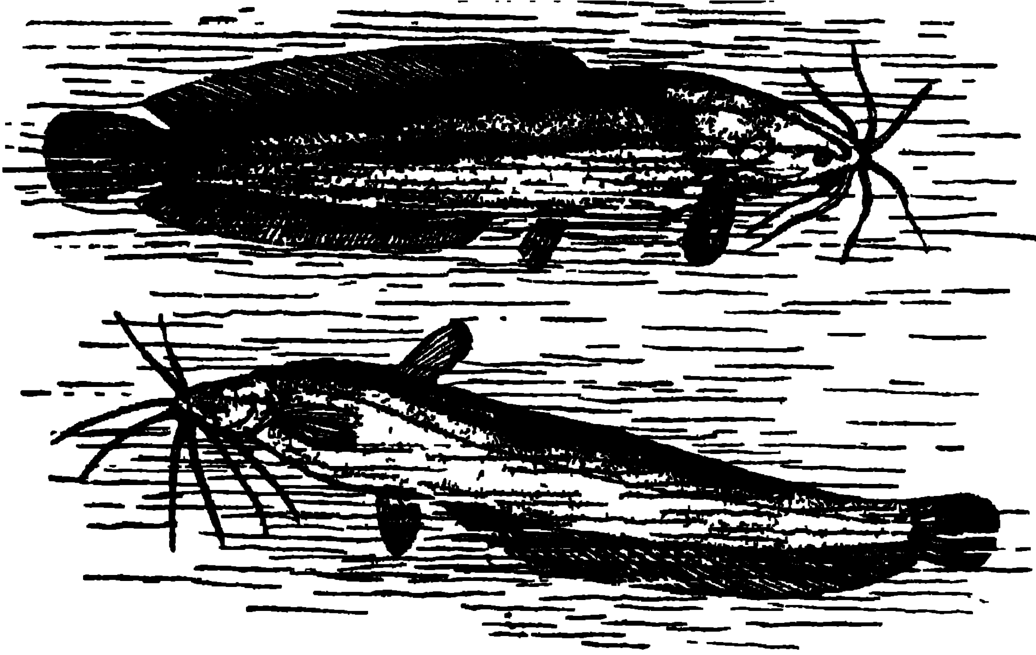


২৬নং চিত্র—মাছ

আমবা ইহাদেব আকাব রেল গাড়ীর বা ঘোড়াব গাড়ীব চতুষ্কোণ কামরাব মত গঠন করি না। একটি মাঝা মাঝি কাটা পটোলেব মত উহাদেব খোল নির্মাণ কবা হয। তাহাতে সুবিধা এই হয যে চলিবাব কালে জল ইহাদেব গতি পথে অধিক বাধা দিতে পাবে না। তোমবা দেখিযাছ প্রত্যেক মাছেব দেহ ঠিক ঐরূপ ভাবে গঠিত—দুইদিক সরু এবং মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা। ইহাতে, জলে সাঁতার দিবাব পক্ষে ইহারা অনেক সুবিধা পায। পাখীদেব যেমন পাখা এবং পালক থাকে, স্তন্য-পাযী জীবদেব যেমন লোম থাকে, মাছ মাত্রেবই তেমনই জোড়া পাখনা আছে এবং প্রায সর্ব্বলেব দেহে আঁশ আছে। ইহাবা মেরুদণ্ডী প্রাণীদেব নিম্নতম শ্রেণীব জীব।

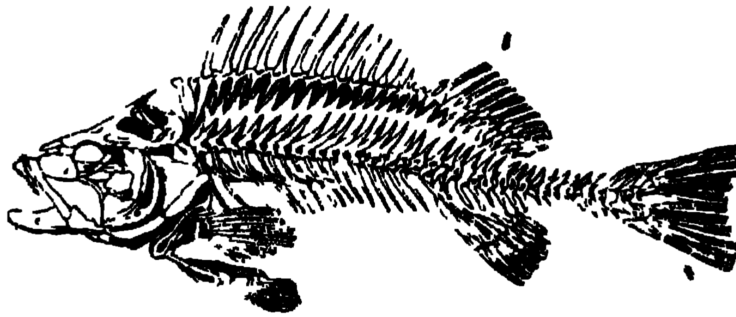
সকল মাছেব দেহে এক পিচ্ছল পদার্থ মাখান আছে বলিয়া মনে হয়; সেজন্য ইহাদেব দেহ অতিশয় পিচ্ছল, ধরিতে গেলে পিছলাইয়া যায। ইহাতে তাহাদের আততায়ীর হাত হইতে বক্ষা পাইবাব বিশেষ সুবিধা হয়। ট্যাংরা, মাগুর,

শিঙ্গি প্রভৃতি কযেকটি মাছ ছাড়া সকল মাছেব শবীব আঁশে ঢাকা। যাহাদেব আঁশ নাই সে সকল মাছেব লম্বা লম্বা গোঁফ দেখা যায়, অবশ্য বড হইলে রুই



২৭ নং চিত্র—শিঙি মাছ ও মাগুব মাছ

মাছেবও গোঁফ জন্মাইতে দেখা যায়। সকল মাছেব দেহ একটি প্রধান হাড দ্বাবা গঠিত—উহাই মাছেব মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড হইতে কতগুলি লম্বা লম্বা কাঁটা বাহিব হইযা মাছেব দেহেব কাঠাম প্রস্তুত করে এবং তাহাতেই মাছেব বিভিন্ন আকাব

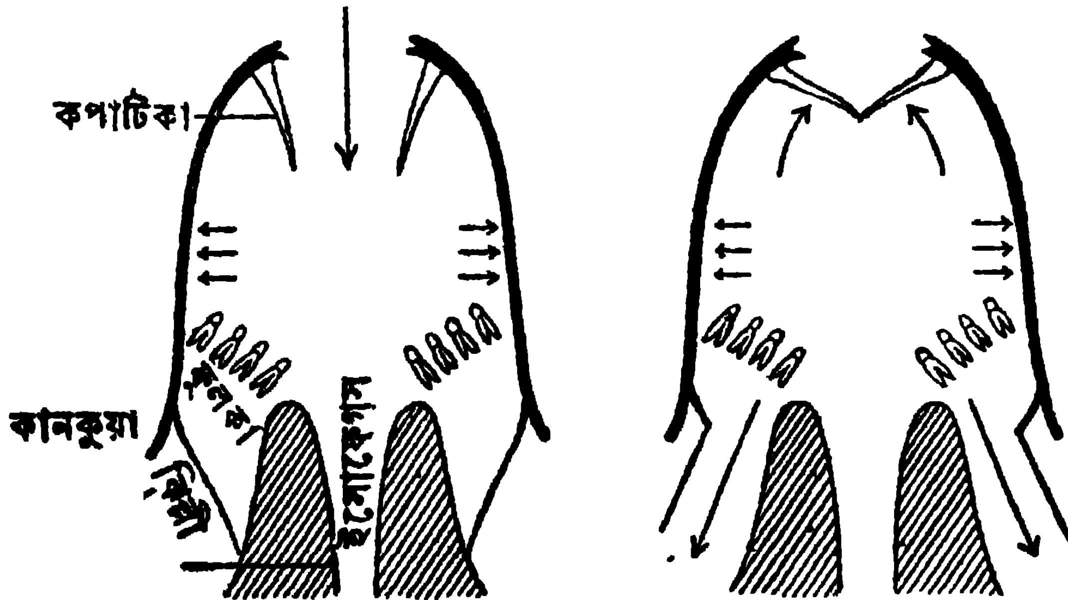


২৮ নং চিত্র—মাছেব হাড

বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট থাকে। পেটেব কাঠাম ঠিক করিবার জন্য যে বড বড কাঁটাগুলি আছে তাহাদিগকে মাছেব জঙ্ঘাস্থি বলা চলে। বড মাছেব পেটি খাইবার সময় তোমরা যে বড বড় কাঁটা ফেলিয়া দাও তাহাই মাছেব জঙ্ঘাস্থি। মাছেব

কানকোর দুই পাশে দুইটি, বুকের দুই পাশে দুইটি, পেটের তলায় দুইপাশে দুইটি, সমস্ত পিঠের উপর লম্বা একটি এবং লেজে অপেক্ষাকৃত আয়তনে বড় একটি করিয়া **পাখ্‌না** (Wing) আছে। এই পাখনার সাহায্যেই ইহারা জলে সাঁতার দেয় এবং আপনাদের গতি পথ ঠিক রাখিতে পারে। ইহাই মাছের হাত পা বলিলে চলে। লেজের পাখনাটি নৌকার হালের সঙ্গে তুলনীয়। মাছের কান্‌কোর নিচে **ফুল্‌কা** (Gill) থাকে, সেই ফুলকার সাহায্যে ইহারা অক্সিজেন গ্রহণ করে। ফুলকাকে ঢাকা দিয়া ইহার উপর একটি শক্ত আবরণ থাকে তাহাকে মাছের **কান্‌কুয়া** (Operculum) বলে। ইহাদের নাক আছে বটে কিন্তু নাক দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলে না, তাহার দ্বারা ইহারা ঘ্রাণ লইয়া থাকে। এই জন্য জল হইতে তুলিলে মাছ বেশীক্ষণ বাঁচে না। ইহাদের চোখ আছে বটে কিন্তু চোখের পাতা নাই বলিয়া ইহাদিগের ঘুমন্ত অবস্থায় চোখ খোলা থাকে।

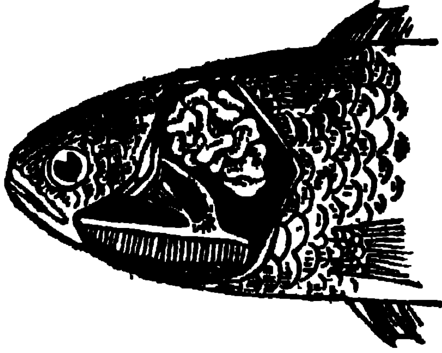
ইহারা হাঁ করিয়া মুখে জল টানিয়া লয়, পরে চোয়াল তুলিয়া ধরে। ফলে জলে চাপ লাগে। সেই চাপে খানিকটা জল ফুলকার মধ্যে চলিয়া যায়। জলের



২৯নং চিত্র—মাছের শ্বাসক্রিয়া

অক্সিজেন ফুলকাস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা নালীর ভিতর প্রবেশ করে। এইবার

মুখ বন্ধ করিয়া দিলে জলে আরও বেশী চাপ পড়ে। কাজেই তখন কানকুয়া খুলিয়া যায় সেই পথে জল বাহির হইয়া যায়। হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভাসিয়া এইরূপ ভাবে অক্সিজেন গ্রহণ করে। ইহাকেই মাছের খাবি খাওয়া বলে। ভেট্‌কী মাছের কানকুয়াতে একটি করাত থাকে। কানকয়ার নিচে উহাদের অত্যাবশ্যকীয় শ্বাস-যন্ত্র ফুলকা থাকে বলিয়া তাহা সুরক্ষিত রাখিবার জন্য কানকুয়া দুইটি শক্ত চেপ্টা হাড়ে গঠিত। বলিতে গেলে সকল মাছের মাথাটিই এরূপ শক্ত হাড় দ্বারা গঠিত। মাছের মুড়া খাইবার সময় ইহাদের মাথায় ঘি কোথায় থাকে দেখিয়াছ। ইহাই মাছের মস্তিষ্ক। মাথায় একটি প্রকোষ্ঠে ইহা রক্ষিত হয়। আরও অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ মাথায় আছে দেখিয়া থাকিবে। তাহাতে অন্যান্য শরীর যন্ত্র রক্ষিত হয়।



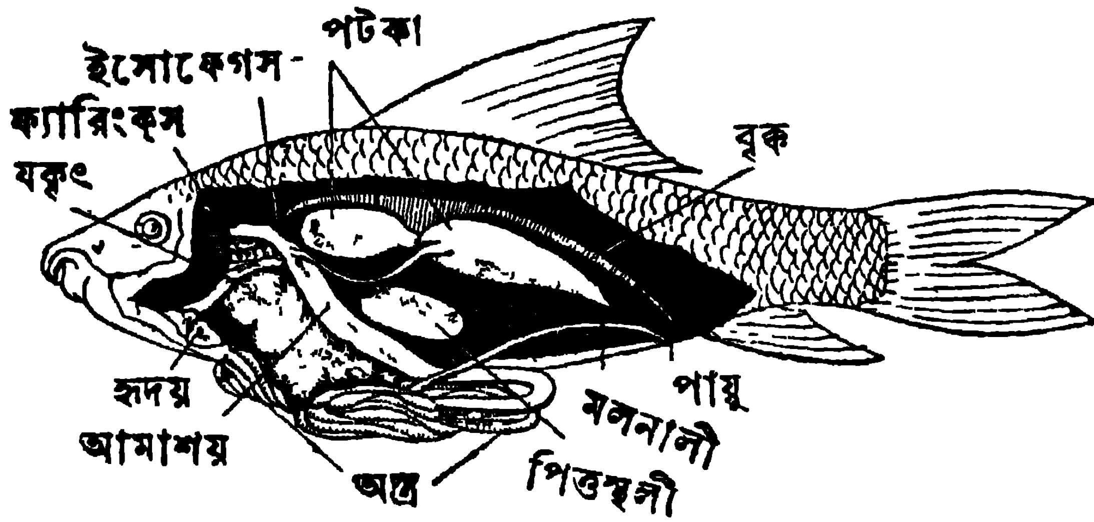
৩০ নং চিত্র—পোনামাছের ফুলকা

মাছের গলায় **ফ্যারিংস** আছে। সেইখানে দাঁতের ন্যায় এক রকম পেষণ যন্ত্র আছে তাহা দিয়া মাছ খাদ্য চিবাইয়া থাকে। বোয়াল বা ঐ জাতীয় মাছের দাঁত কিন্তু চোয়ালের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। বোয়াল, প্রভৃতি কতকগুলি মাছের মুখবিবর অত্যন্ত প্রশস্ত। আবার কালবোস মাছের মুখ দেহের তুলনায় ছোট। কালবোস বা রুই জাতীয় মাছের মুখের সামনে দুইটি মাংসের গদি থাকে উহাদিগকে উহাদের অধরোষ্ঠ বলিলে চলে। বঁড়শীতে মাছ ধরিলে দেখিবে অধিকাংশ মাছের ঠিক ঐ গদির নিচে একটি নরম জায়গায় বঁড়শী আটকাইয়া থাকে।

ফ্যারিংস পার হইয়া মাছের দীর্ঘ পৌষ্টিক নালী কুণ্ডলীকৃত হইয়া পেটে থাকে ; ইহার অপর প্রান্তই ইহাদের মল নালী। ফ্যারিংসের পর যথাক্রমে **ইসোফেগাস, আমাশয়** বা **পাকস্থলী ও অন্ত্র।** বস্তুত সকলগুলিই পৌষ্টিক নালীর অংশ মাত্র। পাকস্থলীকে জড়াইয়া **যকৃৎ** থাকে। এই যকৃতই মাছের মেটুলি। ইহাদের পিত্ত-

থলীটির মুখ সরু এবং পিছন দিক মোটা যেন একটি গদা। ইহা সর্বদাই একপ্রকার সবুজবর্ণ তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। আবরণটি অতিশয় পাতলা বলিয়া একটু নাড়িলে ইহা গলিয়া যায় এবং উক্ত তরল পদার্থ যদি মাছে পড়ে তবে মাছ তিক্ত হইয়া যায়। তাই সাবধানে মাছ কুটিতে হয় যেন থলিটি গলিয়া না যায়। যকৃৎ ও পিত্তথলী উহাদের হজমী যন্ত্র।

মাছের পেটে আর একটি যন্ত্র আছে। তাহা তোমাদের সকলের পরিচিত **পটকা**। পটকার দুইটি কক্ষ। দুইটি কক্ষ একত্র হইলে ইহাও একটি গদার



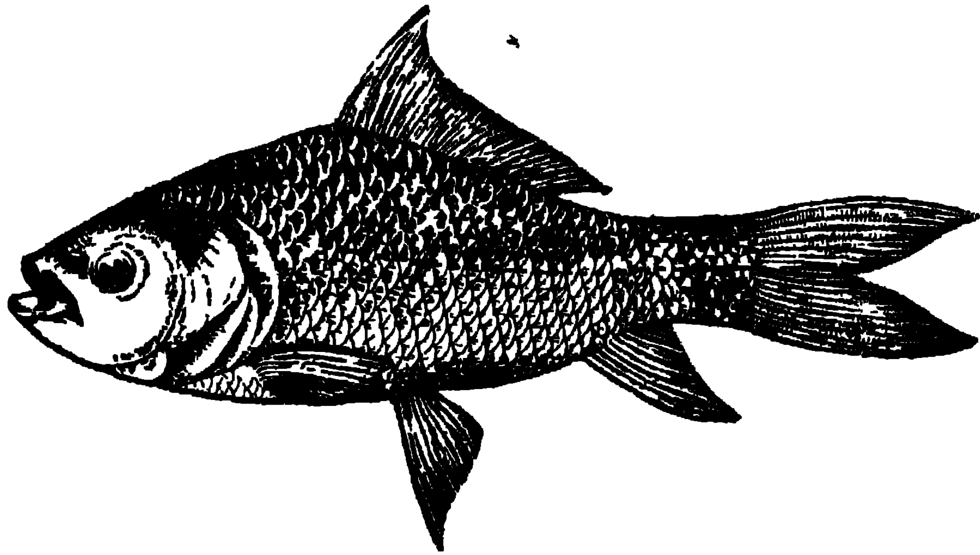
৩১ নং চিত্র -মাছের পৌষ্টিক নালী

মত দেখায়—মাঝখানটি যেন কোন কারণে চুপসিয়া গিয়াছে। মাছের পটকায় যখন বাতাস ভরা থাকে তখন ইহাকে ফোটাইয়া তোমরা অনেকে কৌতুক কর। মাছ এই পটকা ইচ্ছামত ফুলাইয়া ইহাতে বাতাস ভরিতে পারে। তাহাতে ইহাদের ভাসিবার সুবিধা হয়।

রক্তসঞ্চালন প্রণালী (Circulatory system):—অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ন্যায় ইহাদের রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র আছে। ফুলকা দুইটির মাঝে একটু নিচে হৃদয়। হৃদয়ের প্রধান দুইটি ভাগ **অলিন্দ** (Auricle) ও **নিলয়** (Ventricle)। হৃদয় হইতে দূষিত রক্ত, **শিরা** (Vein) দিয়া ফুলকায় নীত হয়। সেখানে ফুলকা দ্বারা জল হইতে অক্সিজেনের সাহায্যে ঐ দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ

হইয়া সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। আবার সমস্ত শরীরের দূষিত রক্ত **ধমনী** (Artery) দ্বারা বাহিত হইয়া হৃদয়ে পৌঁছায়। পুনরায় ঐ রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া দেহ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। হৃদয় সঙ্কুচিত হইলে রক্ত বাহিরে যায় এবং বিস্ফারিত হইলে বাহিরের রক্ত হৃদয়ে ছুটিয়া আসে। মাছের রক্ত লাল—ইহাতে নিউ-ক্লিয়াসযুক্ত শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা দুই-ই আছে।

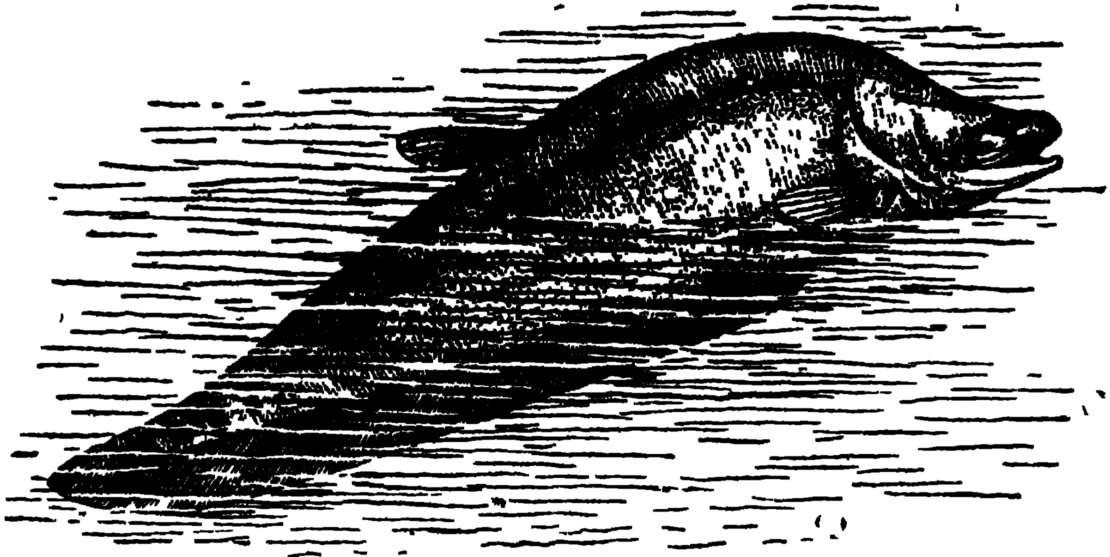
মাছ জলের শেওলা ও ছোট ছোট পোকা মাকড় এবং ছোট ছোট মাছ খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। অনেক মাছ আপন সন্তান দিগকে ঝাঁকে ঝাঁকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ষাকালে ল্যাটা, শোল প্রভৃতি মাছের এইরূপ ঝাঁক পুকুরে দেখিতে পাওয়া যায়। হিংস্র এবং শিকারী মাছের বড় বড় দাঁত দেখা যায়। বোয়াল মাছ হিংস্র—ইহার দাঁত অন্যান্য মাছের চেয়ে বড় বড় এবং সংখ্যায় অধিক। কতকগুলি ছোট ছোট মাছ আছে তাহারা জলের উপরে থাকিতে ভালবাসে। কিন্তু অধিকাংশ বড় মাছ গভীর জলে বাস করিয়া থাকে। বান,



৩১ নং চিত্র—কাতলা মাছ

পাঁকাল প্রভৃতি মাছ পাঁকের ভিতর থাকিতে ভালবাসে। সকল মাছই ঘোলা জলের গন্ধে সেই দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। প্রত্যেক মাছ উজান ঠেলিয়া আনন্দ পায়। নদীর ঘোলা ও স্রোতের জল ছাড়া ইলিশ মাছ বাঁচিতে পারে না

মাছ যে কত প্রকারের আছে তাহা বলা যায না। তবে তোমরা যে চিংড়ি খাও তাহা প্রকৃত পক্ষে মাছ নয় জলের পোকা, ইহা হয়ত জান। মাছের সহিত ইহাদেব কোন সাদৃশ্য নাই কিন্তু পোকাব সহিত আছে। কই, শিঙি, চিতল প্রভৃতি কতকগুলি মাছ আছে তাহাবা জলে ফুট খায় দেখিয়াছ। ইহাবা অধিকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পাবে না। কারণ জলের সঙ্গে যে অক্সিজেন আছে তাহা তাহাদেব শ্বাস-কার্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জলেব উপবেব বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয়। এই সকল মাছেব অক্সিজেন গ্রহণ কবাকেই মাছেব খাবি খাওয়া বলি। রুই, কাতলাব খাবি

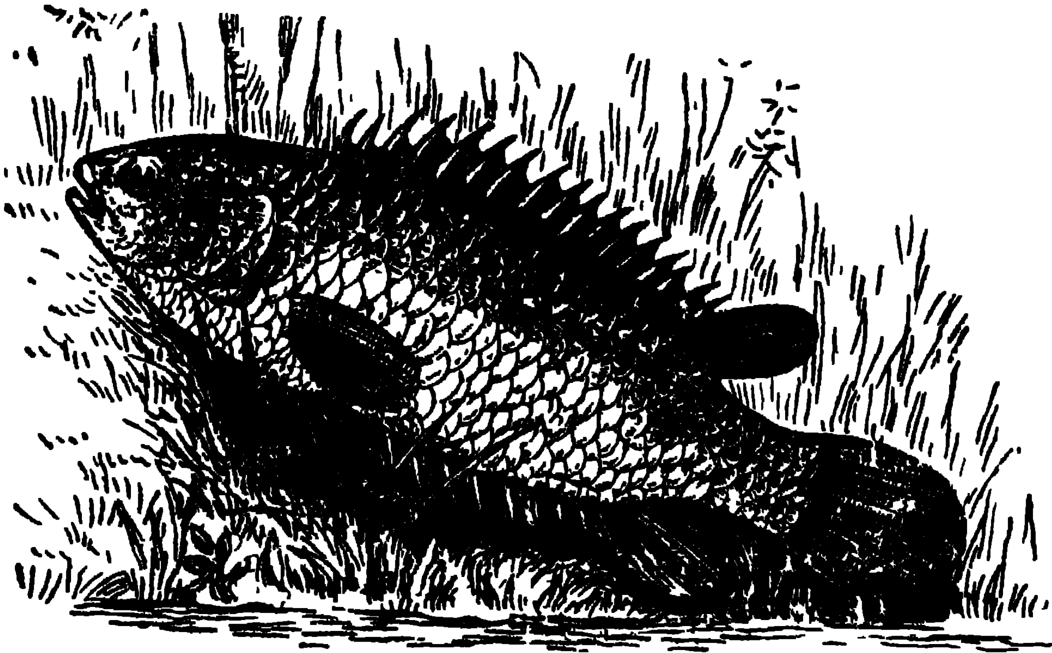


৩৩ নং চিত্র—চিতল মাছ

খাওয়া এবং ঐ সকল মাছের ফুট খাওযাব উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদেব কার্যপদ্ধতি বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

কতকগুলি মাছেব তেল এত অধিক হয যে তাহাদিগকে তৈল দিয়া তো রাঁধিতেই হয় না অধিকন্তু ভাজিলে তাহাদেব দেহ হইতে যে তৈল নির্গত হয় তাহাতে অন্য কার্যও চলিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইলিশ মাছ ও কড মাছেব কথা বলা যাইতে পারে। ইলিশ মাছের মত সুস্বাদু মাছ নাই বলিলেই চলে। কড মাছেব তৈল ঔষধরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মাছ একসঙ্গে বহু ডিম প্রসব করে। এমন কি একেবারে লক্ষ লক্ষ ডিম প্রসব করে। তাহা হইতে বাচ্ছা বা **পোনা** হয়। রুই, কাতলা প্রভৃতি



৩৪ নং চিত্র—কইমাছ

মাছের ডিম পুকুরে বা সকল নদীতে হয় না। সেইজন্য আমাদের দেশের জেলেরা স্বর্ণরেখা হইতে মাছের ছোট ছোট পোনা আনিয়া পুকুরে ছাড়ে। মাছের ডিমও আমাদের একটি সুস্বাদু খাদ্য।

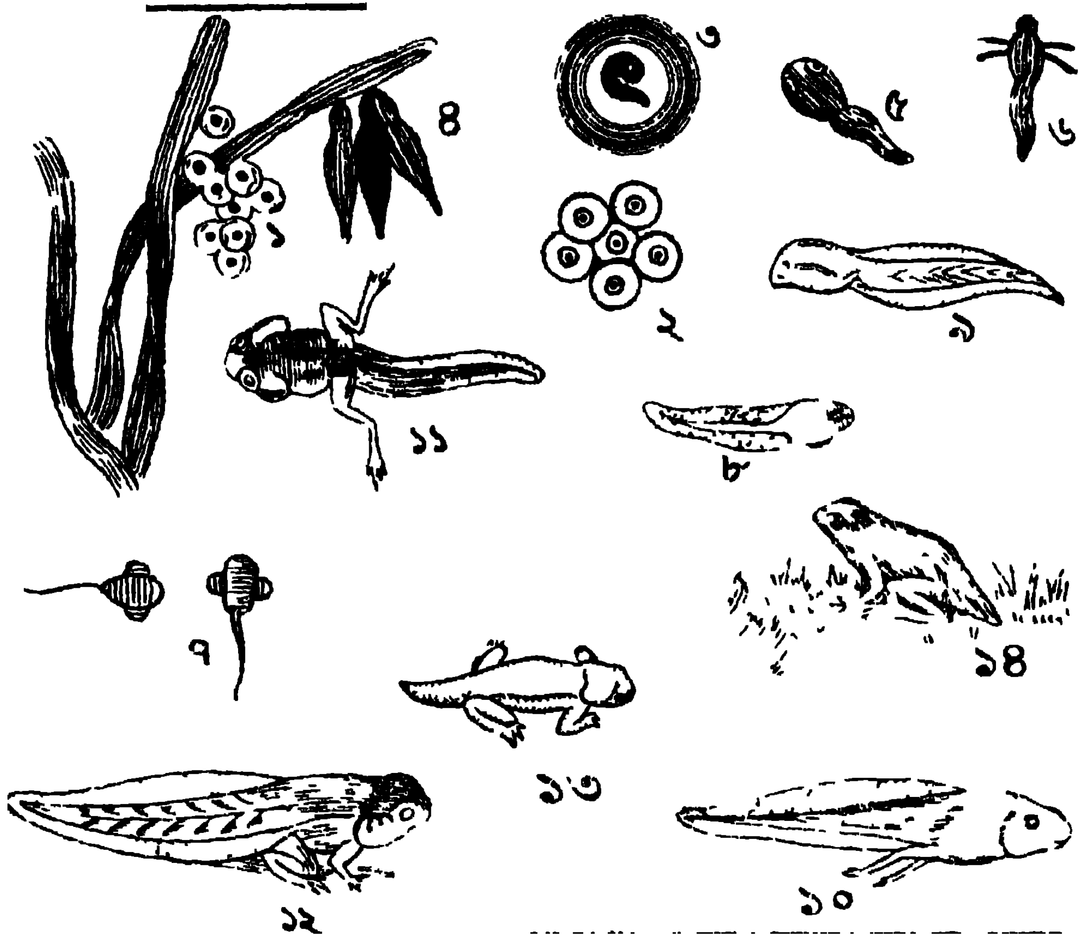
মাছ সাধারণত জলের জীব, তাই প্রত্যেক প্রকার মাছ সন্তরণে পটু। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন অনেক মাছ আছে যাহারা অন্যান্য অবয়ব দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। কইমাছ কেমন কানকোয়া বাহিয়া মাটি বাহিয়া যায় হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। পাঁকাল ও বান মাছ সাঁতার দেওয়ার চেয়ে পাঁক কাটিয়া যাইতে পটু।

ব্যাঙ

ব্যাঙ মাছের পরের স্তরের জীব। মাছ জলে না থাকিলে মরিয়া যায়—ব্যাঙ কিন্তু উভচর। স্থলচর প্রাণীদের সঙ্গে ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। অথচ ছোট বেলায় যখন ইহারা ব্যাঙাচি থাকে তখন দেখিলে ইহারা যে কালে ব্যাঙ

হইবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। তখন ইহাদিগকে মাছ বলিয়াই মনে হয়।

চিত্রে ১, ২ কবিয়া ব্যাঙেব ডিম হইতে বাচ্ছা অবস্থা পযন্ত পবিণতি দেখান হইল। বর্ষাকালে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইবাব পবে ইহাবা পুকুবেব ধারে ডিম



৩৫ নং চিত্র—ব্যাঙেব পরিবতন

পাড়ে। প্রথমে গঁদের আটাব মত চট্‌চটে একটি পিণ্ডের মত ডিমগুলি একত্র হইয়া থাকে তন্মধ্যে কাল কাল দানাগুলিই উহাদেব ডিম। যতদিন যায জলেব সংস্পর্শে ততই ডিমগুলি আকাবে বাড়িতে থাকে। পবে ক্রমে লম্বা হয। তাহাব পরে দুই পাশে দুইটি ডানা বাহির হয় এবং মাথাব দিক চেপ্টা ও প্রায় গোলাকাব হয় এবং তাহার পিছনে লেজ দেখা দেয। এই অবস্থায কাল কাল পোকা হিসাবে আমবা পুকুরেব জলে ব্যাঙএর বাচ্ছা দেখি। ইহারাই **ব্যাঙাচি** নামে পবিচিত।

সোনা ব্যাঙএর ব্যাঙাচির লেজ বেশ বড় হয়। ডিম হইতে বাহির হইয়া প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত তাহাদের মুখবিবর খোলে না বলিয়া তাহাদিগকে কিছু খাইতে হয় না। তখন ইহারা দেহের অংশ বিশেষ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

প্রথমে ব্যাঙাচির ফুলকা থাকে না। একটু বড় হইলে মুখে ফুলকা জন্মে, তাহার দ্বারাই প্রথম প্রথম ইহারা শ্বাস কার্য চালায়। পরে মাছের ন্যায় ইহাদের কানকুয়া গজাইয়া উঠে এবং ফুলকা কানকুয়ার নিচে ঢাকা পড়িয়া যায়। তখন আবার মাছের মত মুখ দিয়া জলশোষণ করিয়া কানকুয়া দিয়া বাহির করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ফুলকা দিয়া জলের অক্সিজেন গ্রহন করে। এই সময় হইতে উহাদের ফুস্‌ফুস্ জন্মাইতে আরম্ভ করে। সোনা ব্যাঙের ব্যাঙাচি অপেক্ষা কুনো-ব্যাঙের ব্যাঙাচির আগে কানকুয়া গজায়।

ন্যূনাধিক এক মাসের মধ্যে ব্যাঙএর দেহে আমূল পরিবর্তন ঘটে। কানকুয়ার নিচে দুই পাশে দুইটি পা বাহির হয়। পরে ঠিক লেজ ও দেহের সংযোগস্থলের একটু অগ্রভাগে দুইটি পিণ্ড দেখা দেয়, তাহারাই বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে উহাদের পিছনের পা গঠিত করে। কানকুয়ার সামনের পা চাপা থাকে বলিয়া মনে হয় যেন পিছনের পা আগে বাহির হয়। এই সময় হইতে ইহাদিগকে ব্যাঙের বাচ্চা বলিয়া মনে হয়, তবু তখনও ইহাদের লেজ থাকে। যতদিন যায় তত লেজ খসিয়া যায় এবং দেহ ক্রমশ স্থূলতর হয়, পাগুলিও বড় হয়। ব্যাঙাচি অবস্থায় ইহাদের লেজ বা দুই পাশের ডানা কাটিয়া দিলে উহারা পুনরায় গজাইয়া উঠে। কিন্তু বড় অবস্থায় ইহাদের হাত পা কাটিয়া গেলে আর বড় হয় না।

ব্যাঙ নানা জাতীয়। সকলগুলির আকার মুখ্যত একইরূপ হইলেও পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। কোন কোন ব্যাঙ আকারে অনেক বড়, কোন কোন গুলির মুখটি লম্বা, চোখ ছোট আবার কোন কোনগুলির বা মুখ থ্যাবড়া এবং চোখ বড়। কতকগুলি ব্যাঙের গায়ে টিপ টিপ কাল রঙের বিন্দু থাকে এবং চামড়া অমসৃণ হয়, আবার কোন কোন ব্যাঙএর চামড়া মসৃণ এবং তাহাতে হলদে রঙএর ডোরা দেখা যায়।

বর্ষাকালে জলে সবুজবর্ণের এক প্রকার ব্যাঙ দেখা যায়। ইহাদের আকার বড, পিঠে কাল ডোরা, চামড়া মসৃণ। ইহাদিগকে **সোনা** ব্যাঙ (Rana)



৩৬নং চিত্র—সোনা ব্যাঙ

বলে। এক পশলা বৃষ্টি হইলে ইহাদেব আনন্দ আব ধবে না। মাঠে ঘাটে ইহাদের গ্যাঁ গোঁ শব্দে কান ঝালাপালা হইযা উঠে।

আব এক প্রকাব ব্যাঙ দেখা যায়—ইহারা ঝোপে ঝাপে বা গর্তে লুকাইযা থাকে, ইহাদেব আকাব বিশেষ বড হয না, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার। ইহাদিগকে **কুনো** ব্যাঙ (Bufo) বলে।

পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙএর শরীর যন্ত্রের সহিত অন্যান্য স্থলচব মেরুদণ্ডী জীবেব অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাদের সর্বশবীব শক্ত চর্মাবৃত, মাথা এবং বুক বা পেট এক একটি বড পিণ্ডের মত, ধড হইতে চারিটি পা বাহির হইয়াছে। মুখের উপর মাথায় দুইটি নাকের ছিদ্র আছে, তাহাতে দুইটি কপাটিকা আছে। কপাটিকাগুলি তাহাবা ইচ্ছামত খুলিতে বা বন্ধ করিতে পাবে, চোখ দুইটি উপর ও নিচেব পাতা দিয়া

বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু আর একটি পর্দা দ্বারা ইহারা চোখ বন্ধ না করিয়াও ঢাকিয়া রাখিতে পারে। চোখের পাশেই দুইটি কান পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। ইহাদের ঘাড় বলিয়া কিছু নাই। ধড় এবং মাথা এক সঙ্গে থাকে। সম্মুখের পায়ে ৪টি এবং পশ্চাতের পায়ে ৫টি করিয়া আঙ্গুল আছে।



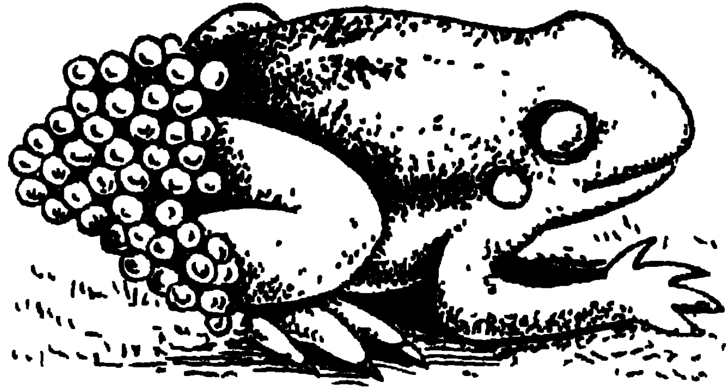
৩৭নং চিত্র—কুনো ব্যাং

পিছনের পা গুলি সাধারণত গুটাইয়া এবং সম্মুখের পা উঁচু করিয়া ইহারা মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকে। ছুটিবার সময় পিছনের পায়ে জোর দিয়া প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া লাফাইয়া যায়।

সোনা ব্যাঙএর উপর পাটিতে দাঁত আছে কিন্তু কুনো ব্যাঙের নাই। মুখ বিবরে একটি জিহ্বা আছে। এই জিহ্বার সম্মুখ ভাগ চোয়ালের সহিত জোড়া কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ আল্‌গা বলিয়া উহাদিগকে জিভটিকে উল্টাইয়া বাহির করিতে হয়।

ইহারা বেশীক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিতে পারে না, কারণ হাঁ করিলে উহাদের শ্বাস কার্যের অসুবিধা ঘটায় উহারা হাঁপাইয়া মরে। শ্বাস লইবার সময় মুখ বন্ধ করিয়া নাকের ঢাকা খুলিয়া বায়ু গ্রহণ করে। পরে নাকের ঢাকা বন্ধ করিয়া মুখবিবর

সঙ্কুচিত করে। ইহাতে মুখ গহ্বরস্থ বায়ু, চাপ পাইয়া ফুস্‌ফুসে চলিয়া যায়। নিশ্বাস ত্যাগকালে মাংসপেশীর চাপ দিয়া ফুস্‌ফুস্ সঙ্কুচিত করে। তখন ফুস্‌ফুসের দূষিত বায়ু মুখে চলিয়া আসে এবং এখান হইতে বাহিরে চলিয়া যায়। এইরূপে ইহাদের শ্বাস কার্য চলে। ব্যাঙএব ত্বক সছিদ্র এবং পাতলা বলিয়া ত্বকের সাহায্যে ইহারা বায়ুমণ্ডলেব বায়ু এবং অল্প জলও শোষণ করিতে পারে। সে হিসাবে ইহাদেব ত্বকও অনেকটা নাকেব কাজ করিয়া থাকে।



৩৮নং চিত্র—ব্যাঙের পিঠে ডিম

এক প্রকাব ব্যাঙ আছে তাহাবা ডিম পাড়িয়া তাহাব উপর বসিয়া থাকে, পৃষ্ঠের নিম্নভাগে ঐ ডিমগুলি আটকাইয়া থাকে, সেই অবস্থায়ও ইহাবা যাতায়াত কবিয়া থাকে।

ফরাসীবা ব্যাঙএর মাংস খাইয়া থাকে। ব্যাঙের চামডা হইতে মনিব্যাগ প্রভৃতি ছোট সৌখীন চামড়াব দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ব্যাঙ ছোট খাটো পোকা মাকড খাইযা জীবন ধারণ কবে, সাপ ইহাব প্রধান শত্রু।

সংক্ষেপ :—মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিম্নতম শ্রেণীর জীব। ইহাদের শরীর সাধারণত চেপ্টা, দুই দিকে সরু এবং মধ্যস্থল মোটা। ইহাতে উহাদের জলে সাঁতার দিবার সুবিধা হয়। হাত পায়ের পরিবর্তে উহাদেব পাখনা থাকে, তদ্দারা উহাবা সাঁতার দেয় ও আপনাদের গতিপথ ঠিক বাখে. চোখের পাতা নাই তাই ঘুমাইবার সময়ও ইহাদের চোখ খোলা থাকে। খাবি খাইবার সময় উহারা মুখ দিয়া জল শোষণ করিয়া কানকুয়া দিয়া ঐ জল বাহির করিয়া দেয়—ফলে ফুলকা দিয়া জলের অক্সিজেন শরীরে টানিয়া নিয়। কতকগুলি মাছ অধিক দিন জলে বাস কবিলেও তাহাদের অক্সিজেনের

অভাব ঘটে না, কিন্তু কই, শিঙি প্রভৃতি মাছের অধিক অক্সিজেন প্রয়োজন হয় বলিয়া উহাদিগকে মাঝে মাঝে জলের বাহিরে উঠিয়া বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয়, ইহাই মাছের ফুট খাওয়া। ইহাব পরের স্তরের জীব ব্যাঙ। ইহারা উভচর—কাজেই ইহাদের সহিত জলচর এবং স্থলচর উভয় শ্রেণীর প্রাণীর কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে। একটি ডিম হইতে বহুপ্রকাব বিবর্তনেব পর তবে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হয়। প্রথমে ইহাদিগকে পোকা, তাহার পর মাছ বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল অবস্থা বিবর্তনের পব পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হয়। ইহাদের শরীর শক্ত চর্মাবৃত, মাথা এবং বুকের মাঝে গলা নাই। মাথায় দুইটি চোখ, তাহাতে তিনটি পাতা আছে; দুই পাতা দিয়া চোখ বন্ধ করিতে পারে এবং অপবটি দিয়া চোখ বন্ধ না করিলেও ঢাকা দিতে পারে। চোখেব পাশে দুইটি কান পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে। সামনের পায়ে ৪টি করিয়া এবং পিছনের পায়ে ৫টি কবিয়া আঙুল আছে। ব্যাঙ বহু প্রকারের আছে।

চতুর্থ প্রশ্নমালা

১। অন্যান্য প্রাণীব তুলনায় মাছের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? (What are the special characteristics of a fish as campared with other classes of the living ?) (কঃ বিঃ ১৯৪০)

২। মাছের বিভিন্ন দেহ-যন্ত্রেব বর্ণনা দাও। (Describe different organs of a fish)

৩। মাছের পৌষ্টিক নালী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (Write what you know of the alimentary canal of a fish)

৪। মাছ আমাদের কি কি উপকাবে আসে। (What utility we get from a fish ?)

৫। ব্যাঙের জীবনেতিহাস লিখ। (Write down the life history of a frog.)

৬। মাছ ও ব্যাঙেব তুলনা কর। (Compare a fish with a frog.)

৭। ব্যাঙের চোখে কি বৈশিষ্ট্য আছে লিখ। (Write what peculiarity there is in the eye of a frog ?)

৮। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ হওয়া পর্যন্ত ইহার অবস্থাগুলির বিবরণ লিখ। (Write down different stages of a frog begining from the egg)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাণী ও উদ্ভিদের পরস্পর নির্ভরশীলতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা

নির্ভরশীলতা

তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে জীব সৃষ্ট হইবার বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ জন্ম লাভ করে। ইহাও ভগবানের অপার করুণার একটি নিদর্শন। কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি রহস্যের আর একটি গূঢ়তম অভিসন্ধি ইহার মধ্যে নিহিত আছে। মানব শিশু জন্মাইবার বহু পূর্বে যেমন তিনি মাতৃ বক্ষে সুধার সঞ্চয় করিয়া রাখেন তেমনি আদিম যুগে জীব শিশুর জন্য জীব জননী ধরিত্রীর বুকে শিশুর ভবিষ্যৎ আহার্যরূপে উদ্ভিদের সৃষ্টি করেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে এই উদ্ভিদই জীবগণের প্রাণ ধারণের একমাত্র সম্বল, তাই আমরা দেখিতে পাই মরুভূমি প্রভৃতি যে সকল অঞ্চলে উদ্ভিদের আধিক্য নাই সে সকল অঞ্চলে প্রাণীও নাই বলিলেই চলে।

প্রাণিগণ উদ্ভিদের নিকট ঋণী বলিয়া তাহাদিগকে উদ্ভিদগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের বংশ বিস্তারের সুযোগ আনিয়া দিতে হয়, উদ্ভিদগণও অন্য দিকে শক্তি অনুসারে আপনাপন দেহ পাত করিয়া অথবা দেহাংশ ত্যাগ করিয়া জীবগণের উপকার সাধন করিয়া থাকে।

ধান, যব, গম, আম, লিচু, প্রভৃতি উদ্ভিদগণ প্রভূত পরিমানে মানবের আহার্য যোগাইয়া থাকে। ইউক্যালিপটাস, সিঙ্কোনা, বেলেডোনা, অশোক, বাকস হইতে আরম্ভ করিয়া মুথা, কালমেঘ, ব্রাহ্মী প্রভৃতি অগণন উদ্ভিদ রোগে ঔষধ এবং সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি উদ্ভিদ আমাদের পথ্য যোগায়। চা, কফি, কোকো আমাদের আরাম দায়ক পানীয়, আলু, বেগুন, পটোল, পিঁয়াজ, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি

আনাজ, নটে, পালম, পুঁই প্রভৃতি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সব্জী, লঙ্কা, হলুদ, ধনে সরিষা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, হরিতকী, বয়ড়া, আমলকী, জায়ফল, কিস্‌মিস্ পেস্তা, বাদাম এ সকলই উদ্ভিদের দান। নীলবড়ি, কিশোরী রঙ্, মেহেদী, হলুদ, প্রভৃতি রঞ্জক, বাঁশ, খড় প্রভৃতি কাগজের ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপাদান, চন্দন, তুলসী প্রভৃতি সুগন্ধি সকলই উদ্ভিদ হইতে পাই। অশোক, বকুল, মালতী, যুঁই বেলা, চাঁপা গোলাপ প্রভৃতি গাছের ফুল আমাদিগকে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য দান করে, দেবার্চনায় আত্মাহুতি দেয়। শাল, সেগুন, সুঁদরী, গরাণ, মেহগ্নি, আম জাম, কাঁটাল, লোহা, চাকুন্দা, পিয়াল, বাবলা, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে জ্বালানী কাঠ, কাঠ কয়লা, তক্তা প্রভৃতি পাওয়া যায়, গাছের ছাল ও আঁশে সূতা, দড়ি এবং তাহা হইতে কাপড়, চট প্রভৃতি আবশ্যকীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কত যে উপকার উদ্ভিদ হইতে জীবগণ পাইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। মাটি হইতে নাইট্রোজেন লইয়া নিজদেহে প্রোটিন জাতীয় এবং কার্বন ঘটিত মানবের খাদ্য সঞ্চয় করা ও আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বৃক্ষ শাখায় বা কোঁটরে মানুষকে আপনাদের আবাস রচনা করিতে দেওয়াও গাছের মানব সেবার নিদর্শন।

কীট পতঙ্গগণ পুষ্পরেণু লইয়া পুষ্পান্তরে ছড়াইয়া দিয়া—পুষ্পের বীজ সঞ্চালিত করিবার সহায়তা করে। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি ফল খাইয়া পক্ষিগণ বহুদূরে বিষ্ঠা-ত্যাগ করিলেও তাহা হইতে ঐ সকল গাছের চারা জন্মায়, ইহাতে উহাদের বংশ বিস্তার হয়। চোর কাঁটা আমাদের কাপড়ে লাগিয়া স্থানান্তরে নীত হয়, ওকড়া কাঁটা গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির লোমে আটকাইয়া স্থানান্তরে নীত হয়, ইহাতেও ঐ সকল গাছের বংশ বিস্তার হয়। গভীর বনে যেখানে মনুষ্য সমাগম হইতে পারে না সেখানে কেঁচো গোপনে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া ইহার প্রভূত উপকার সাধন করে। মানুষ যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দেহাভ্যন্তর হইতে দূষিত বলিয়া ত্যাগ করে তাহাই আবার উদ্ভিদগণ স্ব স্ব শরীরে শোধন করিয়া অক্সিজেন ফিরাইয়া দেয়। এই অক্সিজেন আবার প্রাণিগণের জীবনের প্রধানতম সম্বল,

ইহা তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ। ঝাঁঝি, কলস উদ্ভিদ প্রভৃতি উদ্ভিদ কিরূপে কীট পতঙ্গ, খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহাও পূর্বে জানিয়াছ। গোবর প্রভৃতি জীবগণের বিষ্ঠা, শিংগুঁড়া, হাড় গুঁড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট সার। ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি কয়েক প্রকার উদ্ভিদ মাংস বা চামড়া খাইয়া বৃদ্ধি লাভ করে।

এইরূপে উদ্ভিদ এবং জীবগণ একে অন্যের উপর যেমন নির্ভর করে তেমনই উহারা পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধনও করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদও প্রাণীর পরস্পরের নির্ভরতার কথা কিছু বলা হইল। কিন্তু পরোক্ষ ভাবেও এই পরস্পর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান আছে। আলকাতরা রং, কতিপয় সুগন্ধি ও আরও বহু পদার্থ আপাত দৃষ্টিতে অন্য পদার্থ হইতে প্রাপ্ত মনে হইলেও ইহাদের জন্ম বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় ইহারাও উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিগণের বিশেষ উপকারী।

সামঞ্জস্য রক্ষা

মানুষ যে দিন প্রথমে পৃথিবী দেখিল সেইদিন হইতে তাহাকে সুখ দুঃখের আবর্তনে পড়িয়া আপনার বাঁচিয়া থাকিবার উপায় খুঁজিয়া লইতে হইল। আদিম যুগে মানুষ গাছের শাখায় তীর ও লতায় ধনুক প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষার্থ শত্রু আক্রমণে ব্যবহার করিত, কিন্তু আজ সে অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণে ক্রমশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বন্দুক, কামান, টরপেডো প্রভৃতি সাংঘাতিক আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে। স্বল্প পরিসর পর্বত গুহায় বা বৃক্ষ কোটরে তাহার আদিম বাস ছিল, বহু যুগ ব্যাপী চেষ্টা ও পরিশ্রমে আজ সে তাহার বাসের জন্য আমেরিকার এম্পায়ার অব ষ্টেট্ বিল্ডিং এর মত সুরম্য গগনস্পর্শী হর্ম্যরাজি প্রস্তুত করিয়াও তৃপ্ত নহে। কে জানে এই মহাসমরের অবসানে জগতের বুকে আরও কত অলৌকিক কাণ্ড সামান্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সে এইরূপে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে আসিবে, ফলে তাহার আচার

ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি সকল বিষয়েই একটি ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকিবে। এই পরিবর্তন কেবল মানুষের নহে, সমস্ত জীব জগৎ লইয়া এই ক্রমিক পবিবর্তন চলিতেছে। ডাবউইনের বিবর্তন কাহিনী (Darwin's theory of Evolution) তোমবা শুনিয়াছ। তাঁহার মতে মানুষের পূর্বপুরুষ বানর জাতীয় জীব ছিলেন—কৃষ্টি এবং পাবিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানেব ফলে তাঁহাবা আজ "দীর্ঘকায় গৌব কান্তি"।

তোমবা জান সাগর, হ্রদ ও নদী তীববর্তী অধিবাসিগণেব জীবিকা সাধাবণত মাছ ধবা, নৌকা চালনাও শুক্তি সংগ্রহ করা; তাহাদেব আচার, ব্যবহাব, চাল, চলন, আকৃতি এবং প্রকৃতিতেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবা যায়। সমতলবাসিগণ চাষ, পশুপালন প্রভৃতি দ্বারা ও বন্যেবা শিকার দ্বাবা জীবিকার্জ্জন কবে, এইজন্য পাহাড়িয়া, শীতপ্রধান দেশেব অধিবাসি, মরুবাসী, বন্য এবং সমতলবাসী লোকদেব আচাব ব্যবহাব, চাল-চলন এবং আকৃতিও প্রকৃতিতে কত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায। কেবলমাত্র আকৃতি দেখিয়া তাই অনেক লোকেব বাসভূমি ও প্রকৃতি বলা যাইতে পাবে। এই সব বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম কাবণ পারিপার্শ্বিক অবস্থাব সহিত সামঞ্জস্য বক্ষা।

এখন যদি কোন নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশের সমতল বাসীকে তুন্দ্রাঞ্চলে বা কোন শীত প্রধান দেশে গিয়া বাস কবিতে হয় তবে তাহাকে সেখানকাব অধিবাসীদের পোষাকের ন্যায় গরম পোষাক ব্যবহাব কবিতে হইবে, সেখানে সহজ প্রাপ্য বা সেখানকার জল বায়ুতে সহজ পাচ্য খাদ্য খাইতে হইবে। ফলে ভিতরে ভিতবে তাহাব শবীর এবং মনেরও পবিবর্তন ঘটিযা যাইবে। তেমনই শীতপ্রধান দেশের লোক গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিলে পবিবর্তিত হইবে। এরূপ পরিবর্তন তোমবা প্রত্যহই দেখিতে পাইবে।

এইবার মনুষ্যেতর প্রাণীদের বিষয় ধরা যাউক। শিকাবী পশুদিগকে ছুটিতে হয বলিয়া তাহাদেব দেহ হাল্কা, পেট পাতলা, পা লম্বা, নখ এবং দাঁত তীক্ষ্ণ, ধারাল অস্ত্রের কাজ করে। ইহারা মাংসাসী। নিরামিষাসীদের দেহ অপেক্ষাকৃত স্থূল,

পেট মোটা। ইহাদেব ধারাল নখ ও দাঁত থাকে না, অনেকের খুর থাকে, শত্রু আক্রমনে সাহায্য করিবাব জন্য শিঙ থাকে। ইহাদেব হাত নাই বটে তবে তাহাদের অনেক কাজ লেজেব দ্বাবা করে।

শিকারী পশু মাত্রই উগ্র এবং হিংস্র, কিন্তু নিরামিষাসী প্রাণিগণ সাধারণত হিংস্র নহে, ইহাদের স্বভাব তত উগ্রও নহে। শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষা কবিবার জন্য ইহাদের দেহ অধিক বা অল্প লোমাবৃত। যাহাবা শিকার করিয়া খায় তাহারা সাধারণত বন জঙ্গলে বাস কবে, কিন্তু অধিকাংশ নিবামিষাসী জন্তু সমতল দেশে বাস কবে। বহুরূপী বা গিরগিটি আপনাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে বক্ষা কবিবাব জন্য অথবা শিকাব করিবাব জন্য আপন শবীবেব বঙ কিরূপে পবিবর্তন কবে তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। লাউডগা সাপের বঙ একেবাবে সবুজ—গাছেব পাতায বা কচি শাখায থাকিলে সহজে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। প্রজাপতির সবুজ শূককীটগুলি পাতাব উপব যখন বসিয়া থাকে তখন ইহাদিগকে সহসা চিনিতে পারা যায় না—পাতাবই অংশ বলিযা মনে হয়। মাকডসার শিকাব প্রণালী সম্বন্ধে পুর্বে জানিযাছ। এই সকল দিক বিচাব কবিলে বুঝা যায মনুষ্যেতর প্রাণীও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবাব যথেষ্ট প্রযাস কবে। তাহাব ফলে, তলে তলে ইহাদেরও বিবর্তন ঘটিতেছে। পাখীব যদি পাখা না থাকিযা মানুষেব মত হাত, পা বা পশুর মত চারিটি পা থাকিত তবে তাহাদের কতই না অসুবিধা হইত। সেইরূপ মাছেব পাখা ইহাদিগকে জলে সাঁতরাইবার সুবিধা দেয়, হাঁসেব পাও এই কাবণে উহাদের উপকারী। আবাব দেহ গঠনেব দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে তাহার মধ্যেও একই তথ্য বিদ্যমান—পারিপার্শ্বিক অবস্থাব সহিত সামঞ্জস্য বক্ষা। মনে কব সকল মাছেব শবীর পটোলের মত মধ্যে মোটা ও দুই দিক সরু না হইয়া যদি স্থূলকায হস্তীর চেহাবার মত হইত তবে তাহাদেব জল কাটিয়া সাঁতাব দিতে কত না অসুবিধা হইত। তেমনই পাখীদিগকে বায়ু কাটিয়া শূন্যে উড়িতে হয় বলিয়া তাহাদেব মাথার ও লেজের দিক সরু ও মধ্যে পেট মোটা।

এইবাব উদ্ভিদেব কথা ধরা যাউক। সাধারণত মরু বা পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদ্‌গণের পাতা সমতল সবস ভূমির উদ্ভিদ্‌দিগের পাতা অপেক্ষা পুরু; কারণ বলিতে পার কি? পার্বত্য বা মরু অঞ্চলে বস সুলভ নহে; তাই গাছ পাতায় বস সংগ্রহ করিয়া বাখে, যাহাতে বহুদিন অনাবৃষ্টি হেতু রসের অভাব হইলেও ঐ সকল গাছ পাতা হইতে খাদ্যের অভাব অনেকটা মিটাইয়া লইতে পাবে। অনেক গাছের কাঁটা, তীব্র গন্ধ, বিষাক্ত রস, কুট্‌কুটে শুঁয়া তাহাদিগকে শত্রুব আক্রমণ হইতে বক্ষা কবে। তেমনই কাহাবও কাহাবও ফুলেব সুগন্ধ ও সৌন্দর্য উহাদেব পবাগ সংযোগ ঘটাইবার জন্য ঘটকদিগকে আকৃষ্ট কবে। ইহাদের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন অঙ্গ রূপান্তরিত হইযা বিভিন্ন কাজ করে। অবস্থাষ পডিযা মূল বা কাণ্ড পাতার কাজ করে, পাতাও সময় বিশেষে মূল বা কাণ্ডের কাজ কবে। এক এক গাছেব আকর্ষরূপ নূতন প্রত্যঙ্গ গজাইয়া গাছের একটি বিশিষ্ট উপকাব কবে। ঐ সব গাছেব আকর্ষ না থাকিলে উহাদেব বাঁচা দুর্ঘট হইত। কলস উদ্ভিদ বা ঝাঁঝিব শিকাব কবিবার কৌশল প্রভৃতিও পূর্বেই পড়িযাছ। তাহা হইলে এই সকল বিচাব কবিযা বুঝিতে পাবিতেছ পাবিপার্শ্বিক অবস্থাব সহিত উদ্ভিদদিগকেও সংগ্রাম কবিযা নিজেব দেহ বা প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়াও খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতেছে। সমস্ত জীব জগৎ জুডিয়া এই ব্যাপার চলিতেছে। অতএব পাবিপার্শ্বিক অবস্থাব সহিত সামঞ্জস্য বিধান জীব জগতেব একটি প্রধানতম কর্তব্য এবং জীবনেব একটি প্রধানতম লক্ষণ।

পঞ্চম প্রশ্নমালা

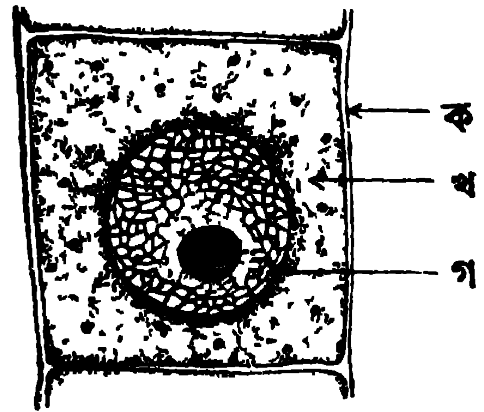
১। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত জীবগণ কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও (Give a brief account of how the livings adopt themselves to environments)

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা কবিতে গিযা মানুষ, ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ আপনাদেব সাধারণ প্রকৃতিব পরিবর্তন করিয়াছে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও (Show by examples where the human beings, inferior animals and the plants change their respective natures under different circumstances)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবদেহের উপাদান

শুধু মানুষ নয় কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ প্রভৃতি জীবমাত্রেরই মূল উপাদান **সূক্ষ্ম কোষ** (Cell)। এই সূক্ষ্ম কোষ একত্র হইয়া জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে। প্রতি কোষে **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) নামক এক প্রকার তরল পদার্থ এবং তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঘনতর **নিউক্লিয়স** (Nucleus) নামক একটি পদার্থ থাকে। নিউক্লিয়স ও কোষ আপনা হইতেই ভাগ হইতে থাকে এবং এইরূপে একটি কোষ হইতে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। জীবের দেহে দুই প্রকার কোষ দেখা যায়। এক প্রকার কোষের চারিদিকে প্রাচীর থাকে অন্য প্রকারের কোষের চারিদিক অনাবৃত। যে সকল কোষের চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত সেই সকল কোষ দ্বারা গঠিত দেহ কঠিন এবং অপর প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত দেহ সাধারণত নরম হয়। উদ্ভিদের দেহ প্রথম প্রকার কোষ দ্বারা গঠিত এবং মানুষের দেহ অনাবৃত কোষ দ্বারা গঠিত বলিয়া উদ্ভিদের দেহ কঠিন এবং মানুষের দেহ নরম। চিত্রে একটি প্রাচীরবেষ্টিত কোষ দেখান হইল। **ক** ইহার প্রাচীর **খ** প্রোটোপ্লাজম ও **গ** নিউক্লিয়স। এই কোষসমূহ একত্রিত হইয়া বহু প্রকারের **তন্তু** (Tissue)



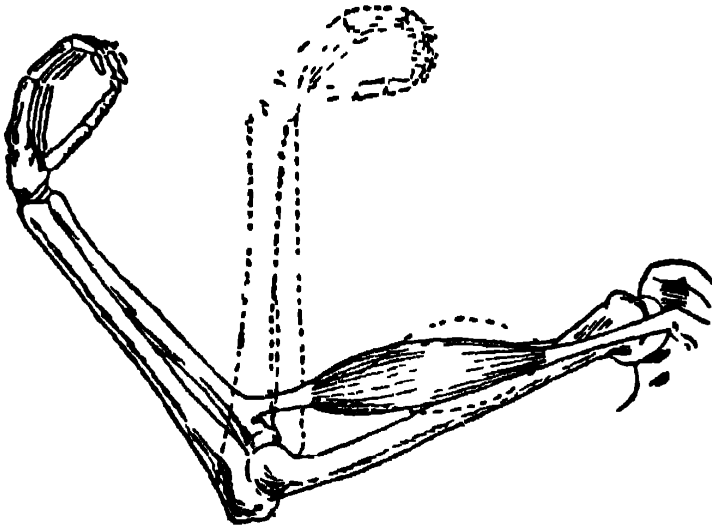
১নং চিত্র—জীবকোষ

সৃষ্টি করে। এই সকল তন্তু হইতে আমাদের দেহের যাবতীয় যন্ত্রাদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মিত হয়। মানবের দেহে সাধারণত চারি শ্রেণীর তন্তু দেখা যায়, যথা—**আচ্ছাদক তন্তু** (Epithelial tissue), **সংযোজক তন্তু** (Connective tissue), **পেশীতন্তু** (Muscular tissue) এবং **বার্তাবহ তন্তু** (Nervous tissue)

আচ্ছাদক তন্তু—দেহের অনাবৃত স্থান সমূহেব উপর এবং গহ্বরবিশিষ্ট অংশের ভিতরেব দিকে এই প্রকাব তন্তু পর্দাব ন্যায় লাগিয়া থাকে।

সংযোজক তন্তু—এই তন্তু দ্বাবা বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন যন্ত্রাদিব সহিত সংযুক্ত থাকে। অবস্থান বিশেষে ইহাদেব ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে।

পেশীতন্তু—এই তন্তু প্রয়োজনানুসাবে সঙ্কুচিত হইতে পাবে। কিন্তু কতক-গুলি তন্তু মানুষেব ইচ্ছামত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় আবাব কতকগুলি হয় না। চোখেব পাতা আমরা ইচ্ছা করিলে খুলিতে ও বুজাইতে পাবি। কিন্তু বক্তবহা ধমনীকে আমরা ইচ্ছামত বন্ধ করিতে পারি না।



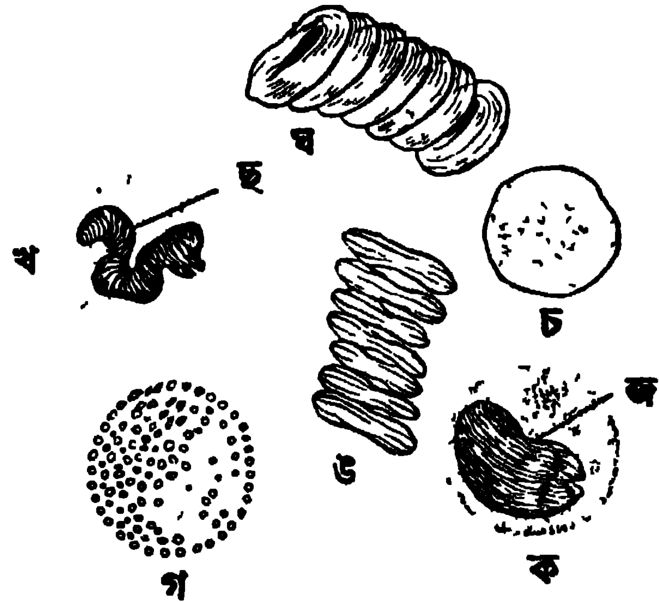
২নং চিত্র—পেশী তন্তুর সঙ্কোচন ও প্রসারণ

চোখেব পাতাব পেশী মানুষেব আজ্ঞাধীন কিন্তু রক্তবাহা নালীব পেশী মানুষেব আজ্ঞাধীন নহে। দেহের সর্বত্র বিভিন্ন পেশী অস্থির সহিত সংযুক্ত থাকে।

বার্তাবহ তন্তু—মানবদেহের সমস্ত অনুভূতি এই তন্তুব সাহায্যে ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জীবের যাবতীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। মস্তিষ্কই ইহার কেন্দ্র-স্থল। মস্তিষ্ক হইতে দেহেব বিভিন্ন যন্ত্রে এবং অন্যান্য অবয়বে, অথবা এই সকল

যন্ত্র বা অবয়ব হইতে মস্তিষ্কে সর্বপ্রকার অনুভূতি, এই প্রকার তন্তুর সাহায্যেই প্রেরিত হয়।

রক্ত (Blood)—জীবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান। দেহের সর্বত্র ইহা বিভিন্ন **নালী** বা **নাড়ির** (Vessels) ভিতর দিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। ইহা তরল এবং উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ বস্তু। ইহা প্রতি তন্তুর মধ্যে গিয়া তন্তুগুলি পুষ্ট করে এবং তথা হইতে দূষিত পদার্থ টানিয়া দেহের বাহিরে ফেলিয়া দিতে সাহায্য করে। রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে প্রধানত **রক্তরস** (Plasma), **শ্বেত কণিকা** (White corpuscles) ও **লোহিত কণিকা** (Red corpuscles) নামক পদার্থ বিদ্যমান। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত যখন দেহের মধ্যে ধাবিত হয়, তখন তাহা তরল থাকে, কিন্তু এই রক্ত কোনও প্রকারে দেহের বাহিরে পড়িলে জমাট বাঁধিয়া যায়। এইজন্যই দেখা যায় যে, রক্তপাত হইলে সেই স্থানে অল্প সময়ে রক্ত জমাট বাঁধিয়া উঠে। এই প্রকার জমাট রক্তে শ্বেত ও লোহিত রক্তকণিকাগুলি পিণ্ডের ন্যায় দলা পাকাইয়া থাকে এবং তাহা হইতে এক প্রকার তরল রস নির্গত হয়। এই তরল রসের বর্ণ ঈষৎ লোহিত। এই রসকে **রক্তমণ্ড** (Serum) বলা হয়। রক্ত জমাট বাঁধিলে উহার রক্তরস হইতে সরু সূতার ন্যায় **ফাইব্রিন** (Fibrin) নামক একটি পদার্থ নির্গত হয়, এই ফাইব্রিন ও রক্তকণিকাগুলি মিলিত হইয়া জমাট বাঁধে। চিত্রে দেখ **ক খ গ** প্রভৃতি কয়েকটি রক্ত কণিকা ও **ছ জ** উহার অন্তস্থ উপাদান।



৩নং চিত্র—রক্ত কণিকা

রক্তরস (Plasma)—দেখিতে হরিদ্রাভ। ইহাতে জল, লবণ, অ্যালবুমেন (Albmen) ও ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি থাকে। কলেরা প্রভৃতি রোগীর যখন নাড়ী বন্ধ হয় তখন তাহাদের রক্তের জলীয় অংশ কমিয়া যাওয়ায় রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায় কাজেই চলাফেরা করিতে পারে না। তাই নুন জল ইন্‌জেকসন দিয়া রক্ত তরল কবিতে হয়।

লোহিত কণিকা (Red corpuscles)—ইহারা গোলাকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ। মধ্যস্থানে কিছু চাপা। ইহাদেব মধ্যে লোহিত রঙ বিশিষ্ট হিমোগ্লোবিন (Hœmoglobin) থাকায় ইহাদিগকে লাল দেখায়। এই হিমোগ্লোবিনেব সহিত অক্সিজেন দেহের বিভিন্ন কোষে চালিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উক্ত কোষ হইতে হিমোগ্লোবিনেব সহিত মিলিত হইয়া ফুস্‌ফুসে নীত হয।

শ্বেত কণিকা (White corpuscle)—ইহাবা বর্ণহীন এবং লোহিত কণিকা অপেক্ষা অনেক বড। বক্তেব মধ্যে ইহাদেব সংখ্যা লোহিত কণিকা অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু বোগ বীজাণু ধ্বংস করিবাব সময ইহাবা যোদ্ধাব কাজ করে। কোন প্রকাবে বোগ বীজাণু দেহে প্রবিষ্ট হইলে ইহাবা তাহাদেব সহিত যুদ্ধ কবিয়া তাহাদিগকে মাবিযা ফেলে। ইহাবা যুদ্ধে পরাজিত হইলে আমাদিগকে বোগাক্রমণ করে। অস্থিব মধ্যস্থিত **লোহিত মজ্জা** (Red marrow), **লসিকা গ্রন্থি** (Lymph glands), **টনসিল** (Tonsil) প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত বয়সে শ্বেত কণিকাব জন্ম হয়।

রক্তবহা নাড়ী (Blood vessel,)—আকৃতি ও কার্যেব বিভিন্নতা হিসাবে ইহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :—**শিরা** (Vein), **ধমনী** (Artery) ও **কৈশিক নাড়ী** (Capillary)।

(১) **শিরা**—ইহাবা দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে হৃদয়ের দিকে রক্ত বহন করিয়া লইযা যায়। একটি শিরা দেহেব নিম্ন এবং একটি শিরা দেহের উপরের অংশ হইতে অপরিষ্কার রক্ত হৃদয়ে লইয়া যায়। ইহা ছাড়া ফুস্‌ফুস্‌ হইতে চারিটি

বৃহৎ শিরা এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্য হইতে কতিপয় শিরা হৃদয়ে রক্ত লইয়া যায়। শিরার গাত্র পাতলা এবং ইহার ভিতবে মাঝে মাঝে **কপাটিকা** (Valve) আছে। এই কপাটিকা থাকার জন্য ইহার মধ্যে প্রবাহিত রক্ত এক দিকেই যাইতে পারে, দুই দিকে যাইতে পাবে না। মৃত্যুব পব দেখা যায় যে, শিরার উভয় গাত্র জুড়িয়া গিয়াছে, কারণ শিরার স্থিতিস্থাপক শক্তি নাই। চিত্রে শিরার মধ্যে রক্তের গতি দেখান হইয়াছে।

(২) **ধমনী**—শিরাদ্বারা দেহেব বিভিন্নস্থান হইতে নীত অপবিষ্কার বক্ত ফুস্‌ফুসে আসিয়া পবিষ্কৃত হইয়া হৃদয়ে আসে। ধমনী সেই পবিষ্কৃত রক্ত দেহেব বিভিন্ন স্থানে সববরাহ কবে।

(৩) **কৈশিক নাড়ী**—শিরা ও ধমনী কৈশিক নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত। ধমনী ও শিরাব সূক্ষ্মতম অংশ যেখানে শেষ হইয়াছে, তথায় এই কৈশিক নাড়ীব জাল বিস্তৃত। এই কৈশিক নাড়ী অতীব সূক্ষ্ম ও উহাব দেহ অতি পাতলা।

গঠনানুসাবে অস্থি চাবি প্রকার :—

(১) **লম্বা অস্থি** (Long bones)—দ্বারা আমাদের দেহের কাঠামো প্রস্তুত হইযাছে। ইহাবা প্রধানত চাবি প্রকাব, ইহাবা হস্তপদাদিব কাঠামো তৈয়াব করিয়া থাকে।

(২) **ক্ষুদ্রাস্থি** (Short bones)—এই সকল অস্থি, হস্ত পদের অঙ্গুলি ও অন্যান্য অংশে পরপব জুড়িয়া থাকে এবং তাহাদের পরিচালনার সহাযতা কবে।

(৩) **চ্যাপ্টা অস্থি** (Flat bones)—ইহাবা মাথাব খুলি, বক্ষোগহ্বর ও উদরগহ্ববেব খাঁচা বচনা করিয়া থাকে।

(৪) **অসমগঠন অস্থি** (Irregular bonees)—ইহা হস্ত ও পদে থাকে।

ইহা ছাডা অস্থিব সহিত অনেক স্থানে সংলগ্ন **তরুণাস্থি** (Cartilage) থাকে। অস্থির প্রায় অর্ধেকাংশ জল এবং বাকি অংশ জৈব এবং অজৈব লবণ। তন্মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস প্রধান। ক্ষয় রোগে এজন্য রোগীকে ক্যালসিয়াম খাওয়াইবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

সংক্ষেপ ঃ—মানব দেহের প্রধান উপাদান জীব কোষ। এই জীবকোষগুলি প্রাচীর বেষ্টিত নয় বলিয়া মানবদেহ নরম। জীবকোষে প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস আছে। জীবকোষগুলি আমাদের দেহে চারিপ্রকার তন্তু সৃষ্টি করে—আচ্ছাদক, সংযোজক, পেশী ও বাত বহ তন্তু। রক্ত মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা ইত্যাদিও দেহের এক একটি উপাদান। রক্তে শ্বেতকণিকা, রক্ত কণিকা, রক্ত রস ও রক্ত মণ্ড থাকে। রক্ত বহা নাড়ীর কার্যের বিভিন্নতা হিসাবে, ইহারা শিরা, ধমনী ও কৈশিক নালীতে বিভক্ত। অস্থিও বিভিন্ন প্রকারের হয়—যথা, লম্বাস্থি, ক্ষুদ্রাস্থি, চ্যাপ্টা অস্থি ও অসমগঠন অস্থি।

প্রথম প্রশ্নমালা

১। মানবদেহের প্রধান উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (Give a short account of chief constituents of a human body.)

২। দেহে কত প্রকার রক্তবহা নাড়ী এবং অস্থি আছে লিখ। (Write how many kinds of blood vessels and bones there are in our bodies)

৩। রক্তের এবং জীবকোষের বিভিন্ন উপাদান কি কি ? (What are the chief ingredients of a cell and blood ?)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরদেহের বিভিন্ন যন্ত্র

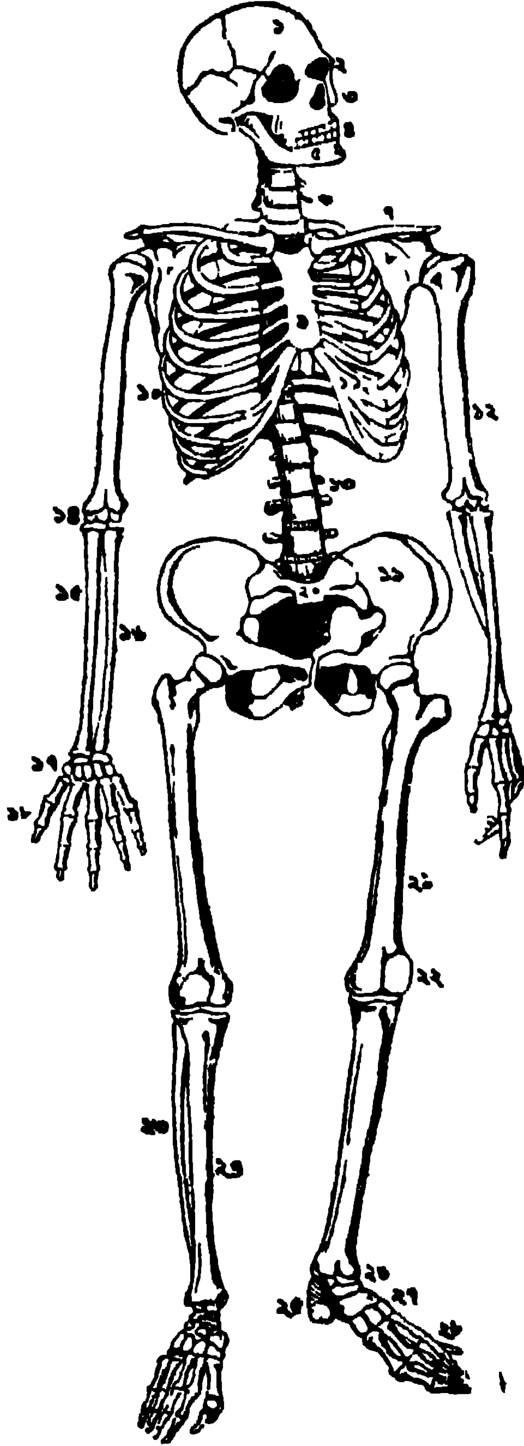
কঙ্কাল

জাহাজ, রেলগাড়ী, উড়ো জাহাজ কলের সাহায্যে কেমন মানুষের ইচ্ছামত চলিয়া বেড়ায়, গ্রামোফোনে কথা কয়, গান গায়, ছায়াচিত্রে জীবন্ত মানুষের মত চিত্র চলাফেরা করে, কথাবার্তাও কহিয়া থাকে। এ সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিষয় আলোচনা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, ইহাদের আবিষ্কর্তার প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ স্বতই উৎসারিত হইয়া উঠে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি মানুষের দেহযন্ত্র এবং তাহার সৃষ্টি কৌশল আরও কত বিস্ময়কর, অভাবনীয়। যুগ যুগ সাধনার বলে মানুষ বহু অপূর্ব ব্যাপার সাধন করিতেছে। কিন্তু এমন দিন কি কখনও আসিবে যখন মানুষ জাহাজ, গাড়ী, উড়োজাহাজের মত কারখানায় মানুষ সৃষ্টি করিবে?

আপাত দৃষ্টিতে জীবের দেহযন্ত্র অতীব জটিল ও সূক্ষ্ম হইলেও ইহাতে যে সাধারণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বহু কার্যই সংসাধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বস্তুত নরদেহও একপ্রকার এঞ্জিন—ইহার নির্মাণ কৌশল মানুষের আয়ত্তে না থাকিলেও মেরামতি কাজ যে মানুষের দ্বারা একেবারেই অসম্ভব একথা বলা যায় না। অতএব এ যন্ত্রটি বহুদিন স্থায়ী এবং নির্দোষ করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। পরে তাহাদিগকে কিরূপে কার্যক্ষম রাখা যাইতে পারে তাহা দেখা যাইবে।

নরদেহ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত—(১) **মস্তক** (২) **ধড়** ও (৩) **হস্তপদ**।

প্রত্যেক অংশেই কিন্তু অস্থি, মাংস, পেশী, মেদ, মজ্জা, রক্ত ইত্যাদি রহিয়াছে। হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস পেশী লাগাইয়া তাহাতে চর্ম ঢাকা আছে।

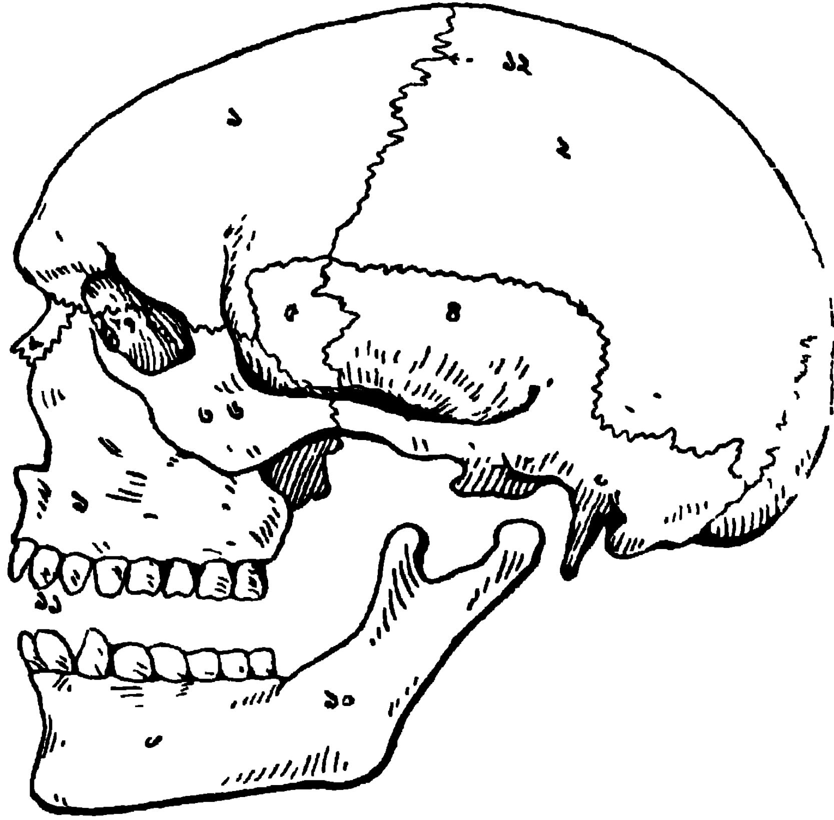


৪নং চিত্র—নরকঙ্কাল

মস্তক—জীব দেহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। ইহার ভিতর নর-দেহের সর্বাপেক্ষা সার বস্তু **মস্তিষ্ক** (Brain) রহিয়াছে। মস্তিষ্ক মানব দেহের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া পাছে ইহাতে কোনরূপ আঘাত লাগে তাই ভগবান ইহাকে শক্ত হাড়ের দ্বারা সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। মোট ২২খানি হাড়ে একটি কৌটা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে মস্তিষ্ক রক্ষিত হইয়াছে। মস্তকে আমাদের কর্মে-ন্দ্রিয়ের অধিকাংশগুলি আছে, সেই হিসাবেও মস্তক আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ। মস্তকের সর্বোপরি অংশে মস্তিষ্ক জল সিক্ত একখণ্ড স্পঞ্জের মত বিদ্যমান। মস্তিষ্কের বিষয় পরে শিখিবে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ঠোঁট ইত্যাদি সকলই মস্তকে আছে, ইহাদের এক একটির বিষয় কিছু কিছু বলিতে গেলেও অনেক কিছু বলিতে হইবে। মস্তক গোলাকার একটি বলের মত বলিলেও চলে

দেহ কাণ্ড বা ধড—ইহা মস্তক অপেক্ষা অধিকতর লম্বা, চওড়া এবং পুরু। দেহের অপেক্ষাকৃত সরু অংশ গলার দ্বারা ইহা মাথার সহিত সংযুক্ত আছে। হাত, পা এবং মাথা কাটিয়া দিলে ধড়টি প্রায় কুমড়ার আকার ধারণ করে। এই ধড়কেও মোটামুটি তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে, গ্রীবা, বক্ষ ও উদর। মস্তকের মস্তিষ্কের মতই ধড়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ **হৃদয়** (Heart), বক্ষ



৫নং চিত্র—মাথার হাড

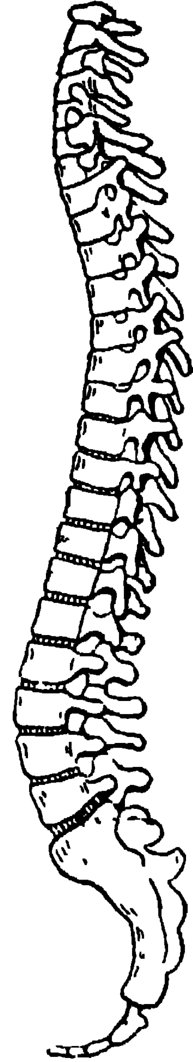
গহ্বরে অবস্থিত। এঞ্জিন যেমন সমস্ত ট্রেণটিকে চালাইয়া লয় আমাদের দেহ যন্ত্রের এঞ্জিন হৃদয় সেরূপ আমাদের দেহ যন্ত্রকে চালাইয়া থাকে। এই এঞ্জিন যে কি উপায়ে চলিতেছে তাহা এখনও মানুষের জ্ঞানের অতীতই রহিয়াছে। মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুই-ই সমান প্রয়োজনীয়, একটির অভাবে অপরটি বাঁচিতে পারে না। তাই দেহ যন্ত্রের মস্তক যেমন প্রয়োজনীয়, দেহ কাণ্ড ঠিক তেমনই প্রয়োজনীয়। ইহাদের কোনটি নষ্ট হইলে আমাদের দেহ নষ্ট হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু হস্তপদাদি সেরূপ মূল্যবান অংশ নহে। ইহাদিগকে বাদ দিলেও আমরা বাঁচিতে পারি। দেহযন্ত্রে

বাহ্য প্রয়োজন সরবরাহ করিবার জন্য ইহারা ভৃত্যের ন্যায় কার্য করে। চক্ষু কর্ণাদি আছে বলিয়া মস্তক তবু কিছু আমাদের বাহ্য কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু সে দিক দিয়া ধড়কে একেবারে নিষ্ক্রিয় বলা যাইতে পারে।

মস্তিষ্ক যেমন কতকগুলি চওড়া হাড়ের কৌটার মধ্যে রক্ষিত হৃদয়ও সেইরূপ বক্ষ গহ্বরে হাড়ের খাঁচায় সুরক্ষিত। এখানকার যে হাড়গুলি খাঁচা প্রস্তুত করিয়াছে তাহারা কিন্তু মাথার হাড়ের মত চেপ্টা নহে। ইহারা কাঠির মত সরু এবং লম্বা। এই খাঁচাটিও মাংস ইত্যাদি দ্বারা আবৃত। বাহির হইতে আক্রান্ত হইলে সহজে হৃদয় যাহাতে আঘাত পাইতে না পারে তজ্জন্য গহ্বরটি আয়তনে বেশ বড় রাখা হইয়াছে। মেরুদণ্ডই দেহের প্রধান অস্থি। ইহার জন্য দেহের কাঠাম সুদৃঢ় অথচ খাড়া থাকে, মেরুদণ্ড না থাকিলে সমস্ত দেহকাণ্ডটি পাকাইয়া পিণ্ডাকার হইয়া যাইত। তথাপি এই মেরুদণ্ডকে অল্প বাঁকাইতে পারা যায়। তোমাদের মধ্যে অনেকেই কুব্জ হইয়া বসিবার জন্য শিক্ষক মহাশয়ের ধমক খাইয়া থাক। মেরুদণ্ডের হাড় যদি নমনীয় না হইত তবে মানুষ কখনও পিঠ বাঁকাইয়া কুঁজা হইয়া বসিতে পারিত না। তোমরা বড় বড় মাছ কুটিবার সময় দেখিয়াছ মাছের শিরদাঁড়ার হাড় কেমন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, যেন মনে হয় কতকগুলি খণ্ড হাড় মালার মত গ্রথিত রহিয়াছে। আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়ও ঐরূপ খণ্ড খণ্ড, একত্র গ্রথিত হইয়া সমস্ত মেরুদণ্ডটিকে সাজাইয়া রাখিয়াছে, এক একটি খণ্ডকে **কশেরুকা** (Vertebra) বলা হয়। এই কশেরুকার সংখ্যা তেত্রিশ। এই তেত্রিশখানি কশেরুকার সাতখানি **গলদেশীয়** (Cervical), বারখানি **পৃষ্ঠদেশীয়** (Dorsal), পাঁচখানি **কটিদেশীয়** (Lumbar), পাঁচখানি **বস্তিদেশীয়** (Sacral) এবং নিচের দিকে চারিখানি **পুচ্ছদেশীয়** (Cocygeal)। কশেরুকার প্রত্যেকটি ফাঁপা, এক একটিকে পৃথক করিলে বেশ একটি আংটির মত দেখায়। সমস্ত কশেরুকাগুলি যখন একত্র সংবদ্ধ থাকে তখন ইহার ভিতর যে একটি নর্দমার মত নালী প্রস্তুত হয় তাহার ভিতর **মেরুমজ্জা** (Spinal cord) পূরা থাকে। এই মেরুমজ্জা এই নালীর ভিতর একটি মোটা দড়ির

মত লম্বমান থাকিয়া নালীটি বন্ধ করিয়া রাখে। এই মেরুমজ্জা কতকটা ঘৃতের ন্যায় পদার্থ। তোমরা বড় মাছের শিরের কাঁটার ভিতর এইরূপ পদার্থ দেখিতে পাইবে। কশেরুকা-গুলির সন্ধিস্থলে এক একটি **তরুণাস্থির** (Cartilage) গদি থাকে। আমাদের কানের পাতাও তরুণাস্থি দিয়া গঠিত। তাই আমরা কানের পাতা অনেকটা দুমড়াইতে পারি।

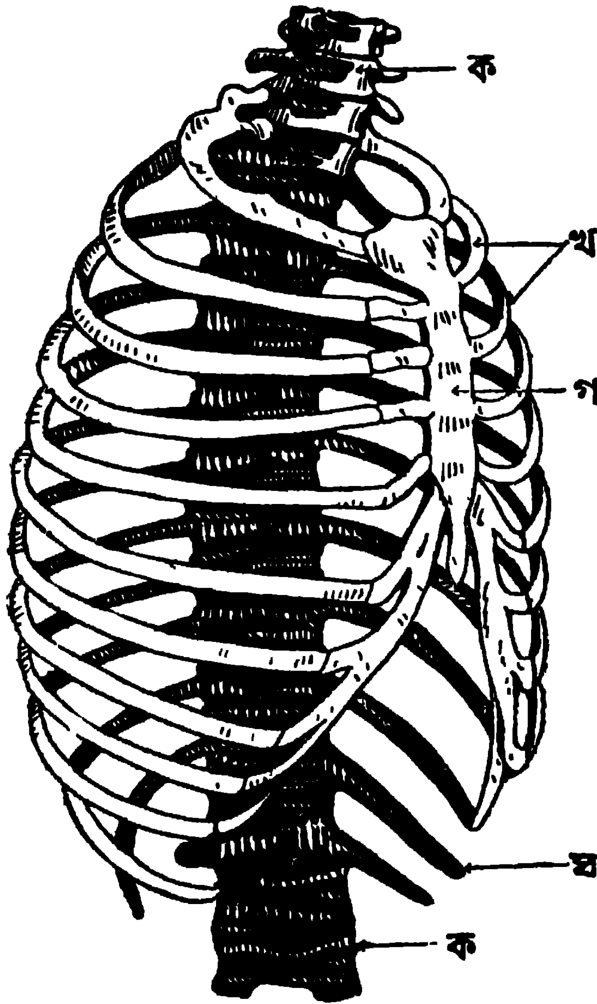
৪নং চিত্রে একটি নরকঙ্কাল দেখান হইয়াছে। ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা নরকঙ্কালে কত ভিন্ন প্রকারের হাড় হইতে পারে দেখান হইয়াছে। স্মরণ রাখিও প্রত্যেক নম্বরের হাড় সংখ্যায় একাধিক হইতে পারে। চিত্রটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এক প্রকারের প্রত্যেক হাড়ে ভিন্ন নম্বর দেওয়া নাই। ৫নং চিত্রে মাথার খুলির মোট ২২ খানি হাড়ের ১১ খানির নম্বর দেওয়া আছে। বাকি ১১ খানি হাড় প্রত্যেক হাড়টির বিপরীত দিকে অবস্থিত।



৬নং চিত্র—মেরুদণ্ড ও কশেরুকা

গল দেশ :—মুখ গহ্বরের নিচে চোয়াল, তাহার নিম্নদেশ হইতে গলদেশ। গলদেশে যেমন মেরু মজ্জার পথ লম্বমান সেইরূপ আরও কয়েকটি নল বর্তমান। তাহাদের মধ্যে দুইটির কথা এখানে বলি। একটি **অন্ননালী** (Œsophagus), অপরটি **শ্বাসনালী** (Trachæa)। নাসিকা গহ্বর হইতে যে নালী আরম্ভ হয় তাহা মুখ গহ্বরে মিলিত হয় বটে কিন্তু মুখ গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ইহা দেহ কাণ্ডের দিকে চলিয়া যায়। আবার মুখ-গহ্বর হইতে অন্ননালী নির্গত হইয়াছে। শ্বাসনালী ও অন্ন নালীর সংযোগ স্থানকে **ফ্যারিংস** (Pharyngs) বলা হয়। তাহা হইলে মুখ গহ্বর যেন একটি হ্রদ এবং

শ্বাসনালীর নিচেব অংশ ও অন্ননালী যেন দুইটি নদী। ইহাদেব সংযোগ স্থলে **অধি-জিহ্বা** (Epiglottis) একটি কপাটিকাব (Valve) কাজ কবে। মুখের গহ্ববেব উপবিভাগ **তালু** (Palate)। **তালুর কোমলাংশ** (Soft palate) একটি কপাটিকার মত শ্বাসনালীব পথ খুলিয়া দেয ও বন্ধ কবে। শ্বাসনালীব দ্বাবা আমাদেব দেহে বাযু চলাচল কবে এবং অন্ননালী দ্বাবা ভুক্ত দ্রব্য উদবে চলিয়া যায। বাযু ও ভুক্ত দ্রব্যের যাতায়াতেব সময গোল বাধে ফ্যাবিংসে। এককালে যদি শ্বাসেব কার্য এবং ভোজন কায চালান হয তবে ভুক্ত দ্রব্য অনেক সময উপবে উঠিয়া শ্বাস নালীতে চলিযা যায। এই সময আমাদেব বিষম লাগে। তাই একসঙ্গে শ্বাস কার্য ও ভোজন কায চালান যায না। বিষম লাগিলে এইজন্য অনেক সময নাক দিযা ভুক্তদ্রব্য বাহির হইযা থাকে।



৭নং চিত্র—বুকেব হাড

উক্ত দুই প্রকাব নালী ছাড়াও শিবা, ধমনী প্রভৃতি গলদেশ দিযা প্রবাহিত, ইহাদেব বিষয় পরে বলা যাইবে।

বক্ষ গহ্ববেব খাঁচাটি বাব জোড়া **পঞ্জরাস্থি** (Ribs) দ্বারা নির্মিত হইযাছে। বাবটি কশেরুকাব দশটির দুই পাশ হইতে ঐ বাব জোড়ার দশ জোড়া পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া সম্মুখেব **বক্ষফলকে** (Sternum) মিলিত হইয়াছে এবং দুই জোড়া বাকি দুইটি কশেরুকা হইতে বাহিব হইয়া অর্ধ পথে শেষ হইয়াছে,

বক্ষ ফলক পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। এই সকল অস্থিগুলি একটু চেপ্টা ধরণের। চিত্রে দেখ **ক** দুইটি ভিন্ন কশেরুকা (Vertebra), **খ** দুইটি ভিন্ন পঞ্জরাস্থি, **গ** বক্ষফলক এবং **ঘ** একটি অর্ধপঞ্জর।

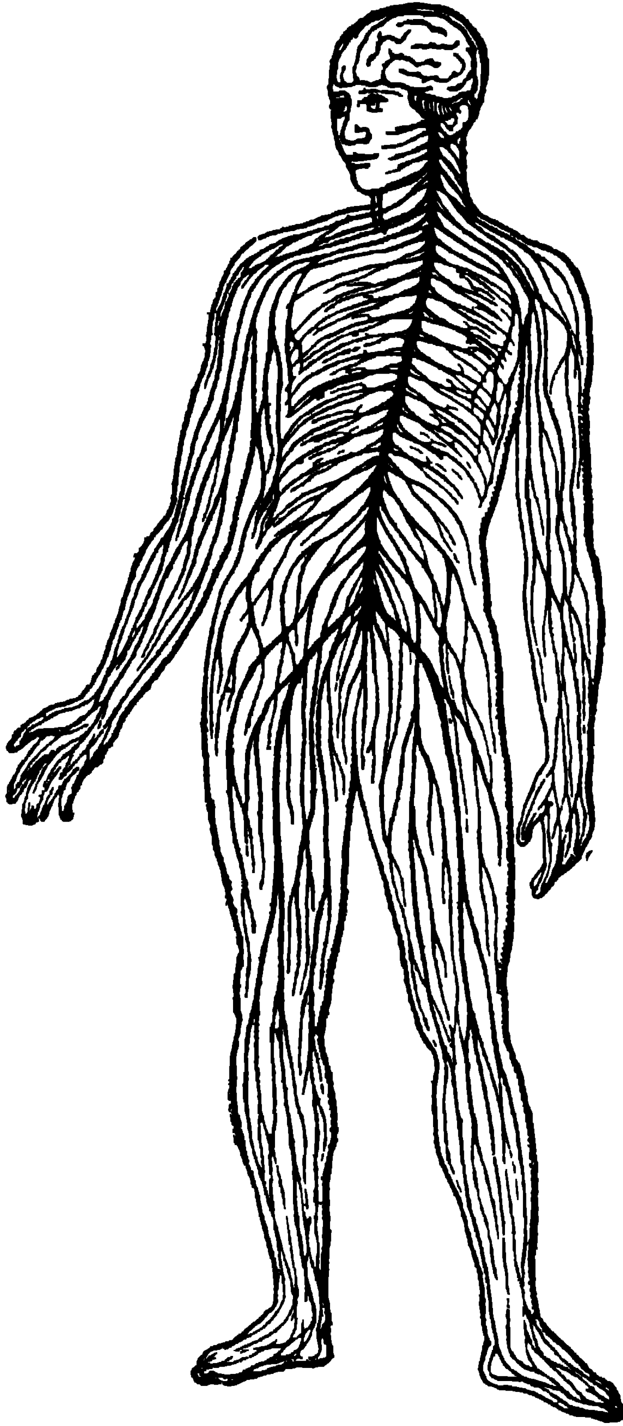
উদর (Abdominal cavity) **:**—অন্ননালী গলদেশ হইতে নামিয়া উদরে অনেকগুলি পাক খাইয়া অবশেষে গুহ্য দেশ পর্যন্ত গিয়াছে। উদরেই অন্ন নালীর আকার নানা রকম হইয়াছে, কোথাও মোটা কোথাও সরু কখনও বা উর্দ্ধগামী কখন নিম্নগামী। ইহার অংশ বিশেষ আবার বিভিন্ন কার্যও করিয়া থাকে। সেই হিসাবে ইহার বিভিন্ন নামও হইয়াছে। উদরেই **প্লীহা** (Spleen), **যকৃত** (Liver), **বৃক্ক** (Kidney) ইত্যাদি আছে।

হাত ও পা :—ইহারা প্রত্যেকেই তিন অংশে বিভক্ত। **প্রগণ্ড** (Upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (Fore arm) ও **চেটো** (Palm) যেমন হাতের তিন অংশ, **উরু** (Thigh), **জঙ্ঘা** (Shank) ও **পদতল** (Foot) তেমনই পায়ের তিন অংশ। এই দুই অংশের অস্থি বিন্যাস প্রায় সমান। প্রগণ্ডে ও উরুতে একখানি করিয়া লম্বা অস্থি, প্রকোষ্ঠে ও জঙ্ঘায় দুইখানি করিয়া অস্থি আছে। হাতের চেটোতে ২৭টি কিন্তু পদতলে ২৬টি করিয়া অস্থি আছে।

নার্ভ-তন্ত্র (Nervous System)

আমাদের মস্তিষ্ককে যদি কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিস ধরা যায় তবে নার্ভ-তন্তুগুলি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত তারের সহিত তুলনীয় হইবে। তড়িৎ বহনই যেমন টেলিগ্রাফ তারের কার্য, তেমনই দেহের আনন্দ বা বেদনা ইত্যাদি অনুভূতি বহন করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দেওয়াই ইহাদের কার্য। মনে কর আমাদের দেহের কোন স্থানে পিন ফুটিয়া গেল, আমরা কিন্তু তৎক্ষণাৎ বেদনা অনুভব করি না। পিন ফুটিবার পর এই নার্ভ মস্তিষ্কে গিয়া খবর দিলে তবে আমরা বেদনার অনুভূতি পাইব। অবশ্য একথা ঠিক যে এই সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া গিয়া

আমাদেব অনুভূতি জাগাইতে যে সময় যায় তাহা অতি অল্প , এমন কি কাজ দুইটি একসঙ্গে হয় বলিলেও চলে।



৮নং চিত্র—নার্ভ-তন্ত্র

মস্তিষ্ক এবং মেরু-মজ্জা নার্ভতন্তুগুলি হইতে উদ্ভুত হইযা দেহেব চারিদিকে বিস্তৃত হইযা আছে। শুধু যে নার্ভ বার্তাবহেব কার্য কবে তাহাই নহে। ইহাবা শবীরেব যন্ত্রাদি শাসনাধীনে বাখে এবং দেহ যন্ত্রেব প্রত্যেকটিব কার্য নিয়ন্ত্রিত কবে বা প্রত্যেকটিকে কাজেব নির্দেশ দিয়া থাকে।

সুখাদ্য সম্মুখে আসিলে চোখেব নার্ভ গিয়া মস্তিষ্কে খবব পাঠায , অমনই আব একটি নার্ভ মস্তিষ্ক হইতে আসিযা একটি গ্ল্যাণ্ডকে লালা নিঃসবণ কবিতে বলে , অমনই আমাদেব জিহ্বায় জল আসে। অন্য নার্ভ আসিয়া হাতকে কাজ কবিতে বলিলে হাত পেশী সঙ্কোচন ও প্রসাবণ কবিয়া ঐ খাবাব মুখে তুলে এবং দাঁত চিবায় , এইরূপে পববর্তী কার্য সকল সাধিত হয়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তের কার্যই নার্ভ মস্তিষ্কে পাঠাইয়া দেয় এবং কাহাকে কি করিতে

হইবে প্রতি অঙ্গে প্রতি মুহূর্তে নির্দেশ আনিয়া দেয়। তাহা হইলে নার্ভ দুই রকম—এক রকম বাহিরের অনুভূতি মস্তিষ্কে লইয়া যায়, অপরগুলি মস্তিষ্ক হইতে নির্দেশ আনে। প্রথম প্রকারের নার্ভকে **অন্তর্বাহী** (Afferent) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে **বহির্বাহী** (Efferent) বলা হয়।

মস্তিষ্ক রাজার মত থাকিয়া নার্ভগুলি দ্বারা আপনার প্রভাব সমস্ত দেহের উপর ছড়াইয়া বসিয়াছে। দেহের সকলের খবর লইয়াই মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় থাকে না, যাহাতে প্রতি অঙ্গ ক্রিযাশীল হয় তাহার ব্যবস্থা করে।

নিউক্লিয়াসযুক্ত নার্ভকোষ দ্বারা নার্ভসূত্র গঠিত। কোন অঙ্গের ঐ নার্ভ-কোষগুলি মরিয়া গেলে নার্ভগুলিও মরিয়া যায়। তখন যে অঙ্গে ঐ নার্ভগুলি থাকে সে অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। তোমরা পক্ষাঘাত রোগী দেখিয়াছ। তাহাদের অঙ্গগুলির পরিবর্তন কিছুই বুঝা যায় না—কিন্তু সেই সকল অঙ্গের নার্ভ মৃত বলিয়া অঙ্গগুলি অকর্মণ্য হইয়া থাকে।

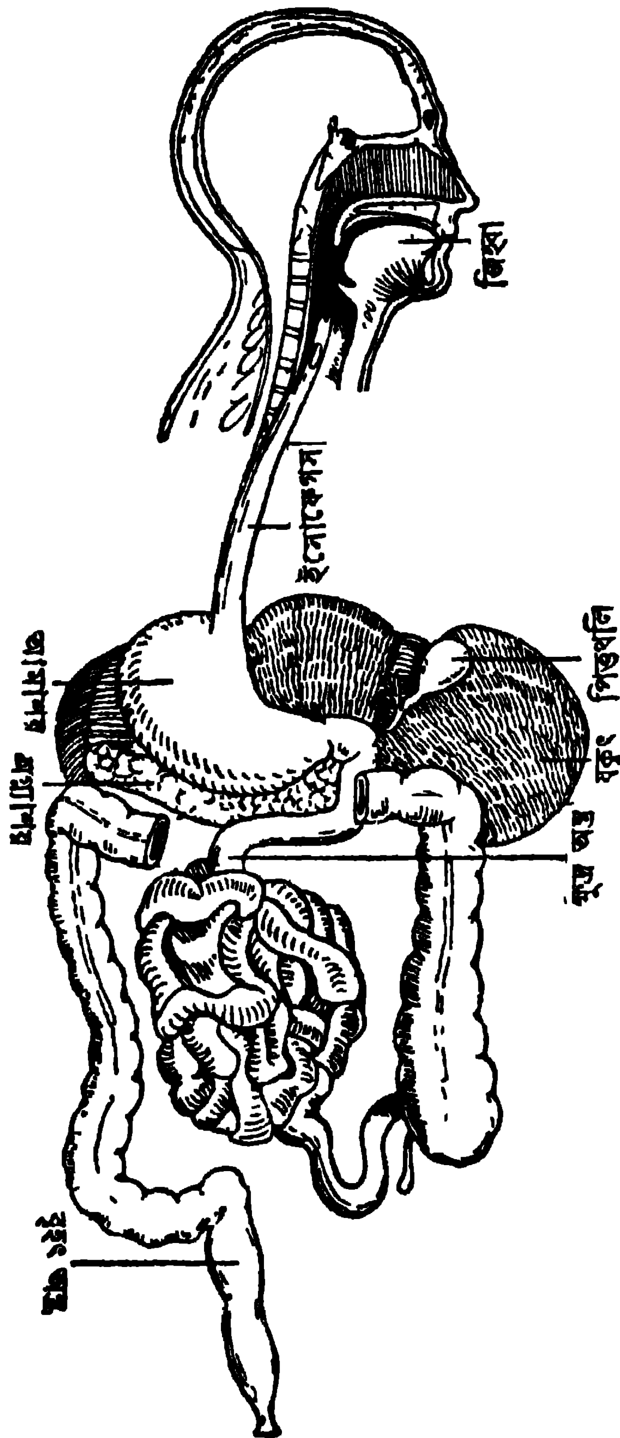
পাচন-তন্ত্র (Digestive System)

মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত লম্বিত দীর্ঘ নালী পথকে পচন তন্ত্র ধরা হয়। ইহার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রিয়া হইয়া থাকে।

(১) মুখের মধ্যে ক্রিয়া—খাদ্য-দ্রব্য মুখে পুরিয়া দন্ত, জিহ্বা ও লালার সাহায্যে উত্তমরূপে চিবাইয়া শক্ত ও কঠিন খাদ্য-দ্রব্য নরম করিতে হয়।

মুখের এক এক দিকে তিনটি করিয়া দুই পার্শ্বে ৬টি **লালাগ্রন্থি** (Salivary-gland) আছে। খাদ্য-দ্রব্য চিবাইবার সময় এই সকল গ্রন্থি হইতে প্রচুর পরিমাণে **লালা** নিঃসৃত হয় এবং এই লালাই কঠিন খাদ্য-দ্রব্যকে নরম ও সরস করিয়া গিলিবার সুবিধা করিয়া দেয়। খাদ্য-দ্রব্য যত কঠিন হয়, প্রয়োজন অনুসারে লালাও তত বেশী বাহির হয়। খাদ্যদ্রব্য নরম ও তরল করাই লালার একমাত্র কার্য নয়। উহার **টায়ালিন্** (Ptyalin) নামক একটি পদার্থ আছে, তাহা শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করাইতে সাহায্য করে।

(২) **পাকস্থলীর মধ্যে ক্রিয়া**—খাদ্য-দ্রব্য গিলিবার পব উহা পাকস্থলীতে যাইয়া সঞ্চিত হয়, কিন্তু পূর্বেই শ্বেতসাব-জাতীয় খাদ্যের কিয়দংশ টায়ালিন্ দ্বাবা পবিপক্ক হয়। খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছিবা-মাত্রই পাকস্থলী হইতে একপ্রকার বস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত বস্তুব সঙ্গেমিশ্রিতহইতে থাকে। **পেপ্‌সিন-হাইড্রোক্লোরিক্ অ্যাসিড্‌ই** (Pepsin-hydrochloric Acid) এই বসেব প্রধান উপাদান। এই বসেব নাম **পাকস্থলী-রস**। সুতরাং ইহা অম্লগুণবিশিষ্ট ও জীবাণু-নাশক এবং প্রোটিন জাতীয পদার্থকে পবিপাক কবিতে পাবে। ইহাদেব জন্য খাদ্য-বস্তুব সঙ্গে কোন প্রকাব অনিষ্টকর জীবাণু শরীরে প্রবেশ কবিযা রোগোৎপাদন কবিতে পাবে না।



৯ নং চিত্র—পাচন-তন্ত্র

পাকস্থলী-রসের মধ্যে যে পেপসিন আছে, তাহা প্রোটীন-জাতীয পদার্থকে হজম কবিতে বিশেষ সাহায্য

করে। পেঁপেব আটায পেপ্‌সিন যথেষ্ট পবিমাণে থাকে। সেই জন্য মাংস রাঁধিবাব সময় উহাতে পেঁপেব আটা দিলে সহজেই উহা সিদ্ধ হয়।

পাকস্থলী-বসে আব একটি পদার্থ আছে। উহার নাম **রেনেট্** বা **রেনিন** (Rennet বা Rennin)। ইহা তুধকে দধিতে পবিণত কবে। তুধ আমাদের একটি অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য বটে; কিন্তু উহা পাকস্থলীতে গিয়া বেনেটেব সাহায্যে প্রথমত দধিতে পবিণত হয, পবে হজম হয। এইজন্যই দেখা যায যে, তুধ খাওয়াইবাব অল্প পবে বমি কবিলে শিশু দধিই বমি কবে।

(৩) **ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে ক্রিয়া**—পাকস্থলীতে ভুক্ত দ্রব্যেব অংশ মাত্র পবিপক্ক হয। এইরূপে পাচিত ভুক্ত দ্রব্য তাহাব পব ক্ষুদ্রান্ত্রে নীত হয়। এইখানেই পবিপাক-ক্রিযা প্রায সম্পূর্ণ হয। এই স্থানে যকৃত হইতে **পিত্তরস**, অগ্ন্যাশয় হইতে **ক্লোমরস** (Pancreatic Juice) এবং ক্ষুদ্রান্ত হইতে **ক্ষুদ্রান্ত্র-রস** নির্গত হইযা ভুক্ত দ্রব্যেব সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয এবং উহাকে সম্যকরূপে পবিপাক কবিতে সাহায্য কবে।

ক্লোম-বসেব মধ্যে অন্যান্য পদার্থেব সহিত প্রধান তিন প্রকাব বস আছে। উহাবা অন্যান্য পাচক-বস হইতে অত্যধিক কার্যকবী। এই বস নিজেই শ্বেতসাব, স্নেহ ও প্রোটীন জাতীয় পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করাইতে সক্ষম। স্থতবাং পবিপাক-ক্রিয়াব জন্য অগ্ন্যাশযেব স্থান অতি উচ্চে। অগ্ন্যাশয়স্থ বস উপযুক্ত পবিমাণে নিঃসৃত না হওযা অজীর্ণ বোগেব একটি প্রধান কাবণ।

অগ্ন্যাশয হইতে **ইনস্থুলিন** (Insulin) নামক একপ্রকাব অত্যাবশ্যকীয অন্তঃস্রাব (Internal secretion) নির্গত হয। আমরা যে সকল শ্বেতসাব-পদার্থ খাদ্যেব সঙ্গে খাই, উহা প্রথমত চিনিতে পবিণত হয়। ইন্‌স্থলিনই এই চিনিকে জল ও কার্বনডাই-অক্সাইড্ বাষ্পে পবিণত কবিযা জীবদেহে তাপ সৃষ্টি কবে।

যকৃৎ (Liver) একটি অতি প্রযোজনীয গ্রন্থি। উহা শবীবেব বহু কার্য সম্পাদন কবিয়া থাকে। যকৃৎ হইতে **পিত্তরস** নিঃসৃত হইয়া পিত্তকোষে সঞ্চিত হয়। পিত্তকোষ হইতে উক্ত পিত্তবস ক্ষুদ্রান্ত্রে যাইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া

স্নেহ-জাতীয় পদার্থকে হজম করাইয়া দেয়। ক্ষুদ্রান্ত্রে শ্বেতসার জীর্ণ হইলে উহা চিনিতে পরিণত হইয়া রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। **যকৃৎ দেহস্থিত চিনির আধার।** দেহের প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চিত চিনি দেহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

দেহস্থিত চিনিকে শরীররূপ বাষ্পীয়পোতের কয়লা বলা যাইতে পারে, কারণ, কয়লা পুড়িয়া যেমন তাপে পরিণত হয়, চিনিও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে দেহের মধ্যে তাপ উৎপাদন করে। আবার, কয়লা পুড়িলে যেমন জল ও কার্বনডাই-অক্সাইড্ উৎপন্ন হয়, চিনিও দেহের মধ্যে এই দুই পদার্থই উৎপন্ন করে।

ভুক্ত দ্রব্যের স্নেহ-জাতীয় পদার্থ যকৃৎ-নিঃসৃত পিত্তরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া অগ্ন্যাশয়স্থ রসের সাহায্যে সাবান জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং দ্রবীভূত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ও শরীরের মেদ-স্তরে সঞ্চিত হয়।

মেদ-স্তর পেশী-স্তরের উপরে বর্তমান থাকিয়া শরীরকে সুগোল করে ও শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মেদ তাপের সুপরিবাহী নহে বলিয়া শরীরের অভ্যন্তরে উৎপন্ন তাপকে বাহির হইতে দেয় না, ইহাতে শরীর গরম থাকে। সর্বোপরি, দেহে শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থের অভাব হইলে মেদ-ই জল ও কার্বনডাই-অক্সাইডে পরিণত হইয়া শরীরে তাপ এবং শক্তি (Energy) সঞ্চার করে। শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করিতে শ্বেতসার অপেক্ষা মেদ অনেক বেশী ক্ষমতা-শালী। **মেদকে ঘনীভূত শক্তি** (Condensed Energy) বলা হয়।

প্রোটীন-জাতীয় পদার্থের কিছু অংশ পাকস্থলীর পেপ্‌সিন দ্বারা পরিপক্ক হয়। কিন্তু অগ্ন্যাশয়স্থ রসের পেপ্‌সিন্ নামক পদার্থ দ্বারাই প্রোটীন-জাতীয় পদার্থের বাকি প্রায় সম্পূর্ণ অংশের পরিপাক হয়। এই জীর্ণ পদার্থ দ্বারাই জীব-শরীরের ক্ষয় পূরণ হইয়া থাকে ও নূতন জীব-কোষ তৈয়ারী হইয়া শরীরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। সুতরাং আমরা খাদ্যদ্রব্যের সহিত যে **প্রোটিন-জাতীয় পদার্থ** খাই, উহাই জীর্ণ হইয়া শরীরের **জীব-কোষ প্রস্তুত করে।**

খাদ্য হইতে দেহ গঠনের উপযোগী উপাদানগুলি গ্রহণ করিবার পর অনেক

অপ্রয়োজনীয় জিনিস পড়িয়া থাকে। এই অপ্রয়োজনীয় পদার্থের কতক অংশ যকৃতে আসিয়া নির্দোষ হইয়া ইউরীয়া (Urea) এবং ইউরিক অ্যাসিডে (Uric Acid) পরিণত হয় এবং বৃক্কের (Kidney) মধ্য দিয়া মূত্রাকারে ও চর্মের মধ্য দিয়া ঘর্মাকারে শবীব হইতে বাহির হইয়া যায়। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে তাহাদেব বিভিন্ন নির্গমন পথে পাঠানই বৃহদন্ত্রেব প্রধান কাজ।

রক্তসংবহন তন্ত্র (Circulatory System)

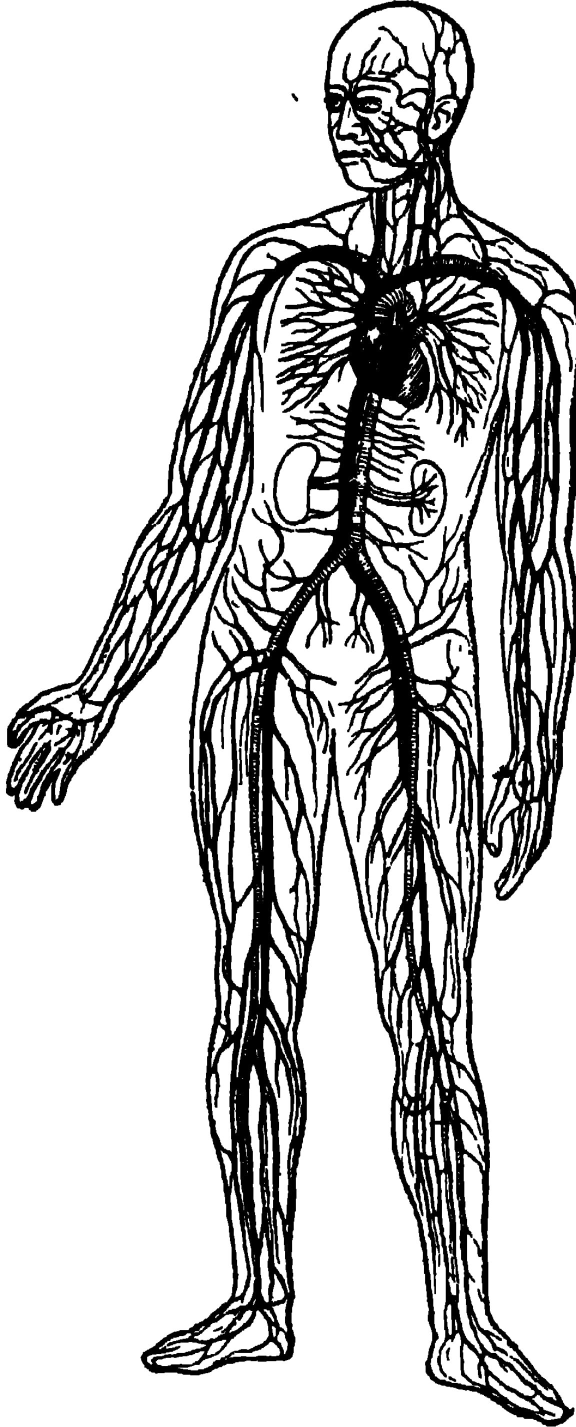
বক্ত আমাদেব শবীবের প্রধানতম উপাদান। যতক্ষণ বক্তস্রোত আমাদেব দেহে প্রবাহিত, ততক্ষণ আমাদেব দেহে জীবন—বক্তস্রোত বন্ধ হইলেই আমবা মবিয়া যাই। হাত টিপিয়া আমবা যে নাড়ী দেখি তাহা দ্বাবা আমবা বুঝিতে চাই আমাদেব দেহে ঠিকমত রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে কিনা। বক্ত আমাদেব শবীবে শক্তিব উৎস; আমাদেব দেহ হইতে কোন কাবণে অধিক বক্তস্রাব হইলে আমবা অবসন্ন হইয়া পড়ি।

আমবা যে খাদ্য খাই তাহাব অপ্রয়োজনীয় অংশ বিষ্ঠারূপে ত্যাগ কবি, বাকি অংশ দেহের বিভিন্ন উপাদান গঠন কাযে লাগিয়া যায। সেই হিসাবে সমস্ত দেহেব বিভিন্ন অংশে বক্ত প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু তাহাব সহিত দূষিত পদার্থ থাকে। বক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দ্বাবা ঐ দূষিত বক্ত বিশুদ্ধ হইয়া পুনবায আমাদেব দেহেব বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। এই সমস্ত প্রক্রিযাটি রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া।

সমস্ত বক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়াব মূলে আমাদেব হৃদয। মানবেব ধাবণাতীত কৌশলে এই হৃদয এক শক্তি বলে তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসাবিত হইতেছে। ইহাব ফলে হৃদয়ের স্ফীতি এবং সঙ্কোচনের ফলেই সমস্ত দেহেব বক্তসঞ্চালন ক্রিযা সাধিত হইতেছে।

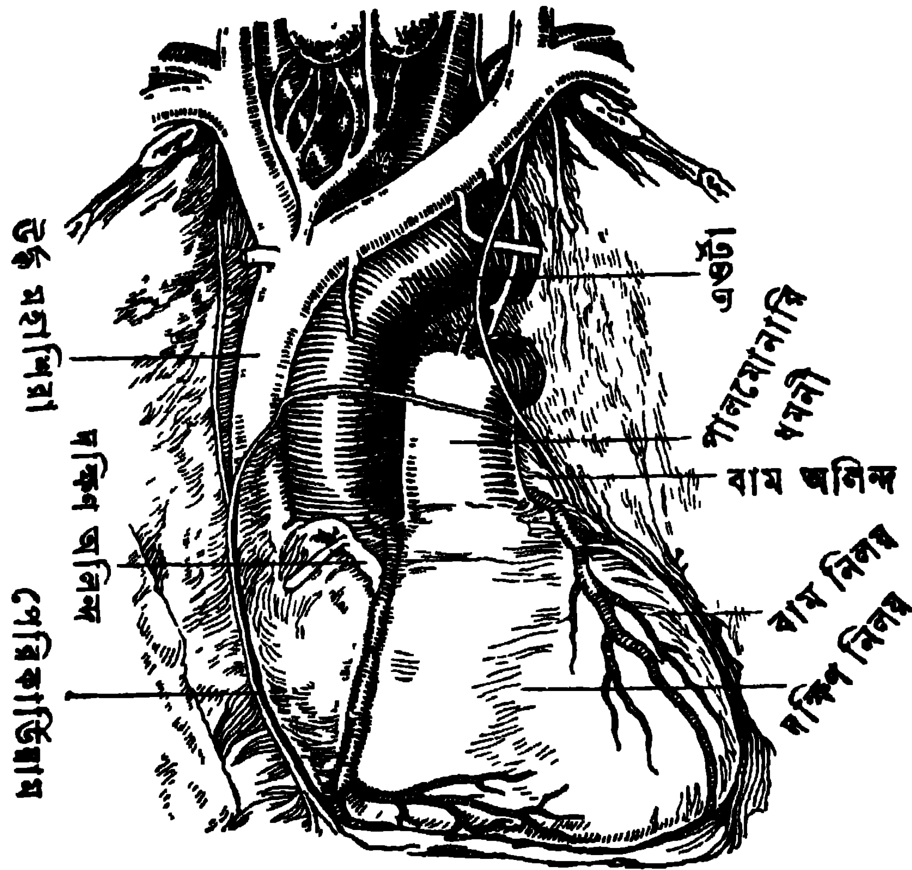
বক্ষগহ্বরে দুইটি ফুস্‌ফুসের মধ্যে হৃদয অবস্থিত। সমস্ত হৃদয়টি প্রত্যেক মানুষেব স্ব স্ব মুষ্টির সমান—দেখিতে নোনা আতাব ন্যায়, ইহা দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রকোষ্ঠ দুইটি আবার প্রত্যেকে দুই ভাগে বিভক্ত। উপবে একটি

ভাগ, নিচে একটি ভাগ। হৃদযেব উপবিস্থ ক্ষুদ্রতব ভাগকে **অলিন্দ** (Auricle) এবং নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ভাগকে **নিলয়** (Ventricle) বলে। হৃদয়ের প্রধান দুই ভাগের যেটি বাম দিকে অবস্থিত সেইটির উপবিস্থ অলিন্দ অর্থাৎ **বাম অলিন্দটি** হইতে বহির্গত হইযা একটি শিবা আসিযা ফুস্‌ফুসে বহু কৈশিক নালিব (Capıllar-ıes) দ্বাবা উহাব সহিত যুক্ত হইয়াছে। আবাব দক্ষিণ নিলয হইতে একটি প্রধান ধমনী আসিয়া ঐরূপ কৈশিক নালী দ্বাবা ফুস্‌ফুসেব সহিত যুক্ত হইয়াছে। উহাদিগকে যথাক্রমে ফুস্‌ফুসীয় (Pulmo naıy) শিরা ও ধমনী বলে। যে মাংসল প্রাচীর দ্বাবা অলিন্দ গঠিত তাহা নিলয় বেষ্টনকারী প্রাচীব অপেক্ষা পাতলা। সমস্ত হৃদয়টি **পেরিকার্ডিয়াম** (Peric-ardium) নামক আবরণে আবৃত, ইহা পরপর দুইটি পাতলা পর্দায় দ্বাবা নির্মিত।



১০নং চিত্র—রক্তসংবহন তন্ত্র

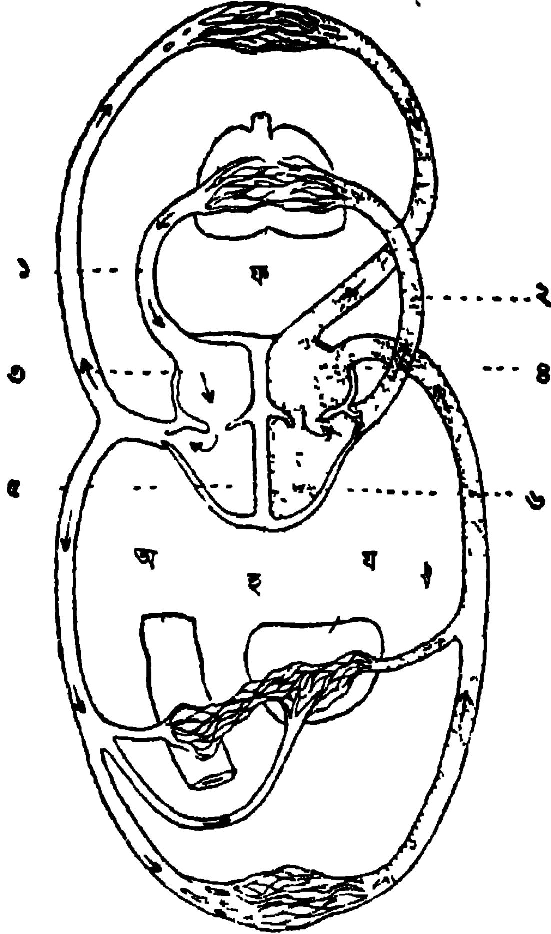
ঊর্ধ্ব মহাশিরা (Superior Venacava) এবং **নিম্ন মহাশিরা** (Inferior Venacava) নামক দুইটি প্রধান শিরা দক্ষিণ অলিন্দ হইতে বাহির হইয়া একটি মাথায় এবং হাতে বা ঊর্ধ্বদেহের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে এবং অপরটি নিম্নাঙ্গের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। তেমনই বাম নিলয় হইতে একটি প্রধান ধমনী বাহির হইয়া পথে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ঊর্ধ্বাঙ্গে এবং অপরটি নিম্নাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উক্ত প্রধান ধমনীটির নাম **এওর্টা** (Aorta)। হৃদয়টি এমন সুকৌশলে



১১নং চিত্র—হৃদয

গঠিত যে দুইটি অংশের সরাসরি কোন সংযোগ নাই। দক্ষিণ অলিন্দে মহাশিরা দুইটি দ্বারা সমস্ত দেহের দূষিত রক্তস্রোত আসিয়া একটি কপাটিকা পার হইয়া দক্ষিণ নিলয়ে পড়ে। এখানে আসিলে উক্ত কপাটিকা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায় এবং সেখান হইতে আর একটি কপাটিকা পার হইয়া ফুস্‌ফুসীয় ধমনী (Pulmonary artery) নামক শিরা পথে রক্তস্রোত ফুস্‌ফুসে চালিত হয়।

এখানে কৈশিক নালী দ্বাবা বায়ুর অম্লজান রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত সংশোধিত কবে। অতঃপব বিশোধিত বক্ত ফুস্‌ফুসীয় শিবা (Pulmonary veins) দিযা বাম অলিন্দে আসে, সেখান হইতে এওর্টা বাহিত হইযা সাবা দেহে ছডাইয়া পডে। ১২নং চিত্রে বক্ত সঞ্চালন প্রণালী দেখান হইল। হৃ হৃদয, ইহাব চাবিটি কক্ষ ৩, ৪, ৫ ও ৬ যথাক্রমে বাম অলিন্দ, দক্ষিণ অলিন্দ, বাম নিলয় ও দক্ষিণ নিলয়। ১ ও ২ ফুসফুসীয় শিবা ও ধমনী, ফ ফুসফুস, অ অন্ত্র ও য যকৃৎ। উপব দিকেব বড কাল নালীটি ঊর্ধ্ব মহাশিবা ও বডশাদাটি এওর্টা এবং নিম্নদিকেব কাল নালীটি নিম্ন মহাশিবা। মস্তকে, ফুস্‌ফুসে, হস্ত ও পদাদিতে ঐ বৃহৎ বৃহৎ শিবা ও ধমনীগুলি কৈশিক নালীতে পবিবর্তিত হইযা পরস্পব মিলিত হইয়াছে।

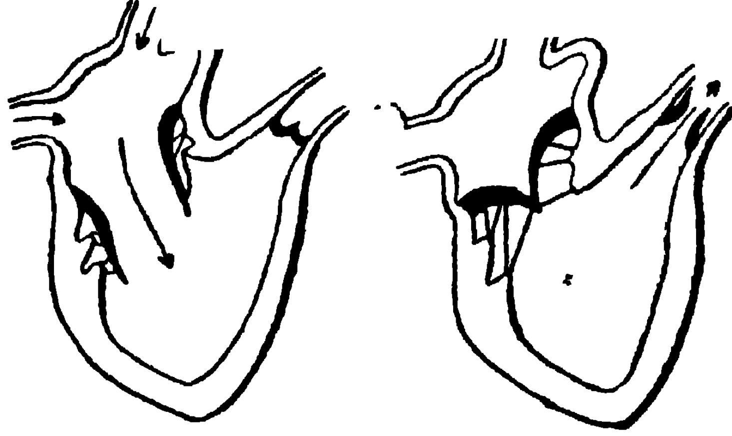


১২নং চিত্র—বক্ত সঞ্চালন

তাহা হইলে দেখা গেল দক্ষিণ হৃদযাংশে তিনটি কপাটিকা এবং বাম হৃদযাংশে তুইটি কপাটিকা বক্তেব গতিপথ নিয়ন্ত্রিত কবিতেছে। তিনটি কপাটিকাব সমাবেশকে **তিনপাল্লা কপাটিকা** (Tricuspid Valve) এবং তুইটি কপাটিকাব সমাবেশকে **তুইপাল্লা কপাটিকা** (Bicuspid Valve) বলা হয। চিত্রে ইহাদের পৃথক পৃথক দেখ; তীরেব সাহায্যে বক্তের গতিপথও দেখান হইল।

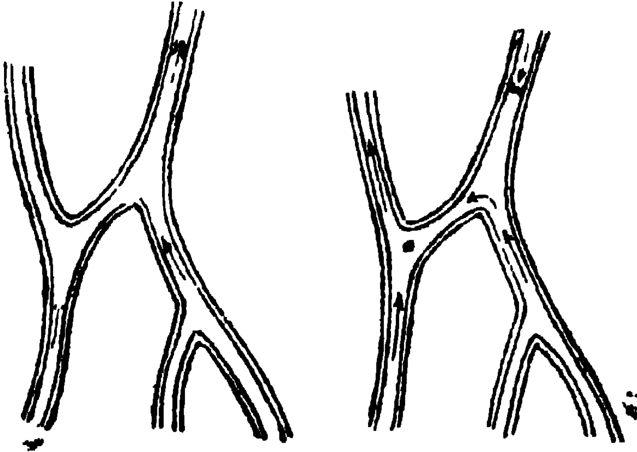
শরীরের প্রতি অংশেই শিরা ও ধমনী জালেব মত ছডাইয়া আছে। যে যে স্থান হইতে কৈশিক শিবা দ্বারা বক্ত হৃদয়ে আসে, হৃদয হইতে ক্রমে কৈশিক

ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত ঠিক সেই সেই স্থানে সঞ্চালিত হয়। ১৪ নং চিত্রে দেখ একটি শিরা বা একটি ধমনীব শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া কিরূপে রক্ত একপথ হইতে অন্যপথে চালিত হইতে পারে।



১৩নং চিত্র—কপাটিকা

আমাদেব শরীরেব কোন স্থান কাটিয়া গেলে বক্ত বাহিব হয। এই বক্ত শিবা বা ধমনীব হইতে পাবে। বক্ত শিরা কিম্বা ধমনী হইতে নির্গত চিনিবাব লক্ষণ—শিবা হইতে নির্গত বক্ত অবিশুদ্ধ বলিয়া ইহাব বঙ একটু কাল মত কিন্তু ধমনীব বক্ত জবাফুলেব ন্যায লাল অথচ শিবাব বক্ত অপেক্ষা ফিকে। দ্বিতীয়ত শিবাব বক্ত অল্প অল্প চুয়াইয়া পড়ে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হৃদয হইতে নির্গত হয বলিযা ধমনীব রক্ত ফিনিক দিয়া পড়ে।



১৪নং চিত্র—শিরা ও ধমনীর শাখা

অতএব কোন অংশের শিরা বা ধমনী কাটিযা গেলে রক্ত নির্গমন বন্ধ করিবার জন্য আমবা এইরূপ ব্যবস্থা কবিতে পারি ; শিবা দিয়া রক্ত হৃদয়ে যায়—হৃদয় বক্ষে অবস্থিত—নিম্নাঙ্গেব শিবা কাটিয়া গেলে শিবাব যে স্থান কাটিয়া যায় তাহাব নিচেব দিক টিপিয়া ও

উর্ধ্বাঙ্গের উপব দিক টিপিয়া ধবিয়া বক্ত বন্ধ করা যায়, অপরন্তু ধমনী কাটিযা গেলে উহাব বিপরীত ক্রিয়া কবিলে বক্ত নির্গমন বন্ধ হয়।

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System)

বায়ু হইতে অক্সিজেন লইয়া শবীরেব বিভিন্ন অংশে প্রেবণ করা এবং শবীব হইতে কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করাই শ্বাসযন্ত্রেব প্রধান কাজ। পূর্বেই বলা হইযাছে আমাদের নাসারন্ধ্র হইতে যে পথ **শ্বাসনল** (Trachœa) পর্যন্ত গিযাছে তাহাবা মুখগহ্বরে গিয়া মিশিয়াছে। যদি নাক বন্ধ কবিযা মুখ দিযা বাযু গ্রহণ কবা হয বা দেহেব কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ কবা যায তবে তাহাতেও শ্বাসকায চলিতে পাবে—তবে কিসের জন্য নাসিকা পথেব প্রযোজন? একথাব উত্তব দিবাব আগে শ্বাসনলি কোথা হইতে কোথায গিয়াছে তাহা বলি শুন। **নাসা পথ** (Nares) হইতে আবম্ভ কবিযা আঁকা-বাঁকা পথ দিযা এই নালী ফ্যাবিংসে গিযা পডে। এই ফ্যাবিংসেব কথা তোমবা আগে শুনিযাছ। সেখান হইতে আবও কিয়দ্দূব গিযা দুইভাগে বিভক্ত হয। এক এক ভাগকে **ব্রঙ্কাই** (Bronchi) বলে। এই ব্রঙ্কাই এবং ফ্যাবিংসএব মধ্যভাগকে **স্বরনালী** (Larynx) বলা হয়। ব্রঙ্কাইগুলি বহু শাখা-প্রশাখায বিভক্ত হইযা অবশেষে ফুস্‌ফুসে গিয়া পড়ে। অতএব নাসাপথ হইতে ফুসফুস পর্যন্ত সমস্ত পথটি **শ্বাসযন্ত্র**। এখন ইহার প্রত্যেক অংশেব কথা ধরা যাউক।

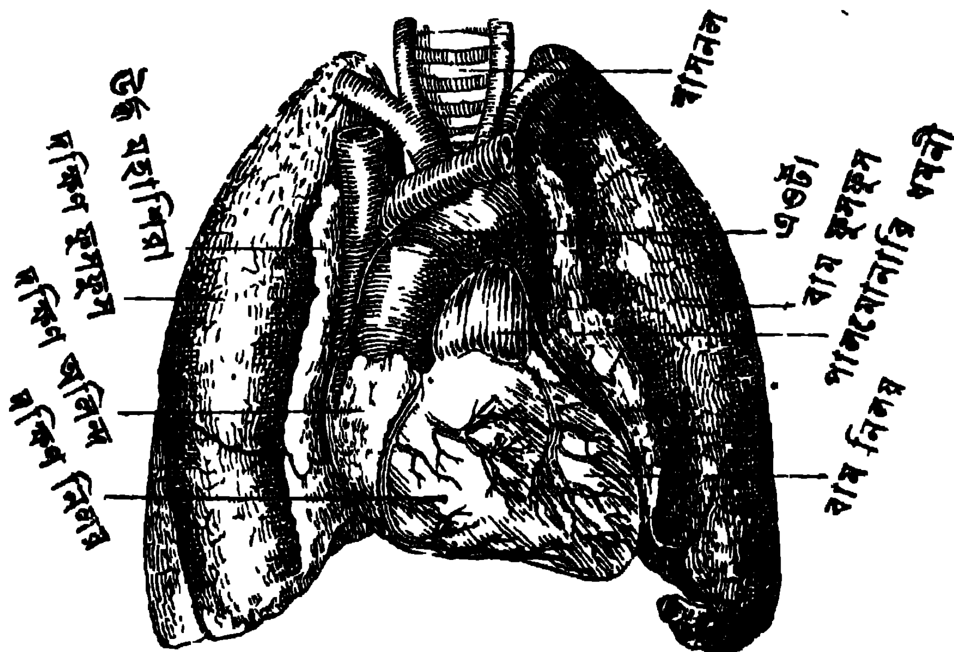
নাসাপথ (Nares)—ত্রিকোণাকাব গহ্বর। ইহাব সম্মুখেব দুইটি দ্বাব **নাসারন্ধ্র**—একটি বন্ধ্র দিয়া অক্সিজেন গ্রহণ কবি অপবটি দিয়া কার্বনডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি। এই নাসাপথ দিযা আসিবাব কালে বাযু বাহিত ধূলিকণাদি এই পথেব সূক্ষ্মলোম রাজিতে আটকাইযা যায় এবং উষ্ণ হইযা উঠে। উষ্ণ বাযুই ফুস্‌ফুসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু মুখ দিযা বাযু গ্রহণ করিলে মুখগহ্বর হইতে শ্বাসনালীতে যাইতে বেশী সময় লয না, কাজেই গরম হইতে পায় না। আবার মুখগহ্বরে নাসাপথের ন্যায বাযুকে ছাঁকিয়া

লইবাব কোন ব্যবস্থা নাই। সেই হিসাবে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেব কাজ চালান শরীবের পক্ষে অনিষ্টকর।*

ফ্যারিংস (Pharynx)—ইহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ফ্যারিংসের উপরাংশে আল্‌জিভ লম্বমান আছে তাহাও বলা হইয়াছে। এইখানে শ্বাসনালী এবং অন্ননালী মুখগহ্ববেব সহিত মিশিয়াছে।

স্বরযন্ত্র (Larynx)—তরুণাস্থি দ্বাবা গঠিত শ্বাসনালীব উপরাংশ ঠিক ফ্যাবিংসএব নিচে। অনেক রোগা লোকেব গলদেশে যেখানে একটি ছোট হাড ঠেলিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থানেই ইহার অবস্থান।

শ্বাসনালী—স্ববযন্ত্রেব পবে এবং ব্রঙ্কাই দুইটিব মধ্যবর্তী স্থান, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায সাডে চারি ইঞ্চ এবং ইহাব পবিধি ২⅙ ইঞ্চ। পাঁঠা কাটা হইলে পাঁঠাব ফুস্‌ফুসের সহিত ইহার শ্বাসনালীর কিরূপ সংযোগ দেখিতে পাব। এই শ্বাসনালীতে ফুঁ দিলে ফুস্‌ফুস্ ফুলিযা উঠে এবং হাওযা বাহিব হইযা গেলে ফুস্‌ফুস্ চুপসাইয়া যায়। শ্বাসনালীব দুইটি বাহু ব্রঙ্কাই। বাযুব অক্সিজেন ব্রঙ্কাই দিযা ফুস্‌ফুসে পৌছায।



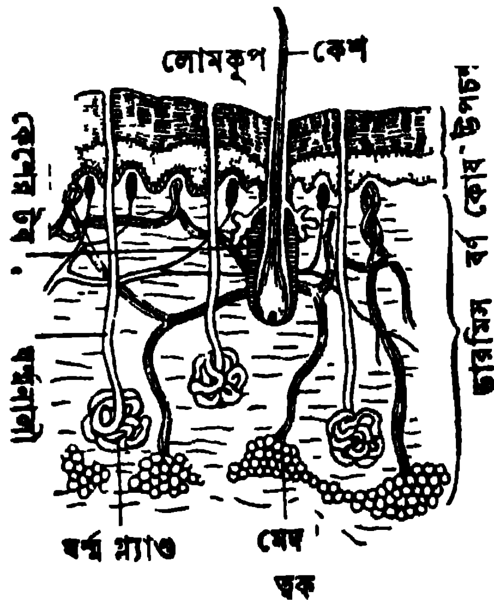
১৫নং চিত্র—ফুস্‌ফুস্

ফুস্‌ফুস (Lungs)—স্পঞ্জের মত জালি জালি পদার্থ। ইহা দুইটি থলিতে

বিভক্ত। আমাদের বুকের মধ্যে হৃদয়—সেই হৃদয়কে ফুস্‌ফুসের দুইটি থলি যেন ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এই ফুস্‌ফুসে বহু কৈশিক রক্তবাহী নালী আসিয়া বিশুদ্ধ অক্সিজেন লইয়া কার্বনডাই-অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। শ্বাসনল ফুটবল ব্লাডারেব নলের মত এবং ফুস্‌ফুস্ যেন ব্লাডাব। শ্বাসনল দিয়া হাওয়া প্রবেশ কবাইলে ফুস্‌ফুস্ ফুলিয়া উঠে এবং হাওয়া ছাড়িযা দিলে চুপসাইয়া যায।

চর্ম (Skin)

চর্ম—আমাদেব স্পর্শেন্দ্রিয়—শীত, গ্রীষ্ম অনুভূতি দেয এবং বাহিবেব অনিষ্ট হইতে শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। চর্মে যে লোমকূপ আছে তদ্বাবা আমাদেব দেহ হইতে দূষিত পদার্থ নির্গত কবিযা থাকি। লোম কিংবা চুল এবং নখ চর্মেব অতিবৃদ্ধি (Outgrowth)। এই চুল আমাদেব দেহকে শীতাতপ হইতে কতক বক্ষা কবে। মানুষ জামা কাপড় পরিযা কতকটা এই কার্য সাধন কবে কিন্তু পশু তাহা পারে না বলিযা ভগবান পশুব গাযে অধিক লোম দিযাছেন। চর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—**বহির্চর্ম** (Epidermis) এবং **অন্তর্চর্ম** (Dermis)। বাহিরের চর্ম অতিশয পাতলা কিন্তু ভিতবেব চর্ম অপেক্ষাকৃত পুরু। বাহিরেব চর্মে শিবা নাই ভিতবেব চর্মে শিবা আছে। তাই অল্প একটু কাটিযা গেলে বা ছিঁড়িয়া গেলে উপবের চর্ম হইতে মাত্র শাদা বসের মত একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয় কিন্তু ভিতরেব চামড়া হইতে রক্তও নির্গত হয়।



১৬নং চিত্র

এপিথিলিয়া কোষ (Epithellial cell) চামড়াকে আবৃত করিয়া আছে। বাহিরের দিকেব কোষগুলি লম্বা লম্বা এবং মৃতপ্রায়। যতই ভিতবেব দিকে যাওয়া যায় ততই কোষগুলি গোলাকার ও সজীব থাকে। বাহিবের দিকে যাহারা আসে তাহাবা মরিয়া যায়। এবং তাহাদেব স্থান ক্রমে নিচেব কোষ অধিকাব করে। ভিতবেব চর্ম হইতে বাহিবের চর্ম পর্যন্ত সরু নালী থাকে। এই নালীকে **ঘর্মকূপ** বলে। ইহাদের গোড়ায় sweat glands থাকে তাহাবা শবীবের দূষিত পদার্থ নালীতে পাঠাইয়া দেয়। বাহিবেব ঠাণ্ডা বাতাসে বাষ্পীভবন হওয়াব দরুণ ক্রমাগত ঘর্ম নির্গত হইতে থাকে। যে দীর্ঘ পথ দিয়া ঘর্ম নির্গত হয় তাহা **ঘর্মনালী** (Pores)। লোমেব গোড়াব দিকে এক প্রকার পেশী থাকে। শীত পাইলে এই পেশী সঙ্কুচিত হয়। তাহাতে লোম খাড়া হইয়া উঠে এবং শীতাতপ রক্ষার সহায় হয। লোমের গোড়ায একটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত গহ্বরে এক প্রকাব চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকিয়া চামড়া এবং চুলকে মসৃণ রাখে। গহ্বরটিকে **কেশটব** বলে।

সংক্ষেপ ঃ—কঙ্কাল আমাদেব দেহের কাঠাম প্রস্তুত কবিয়াছে। প্রায় দুই শতাধিক হাড়েব সমাবেশে এই কাঠাম প্রস্তুত। মেরুদণ্ডই দেহেব প্রধান অস্থি। যেখানে যে রকম হাড় প্রয়োজন সেখানে সেই রকম হাড় দিযা আমাদের মাথাব খুলি, বুকের খাঁচাব মত কাঠাম এবং হাত পা প্রভৃতি প্রস্তুত। মাথার হাড়গুলি চেপ্টা পাতের মত, বুকের পাঁজরা চেপ্টা কাঠিব মত এবং হাত পাযের অস্থি লম্বা দণ্ডের মত। নার্ভের নির্দেশ মত আমাদের শরীরেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজ করে। ইহাদের সাহায্যেই আমাদেব সকল বকম অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছায়। মস্তিষ্ক যেন নার্ভেব রাজা, মস্তিষ্কের আজ্ঞা বহন কবাই যেন নার্ভের কাজ। মুখ হইতে গুহ্যদ্বাব পর্যন্ত দীর্ঘ একটি নালী অন্ননালী নামে খ্যাত। ইহা ফ্যারিংসে অন্ননালীব ও শ্বাসনালীব সংযোগ ঘটাইয়াছে, সেখানে অধিজিহ্বা একটি কপাটিকার কাজ করে। অর্থাৎ শ্বাসনালীতে বায়ু এবং অন্ননালীতে খাদ্য দ্রব্য চালাইয়া দেয়—ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরা বিষম খাই। এই কারণে এক সঙ্গে ভোজন ও শ্বাস গ্রহণ হয় না। অন্ননালীর বিভিন্ন অংশে আমাশব, অগ্ন্যাশয়, যকৃত ইইত্যাদি হইতে বিভিন্ন রস নিঃসৃত হইয়া আমাদের খাদ্যকে পাচিত করিবাব সহায়তা করে। অপ্রয়োজনীয় অংশ বিভিন্ন নির্গম পথে বাহিব হইয়া যায়। নাসাপথ তালুতে ত্রিকোণাকার হইয়া মুখ গহ্বরে আসিয়া পড়িয়াছে। ফ্যারিংস হইতে নির্গত হইয়া ইহার যে অংশ ত্রিকোণাকার তাহাকে

স্বরযন্ত্র বলে। স্বরযন্ত্রের পর খানিকটা নিচে নামিয়া আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কৈশিক নালীর দ্বারা ফুস্‌ফুসে ইহা যুক্ত হইয়াছে। ফুস্‌ফুসে বিশুদ্ধ রক্ত লইয়া যাওয়া এবং সেখান হইতে দূষিত বায়ু বাহির করা ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাস নালীর প্রধান কাজ। ত্বক্ আমাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। লোমকূপ দিয়া ঘর্মরূপে দেহের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালা

১। আমাদের দেহ-কঙ্কালে কোথায় কিরূপ হাড় আছে লিখ। (Describe different kinds of bones of our skeleton stating their location)

২। মাথার এবং বুকের হাড়ের পার্থক্য কি বুঝাইয়া লিখ। (Write explaining the difference of bones found in skull and throat)

৩। নার্ভের কাজ কি সবিস্তার লিখ। (Write in detail the functions of Nerves)

৪। পরিপাক হওয়ার প্রয়োজন কি ? (What is the utility of digestion)

৫। পচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা কি লিখ। (Write down the functions of different parts of alimentary Canal)

৬। আমাদের শ্বাসযন্ত্রের প্রধান কাজ কি এবং কিরূপে তাহা সাধিত হয় লিখ। (Write the chief function of the respiratory system.)

৭। মুখ দিয়া শ্বাস কার্য চালাইলে কি ক্ষতি হয় ? (What is the harm if breathing is effected by mouth ?)

৮। রক্ত সংবহন তন্ত্র বর্ণনা কর। (Describe the whole system of circulation of blood).

৯। কেন হৃদয় হইতে রক্ত চলাচল করে এবং কিরূপে তাহা সাধিত হয় লিখ। (Why blood circulation is effected from the heart and how ?)

১০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :—অধিজিহ্বা, অগ্ন্যাশয়, বহির্চর্ম, কশেরুকা, শিরা, ধমনী ফ্যারিংস ও হিমোগ্লোবিন। (Write short notes on :—Epiglottis, pancreas, epidermis, vertebra, vein, artery, pharynx and Hæmoglobin,)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খাদ্য

খাদ্য—(ক) এঞ্জিনের কয়লার মত ইহা আমাদের শরীরের দুইটি প্রধান কাজ করিয়া থাকে। এঞ্জিনের কয়লার সহিত আমাদের দেহ রূপ এঞ্জিনের কয়লার তফাৎ এই যে, এঞ্জিনের কয়লা কেবলমাত্র তাহাদের কাজ করে, এঞ্জিনের কোন অংশ গঠন কাজে সহায়তা করে না কিন্তু খাদ্য আমাদের দেহের কয়লার কাজ করিলেও রূপান্তরিত হইয়া সময়ে দেহের অংশীভূত হয়।

(খ) আমাদের দেহের উত্তাপ রক্ষা করে এবং জীর্ণ অংশ সরাইয়া দেয়। খাদ্যের কার্য্যকারিতা হিসাবে ইহাদিগকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয়, যথা—গুড়, চিনি ইত্যাদি।

(২) স্নেহ বা চর্বি জাতীয়—যথা তেল, ঘি ইত্যাদি।

(৩) প্রোটিন জাতীয়—আটা, গম, ছানা, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

(৪) জল।

(৫) লবণ জাতীয় পদার্থ।

(৬) ভাইটামিন।

প্রথমোক্ত দুই প্রকার খাদ্যে কার্বনডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে যাহাদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উত্তাপ উৎপন্ন হয় এবং আমাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে দেহ হইতে যে তাপ চলিয়া যায় তাহা পূরণ করিয়া আমাদের শরীরে যে সাধারণ তাপ তাহা রক্ষা করে।

তৃতীয় প্রকার খাদ্যে এ সমস্ত ভিন্ন আরও একটি মূল্যবান পদার্থ থাকে তাহা নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন আমাদের জীর্ণ পেশী গঠন কার্যে অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য তাপরক্ষা বা গঠন কার্যে যে সমস্ত মূল পদার্থের প্রয়োজন বলিয়া উল্লিখিত হইল তাহা ঐ দ্রব্য গুলিতে মৌলিক অবস্থায় না থাকিতেও পারে।

যাঁহারা অধিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের শরীর সাময়িকভাবে তত অধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কাজেই তাঁহাদের শরীরের তাপরক্ষাও গঠন কার্যের জন্য অধিক পরিমাণে আহার্যের প্রয়োজন।

সাধারণত একটি বলিষ্ঠ দেহের জন্য প্রায় ৩০০০ ক্যালরি উত্তাপের প্রয়োজন, প্রায় আধ সের মাখন হইতে ঐ উত্তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হইতে পারে, তাই বলিয়া আধসের মাখন খাইয়া মানুষ সুস্থ থাকিতে পারে না। ইহাতে শরীরের অন্যান্য উপাদান গুলির অনটন ঘটে। তাপ রক্ষা কার্যে মাখন সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। এক পোয়া মাখন শরীরে যে পরিমাণ উত্তাপ জন্মাইতে পারে এক পোয়া চিনি তাহার অর্ধেক উত্তাপ জন্মাইতে পারে। মনে রাখিও এক গ্রাম জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত করিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন তাহাই এক **ক্যালরি** (Calori)।

আমাদের শরীরের উপাদান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় শরীরের শতকরা ৬০ ভাগ জল, এবং বাকি অংশ অন্যান্য জাতীয় পদার্থ। পরিশ্রম করিলে আনুপাতিক পরিমাণে ঐ সকল পদার্থের হ্রাস হয়। ঐ হ্রাস পূরণ করিবার জন্য এবং দেহের সাধারণ বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের মধ্যে উক্ত উপাদানগুলি যথোচিত পরিমাণে থাকা চাই।

সাধারণ মানুষের শরীরে তাপ রক্ষা করিতে হইলে দৈনিক যে উত্তাপ প্রয়োজন তজ্জন্য এবং শরীরের গঠন কার্যের জন্য ঐ ছয় প্রকার খাদ্যই আনুপাতিক হিসাবে খাওয়া দরকার। মোটামুটি ১৪০ গ্রাম প্রোটিন জাতীয় ১০০ গ্রাম চর্বি জাতীয় ও ৫০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে সাধারণ মানুষের উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

আরও একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় শরীরের উপাদান প্রধান যে কয়টি মূল পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন তন্মধ্যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, ফস্ফরস ও নাইট্রোজেন প্রধান।

শর্করা ও চবি জাতীয় পদার্থে নাইট্রোজেন নাই, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে উহা প্রচুর পাওয়া যায়। শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান অংশ কার্বোহাইড্রেট বা কার্বন,

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ঘটিত যৌগিক। এই অক্সিজেনের সহিত অন্য পদার্থের মিলনে তাপের উদ্ভব হয়। এ সকল ছাড়াও শরীরে অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরস্, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, আইডিন ও লৌহ প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যমান। অতএব আহারের মধ্য দিয়া যাহাতে এই সকল পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে তজ্জন্য রকমারি খাদ্যের প্রয়োজন। শরীরের জন্য যে উপাদান প্রভূত পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহা আমরা ফল মূল তরকারী প্রভৃতি প্রত্যেক আহার্যের মধ্য দিয়া গ্রহণ করি এবং পানীয় জল দিয়া জলীয় অংশ পূর্ণ করি। তাই বলিয়া কেবলমাত্র অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বন ইত্যাদি খাইলেও জীব, বিশেষত মানুষ বাঁচিতে পারে না। অনুসন্ধানে জানা যায়, যে জিনিসের অভাবে প্রয়োজনীয় আহার্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানুষ বাঁচিতে পারে না তাহা **ভাইটামিন** (Vitamin)। এই ভাইটামিন আবার বহুবিধ, যথা—ভাইটামিন **এ**, ভাইটামিন **বি**, হইতে ভাইটামিন **এচ**, পর্যন্ত আছে। তাহাদের সকলগুলি দেহে আনুপাতিক পরিমাণে না থাকিলেও আমাদের শরীর বেশী দিন টিকিবে না।

ভাইটামিন **এ** জান্তব চর্বিও উদ্ভিদের সবুজ পাতায় প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভাইটামিন এর অভাবে শরীরের সম্যক পুষ্টি সাধন হয় না। তাই রিকেট শিশুদিগকে ভাইটামিন এ প্রচুর পরিমাণে দিতে হয়। দুধের মধ্যেও ভাইটামিন বেশী পাওয়া যায়। অবশ্য দুধের মধ্যে আমাদের শরীরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি পাওয়া যায়, তাই শিশুকে কেবল মাত্র দুধ খাওয়াইয়া সকল রকমে তাহার পুষ্টি সাধন করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে দুধ খাওয়াইয়া তাহার প্রয়োজনীয় উপাদান গুলি সরবরাহ করা অসম্ভব, তাই বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া খাদ্য একরূপ হইলে মানুষের রুচি বিকৃত হওয়ার দরুণ খাদ্যের গুণ শরীরের উপর কার্যকরী হয় না। বিভিন্ন রূপ রুচিকর খাদ্য পাইলে মানুষের তৃপ্তি হয় এবং খাদ্যের গুণ শরীরের উপর অধিক কার্য করে। তাই খাদ্য যাহাতে তৃপ্তিকর হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

গাছের বীজও **ইষ্ট** (Yeast) নামক, পদার্থে ভাইটামিন **বি** থাকে, **ইষ্ট** প্রধানত চাউলের উপর লালাভ পর্দার সহিত থাকে, তাই মাজা চক্‌চকে চাউল অপেক্ষা আমাজা খস্‌খসে চাউল এবং সরু চাউল অপেক্ষা মোটা চাউল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, অঙ্কুরিত কলাই এর মধ্যে ভাইটামিন **বি** যথেষ্ট থাকে। ভাইটামিন **বি** এর অভাব ঘটিলে বেরি বেরি হয়, আবার তাড়ির গাদ বা জিলাপি ইত্যাদি মিষ্টান্নের খামির মধ্যেও ইহাকে পাওয়া যায়। ডিম এবং টাট্‌কা মাংসেও ভাইটামিন **বি** বর্তমান। সকল ফলে বিশেষত কমলালেবুর রসে ভাইটামিন **সি** পাওয়া যায়; এইজন্য চিকিৎসকগণ শিশুদিগকে কমলালেবুর রস দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুধে অল্প পরিমাণ ভাইটামিন **সি** থাকে; ভাইটামিন সি স্কার্ভি রোগের উত্তম প্রতিষেধক।

মাছ, মাংস প্রভৃতি খাদ্যে নাইট্রোজেন এবং ভাইটামিন বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে টাঁইমাছ, ইলিশ মাছ ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দুধ ও ডাল অবহেলার যোগ্য নয়। অবশ্য দুধের কথা বলা বাহুল্য। মাংসের যে গুণ আছে, ডালে তাহার কোন অংশে কম উপকারী উপাদান নাই। ডালের মধ্যে মুগ, মসুর ও মটর বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য। তাই আমাদের খাদ্যে ডালের ভাগ যাহাতে বেশী থাকে তাহার বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আমরা মধ্যে মধ্যে খিচুড়ি খাইয়া থাকি। ইহা যেমন মুখরোচক তেমনই দেহের পক্ষে **পুষ্টি**কর। তাই মাঝে মাঝে নিয়মিতভাবে আমাদের আহার্যের মধ্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করা মন্দ নয়।

উত্তাপে কয়েক প্রকারের ভাইটামিন নষ্ট হয় তন্মধ্যে **সি** প্রধান, কিন্তু ভাইটামিন **সি** বহুল পরিমাণে থাকে ফলের মধ্যে, যাহাদিগকে কাঁচা খাইতে হয়। অপরন্তু উত্তাপে ভাইটামিন **বি**র কোন অনিষ্ট হয় না।

টাট্‌কা ফল বা সব্জীতে যে ভাইটামিন পাওয়া যায় তাহা অতীব স্বাস্থ্যকর। এই সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া খাওয়া অপেক্ষা যদি টাট্‌কা কাঁচা খাওয়া যাইত

তবে যে ভাইটামিন পাওয়া যাইত তাহা অধিকতর শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর হইত। তাই আজকাল কাঁচা টোম্যাটো ইত্যাদি খাওযাব একটা প্রচলন দেখা যাইতেছে। অবশ্য এই একই কাবণে জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা কাঁচা দুধ শবীরেব পক্ষে বিশেষ উপকাবী। ডিমের মধ্যে ভাইটামিন এবং ফস্ফবাস ছাড়াও অন্যান্য যে প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায় তাহা সম ওজনেব অন্য কোন খাদ্য হইতে পাওয়া যায না। মোবলা মাছ, বাটা মাছ এবং প্রায় সকল মাছেব মস্তিষ্কে ও কাঁচকলায় ফস্ফবাস পাওযা সায়। সন্দেশ মূল্যবান খাদ্য হইলেও শবীবের পক্ষে সাধাবণ খাদ্য অপেক্ষা বহু গুণ পুষ্টিকব।

আবাব যে সকল জীবেব দেহ হইতে আমাদেব খাদ্য পাওযা যায় তাহাদেব জীবন ধাবণেব প্রণালীব উপব আমাদেব খাদ্যেব উপকাবিতা নির্ভব কবে। তাই যে গরু বদ্ধ অন্ধকাব গোযালে থাকে তাহাব দুধ অপেক্ষা ছাড়া গরুব দুধ আমাদেব বেশী উপকাবী।

অনেকের ধাবণা তবকাবীতে কেবল মাত্র জল এবং কযেকটি লবণ ছাড়া— আমাদেব শবীরেব উপকাবী উপাদান কিছুই নাই, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত ধাবণা। জল এবং ববণ তো ইহাতে যথেষ্ট থাকেই, তাহা ছাড়া আহাবে রুচি আনিবার ইহাবা প্রধানতম উপাদান এবং ইহাদের মধ্যেও তবকাবীব উপাদান হিসাবে ভাইটামিন ইত্যাদি পাওয়া যায।

জল এবং লবণ দেহেব পক্ষে এতদূব উপকাবী যে পূর্বোক্ত খাদ্য না পাইলেও মানুষেব পক্ষে কিছুদিন বাঁচা সম্ভব হইতে পাবে কিন্তু জল না হইলে দু-একদিন বাঁচা চলে না এবং লবণ না হইলে শবীবেব কার্য চলা অসম্ভব। লবণ বক্তকে শবীর মধ্যে নিযমিত ভাবে প্রবাহমান বাখিতে পাবে। কলেবা বোগের সময তোমবা হযত লক্ষ্য করিযাছ অধিক ভেদ এবং বমনেব জন্য দেহেব বক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া আসিলে লবণ জল দেহ মধ্যে প্রবেশ কবান হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে শাবীব যন্ত্রেব বিভিন্ন অংশ হইতে বিভিন্ন বস নির্গত হইয়া বিভিন্ন প্রকাব ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করিযা কিয়দংশ শবীব গঠন কার্যে লাগাইয়া দেয়,

খাদ্যের বাকি অপ্রয়োজনীয় অংশ মলরূপে আমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। অতএব আমাদের আহার্যের মধ্যে এমন পদার্থ থাকা চাই যাহারা ঐ সকল রস অধিক পরিমাণে নির্গত করিবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে।

সংক্ষেপ :—পরিশ্রম ও অন্যান্য কারণে শরীরের ক্ষয়পূরণ ও শরীর বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন—ইহা আমাদের দেহের উত্তাপ যোগায়। অতএব আমাদের শরীরে যে যে উপাদান যে যে পরিমাণে থাকে, খাদ্যের মধ্যে সেই সেই উপাদান সেই সেই পরিমাণে থাকা আবশ্যক। সেই হিসাবে খাদ্য ছয় প্রকার—কার্বোহাইড্রেট জাতীয়, প্রোটিন জাতীয়, জল, লবণ জাতীয় ও ভাইটামিন, অবশ্য উহাদের প্রায় সকল গুলিই আবার বহু প্রকারের হইতে পারে। দুধ মাছ, মাংস, ডিম, আনাজ ও তরিতরকারী, শাকশব্জী, ফলমূল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য হইতে বিভিন্ন উপাদান পাই। সেইজন্য আমাদের খাদ্য কেবল মাত্র এক রকম হইলে চলে না বিভিন্ন প্রকারের হওয়া চাই। অবশ্য কোন কোন খাদ্যে উপাদানগুলির অধিকাংশই বিদ্যমান থাকে, যেমন দুধ, তাই বলিয়া কেহ কেবলমাত্র দুধ খাইয়া থাকিতে পারে না, রুচির জন্য খাদ্য রকমারি হওয়া দরকার।

তৃতীয় প্রশ্নমালা

১। আমাদের খাদ্যে প্রয়োজন কেন? খাদ্যের প্রধান প্রধান উপাদান কি? (Why do we need food? What are the important ingredients of food?)

[কঃ বিঃ ১৯৪০]

২। ভাইটামিন কয় প্রকার ও শরীরের পক্ষে তাহাদের উপকারিতা কি লিখ। (Write how many kinds of Vitamin there are and what their actions are on our bodies)

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যে শরীরের উপকারী কি কি উপাদান পাওয়া যায়—কমলালেবু, ডিম, মাংস, টোম্যাটো, মাছের মুড়া, সন্দেশ, কাঁচকলা ও দুধ? (What ingredients useful for our bodies are there in the following —Oranges, eggs, meat, tomato, head of a fish, Sandesh, green banana and milk?)

পরিভাষা

পদার্থ-বিদ্যা—Physics

অন্তরক—Insulator ১৪৯
অপরিবাহী—Non-conductor ১৪৯
অভিলম্ব—Normal ১১৩
অভেদ্যতা—Impenetrability ২
অস্বচ্ছ—Opaque ১০৪
আপতন কোণ—Angle of incidence ১১৩
আপতিত রশ্মি—Incident ray ১১৩
আপেক্ষিক গুরুত্ব—Specific gravity ৪১
আলোক—Light ১০৫
অ্যাম্পিয়ার—Ampere ১৫২
ঈথার—Ether ৬৭
উপচ্ছায়া—Penumbra ১১০
ঊর্ধ্বচাপাবশেষ—Resultant upward thrust ৪৩
উষ্ণতা—Temperature ৫৭
ওজন—Weight ২
কপাটিকা—Valve ৩৬
কাল—Period ৯৭
কলাই—Electro-plating ১৫১
কাঁচা লোহা—Soft iron ১৪০
গতিশক্তি—Kinetic energy ১২৯
গরিষ্ঠ থার্মমিটার—Maximum thermometer ৬৩
গাঢ়নীল—Indigo ১২৯
চাপ—Pressure ১৪, ২৮
চালকপাথর—Lodestone ১৩৫
চুম্বক—Magnet ১০৫
ঐ স্বভাবজ—Natural magnet ১৩৫
চুম্বকীকরণ—Magnetisation ১৪০
চুম্বকশক্তির আবেশ—Magnetic induction ১৩৮
ছিপি—Cork
জড়তা—Inertia ২
টুনি—Bulb ১৫০
টেলিগ্রাফ—Telegraph ১৫৫
তড়িৎ—Electricity ১৪৫
তড়িৎকোষ—Electric cell ১৪৫
তড়িৎ ঘণ্টা—Electric bell ১৪৫
তড়িৎ প্রবাহ—Electric current ১৫১
তড়িৎ চুম্বক বা বৈদ্যুতিক চুম্বক—Electromagnet ১১৪
তাপ—Heat ৫২
তেপলা কাচ—Prism ১২৮
থার্মমিটার—Thermometer ৫৮
দিগ্‌দর্শন যন্ত্র—Compass ১৪১
দোলক—Pendulum ৯৬
দোলক পিণ্ড—Bob ৯৭

রসায়ন-বিদ্যা—Chemistry

ভূবিদ্যা—Geology

উদ্ভিদ-বিদ্যা—Botany

প্রাণী-বিদ্যা—Zoology

শারীর-বিদ্যা—Physiology